সবুজ বাংলা

বিজয়ী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৮৪ ১১ই মার্চ, ১৯৭৮	২৩ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

এবং

সুভাষ

আলো জ্বেলেদে

বাবা, শুধু আলো জেলে দে রে, আলো জেলে দে ! লোকে অন্ধকারে কানা হয়ে গেল। একবার তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করে দে বাবা ! তখন তারা আপনি বুঝবে, কোন্‌টা কালা, কোন্‌টা ধলা !

—পৃষ্ঠা ১৫

রাজনৈতিক পর্যালোচনা

গণতান্ত্রিক প্রশাসন ও মানুষের প্রত্যাশা

স্মরণীয় যাঁরা

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা

গ্রাম-বাংলা

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রাম-উন্নয়ন ভাবনা

ARCHIVE

বিপ্লবী পরিষদের গ্রন্থমালা

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ধাস—৩'০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার—১'০০

প্রাপ্তিস্থান :—৪৯বং বলরাম ধাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

ক্ষীরোদ কুমার দত্ত প্রণীত

বিপ্লবী পুস্তকমালা

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১'৫০

২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮'০০

৩। অনুশীলন সমিতির বি, মিত্তির—২'০০

৪। গেরিলা সংগ্রাম কাহিনী—১'৫০

৫। কানাইলী শহীদত্বয়—১'২৫

৬। কলতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—'৫০

৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—'৬০

৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—'৫০

৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—'৬০

১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—'৫০

১১। মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—'৫০

১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—'১৫

১৩। দেশ যাদের ভোলেনি (১)—১'০০

১৪। দেশ যাদের ভোলেনি (২)—২'০০

১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—'৫০

১৬। ১৯৪ এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—[illegible]

১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—'১৫

১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৫'০০

১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—'৫০

২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১'৫০

বিপ্লবী পরিষদ—৪৯বং বলরাম ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭

বৈশাখী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

সম্পাদকীয়

শোচনীয় পরিস্থিতি

দিনে দিনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পরিস্থিতি একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। জীবনের প্রতি স্তরে মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। চলাফেরা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। যানবাহনের অভাব মানুষকে এমন পীড়িত করে তুলেছে যে পথে বেরিয়ে মনে হয় প্রদেশটা যেন একটা পরিকল্পনা-নীতির শিকার হয়েছে। আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা না করলে একটা গাড়ী পাওয়া যায় না। তারপর দীর্ঘ যাত্রাপথে একটি যদি আসে, তাতে ওঠার সাধ্য কারো থাকে না। বিশেষ করে মহিলা, বৃদ্ধ ও শিশুদের ত কথাই নেই। নির্দিষ্ট সময়ে অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ বা কর্মস্থানে সময়মত উপস্থিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কুড়ি পঁচিশ মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করতে হলে, হাতে একঘণ্টা সময় নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়, চব্বিশ ঘণ্টার একটা দিনে সময় কুলিয়ে ওঠা কষ্ট। তারপর জিনিসপত্রের দর তো আকাশে বসে আছে, সেখান থেকে মানুষের কমবার কোন লক্ষণ নেই। মাছ মাংসের দরের কথা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ দুটি ডাল ভাত তরকারী যোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ সঙ্কট এমন ঘনীভূত হয়েছে শীতের সময়, যে গরম কালের কথা ভাবলেই আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যুৎ-এর অভাব সুদূরপ্রসারী ভয়ঙ্কর দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অথচ যথেচ্ছা বিলের টাকা দিতে বাধ্য হতে হচ্ছে। ক্ষেতে খামারে বিদ্যুৎ-এর অভাবে, চাষবাস করা সম্ভব হচ্ছে না। গোটা বোরোধানের চাষ মার খাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন শাসকদলের অন্যতম শরিক-দলের প্রতিনিধি। কলকারখানার উৎপাদনও ব্যাহত হতে বাধ্য। পানীয় জল সরবরাহ বিঘ্নিত হতে বাধ্য। তবে কলকাতার মানুষ বিশেষ করে এবং গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ বাঁচবে কি করে? গোটা রাজ্যটা কি বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে না? এর ফলে, ব্যাপক ভাবে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে বাধ্য। এর প্রতিকার করতে না পারলে, যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন, তাদের গদী আকড়ে থাকবার কি কোন অধিকার থাকতে পারে? এই সব অব্যবস্থা ও দুঃসহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সরকার কি প্রচেষ্টা করছেন, তাও মানুষকে জানান হচ্ছে না। প্রকৃত সরকারের কোন অস্তিত্ব আছে কি না, সেটাই লোকের জিজ্ঞাস্য হয়ে উঠছে। অথচ প্রচণ্ড একটা সোরগোল তোলা হচ্ছে এবং এই পশ্চিমবঙ্গই তার প্রধান উৎস, যে আরো ক্ষমতা না পেলে কিছুই করা যাবে না। যা ক্ষমতা রাজ্যের হাতে আছে, তারই সাহায্যে এর প্রতিবিধান করা সম্ভব বলেই মানুষ মনে করে। এতদিনে কোথায় এর গলদ সেটা খুঁজে বের করতে তো আরো ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ক্ষমতার অপ্রাচুর্য্যের জন্য সরকারকে বিফল হতে হয়েছে,

সেকথা পরিষ্কারভাবে জনসাধারণকে জানাবার কর্তব্য তারা পালন করেছেন কি? সুষ্ঠু প্রশাসনের অস্তিত্ব প্রমাণ করার মত কোন্ কাজ তারা এ যাবৎ করেছেন, তার জবাবও দাবী করে মানুষ অত্যন্ত সঙ্গত ভাবে। বেঁচে থাকবার দাবী নিয়ে এই দাবী তারা চান সরকার পক্ষ থেকে। শুধু বড় বড় কথা, বড় বড় আশা দিয়ে কত দিন চলবে? যত দোষ নন্দ ঘোষ, এই কৈফিয়ৎ অচল। সব ব্যর্থতার গ্লানি বিগত দিনের শাসকদলের উপর আরোপ করে বসে থাকলেই কি বর্তমান সরকার অব্যাহতি পাবেন? দলীয় স্বার্থ সাধনই কি একমাত্র উদ্দেশ্য? কোটী কোটী মানুষের এই চরম দুর্দশার লাঘব কি কোন মতেই হবে না? দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা তারা প্রার্থনা করুন। মানুষ সেই আবেদনে সাড়া দেবে নিজের অস্তিত্বের জন্যই। তবে সে আবেদন আন্তরিক ও অকৃত্রিম হওয়া দরকার। আর একটা কাজ অবশ্যকরণীয় বলে আমরা মনে করি। নিত্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি করা বন্ধ করতে হবে; পুরাণো সমস্যাগুলির অবশ্য সমাধান করতে হবে। যতদিন সেদিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সক্ষমতা লাভ না করতে পারেন, ততদিন পুঁথিগত মতবাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার বিকল প্রচেষ্টা থেকে একটু সংযত থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। এদেশে একটা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা সবাই লক্ষ্য করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। সাধারণ মানুষের ভোট পেয়ে যারাই ক্ষমতায় আসেন, তারা এসেই সাধারণ মানুষের মতামতের মূল্য দিতে অনেক সময়ই ভুলে যান এবং দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু দেশের কয়টী মানুষ কোন্ দলের সভ্যতালিকাভুক্ত, এটা তারা খতিয়ে দেখেন না। উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে চাকুরী বণ্টনের ব্যবস্থাটাকে। এই বেকারী-জর্জরিত দেশে সব চাকুরীই যদি দলীয় সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, তবে দলের বাইরে যে অসংখ্য মানুষ আছেন, তাদের উপায় কি হবে? আমাদের নিকট খবর আছে যে বহু বিভাগে চাকুরী-প্রদান ব্যবস্থাটাকে বন্ধ রাখা হয়েছে গত কয়েকমাস ধরেই। এর কারণ বুদ্ধির অগম্য। এ ক্ষেত্রে যদি মানুষ মনে করে দলীয় লোক বাহাল করার কাজ শেষ না হলে, কর্মসংস্থানের বন্ধ দুয়ার খুলবে না, তবে কি খুব ভুল করা হবে? গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী আবার এই দলবহির্ভূত বহু মানুষের নিকটই ভোট ভিক্ষা করতে যেতেই হবে। অবশ্য মানুষের স্মৃতিশক্তি খুবই কম বলে একটা কথা শোনা যায়। নির্বাচনের মুখে আবার বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিলে তারা সব অপরাধ ক্ষমা করবে, এই ভরসার উপর নির্ভর করলে তরাডুবি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। তার প্রমাণও অনতি-দূরবর্তী কালে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। জনতার রুদ্ররোষ জেগে উঠ্‌লে, কি অসাধ্য সাধন তারা করতে পারে, তার প্রমাণ পেতেও বেশী দূরে যেতে হবে না। সর্বনাশের অতলতলে ডুবিয়ে দেবার জন্য কোন দল বা নেতৃত্ব যদি সিদ্ধান্ত নেয়, তবে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য এবং এই ঐতিহাসিক সত্য যে এই পথ বেছে নিলে, তাদেরই সর্বনাশ হবে সকলের আগে। আমরা প্রার্থনা করব, বিলম্বে হলেও, এখনই শাসকদলের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে এবং এখনই যথাকর্তব্য তারা পালন করবেন। বাঁচতে হলে জনকল্যাণ ও জনসেবার পথ বেছে নিতেই হবে, নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা।

চিকিৎসা সঙ্কট

শ্রীসতীভূষণ সেন

সে দেখেছি আমাদের ছেলেবেলায়। সেই তুলনায় দেশটা বড় বেশী বদলে গেছে। তখনকার দিনে 'ঠাকুর মা'দের ওষুধই ছিল চালু, ছেলেপিলেরা তাতেই ভাল হয়ে যেত। বাড়ীতে কদাচিৎ পড়ত ডাক্তারবাবুর পদধূলি। আজকের দিনে কোন ভদ্র পরিবারের বাড়ী ঢুকুন, দেখবেন টেবিলটি হরেক রকম ওষুধে ঠাসা। ছেলে বুড়ো যখন তখন আসছে, মুড়ি মুড়কির মত একটা দুটো পিল মুখে দিচ্ছে। কারো রক্তে শুগার, কারো রক্তে প্রেশার। মাসকাবারি বাজেটের, টাকার দশ পয়সা যাচ্ছে ওষুধে। পশ্চিমীদেশে শুনেছি শরীরটাকে সুস্থ রাখবার মাশুল দিতে হয় বাজেটের চতুর্থাংশ। যেন ওষুধ খাওয়ার জন্যই আমাদের জীবন ধারণ, শুধু কোম্পানীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই আমরা বেঁচে আছি।

সেদিন একটা অদ্ভুত কথা বলে বসলেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেকটার জেনারেল Dr. H. Mohler। বললেন, "মানুষের যত অসুখ হয়, তার নব্বই ভাগই ভালো হয়ে যায়, বাজারের চালু ওষুধের শতকরা দু-ভাগ দিয়ে। এই দুভাগ ওষুধ অপরিহার্য; না হলে আমাদের চলে না। এই রকম Essential drugs আছে শ' দুয়েক। বাদ বাকি যে হাজার হাজার ওষুধ বাজারে চলছে, তার কোন প্রয়োজন নেই। দেখতে শুনতে ভাল, সাজ পোষাক চটকদার, খেতেও মন্দ নয়, এই পর্য্যন্ত। পাঁচমেশালী [Multinational] ওষুধ কোম্পানী শুধুমাত্র তাদের High Pressure Salesmanship এর কৌশলে আমাদের পকেট মারছে,"—তাইতো এবারকার বাজেটে অর্থমন্ত্রী প্যাটেলের নজর পড়েছে ওদিকে। ঠুকে ট্যাক্স বসিয়েছেন বিক্রয়ে দক্ষতার উপরে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে, অবস্থা ছিল অন্যরকম। অল্প কয়টা ওষুধ ছিল বাজারে, ডাক্তারবাবুরা তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। আমরা সুস্থ হয়ে উঠতাম। মেয়াদ আর ফুরিয়ে গেলে আর কি করা যাবে। নইলে কিছুদিন ভুগে, দুচার দিন বিশ্রাম নিয়ে, আবার কাজকর্ম সুরু করতাম। সেই সময়কার একটা গল্প বলে নিই, বেণী ডাক্তারের গল্প। ছোট একটা গল্প, বেশী সময় নেব না। বেণী ডাক্তারকে যারা চেনেনি তার অল্প কিছু এখনো অবশিষ্ট। তাছাড়া, সে যুগের চিকিৎসা পদ্ধতির কথা এই স্বাধীনতোত্তর যুগে অল্প মানুষই জানেন। তাই গল্পটা বলেই ফেলি।

প্রেমানন্দের মা ছিলেন আমাদের 'ন্যাও জেড্ডি'। কিছুদিন ধরে অসুস্থ। ওর ডাকেই বিছানায় উঠে বসলেন। ম্লান হেসে বললেন, "কি আর দেখতে এসেছেন, আমার তো কিছুই হয়নি!—কেন, বেণী ডাক্তারই তো বলে গেলেন।—দেখুন তো, আমি মরছি অসুখের জ্বালায় তিনি করছেন ঠাট্টা। ওষুধ দিলেন না, দিলেন মন্ত্র। আবার খোঁচাটুকু দিতেও ভুল হল না। বললেন, 'আপনারা আবার ব্রাহ্ম, মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করেন কি? যদি করেন এই মন্ত্রটা জপ করবেন'। এখন শুয়ে শুয়ে জপ করছি—Every day, hour after hour I am getting better and better."

বেণীবাবু ছিলেন সহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। রবি বর্মার ছবির রমণীদের মত, এক মুখ দাড়ি, শিল্পীর ভাসা ভাসা চোখে সাধকের নিষ্ঠা। ডেকে গেলে যেতে রাজি। রোগীর দিকে চেয়ে যেন বোঝার চেষ্টা করছেন ভেতরে প্রাণ আছে কিনা খুঁজতেন বুকে স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখতেন রোগীর বাঁচবার আগ্রহ বা will আছে কি নেই। যত ভাল ডাক্তারই চিকিৎসা করুক, আর যত অভিজ্ঞ নার্সই করুক শুশ্রূষা, রোগের সঙ্গে লড়াই করবে তো রোগী নিজে, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও সুস্থ হবার আগ্রহ নিয়ে। তা যদি না থাকে, দামি ওষুধ সব জলে যাবে।'

এই High Pressure Salesmanship এর যুগেও সব ডাক্তারই কিছু আর কোম্পানীর লিটারেচার খুলে চোখ বুঁজে প্রেসক্রিপশন লেখেন না। পারিপার্শ্বিক stress এর কথা মনে রেখে ওষুধের চেয়ে বেশী দেন পরামর্শ। 'অনেক তো খাটলেন সারাজীবন, এবার কাজকর্ম কমিয়ে ফেলুন। Dont worry, dont hurry dont carry, dont সিডি'। আমাদের অসুখের ৭০ ভাগই আসে Stress থেকে। সত্য হয়ে উঠছি তো, তারই ফলশ্রুতি। ভেবে ভেবেই আমরা অসুখ সৃষ্টি করে বসি।—'যদি অসুখ হয়েছে বিশ্বাস করে শুয়ে পড়তে পারি, অসুখ হবেনি বিশ্বাস করতে পারলে তো সুস্থও হয়ে উঠতে পারব'। বলেছেন Dr. Irving Oyle। তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির

মূল—সচেতনতার শক্তি দিয়ে দেহকে প্রভাবিত করা [Power of Consciousness to influence the body]। তিনি বলেন তাঁর যুগের চিকিৎসক ওষুধের উপর নির্ভর করবেন না, করবেন প্রধানতঃ রোগীর মানসিক শক্তি উদ্বুদ্ধ করার উপরে। তাই বলে আমার আপনাকে ভৌতিক চিকিৎসকের হাতে ফেলবেন না। আমি একজন অতীব নিরীহ পারিবারিক চিকিৎসক মাত্র, একেবারে বিশুদ্ধ family Physician। একটা আইডিয়া ঢুকেছে মাথায়, তাড়াবেও যাব না। তাই নিজের মত করে একটু রিসার্চ করছি। একই অসুখ, একই ওষুধ দিই, একজন ভাল হয়ে ওঠে, একজন ওঠে না। কেন এমন হয় তারই আসল কারণটা খুঁজে বেড়াই'।

তার মানে আত্মশক্তি। এইখানে একটু সাবধানে পা ফেলতে হবে। একটু এদিক ওদিক পা পড়লেই একেবারে আধ্যাত্মশক্তি বা Psychic Phenomenaর জগতে গিয়ে পড়ব। আজকাল এর নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'the world of PSI'। এই 'PSI'র জগৎটা আমাদের পরিবেশ বা Conditioning থেকে বিচ্ছিন্ন। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে এই জগৎটার সন্ধান পাওয়া যায় না, বিশ্বাস করি কি করে? লেখাপড়া শিখেছি, বটগাছের ডাল থেকে ফুরুৎ তাড়িয়েছি, পুরানো বাড়ী থেকে ইঁদুর দিয়েছি খেদিয়ে, সে কি, অবশেষে PSI এর শক্তিতে বিশ্বাস করবার জন্য? অথচ তাবড় তাবড় সাহেব বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন, একেবারে যে উড়িয়ে দেব সব, সে সাহসও নেই। যেটা নিয়ে রোজ কারবার সেই মনের রেকর্ডনীয়ত্বের কি কোন ব্যাখ্যা পেয়েছি? যন্ত্রকে কি স্পর্শ করতে পারি? তার কি ওজন আছে? মনের অবস্থান কোথায়, সে বিষয়েই কি বিজ্ঞান নিঃসন্দেহ? অথচ মন যে আছে, সেটা তো অস্বীকার করতে পারি না।

বিজ্ঞানের জানতে এখন পর্যন্ত আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক বিষয়গুলি স্বীকৃত হয় নি। PSI রয়ে গেছে প্রবল বিতর্কমূলক বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞানের আইন কানুন বড় কঠোর। পরীক্ষাগারে পরীক্ষার পরেই তর্কাতীত স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। অল্প কিছুদিন আগে একজন বৈজ্ঞানিক ও সাধুর মধ্যে বিতর্ক আরম্ভ হতে হতে থেমে গেছিল। বৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জ করেছিলেন সাধুকে, উত্তরে সাধু বলেছিলেন "Physic ব্যাপারগুলো সবসময় সকল অবস্থায় পরিষ্কার হয় না। যখন খুশী আসে যখন খুশী চলে যায়। লেবরেটারীতে পরীক্ষা করার মত বস্তু নয় এটা।" যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা যে সব ঘটনা অহরহভাবে মিলে গেছে, সেই সব অলৌকিক কাহিনীই প্রচার করেন। যা মেলে নি, সেগুলো বেমালুম ভুলে যান। তাই Statistics বা পরিসাংখ্যিক হিসেব নিয়ে, কত পারসেন্ট মিললো আর কতটা হল গরমিল, তা বের করা সম্ভব নয়। Data সংগ্রহ করারও অসুবিধা আছে। সবারই তো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নেই।

সাধারণ গেরস্থ মানুষ এই সব অলৌকিক ব্যাপার দেখলে ভয় পেয়ে যান। মনের গোপন কক্ষে ভূলুণ্ঠ এঁটে আটকে রাখতে চান ওদের। শেষটায় যখন আর পারেন না, তখন হয়ত 'সাধু' বা 'ভণ্ড সাধু'র পায়ে পড়ে বলেন, "আমার স্বপ্ন এমন সত্য হয়ে উঠছে কেন বাবা? যা স্বপ্নে দেখি তাই সত্য হয়ে ফলে যায়! আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?"—জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আমরা গুরুর সন্ধান করি, সুযোগ নিয়ে ভণ্ড হাতুড়ে পণ্ডিতরা আমাদের প্রতারণা করে। সহজবুদ্ধি মানুষ অলৌকিক কিছু দেখলেই ভক্তিতে আপ্লুত হই, ম্যাজিক ও যৌগিকে তাল গোল পাকিয়ে ফেলি। বিশ্বাস করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই গুরুর কাছে যাই কিনা, তাই আমাদেরকে প্রতারণা করা সহজ।

কিন্তু প্রতারক আছে বলেই, দুনিয়ায় সবাই কিন্তু প্রতারক নয়। মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে অনেক খাল বিল পড়েছে। সাঁকো বেঁধে সেই সব অতিক্রম করেছে মানুষ। আজ হয়ত একটা void বা শূন্যের কিনারে এসে গতি স্তব্ধ হয়েছে, তাই বলে পথ একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না, সে কি একটা কথা! আগামীকাল হয়ত আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জেগে উঠবে, পৃথিবীর যে কোন স্থানের সঙ্গে আমরা যোগসূত্র স্থাপন করতে পারব। স্থান ও কালের বাধা অতিক্রম করে ছুটিয়ে দিতে পারব মনের রথ। অতীত ও ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণ দেখতে পাব সম্মুখে, যেমন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আজ শুধু বর্তমানকে। (আইনষ্টাইন তাঁর 'আপেক্ষবাদ' বা Relativity তত্ত্বে, কাছাকাছি পৌঁছে গেছিলেন শুধুমাত্র আঁকের সাহায্যে।)

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জেগে উঠলে, তখন কি মেয়ের অসুখ থাকবে, না চিকিৎসার জন্য ওষুধের দরকার হবে?

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[দ্বিতীয়বার বিলেত গমন ও ১৮৭৫—১৮৮২ সালের ঘটনাবলী]

১৮৭৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৮৭৫ সালের যে পর্য্যন্ত আমি ইংল্যাণ্ডে ছিলাম। এই ছেচ্ছ মাস আমি যেরূপে কাটিয়াছি। আমার বাস গৃহ ছিল হ্যাম্পটন কোর্টের নিকট ইষ্ট মোলেসে গ্রামে। সারাদিন পড়াশুনা করেই কাটিয়েছি। যে কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য সফর গ্রহণ করেছি সেই কাজে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার মত প্রয়াসি অধ্যয়ন করেছি। সকাল বেলার ব্রেকফাষ্টের পরে বেলা ১০ টা থেকে রাত আটটায় ডিনারের সময় পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করেছি। এমন সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করেছি, যা আমার হৃদয়ে আমার জীবনের ব্রতে প্রেরণা যোগাবে, উৎসাহ দিবে শক্তি সামর্থ্য সঞ্চার করবে বলে আমি মনে করেছি। সেই পঠিত গ্রন্থরাজি থেকে প্রচুর পরিমাণে নির্দেশিকা সহ নোট রেখেছি। সেগুলি এখনও আমার কাছে আছে, মধ্যে মধ্যে আমি লণ্ডনে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছি এবং বারে যোগদানে আহুত হওয়ার জন্য কি করতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু একথা বলা অতিরঞ্জন হবে না যে আমি পুস্তকের মধ্যেই পুস্তক পাঠের মধ্যেই ডুবে রয়েছিলাম। পুস্তক পাঠের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত মহান গ্রন্থকারের সঙ্গলাভ করেছি তার চেয়ে বেশী আনন্দ আর কিছুতেই পাই নি। প্রতিদিনই তাঁদের এই সঙ্গলাভ করেছি। এই এক বছর কাল ছিল আমার প্রস্তুতির কাল ১৮৭৪ এপ্রিল থেকে ১৮৭৫ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত। দারুণ পরিশ্রম করেছি এই শিক্ষালাভ কালে। আমার জীবনে এই শিক্ষালাভ কালটি ছিল অতি মূল্যবান। পিছনে ফিরে যখন এই শিক্ষাকালের কথা স্মরণ করি তখন অপরিসীম আনন্দ বোধ করি। যে বিষয় ভাব এত দিন আমাকে ঘিরে রেখেছিল, তা কেটে গেছে, নতুন দৃষ্টি খুলে গেছে। একটা পতিত জাতির সেবায় নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এই শিক্ষালাভের সময়টা ছিল আমার কাছে এক অদ্ভুত প্রেরণা চালিত নিরবচ্ছিন্ন কাজের সময়। আমার অন্তরে যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে, তাতে আমি আমার উদ্যম ফিরে পেলাম; ফিরে পেলাম জীবনের আনন্দ যা আমাকে উল্লসিত করে তুলল: মনে হল পেলাম এই ছেড়ে যে সব কিছুই হারায়নি: এখনও আমার অনেক কাজ করার আছে হয়ত সে কাজ পূর্বের চেয়ে আরও দুরূহতর, মহত্তর ক্ষেত্রে। মৃত্যু থেকে জীবন আসে: পুনর্জন্ম জীবন, মহত্তর পুনরুজ্জীবন। আমার ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে।

১৮৭৪ সালে দেশে ফিরে এলাম। এখন আমি সকলের বিবেচনায় একজন সম্ভ্রান্ত লোক। কেবলমাত্র আমার স্ত্রী এবং আমি নিজে তা ভাবিনি। আমি দেশে ফিরে এলে আমার স্ত্রী আমাকে প্রফুল্লচিত্তে সহাস্য বদনে গ্রহণ করেন। এখানে মুহূর্তের জন্য একটুখানি থেমে আমার প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি আমার প্রেম ও সম্ভ্রমের অর্ঘদান করছি। আজকাল সৌভাগ্যক্রমে মহিলারা যে রকম শিক্ষালাভ করে থাকেন, তাদের সমশ্রেণীর ও পর্য্যায়ের লোক হয়েও আমার স্ত্রী সে কালে সে রকম কোন শিক্ষালাভ করেন নি। কিন্তু তার সাধারণজ্ঞান, মমতা ও সাহস ছিল অনন্য সাধারণ। তিনি দৃঢ়ভাবে এই ঘোর সঙ্কটকালে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং কখনও ভাবেন নি যে আমরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছি বা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছি। অতীতে যা ঘটেছে তা নিয়ে একবারও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেননি বরং সাহসের সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়েছিলেন। তার এই সাহস ও আত্মবিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত ছিল বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

১৮৭৪ সালে কলকাতায় ফিরে এসে। এখন কি

করব? কি করে জীবিকার উপায় করব এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের জন্যও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কাজ করব? যতদূর দৃষ্টি যায় সব যেন কাপসা লাগে। কোথাও যেন আশা ভরসার কিছু দেখা যায় না। সব দিকেই দরজা বন্ধ। বারে যোগ দেওয়ার কোন উপায় ছিলনা কিবা উকিল কি বা ব্যারিস্টার, কোন ভাবেই না। ওই ব্যবসার পথটাই আমার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। এমন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানও ছিলনা যেখানে গিয়ে ঢুকতে পারি, তবে আমি অবিলম্বে জনসেবামূলক কাজে যোগ দিতে আরম্ভ করলাম, আমার কলকাতায় ফিরে আসার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মেডিকেল কলেজের বক্তৃতা ঘরে মদ্যপান নিবারণ আন্দোলনের প্রসার কল্পে এক সভা হয়। সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়। মদ্যপান নিবারণের বিষয়টি সেদিনে লোকের মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল। এই আন্দোলনের হোতা প্যারীচরণ সরকারের শ্রম সার্থক হতে চলেছে। আন্দোলনটি ছিল খুব জীবন্ত। উঠতি নবীন বংশধরদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মদ্যপান আধুনিক যুবক যেন বাস্তব তেমনি অমঙ্গল সূচক। মদ্যপানের লোভনীয় প্রভাব থেকে তাদের বাঁচাতেই হবে। গত প্রজন্মের কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তি এই মদ্যপানের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাঁই জনগণের মধ্যে এই ব্যাপারে আগ্রহ খুব বেশী করে প্রকাশ পেল এবং তারা দলে দলে এসে সভায় যোগদান করেন। আমাকে সভায় কিছু বলতে বলা হল। প্রকৃত পক্ষে কলকাতায় কোন বড় সভায় এটাই আমার প্রথম বক্তৃতা। শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারলাম। পরের দিন সকালে এক বন্ধু আমাকে জানালেন যে কলকাতার সর্বজন স্বীকৃত বক্তাদের মধ্যে আমি স্থান পেয়ে গেছি।

কিছুদিন বাদে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউটে ইংরেজীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করতে চাইলেন। আমি সে কাজ গ্রহণ করলাম। আমার বক্তৃতা আমাকে ছাত্র মহলে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। আমার মনে হয় আমার এই পদ পেতে তা সাহায্য করেছে। বেতন ছিল পঁচাত্তর, মাসে মাত্র দুশত টাকা। এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে যে বেতন পেতাম এ বেতন তার অর্ধেকেরও কম। কিন্তু আমি এতেই খুসী ছিলাম, এই মনে করে যে যা হোক একটা কিছু কাজ তো পেয়েছি। তা ছাড়া এটা একটা সুযোগ বটে যা আমি পুরোদমে কাজে লাগতে পেরেছিলাম আমার শক্তি সামর্থ অনুযায়ী ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের উদ্বোধন করতে প্রয়াস পেয়েছি। এতে তাদের যেমন মঙ্গল হবে, মাতৃভূমির কল্যাণ হবে। সেকচার দিয়ে আমি অধ্যাপকরূপে আমার আশু কর্তব্য যা ছিল তা পালন করতাম। কিন্তু আমি মনে করতাম এর চেয়েও বড় কিছু করার আহ্বান আমার প্রতি আছে। ইতিপূর্বে ইয়ংবেঙ্গল এসোসিয়েশন গড়ে উঠেছিল। আমি তার একজন অতি সক্রিয় সদস্য হলাম এবং বিভিন্ন কলেজে পরিপোষক সংস্থা রূপে তার শাখা সমিতি গড়ার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলাম।

অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার ছাত্র মহলকে নতুন উৎসাহে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছি। আমি কলকাতা উত্তরপাড়া, হিন্দিপুর এবং আরও অনেক জায়গায় বক্তৃতা করেছি। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতীয় ঐক্য, ইতিহাস অধ্যয়ন, ম্যাৎসিনির জীবনী, চৈতন্যের জীবনী, উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা ইত্যাদি। বক্তৃতা করার জন্য আমার নানা স্থান থেকে খুব ডাক আসতে থাকে, সে ডাকে আমি সাধ্যমত সাড়া দিয়েছি, ছাত্রদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলো, আর এই ঘনিষ্ঠতাকে আমি আমার অন্তরের মহামূল্য সম্পদ বলে মনে করেছি। এই সময় সভায় সে সময়ে যারা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিঃ বি. চক্রবর্তী, স্বামী বিবেকানন্দ, মিঃ নন্দ কিশোর বোস, মিঃ এস. কে. আগস্তি এবং অন্যান্য অনেকে।

১৮৭৩ সালে সিটি কলেজ স্থাপিত হয়, কোচবিহারের মহারাজার সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ-নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এই মতভেদের ফলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ফলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সৃষ্টি হয়, সিটি কলেজ গড়ে ওঠে এবং এই ব্রাহ্মের

আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয়। এই বিরোধী আন্দোলনের নেতা ছিলেন আনন্দ মোহন বসু শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ। সিটি স্কুলে টিউটোরিয়াল হাউসে যোগদান করার জন্য আমাকে আহ্বান জানান হয় (তখনও পর্যন্ত স্কুলটি কলেজে উন্নীত হয়নি)। আমি সানন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। এতে আমার উপার্জনও কিছু বাড়ল, আর ছাত্র সমাজের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রও প্রসারিত হল।

আমার কাজ এখন বড় কঠিন হয়ে পড়ল, ছাত্রদের মধ্যে আমার প্রচার কার্য্য চালান ছাড়াও চার ঘণ্টা করে ক্লাসে পড়াতে হত। তার উপরে আবার ছিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পর্কে আমার রাজনৈতিক কাজকর্ম, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কাজে অতিমাত্রায় অনুরক্ত ছিলাম। কিন্তু কোন সময়েই এই শ্রম বা অবসরাভাবের জন্য আমার মনে কোনরূপ অসন্তোষ ছিল না। কাজের উত্তেজনা জীবনে আমাকে আনন্দই দিয়েছে এবং নৈরাশ্য, পরাভব ও বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তা আমাকে উজ্জীবিত রেখেছে। এমন কি, এখনও এই বয়সে, এই পঁচাত্তর উর্দ্ধ বয়সেও কাজের উত্তেজনার আকর্ষণ এমন প্রবল যে কেবলমাত্র স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই নিজেকে সংযত রাখতে হয়।

একটা কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময়ে আমি একটা চাকরীর প্রস্তাব পাই। এই চাকরী যদি আমি সে সময়ে গ্রহণ করতাম তা হলে আমার সমস্ত জীবনের গতি বদলে যেত। ত্রিপুরা রাজ সরকারে আমি এই চাকরীর প্রস্তাব পাই। চাকরীর কাজটি ছিল বোধ হয় ইংলিশ সেক্রেটারীসিপ। মাসিক বেতন ছিল সাতশত টাকা। এই সময়ে আমি যে কাজ করতাম তাতে আমার মাসিক আয় ছিল মাত্র তিনশত টাকা। তাছাড়া সেই কাজে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতেও কোন উল্লেখযোগ্য বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। যা হোক, মনস্থির করতে আমার কোন অসুবিধা হলনা; আমি সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করলাম। নিজেকে বললাম, ভাগ্যের জন্যই হোক আর মন্দের জন্যই হোক, আমার জীবনের গতিপথ সুস্পষ্ট ভাবেই নির্দ্ধারিত হয়ে গিয়েছে; যে ভূমি ভাগ্যের হাতে দিয়েছি তা যেচে ফিরিয়ে নিয়ে তাকাতে পারিনা!

১৮৮০ সালে আমি মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউটের কাজ ছেড়ে দিলাম। পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন আমি যেন সিটি কলেজের মাস্টার হয়ে করি, এবং সে জন্য আমার যে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে, তা তিনি পূরণ করতেও চেয়েছিলেন, তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করার কোন উপায় ছিল না, যদিও তাঁকে মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউটে অতিরিক্ত আর এক ঘণ্টা শিক্ষা কার্য্যের জন্য দিতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি পদত্যাগ করলাম এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন। (চলবে)

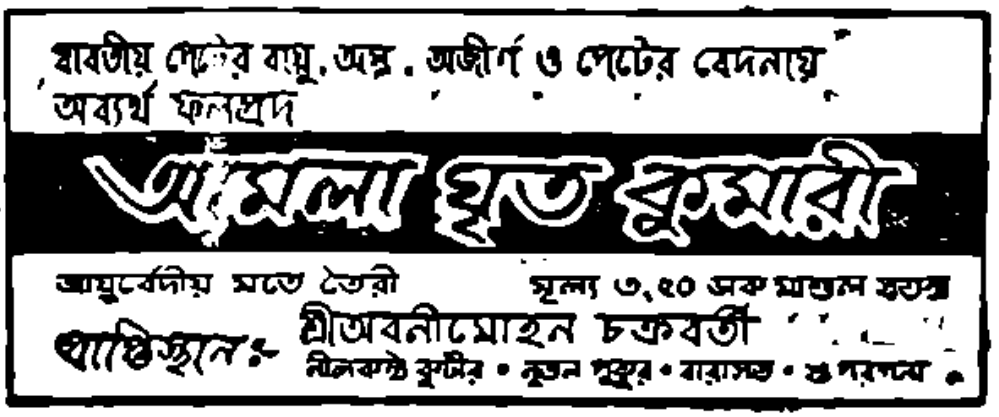

গণতান্ত্রিক প্রশাসন ও মানুষের প্রত্যাশা

—সৌমীর আচার্য

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সংকট তীব্র হচ্ছে দিনে দিনে। এরকম জটিল পরিস্থিতির মধ্য থেকে রাজ্যকে বার করে আনা খুব সোজা কাজ নয়। তা সত্ত্বেও একথা সত্য এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন—সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়েও কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব। এই সব কাজের জন্য কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হবে না। সেতু রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুল, পাঠাগার, সমবায়, খেলার মাঠ ইত্যাদি তৈরী, সংস্কার ও সম্প্রসারণ। একাজগুলি নিয়ার লক্ষে সরকার করতে চাইছেন এমন কথা মন্ত্রীরা বলছেন। কিন্তু কাজ এগোচ্ছে না। কেন? কেন কাজ এগোচ্ছে না, বা কোথায় কাজ আটকাচ্ছে তা অনুসন্ধান করে বের করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বিভাগীয় সচিবদের নির্দেশ দিয়েছেন। এবং তা এক মাসের মধ্যেই খুঁজে বার করতে হবে

আটমাস ক্ষমতায় থাকার পর মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন কাজ আটকে যাচ্ছে। জ্যোতিবাবুর প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্পর্কে জনসাধারণের কোন সন্দেহ ছিল না। বরং আস্থা ছিল। এই নির্দেশ দানের পর স্বভাবতই সন্দেহ জাগছে জনমানসে—তাহলে রোগটা কোথায়?

প্রশাসনের স্থবিরতার কথা দীর্ঘদিন আমরা শুনে এসেছি। বাম, দক্ষিণ, মধ্যপন্থী সব রাজনীতিকরাই আমলাতান্ত্রিকতা ও লাল ফিতাকে নানাভাবে অভিযুক্ত ও অপরাধী ঘোষণা করেছেন—উন্নয়নের কাজ আটকে যাওয়ার কারণ হিসাবে। প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি বসিয়েও কাজ হয়নি বিশেষ। না হওয়ার কারণ প্রশাসন যারা চালান এবং যারা যদের জন্য তাদের মতামত জানা উচিৎ ছিল। কেউ সেদিকটায় তাকান নি।

যে প্রশাসনে ধনতান্ত্রিক সমাজকাঠামোকে বাঁচিয়ে রেখেছে তারাই বামফ্রন্টনীতির মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে রাতারাতি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হবেন এমন আশা করা ভুল প্রশাসকের মানায় না। আসলে আগের বিন্যাসটায় গলদ রয়ে গিয়েছিল। এবং নতুন করে যে সব কথা শোনা যাচ্ছে তাও দায় এড়ানোর কৌশল। কোন কোন জায়গায় নাকি 'সাবোতাজ' হচ্ছে। কোন কোন কর্মী নাকি কাজে গোলমাল করে দিচ্ছে জানিনা এর সত্যতা। কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতাদের কথা উল্লেখ করে বলতে চাই—তারা এতদিনে কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নিতে যাচ্ছেন কেন? এবং মুখ্যমন্ত্রী আগে তাদের কাছেই প্রশ্ন রেখে জানতে পারতেন কেন কাজ হচ্ছে না। রাজ্যসরকার তো তাদের জন্য বেশ কিছু সুবিধা দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা বিনিময়ে কিছুই দেন নি—না সরকারকে। না জনসাধারণকে। আসলে বামফ্রন্টের দলগুলি সংগঠন গড়তেই ব্যস্ত। সরকারী কর্মচারীদের বড় অংশটি রাজনীতি আলোচনাতে ব্যস্ত। কাজ তাহলে হবে কখন? পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের কোন ঘটনাটির মার্কসীয় বিশ্লেষণ কি, অথবা একজন চাষী বা শ্রমিক পুলিশের গুলিতে মরলে-জোয়ারেক-টিপস এর কোন প্যাঁচে ফেলে সেই সংক্রান্ত বিরোধী বক্তব্যকে ঘুরতে দিচ্ছেন জ্যোতিবাবু, সেইটাই আজকের ফেটে যাওয়া ব্লাডের ভক্ত লোকদের আলোচ্য বিষয়। গরীব গাঁয়ের মানুষ, বা শহরের বিশেষহারা মানসিকের

কি অবস্থা এবং তাদের জন্য কি করা যায় সে তা ভাবে? কেমনভাবে তাদের চিঠির বা গণ-দরখাস্তের একটা জবাব না পেলে স্বাক্ষরকারী আম-জনতা বিক্ষুব্ধ হবে। কাগজে পত্রে বহু আর্জি আবেদন, দাবি, প্রচার হয়। কৈ তার কোন কিছু হচ্ছে কি? সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা কি বিষয়টি তেবেও দেখেছেন একটি গণআবেদনের মাধ্যমে যে তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে তার একটা জবাব দেওয়া গণতান্ত্রিক প্রশাসনের দায়িত্ব। জানিনা মন্ত্রীরা অফিসারদের কতটা স্বাধীনতা স্বীকার করেন? কারণ উর্দ্ধতন অধস্তন সব স্তরেই মন্ত্রী বলতে যে তাবটা চোখে পড়ে তাও গণতান্ত্রিক রীতি ও ভদ্রতার বিরোধী। ওটা রাজা-জমিদারদের উক্তির আদলাদেরই মানাতো।

প্রশাসন—জটিল। রহস্যর আছে এতে। সেইজন্য বিলম্ব, সেই জন্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা দেখা দেয়। কোন্ অফিসের কাজগুলি ছোট ছোট 'সেলে' ভাগ করে দিন। কোন বড় অফিসার সোজাসুজি করনিকদের কাজে নির্দেশ দিতে পারে সেই ব্যবস্থা চালু করুন। অফিসাররা প্রাপ্তচিঠি নিয়ে প্রতিদিন দুপুরে একটা মিটিং করে চিঠির উপরেই নির্দেশ লিখে দিতে পারেন। এবং বিষয়টা সকল অফিসার এক সঙ্গে জানতে পারছে। এই সব বিনিময়টা 'ফাইলে' রাখতে থাকলে সময় লাগে অনেক। টাকা মঞ্জুরী বা বিল পাশ জাতীয় কাজগুলি দায়িত্বশীল অফিসার ছাড়া কেউ না করা উচিৎ। এবং ছোট ছোট ত্রুটির জন্য যে সব কাজ ফেলে রেখে মানুষের কষ্ট দেওয়া হয় তা যাতে না করতে পারে তার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া উচিৎ। চিঠি পাওয়া থেকে জবাব দেওয়া পর্য্যন্ত—অফিসার কেরাণী মিলিয়ে পাঁচ ছ' জন লোকের হাত ঘোরে কমপক্ষে তিনবার। এই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে কাজ দ্রুত করতে হলে।

সরকারী প্রশাসক ও রাজনীতিকদের কাজের একটা সমন্বয় দরকার অনেক ক্ষেত্রে আবার দুয়ের রক্ষা করাও দরকার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে।

জেলায় জেলায় বামপন্থী কর্মীরা ঘটালেন টাকা নেই। কিন্তু ঘটনাটি কি? টাকা যতটা আছে ততটা কাজ হচ্ছে না কেন? কেন্দ্রীয় সরকার তো টাকা দিচ্ছেন। গ্রামের ও শহরের বহু কাজ মাঝ পথে বন্ধ পড়ে আছে! এগুলি তো করা যায়। এবং টাকা থাক বা না থাক যে কাজগুলি হলে দেশের উন্নতি হবে এবং যে কাজগুলি স্থানীয় মানুষ দাবী করছেন সেগুলিতে টাকা বরাদ্দের আগে অনেক স্তর আছে। সেইসব স্তর পেরিয়ে গিয়ে কাজ পড়ে থাকলেও লোকে বোঝে যেমন ধরুন একটি রাস্তা করার জন্য জমি, মার্ভে, অধিগ্রহণ, মাপ তৈরী, ইত্যাদি কাজ করা যেতে পারে। টাকা পাওয়া গেলে সেটাই হাত দেওয়া যাবে। একটি হাসপাতাল, স্কুল, সেতু বিদ্যুৎ সব কিছু সম্পর্কেই এই কথা খাটে। কিন্তু তাও তো হতে দেখিনা।

আবার শোনা যাচ্ছে দলের সুপারিশ ছাড়া কাজ হবে না। কোন দলের সুপারিশ চাই—কোন কোন কাজে তাও শোনা যাবে বাতাসে কান পাতলেই। বামফ্রন্টের অনেক দল, একাধিক কাজের জন্য একাধিক দলের দরজায় ধর্না দিতে হবে—এটাই চলতি গণতান্ত্রিক রীতি। এর ফলে হচ্ছে বিভিন্ন দলের অফিসে লোকেরা ভীড় করছে এবং লোকেদের দায়িত্বশীল দলের নেতারা ও এম,এল,এ,রা ঘুরছেন কেরাণীর টেবিলে টেবিলে। নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতিটা ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন কোন বিপদের বীজ এতে নিহিত। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনার এই জাহান্না ইতিহাস কি সহ্য করে?

গ্রাম-বাংলা

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রাম উন্নয়ন ভাবনা

—বেগম দিলদার জাহান

"সন্ধ্যে হয়ে আসছে সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষীরা ফিরছে ঘরে। একদিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার আর একদিকে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে এক একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মত।" —এমন যে গ্রাম তা দেখে একদিন রবীন্দ্রনাথের মনে দুঃখের বেদনা জেগেছিল। আবার অন্ধকারে দ্বীপের মত সেই সব গ্রামেই ফিরে যেতে বলেছিলেন গান্ধীজী।

'গ্রামে ফিরে যাও' কথাটা সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। সারা দেশ জুড়ে শহরমুখীনতা মাথাচাড়া দিয়েছিল সেই সময় প্রচণ্ডভাবে। গ্রাম থেকে শিক্ষিত এবং অর্থবান ব্যক্তিরা চলে আসতেন শহরে ভাল পেশা, উচ্চশিক্ষা, অর্থ উপার্জন সঞ্চয় ও সম্পদবৃদ্ধির মানসিকতা নিয়ে। জমিদার, তালুকদার, জমাদার, আরমাদার এরা ঐ যুগে ছিলেন সমাজের উপর তলার মানুষ। ক্রিশ্চ বা অভিজাত শ্রেণী। সমাজের তালবন্ধের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন এরা এবং সমগোত্রীয় আরও কিছু বিশেষ ব্যক্তি। তারা সমাজে নিজেদের স্বার্থ ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য যেভাবে ভাল বুঝতেন সেইভাবেই সমাজকে চালাতেন। তাতে ভালমন্দ দুইই ঘটতো।

মন্দ কিছু ঘটলে অসন্তোষ দানা বাঁধতো। বিক্ষোভ বিদ্রোহ ঘটতো। অত্যাচারের বিরুদ্ধে-বিশ্বের সব মানব সমাজে যা ঘটেছে আমাদের গ্রামীণ সমাজেও তাই ঘটতো। এ ইতিহাস সকলের কমবেশী জানা।

গ্রামের প্রবীণ মানুষদের মুখে যে সব ঘটনা শোনা যায় তা থেকেই বোঝা যায় অনেক সময় এই ধরণের অত্যাচারের প্রতিকার করতে না পেরে এক গ্রামের মানুষ অন্য গ্রামে অথবা শহরে চলে যেতো। দ্বিতীয়তঃ অর্থবল যেহেতু সে যুগে শ্রেষ্ঠ বল বলে বিবেচিত হোত, অর্থের জোরে সমাজের সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতো, সেই হেতু গ্রামের অত্যাচারিত মানুষ বাঁচার পথ হিসাবে অর্থ-উপার্জন সঞ্চয় ও সম্পদবৃদ্ধির চেষ্টায় গ্রাম ছেড়ে শহরে ভীড় জমাতো। তৃতীয়তঃ গ্রাম এলাকায় দারিদ্র্য চিরকালই ব্যাপক। এই দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যও মানুষকে যেতে হোত শহরে। চতুর্থতঃ বন্যা, খরা, মহামারী প্রভৃতি দেখা দিলে লোক পালাতো গ্রাম ছেড়ে। ঠাঁই নিতো ভিন গাঁয়ে কিংবা শহরে। বলতো 'মড়ক' লেগেছে। না পালালে বাঁচা যাবে না। পঞ্চমতঃ ভাল চিকিৎসা ও চাকরী কিংবা ব্যবসার জন্যও শহরে না এসে উপায় ছিল না। আরও কিছু কিছু কারণে গ্রামের মানুষকে শহরে আসতে হোত। যেমন সৎ, সমাজসেবী অথবা একেবারে নিলিপ্ত মানুষেরা কোন প্রভাবশালী বা ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির বিরাগভাজন হলে তাঁকেও ছাড়তে হোত গ্রাম।

ফলে গ্রামজীবনে কোন পরিবর্তন আনার বা উন্নতি বিধানের চেষ্টা হোত না। হলেও স্থায়ী হোত না বেশীদিন। গ্রামের মানুষ যুগ যুগ ধরে এই ভাবেই ভুগেছে জীবন যন্ত্রণা। এটা যে একটা সমস্যা একথা কেউ সেদিন বলেন নি। অবশেষে, শহরমুখী প্রবণতার বিরুদ্ধে জনচেতনা গড়ে তুলতে এবং গণজাগরণ সৃষ্টি করতে মহাত্মাগান্ধী আবেদন রাখলেন বেনেরালীর উদ্দেশ্যে। বললেন—'গ্রামে ফিরে যাও'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বললেন—'ফিরে চল মাটির টানে' গাইলেন, 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে'। গান্ধীজী গঠনমূলক কাজে নামলেন পল্লী পুনর্গঠনের একটা ছক হাতে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ শুরু করলেন শ্রীনিকেতনে আর একটি প্রকল্পের রূপায়ণ। তাঁদের সেই আন্তরিক ও সক্রিয় ভূমিকা ভারতীয় জনমানসে সাড়া জাগালেও ব্যক্তি উদ্যোগে বা বেসরকারী প্রয়াসের দ্বারা তা খুব ফলপ্রসূ করা যায় নি।

দেশ তখন পরাধীন। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী সরকার এদেশ গঠনের জন্য সরকারীভাবে কোন ব্যাপক পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। দেশ স্বাধীন হবার পর শুরু হোল অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। শুরু হোল পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা। অগ্রগতি যে কিছুই হয়নি তা নয়। সে অগ্রগতি ঘটেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। বিদ্যালয় ও শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়লো, বাড়লো চিকিৎসক ও হাসপাতাল পথঘাট, পরিবহন, ব্যাঙ্ক, পোষ্টঅফিস ইত্যাদি। আরও অনেক কিছু গড়ে উঠলো গ্রামে। কিন্তু সে উন্নয়ন সুষম হয়নি। উন্নয়নের সুফল সমাজের সব স্তরে পৌঁছেছে, কিন্তু সকলের প্রয়োজন মেটাতে পারেনি।

স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরে সেজন্যই বেকারী ও দারিদ্র্যের বহুবিকাশ সমস্ত উন্নয়ন সাফল্যকে উপহাস করতে চাইছে।

দারিদ্র্য দূর করতে হলে উৎপাদন বাড়াতেই হবে। আমাদের উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু দারিদ্র্য দূর হয়নি। কারণ আমাদের দেশের প্রচলিত অর্থকাঠামোর ধনবণ্টন ব্যবস্থা একপেশে রয়ে গেছে। এ বৈষম্য গ্রামে আরও বেশী প্রকট। অধ্যাপক হাজেকার এবং অধ্যাপক রুদের মতে—গ্রামীণ জনতার ৪০%শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে আছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রের মতে—ভারতের ৩৫০টি জেলার ২৮০টি জেলা অনগ্রসর বলে চিহ্নিত। পশ্চিমবঙ্গের ক'টি জেলা অনগ্রসর বলে চিহ্নিত জানি না। তবে ৩৪২টি ব্লকের ২০০টিরও বেশী ব্লক যে অনগ্রসর তা বলা যায়। ৩৮০০ হাজার গ্রামের কতগুলি গ্রামে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি পাওয়া যায়, তার একটা পরিসংখ্যান তৈরী হওয়া দরকার। ডঃ অমর্ত্য সেনের মতে পশ্চিমবঙ্গে বছরে আড়াই লাখ নতুন বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। তার মধ্যে অধিকাংশ নিঃসন্দেহে গ্রামের ছেলে।

গ্রামের নানান তথ্য আর চিত্র খুঁজতে খুঁজতে চোখে ভেসে ওঠে 'চিরপথে' রবীন্দ্রনাথের আঁকা গ্রামীণ চিত্রটি। "শ্রাবণ গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে গাঙা. লতা. গুল্ম পড়তে থাকে. গোয়ালঘর লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত. উলঙ্গ পেটমোটা পা সরু, রুগ্ন ছেলে মেয়েরা যেখানে সেখানে জল কাদার মাখামাখি ঢাঁপাঢাঁপি করতে থাকে মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ী গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ার বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাটুর উপরে কাপড় তুলে জল ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায় তখন সে দৃশ্য কোনমতেই ভালো লাগে না"।

গ্রামের সামাজিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের মধ্যদিয়ে গ্রাম গঠনের পথে এগোতে হবে। কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুত উন্নতি করা প্রয়োজন। এই সর্বাত্মক উন্নয়নের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রেখে দেশে ভারী শিল্পের পরিপূরকরূপে কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের সুসংবদ্ধ উন্নয়নের ভিত্তি গড়তে হবে। সেই শিল্পায়ন পরিকল্পনা গ্রামমুখী গ্রাম উন্নয়ন পরি-

কল্পনায় অঙ্কীকৃত। কিন্তু সেই চকটি আমাদের সামনে আজও গড়ে ওঠেনি। এইখানেই গ্রাম উন্নয়নী প্রয়াসের দুর্বলতা। আজকের গ্রামের মানুষের আন্তরিক কামনা বর্ত্তমান সরকার সেই ত্রুটি সংশোধনে উদ্যোগী হবেন।

রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্বে বলেছিলেন—"আমাদের ভেঙে পড়া গ্রাম্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, আমাদের পুরানো কৃষিব্যবস্থা সংস্কার, আমাদের কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবন, সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিদ্যুৎশক্তি ও কৃষিজাত উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহার—এইগুলিই আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবনকে গড়ে তোলার "গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী"।

সেই কর্মসূচী রূপায়ণের চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। বরং যে সব চেষ্টা হয়েছে তা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। সেই ব্যর্থতার কারণগুলি অনুসন্ধান এবং তার প্রতিবিধান হয়নি বলেই প্রায়পুরুষভাবে কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ সমবায় কোন কিছুই সম্প্রসারণ ঘটেনি।

গ্রামের মানুষ আজ অনেক বদলে গেছে। আধুনিক জীবনের স্বাভাবিক গতির তাগিদে তাদের প্রয়োজন গুলিকেও বদলে দিয়েছে। সেই প্রয়োজন মেটাতে গড়তে হচ্ছে বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাল বাজার, ভোগ্যপণ্যের দোকান, রুচিসম্মত বাসগৃহ, পথঘাট, খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, পাঠাগার, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, শিশু,যুব ও মহিলা সমিতি, পঞ্চায়েত অফিস, কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাঁতারের পুকুর, সরকারী আবাসন ইত্যাদি। এর কোনটি আছে, কোনটি বা নেই এমন গ্রাম হাজার হাজার। সবগুলি না থাক অনেকগুলি না থাকলে গ্রামের মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে? সবগুলো হয়তো সবগ্রামে দরকার নেই ঠিকই, কিন্তু এইসব প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান না থাকায় তাদেরই গ্রামে ডাকাত, অফিসার, মাষ্টার কেউ যেতে বা থাকতে চান না।

বাঁচা বলতে অবশ্য অনেকে দুমুঠো বোঝেন, এবং গ্রাম উন্নয়ন বলতে কৃষির উন্নতির কথা ভাবেন। কিন্তু বোঝা দরকার—তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ গ্রামবাসীর মধ্যে ৭৭ লক্ষ লোক কৃষিকাজে নিযুক্ত। কৃষি পণ্য ছাড়া তাদের আরও অনেক কিছু প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন জীবন যাপনের উপকরণের। গ্রামে থাকলেও জমির সঙ্গে যোগ নেই এমন মানুষ আড়াই কোটির উপরে। তারা নানান পরিচয় ও পেশার মানুষ—জেলে, ধোপা, তাঁতী, জোলা, তেলি, কামার, কুমোর, হাড়ি, মুচি, ডোম, চাড়াল, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, নাপিত, ঘাট, বাড়ুই ঘরামি বাইতি প্রভৃতি পরিচয়ের মানুষদের পেশা ও প্রয়োজনগুলির কথাও তো ভাবতে হবে।

গাঁয়ে একটা হাটকে কেন্দ্রে রেখে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠলে এরা অনেকেই কাজ পাবেন। এদের প্রয়োজনগুলিও মিটবে গ্রামেই। এজন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের, প্রয়োজন সমন্বিত প্রয়াসের।

গ্রামীণ প্রশাসন বলতে বোঝায়—সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত। বর্তমান পঞ্চায়েত যেন একটি জনবিকৃত সংস্থা। সমষ্টি উন্নয়ন নানান দুর্বলতায় কৃশ। ৩৪২টি ব্লক অফিসের মাত্র ১১৯টি স্থায়ী কার্যালয় আছে। তাছাড়া বাকী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কোন নির্দিষ্ট এলাকার ভাড়াটে বাসিন্দা। কোন ব্লকের অফিসটি এলাকার ভিতরেই নেই। আবার অফিসগুলিতে—নাম এক, দুই, তিন চিহ্নবাহী। সত্যি বলতে কি আজও পশ্চিমবঙ্গে কোন 'গ্রাম উন্নয়ন' দপ্তর নেই। অথচ এই ব্যাপারটির গুরুত্ব সবথেকে বেশী।

সাধারণ নাগরিকের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জাতীয় সেবা প্রকল্পের ছেলেমেয়েরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে বেড়াচ্ছে বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ হাতে নিয়ে। অথচ গ্রামের মানুষেরা নির্বিকার। সেবাপ্রকল্পের ছাত্রছাত্রী ও সরকারের কর্মচারী যাবাই গ্রামে যাবেন তাদের প্রত্যেকটি গ্রামে যদি কিছু সময় অতিবাহিত করেন, গ্রামের মানুষরা যদি এগিয়ে আসেন তাদের সাহায্য করতে তাহলেই কেবল গ্রাম জীবন ও তার সমস্যা সম্বন্ধীয় সমাক্ উপলব্ধি সম্ভব এবং ওইসব সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে।

(চলবে)

সংবাদ

"গান্ধী-অর্থনীতি থেকে সরে আসায় দেশের অর্থনৈতিক অধঃপতন হয়েছে"

সম্প্রতি একটি জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিং এই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, "বিগত বছরগুলিতে ভারি শিল্পের উন্নয়নে জোর দেওয়ায়, কৃষিক্ষেত্র উপেক্ষিত ছিল বলে বেকারী বেড়েছে, দেশে অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্য দেখা দিয়েছে। তাই অধিক অর্থবিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের দ্বারাই কেবলমাত্র বেকারী মোচন ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব"। প্রসঙ্গতঃ, কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষি বিনিয়োগ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উত্থাপন বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের ফলে রাজ্যের চাষবাস ভীষণভাবে মার খাচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে সর্বসমেত ২৩৩২টি গভীর নলকূপ ও ৩৩৮৯টি শ্যালো নলকূপ সেচের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪-পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলায় এগুলির ব্যবহার বেশী। রাজ্যে সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ-সংকট ছাঁটাইয়ের ফলে এইসব জেলাগুলির চাষবাস বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। বিশেষতঃ যাঁরা বেশী ফসল ফলানোর আশায় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে 'স্যালো' লাগিয়েছিলেন, আগাম সেচকর দিয়ে ও ঋণ কেটেও এঁরা সেচের জল পাচ্ছেননা। ফলে বহুসংখ্যক চাষ নষ্ট হতে বসেছে। এছাড়া গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পগুলিও বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের ফলে পড়ে নাভিশ্বাস তুলছে।

চিনির স্বাদ তেঁতো (!)

রেশনে চিনির দাম কেজি প্রতি ১৫ পয়সা বাড়লো। শহরের জনসাধারণের কাছে এটা খুব একটা বড়ো ক্ষতি নয়—কারণ খোলাবাজারে তাঁরা এর চেয়ে অনেক বেশী দামে চিনি কেনেন। ক্ষতি যা হবার হয়েছে আখচাষীদের। এবারে আখের রেকর্ড ফলন হয়েছিল। কিন্তু চিনির মিলমালিকেরা আখ কেনা বন্ধ করায় আখের দাম হু হু করে পড়ে গেল—চাষীর চাষের খরচাই উঠেনা, প্রায় এমন অবস্থা। মিলমালিকদের যুক্তি, সরকারকে লেভী চিনি (মোট উৎপাদনের শতকরা ৬৫ ভাগ) দিয়ে তাঁদের আর কিছুই থাকেনা। সেই তাঁদের কিছু থাকাতে গিয়ে সরকার চিনির দাম বাড়ালেন। কেন্দ্রীয় বাজেটে চিনির ওপর উৎপাদন শুল্ক ছাড়েরও ব্যবস্থা করলেন—ফলে মিল মালিকদের পকেটে বেশ দু-পয়সা এলো। কিন্তু আখ চাষীরা কি পেলেন? তাঁদের কপূর্র মাপ কেউই নষ্ট হলো, চাষের খরচও পুষিয়ে গেলনা— আর আখের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির কথা না করাই ভালো।

সুভাষচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধী

—সন্তোষ কুমার অধিকারী

গান্ধী এবং সুভাষ—জাতীয় আন্দোলনের বিশিষ্টতম এই দুই নেতার কেউই স্বাধীনতার আলোককে উপভোগ করবার জন্যে বেঁচে থাকেন নি। একজন স্বাধীনতার প্রথম উষাকে রক্তাক্ত করে বিদায় নিলেন। যাঁরা এই দেশকে বিভক্ত ক'রে হানাহানি ও রক্তপাতের সূচনাকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন সেই অনুচরদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই যেন গান্ধী বলিদান দিলেন নিজেকে। আর একজন অশান্ত বিপ্লবী ভারতের বাইরে এক অপরিচিত পরিবেশে চিরদিনের জন্যই নিরুদ্দেশ হলেন স্বাধীনতার প্রাক্কমুহূর্তে। গান্ধী স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ করে দূরে সরে গিয়েছিলেন, যদিও কংগ্রেসই ছিল তাঁর সকল কর্মের কেন্দ্র। আর একজন সুভাষ, কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, যদিও কোন সময়েই তিনি নিজেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধপক্ষ বলে ভাবতে চাননি।

গান্ধী ছিলেন বিবেকবাদী। তাঁর যুদ্ধ ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, ভারতের নৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই তাঁর কাম্য। তাই অহিংসা তাঁর শুধু অস্ত্র নয়, একমাত্র ধর্ম।

সুভাষ ছিলেন দুরন্ত জাতীয়তাবাদী। তাঁর সংগ্রাম বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে। ইংরেজ শাসককে তাই তিনি শত্রু বলে জেনেছিলেন। অহিংসা তাঁর কাছে একটি বিশেষ অস্ত্র মাত্র। তাই প্রয়োজনের মুহূর্তে যোদ্ধা যেমন অস্ত্রবদল করে, তিনিও তাই করেছিলেন। অহিংসাকে সরিয়ে রেখে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে তিনি মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধান্বিত হননি।

গান্ধী ছিলেন ধর্মপরায়ণ দার্শনিক। সুভাষ বাস্তববাদী রাজনীতিক।

সাংবাদিক লেখক মাইকেল এডওয়ার্ডস্ তাঁর 'দি লাস্ট ইয়ার্স অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ভারতের জাতীয় নেতাদের রাজনৈতিক ভূমিকার চমৎকার ছবি এঁকেছেন। গান্ধী সম্পর্কে তাঁর অভিমত—"He was a religious reformer ..... a man who could exercise almost hypnotic influence upon the most diverse of characters, and his main effect on them was to drain away any revolutionary fervour they might have had,"

কংগ্রেসের কণ্ঠদেশে 'Ancient Mariner' কবিতার 'এ্যালবেট্রস' পাখির মতই তিনি ঝুলে থেকে তাকে বৈপ্লবিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন—এই হ'ল এডওয়ার্ডসের অভিমত। "His response was to develop a system that might be called 'conscience in action' and because it was successfull, Congress never became a truly revolutionary movement..... .... ।"

গান্ধীর পরই তিনিই উল্লেখ করেছেন প্যাটেল ও নেহরুর। Gandhi chose his lieutenants with great care.....তাঁদের একজন হলেন বল্লভভাই প্যাটেল।—Patel was not a thinker but a worker, অর্থাৎ প্যাটেল-এর কোন রাজনৈতিক দর্শন ছিল না, তিনি ছিলেন শুধু কর্মী। The other leader was Jawaharlal Nehru, a Harrow educated aristocrat with Fabian — Socialist ideas, যিনি ইংল্যাণ্ডে শিক্ষিত, বিশিষ্ট, অভিজাত এবং ইংল্যাণ্ডের সোস্যালিষ্ট দলের মতই সতর্ক সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন।

এরপরে গান্ধীর পাশাপাশি সমান্তরাল রেখায় তিনি লিখেছেন সুভাষচন্দ্রের নাম—Only one outstanding personality took a different and violent path, and, in a sense, India owes more to him than to any other man—even though he seemed to be a failure।

গান্ধীর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হওয়ার বিবরণ সুভাষচন্দ্র নিজেই দিয়েছেন তাঁর দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল্ গ্রন্থে। "সেদিন অপরাহ্নের ঘটনার প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমি স্মরণ করতে পারি। বম্বেতে গান্ধীজির বাসভবন মণিভবনে পৌঁছলাম, কার্পেট দিয়ে মোড়া একটি ঘরের ভেতরে আমাকে নিয়ে গেল। তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সঙ্গী পরিবৃত হয়ে গান্ধীজি ঘরের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট ছিলেন।"

বলা বাহুল্য এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে। সুভাষ আই.সি.এস. থেকে পদত্যাগ করেছেন, কারণ দেশের সেবা এবং বিদেশী রাজার সেবা একই সঙ্গে করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কল্পনা। লণ্ডন থেকে ফিরে তিনি বম্বেতে প্রথম নামলেন এবং গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—'আমি তাঁর পরিকল্পনার সমস্ত খুঁটিনাটি বুঝে নিতে চেয়েছিলাম; একটি একটি করে ধাপ এগিয়ে কি ভাবে এই আমলাতান্ত্রিক শাসন যন্ত্রের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা তিনি ছিনিয়ে নিতে চান—সেই কৌশলের বিন্যাসকে। সেই উদ্দেশ্যে আমি একটির পর একটি প্রশ্ন করে চললাম এবং মহাত্মা তাঁর স্বভাব ধৈর্যের সঙ্গে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। আমি তিনটি বিষয় বিশেষভাবে বুঝে নিতে চাইছিলাম—

প্রথম: কিভাবে কংগ্রেসের বিভিন্ন মুখী কর্মধারা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ টাক্স না দেওয়ার সংগ্রামে পৌঁছবে?

দ্বিতীয়: টাক্স না দেওয়ার আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ কিভাবে এই সরকারকে আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করবে?

তৃতীয়: এবং কিভাবে মহাত্মা এক বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন?

(নাগপুর কংগ্রেসে এইরকম প্রতিশ্রুতিই মহাত্মা দিয়েছিলেন।)

প্রথম প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরের দুটি প্রশ্নের যে উত্তর তিনি দিলেন, তাতে আমি একটুও আশ্বস্ত হতে পারিনি।"

সুভাষচন্দ্র জাতীয় সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক গান্ধীর সংগ্রাম-নীতির ব্যাখ্যাকে ধোঁয়াটে মনে করে হতাশ হয়েছেন। "Depressed and

disappointed as I was, what was I to do ?"

সুভাষচন্দ্র এবার ছুটেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে। আর এখানেই তাঁর সংশয়ের নিরসন ঘটেছে। তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন দেশবন্ধুর। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—During the course of our conversation I began to feel that here was a man who knew what he was about—who could give all that he had and who could demand from others all they could give.....I felt that I had found a leader.....।"

(চলবে)

বিধানসভায় সংযুক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিষদের ডেপুটেশন

গত ৬ই মার্চ সংযুক্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামী পরিষদের উদ্যোগে চারজনের একটী প্রতিনিধিদল সভাপতি জগদীশ চ্যাটার্জী ও সাধারণ সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র দাসের নেতৃত্বে বিধান সভায় রাজনৈতিক পেনসন-সংক্রান্ত সরকারী কমিটির সভাপতি ও রাজ্যের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। এই স্মারকলিপিতে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ২০০ টাকা হারে স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন ছাড়াও রাজ্য সরকার থেকে আরও ১০০ টাকা হারে পেনশন দান এবং প্রদেশে বর্তমানে যে অস্থায়ী পেনশনের ব্যবস্থা চালু আছে তার পরিবর্তে স্থায়ী আজীবন পেনশন দানের দাবী জানানো হয়েছে।

মন্ত্রীমহোদয় রাজ্য সরকারের পক্ষে এই দাবীগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং শহীদ ক্ষুদিরামের মর্মর্মূর্তির পাদদেশে বিপুল সংখ্যক স্বাধীনতা-সংগ্রামী সমাবেশে ভাষণদান কালে বলেন যে, রাজ্য সরকার বর্তমানে স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবারের আর্থিক পুনর্বাসন দানের চেষ্টা করছেন; তাছাড়া, যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামী অত্যন্ত পেনশন পান, তাঁদের জন্য ন্যূনতম ৫০৲ পেনশন দানের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। তাই, নূতন দাবীগুলি সম্পর্কে এখনই কোন আশ্বাসবাণী তাঁর সরকার শোনাতে পারছে না। তবে, প্রদত্ত পেনশনের স্বল্পতা, অধিকতর আর্থিক দাবীর ন্যায্যতা এবং বৃদ্ধ বিপ্লবীদের অবদান সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ একমত—প্রয়োজন হলে, সংগ্রামী পরিষদের সঙ্গে একযোগে এই দাবী আদায়ে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেবেন। এস,ইউ,সির একজন তরুণ এম, এল, এও স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দাবীর প্রতি তাঁর দলের পূর্ণ সমর্থন জানান।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	West Dinajpur Distt.		
Roy Smt.-Supriti Wd/Late Santosh Kr. Roy	Palpara P. O. Raiganj	200	11. 8. 77
	Malda Distt.		
Bhattacharya Smt. Hironmoyee Devi Wd/Late Manindra Lal Bhattacharya (alias Moni)		200	12. 9. 77
Roy Smt. Ashalata Wd/Late Nani Gopal Roy	Vill. Talasur P. O. Singhebad P. S. Habilapur	200	1. 10. 76
	Birbhum Distt.		
Bakshi Kalipada	Vill. Bhadulia, P. O. Khairasole	200	
Das Gopeswar	Bolpur Khadi School Kacharipaty, Bolpur	200	
Das Haripada	P. O. Dubrajpur	200	"
Mal Smt. Amodini Wd/Late Suchandan Mal	P. O. & Vill. Jogai, P.S. Murari	100	12. 8. 77
Roy Smt. Sulata Wd/Late Dwarika	P. O. & Vill. Sunthia	200	1, 10. 76
Roy Joy Gopal	P. O. Vill Dwaraka	200	"
Sinha Smt, Putul	P. O. & Vill. Kukhutia	370	22. 7. 77
	Purulia Distt.		
Chanda Smt. Labanya Prova Wd/Late Himlal	P. O. & Vill Lakshmanpur	200	8-7-76
Mahato Parikshit	P. O. & Vill Hazhirhira	200	1-10-76
Mahato Smt. Sabita		100	8-9-77
	Midnapore Distt,		
Doloi Smt. Saraswati Wd/Late Lal Mohan	Vill Nimdasbarh, P. O. Pichabani P. S. Contai	100	29-9-76
	West Tripura		
Bhattacharya Ramendra Kumar	Manada Bhawan, Ramnagar Road No. 7 Ramnagar	200	

RgadNo. R. N .24511/71 Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

13 MAR 1978

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীশ রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীযাযাবর ঘোষ। বেতালা—শ্রীমনগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীদীপ্ত গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টি' পাবলিসিটী, ১১১ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৮৪ ১৮ই মার্চ, ১৯৭৮	২৪ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

একটি অনন্য আলোচনা

সুভাষচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধী

বিশেষ আকর্ষণ

কর্কট নাগের উপাখ্যান

বিশ্লেষাত্মক রচনা

ভারতীয় সমাজবাদের ধারা

বিপ্লবী কার্যকলাপ

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

স্মরণীয় যাঁরা

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা

গ্রাম-বাংলা

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রাম-উন্নয়ন ভাবনা

সাম্প্রতিক

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

রক্তে আনো লাল
রাত্রির গভীর
বৃন্ত থেকে
ছিঁড়ে আনো
ফুটন্ত সকাল।
—সুকান্ত

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt. –Calcutta		
Aio Amulya Chandra,	Viveknagar, P.O. Santoshpur, Calcutta-75.	200	1. 10. 76
Bakshi Prafulla Chandra,	105/5, Canal Street, Sribhumi. Cal-48.	200	
Bal Manmohan,	2/199, Bijoygarh Colony, Cal-32.	200	
Banerjee Badal,	34/C, Nalini Sarkar Street, Cal 4,	200	
Banerjee Haridas,	31A, Goabagan Lane, Cal-6.	200	
Banerjee Manoranjan,	68/10, Jagipara Road, Cal-28.	200	
Banerjee Pankaj Behari.	159 1, Roy Bahadur Road, Cal-34.	200	
Baruri Manindra Mohan,	27, Prince Anwar Shah Road, Cal-33.	200	
Basu (Bose) Smt. Lilabati, Wd/Late Upendra Nath Bose	1/15, Gandhi Colony, Cal-40.	150	
Basu (Bose) Sailendra Mohan,	61/16, Jorabagan Road, Cal-47.	200	
Basu Roy Benoyendra Nath,	36/G, Sarat Ghosh Garden Road, Cal-31.	200	
Basu (Bose) Sushil Chandra,	71, Netaji Colony (High Land) Cal-50.	200	
Bhattacharyya Manindra Mohan,	46, Graham Road, Cal-40.	200	
Bhattacharyya Naba Kumar,	10, Senpara Lane, Cal-32.	200	
Bhattacharyya Nagendra Nath,	40/G/H/2, Upendra Cb. Banerjee Road, Cal-54.	200	
Bhattacharyya Prodyot Kumar,	1/19, Gopal Bose Lane, Cal-40.	200	
Bhattacharyya Surya Kumar,	11, Senpara Lane Cal-32.	200	
Bhowmik Manindra Chandra,	3/32, Vidyasagar Colony, Cal-47.	200	
Biswas Smt. Priya Bala Wd/Late Hiralal Biswas	P-22, Basudebpur, Sursuna Main Road, Cal-61.	100	
Biswas Sunirmal,	18/9, Dover Lane, Cal-29.	200	
Chakrabortty Anil Kumar,	P-71, Unique Park, Cal-34.	200	
Chakrabortty Ashutosh,	E-7, Ramgarh Colony, Cal-47.	200	
Chakrabortty Hari Gobinda,	30/9, Harish Neogi Road, Cal-4.	200	

(contd. on 3rd. cover)

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

ককটে নাগের উপাখ্যান

সোজা বাংলায় বলতেই হবে মনের কথা। ট্যাক্সি হয়ে বেড়াতে তো আসিনি, এটা আমার দেশ। প্রতিবেদন-শীল [Responsive] গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত বলে গর্ব করে থাকি। বিশেষতঃ ইন্দিরাজীর মত একজন পরাক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীকে পদচ্যুত করার পরে। আসল গণতান্ত্রিক সরকার যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, প্রত্যেকেরই মনের ভাবসঙ্গত সমালোচনাকে ভাষা দিতে হয়। যদি না পারি, যদি সাহস না হয়, বুঝবো এ গণতন্ত্র ফুটো। আমিই তৈরাণী হয়নি এখনো, গণতন্ত্রের বীজ রোপণের। এবং সেটা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করবো।

এই বছরটা মানবাধিকার স্বীকারের। নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন Amnesty International। জগতের নিপীড়িত লাঞ্ছিত প্রজাকুলের দুর্দশার

শ্রীশচীভূষণ সেন

কাহিনী প্রচার করাই তাদের ব্রত। তারা সাদায় কালোয় ভেদ করেন না। ধনী দরিদ্র, পুঁজিবাদী বা সাম্যবাদী, যে দেশেই শাসক বিরুদ্ধ মতাবলম্বী dissentorদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন, সেখানেই Amnesty International এর স্বেচ্ছাসেবীদের নিঃশব্দ পদচারি বিধি। প্রমাণ-গ্রাহ্য সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার এই সংস্থার একমাত্র কাজ। এই প্রচারের ফলে, ধীরে, অতি ধীরে, বিশ্বের জনমত জাগ্রত হয়ে উঠেছে। বছরের পর বছর কেটে গেছে, একদিন পরে মানবাধিকার রক্ষার উপযুক্ত একটা কার্যকরি প্রোগ্রাম গ্রহণ করবার সময় এসেছে, বিশ্ব সভায় একজন মানবাধিকার-অধ্যক্ষ [U. N. High Commissioner for Human Rights] নিয়োগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। আর এই সময়টায় কিনা আমাদের দেশে.....

অবশ্য এটা স্বীকার করতেই হবে যে ভারত তার নিজের দেশের সরকার বিরোধীদের নতুন করে কারাগারে বন্ধ করছে না। এ বিষয়ে সমালোচনা করার কিছু নেই। তবে বিশ্বের অন্য কোন দেশে, শাসক শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা চূর্ণ করলে, সে বিষয়ে, ভারত নির্বিকার। শুধু নির্বিকার বললে ভুল হবে, সেই সব শাসক কুলের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে অতীব আগ্রহশীল। ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ভুলেই গেছেন নিজ নিজ কারাজীবনের অভিজ্ঞতা।

মুক্তি পাওয়ার অল্প ক'দিন পরেই জেলাইয় সঙ্গে জিয়ার ঘনিষ্ঠতার আরম্ভ। করাচীর চিরস্থায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে গেল দিবা-রেণী বাক্যব্যয়ে। জলের হিসেবে জিতলাম না হারলাম সেটা বড় কথা নয়। শক্তিমান কিছু না ছাড়লে দুর্বলের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না। তাইয়ের জন্য নয় কিছু ছাড়লাম কিন্তু ঠকে গেলাম আমরা নীতির দিক দিয়ে। বাংলাদেশের যে সব শরণার্থী নীরাকের এপারে আশ্রয় নিয়েছিলেন, ভারত সরকার তাদের বিতাড়িত করে জিয়াকে তুষ্ট করলেন। কয়েক হাজার সরকার বিরোধীকে তুলে দিলেন অন্ধ ট্রাইবুনালের কোমল অনুকম্পার উপরে। কি যে হল তাদের, অত শো শো সৈন্য হলেন আর ক'হাজার হলেন কয়েদ, জানতেও পারল না বিশের মানুষ।

তারপর কয়েকমাস কেটে গেল, এ বছরের গোড়ায় ইরানের বাদশা এলেন ভারত সফরে। বহু দেশ, তার উপরে তেলের টাকার বড়লোক, আমরা যে লাল কার্পেট বিছিয়ে অভ্যর্থনা করব, সেটা তো স্বাভাবিক। পাছে কেউ বিরূপ সমালোচনা করে, দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেট ইরানী ছাত্রদের আদেশ দিলেন, বাদশা যখন আসবেন তোমরা কেউ হোস্টেল ছেড়ে বাইরে আসবে না। কোন রকম শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নিলেও নির্বাসিত হবে'। নির্বাসিত করার অর্থ কি, ইরানী গুপ্ত পুলিশ Savac এর দেশায় কি রকম অভ্যর্থনা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, সেটা তাদের অজানা নয়। তা সত্ত্বেও দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ উপেক্ষা করে একদল ইরানীছাত্র 'সাহেনশার' বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালো। অবশ্য তারা মুখোস পরে এসেছিল, কিন্তু তাই বলে চিনতে অসুবিধা হয় নি, সবাইকেই ভিহার জেলের গারদে পোরা হয়েছে।

মূল বুলারের আমাদের দেশ, সিবি রাজার মত আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে, পরিণামের কথা ভাবে নি।

বাঁচবার অধিকার, কাজ করবার অধিকার, নিজের বিশ্বাস মত ভগবানকে অর্চনার অধিকার কিছু বুকে তুলে নিয়েছে। আমরা চীনের রাষ্ট্র সঙ্ঘে প্রবেশের দাবি সমর্থন করেছি, আমার তিব্বতী শরণার্থীদেরও আশ্রয় দিয়েছি। চীন খুশি হল, না রুষ্ট হল, গ্রাহ্য করিনি। বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের রক্ষার জন্য পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি, আমেরিকার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছি। নিক্সন কিসিঞ্জার ও তাঁর আমেরিকান দোসর চক্রান্ত ব্যর্থ করে সিকিমের উদ্ধার করেছি, চীনের মাসের দাবি গ্রাহ্য করিনি। আমরা জানি শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ একটা গণতান্ত্রিক অধিকার, তার মধ্যে নিক্সনের 'যদি' বা 'কিন্তু' নেই।

আজকে জনতা দলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে যে আমরা, সাধারণ মানুষরা, ভোট দিয়ে তাঁদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছি। বাহুবলে তাঁরা এই দেশ জয় করেন নি। দেশপ্রেমের তাঁগিদা দিয়ে যা আদেশ করবেন, আমরা নতশিরে তাই পালন করব, তা মনেও করবেন না। নিজের দেশের মানুষই হোক আর পরের দেশের মানুষই হোক, কোন মানুষকেই যে ভাগাড়ের যোগ্য জঞ্জাল [disposable rubbish] এর মত ব্যবহার করবেন, তাও আমরা সহ্য করব না।

আজকের এই বর্বর পৃথিবীতে খুব বেশী অবশ্য নেই এই জাতীয় শাসক। নীতিবান মানুষের সংখ্যা বাইশে গিয়ে পৌঁছেছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আজ বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চাই। আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি প্রধানতঃ অহিংসার অস্ত্র নিয়ে, তা বলে হিংসাকে অস্বীকার করি নি। নেতৃত্ব কে নিয়েছিলেন, হিংসা বা অহিংসার পূজারী, সে প্রশ্ন আজ নিরর্থক। মৃত্যুপণ করে পাশার দান দিয়েছি। ফাঁসির দড়ি গলায় আটকাতে গিয়েও ফসকে গেছে। দুনিয়ার নিপীড়িতের পাশে আমাদের স্থান। দুনিয়ার যেখানে কেউ অবিচারের শিকার হয়, আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না। দুনিয়ার যে কোন দেশে, যে কোন মানব, শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, তার সেই অধিকার আমরা স্বীকার করতে পারি না। নিপীড়িত মানবের কণ্ঠরোধ করবার অধিকার ভারত সরকারকে দেওয়া হয় নি।

রাজ অতিথির আগমন উপলক্ষে আন্দোলন নিষিদ্ধ করার রাজনৈতিক ও আর্থিক যুক্তি শুনতে চাই না। কোন রাজনৈতিক বা আর্থিক লাভের মূল্যে আমরা আত্মাকে বিক্রয় করব না। মৌল ন্যায় ও মনুষ্যত্বের প্রশ্ন (Basic issue of humanity & Justice) কোন আলোচনা করব না। সেই সুপ্রাচীন যুগ থেকে, অতীত ইতিহাস ও কৃষ্টির মধ্য দিয়ে ইরানের সঙ্গে আমাদের মৈত্রীর বন্ধন গড়ে উঠেছে। বর্তমান যুগের উন্নয়নের প্রয়োজনে আবার পরস্পর আকৃষ্ট হয়েছি। আমরা চাই ইরানের তেল, চাই ইরানী অর্থ বিনিয়োগ। ইরান চায় আমাদের কারিগরি জ্ঞান, আমাদের টেকনিশিয়ানের সহায়তা। উভয় দেশের মধ্যে একটি স্থিতিশীল solid পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে উঠুক এই আমরা চাই। কিন্তু সম্পর্ক, সে দুজন মানুষের মধ্যেই হোক, বা দুটি জাতির মধ্যেই গড়ে উঠুক, তার ভিত্তি হওয়া চাই দৃঢ় সততার উপর। সেটা প্রচার করব আমরা শুধু ফাঁকা কথায় নয়, কাজের মধ্য দিয়ে।

আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, শুধু নিজের দেশে নয় পরের দেশেও। ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব, ভূপৃষ্ঠে যেখানেই দেখি, আমরা দুঃখ পাই। যারাই সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ করবেন, তাদেরই আমাদের সমর্থন পাবেন। ইরানীই হোন আর বাঙালীই হোন, যেখানে হাতুন, নিজের দেশের অভ্যন্তরে বাক্ স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য যিনিই কঠোর সংগ্রামে নিযুক্ত, তিনিই ভারতের জনগণের নৈতিক সমর্থনের উপর নির্ভর করতে পারেন।— যতদিন নিজের দেশে প্রতিটি ভারতীয় সেই স্বাধীনতা ভোগ করবে।

আমরা নীচের তলার মানুষ। আমাদের মেজাজ ছিলেন ভিখারী ছেলে বন্ধী ; ছিলেন বিদেশে স্বেচ্ছা নির্বাসিত। ভারতীয়ের বিনাই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায়

এর পর ৩ পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[দ্বিতীয়বার বিলেত গমন ও ১৮৭৪—১৮৮২ সালের ঘটনাবলী]

[পূর্বানুবৃত্তি]

এর এক মাস পরে এপ্রিল মাসে, ফ্রি-চার্চ কলেজের প্রিন্সিপাল রবার্টসন সাহেব সেই কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। প্রস্তাবটি গ্রহণ করি এবং ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত সেই পদে কাজ করি। ওই সালে আমাকে পদত্যাগ করতে হয়। কারণ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আমি গড়ে তুলেছি তার দেখাশুনায় আমার অধিকতর সময় ও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

১৮৮২ সালে আমি প্রেসিডেন্সী ইনষ্টিটিউসন্ নামে একটি স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। স্কুলটিতে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হত। এই স্কুলটিকে কেন্দ্র করেই পরে রিপন কলেজ গড়ে ওঠে। কিন্তু আমি যখন স্কুলটির ভার গ্রহণ করি তখন এর ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র দুই শত। আমি স্কুলটির সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করলাম। করলাম। স্কুলটি ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস পর্যন্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত ছিল। পরে ঘটনাক্রমে বি. এ, বি. এস. সি ও বি. এল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। লর্ড রিপনের চলে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তাঁর স্মৃতি নিয়ে তাঁর নামেই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করি। এখন এটি রিপন কলেজ নামে পরিচিত। কলেজটি এখন পরিপূর্ণভাবে সজ্জিত একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ—সঙ্গে আছে একটি হাইস্কুল সর্বসাকুল্যে ২৫০০ ছাত্র এখানে আছে। প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত এর একটি নিজস্ব বাড়ী গড়ে উঠেছে। এই প্রতিষ্ঠানের উপর আমার সমস্ত মালিকানা আমি একটি ট্রাষ্ট ডিডের মাধ্যমে জনসাধারণকে ছেড়ে দিয়েছি।

১৮৭৪ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩৭ বছর শিক্ষা দান কার্যে ব্যাপৃত ছিলাম। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়ায় আমার ঘন ঘন দিল্লী কলকাতা যাতায়াত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে আমাকে আমার বৃত্তিগত কর্তব্য থেকে সরে আসতে হয়। আমার রাজনৈতিক কাজকে আমি বড় করে দেখি ঠিকই; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকের কাজই আমার কাছে বেশী আনন্দদায়ক বলে মনে করি। আমার রাজনৈতিক কাজের কথা পরে বিবৃত করছি।

(২ পাতার শেষাংশ)

প্রচার করেছেন, কেউ বাধা দেয় নি। দেশের অভ্যন্তরে আমরা মনোবলকে পা রাখতে দেখেছি, দেখা দেইনি; নেতার নির্দেশে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। অবশেষে মুক্ত করে এনেছি নেতাদের।

——আজ দেখছি তারা সব প্রতিশ্রুতিই ভুলে গেছেন। ইন্ডিয়ার কানাকানুন এরাই আমাদের আইন। যে সব বিদেশী ছাত্রকে ইন্ডিয়া আশ্রয় দিয়েছিল না, তাদের করেছেন নির্বাসিত।

আজ মনে পড়ছে মহাভারতের কর্কট নাগের গল্প।—কর্কট নাগ, কার যেন অভিশাপে, দীর্ঘকাল আগুনের ঘরে বন্দী ছিল। 'ত্রাণ কর', 'ত্রাণ কর' বলে তারস্বরে আর্তনাদ করত। কেউ তাকে উদ্ধার করতে যায় নি। তারা বুদ্ধিমান। দীর্ঘকাল পরে নির্বাসিত বুদ্ধিভ্রষ্ট রাজা নল, ভ্রাতৃপ্রেমে পরিচালিত হয়ে অগ্নিমুখে প্রবেশ করে মৃতপ্রায় নাগকে উদ্ধার করেন। কর্কট নাগ পরিত্রাণ পেয়ে প্রথম কাজ করেছিল পরিত্রাতা নলকে দংশন। সোনার বর্ণ কালি হয়ে গেছিল সেই বিষে।

———

নিতান্ত অনিচ্ছায়ই আমি আমার শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করি। কারণ, ছাত্রদের আমি ভালবাসতাম এবং তাদের সঙ্গ আমাকে আনন্দ দিত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় একবার আমি বলেছিলাম "আমি যদি ছাত্রদের জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে কিছু করে থাকি, ছাত্ররাও তাদের দিক থেকে, আমি যা করেছি তা গড়ে দিয়েছে। আমি যদি তাদের মনে দেবার মনোভাব আগ্রত করে থেকে থাকি, তারাও আমাকে উজ্জীবিত করেছে, যৌবনের উদ্দীপনায় পূর্ণ করে রেখেছে।" তাদের সান্নিধ্যে আমিও যেন যুবক হয়ে গিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে প্রতিদিনের খেলাধূলার ফলে বয়োবৃদ্ধির মধ্যেও কিছু যৌবনসুলভ গুণ লাভ করি। অক্সফোর্ড মিশনের পরলোকগত মিঃ ফিলিপ স্মিথ ১৮৮৩ সালে কারাগারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ছাত্র সমাজের উপর আমার এতখানি প্রভাবের কারণ কি, তা তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারি কিনা। আমি সঙ্গে সঙ্গেই আমার স্বপ্রত্যয়িত উত্তর দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, "আমি ছাত্রদের ভালবাসি, তাদের আনন্দের মধ্যে আমিও আনন্দ পাই, তাদের দুঃখেরও আমি অংশীদার হই। তারাও তাদের যৌবনের উপর শ্রেষ্ঠতা নিয়ে আমার প্রতি তাদের সেই অনুভূতি প্রদর্শন করে।"

আমার শিক্ষকতার কাজকে আমি এক পবিত্র বৃত্তি বলে মনে করেছি। অবশ্য আমার কর্তব্য ছিল নানা দিকে বিস্তারিত। কিন্তু ক্লাশ নেওয়ার কর্তব্যকে আমি এক বিশেষ অগ্রাধিকার দিতাম। আমি কখনই আমার কাজের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হয়ে ক্লাশের ঘরে আসতাম না, ক্লাশঘরের মাহাত্ম্য এমনই যে সবচ সময় এরূপ ঘটনা ঘটেছে যে কোন কঠিন বিষয় নিয়ে আমার বাড়ীতে প্রস্তুতি কালে কোন সমাধান হস্তগত করে উঠতে পারিনি, কিন্তু ক্লাসে লেকচার দেওয়ার সময় সেই পরিবেশের প্রভাবেই তা উজ্জ্বলভাবে সহজ ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। এই ভাবে দেখা যায় যে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্কের মধ্যে একটা জীবন্ত চুম্বকী আকর্ষণশক্তি আছে। যে সমস্ত শিক্ষক ছাত্রদের সম্পর্কে বাস্তবিকই আগ্রহ নিয়ে কাজ করেন, তাঁরাই এ ব্যাপারটা অনুভব করে থাকেন। আমি সব সময়ই আমার শিক্ষাদান কাজকে খুব উচ্চ মূল্য দিয়েছি। এই কাজকে আমার অন্য সব কাজের অগ্রবর্তী করে রেখেছিলাম। এ সম্পর্কে আমি এক বক্তৃতায় যে মন্তব্য করেছিলাম, প্রসঙ্গক্রমে, তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি।

"রাজনৈতিক কাজের প্রয়োজনীয়তা খুব থাকলেও এটা একটা ক্ষণস্থায়ী সাময়িক ব্যাপার মাত্র। কিন্তু শিক্ষার কাজের মধ্যে একটা স্থায়ী চিরন্তন উপযোগিতার উপাদান আছে। শিক্ষকের সাম্রাজ্য চিরকালীন। ইহা ভাবীকালকে জুড়ে অবস্থান করে। শিক্ষকগণ অনাগত কালেরও গুরু। এর চেয়ে মহত্তর বৃত্তির কথা আমি ভাবতে পারিনা। শিক্ষকদের কাজ হচ্ছে স্বর্গ নিয়োজিত কাজ, এক পবিত্র বৃত্তি। কিন্তু কজন লোক তাদের সেই দায়িত্বের কথা উপলব্ধি করতে পারেন বা নিজেদের সেই উচ্চ আদর্শের মহিমায় মণ্ডিত করতে পারেন? বর্তমানের কাজকে যদি চিরস্থায়ী করে রাখতে হয়, তাহলে তা করতে হবে ভবিষ্যতের যারা নাগরিক হবেন তাদের মাধ্যমে। খৃষ্টান ধর্মের মহান প্রবর্তকের বাণী "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও," যীশুর এই আবেদন ছিল নম্র, শান্ত ও গ্রাহী মনের প্রতি যাদের হৃদয় জীবনের মুষ্টাঘাতে কঠিন হয়ে পড়েনি। তাই উদাসীন ও কঠিন হৃদয়ের প্রতি তিনি আবেদন রাখেন নি।"

আমি মনে করি, আমার শিক্ষকতার কাজ ও রাজনৈতিক কাজ কর্ম একটা আর একটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। আমি অনুভব করেছি, দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত রূপেই নির্ভর করে দেশের তরুণদের মধ্যে নির্ভেজাল, সুস্থ এবং যুক্তিযুক্ত মনোভাবসৃষ্টির উপর যা নিয়ে তারা জনসেবামূলক কাজে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। জনসেবামূলককাজে বাসনার বীজ প্রথমে তাদের মধ্যেই উপ্ত করতে হবে। তাদের একটা শিক্ষা নবিশীর কাল অতিক্রম করে নাগরিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। ১৮৭৫

গড়ে বাংলার ছাত্রদের মনোভাবের মধ্যে রাজনীতি সম্পর্কে যেরূপ একটা ঔদাসীন্যবোধ ছিল, সেরূপ ঔদাসীন্যের জড়তা থেকে তাদের আমরা করতে হবে। এ হল এক দিকের কথা। অপর দিকে তাদের আমার চরম মতবাদের উন্মাদনার হাত থেকেও রক্ষা করতে হবে। কারণ, ইতিহাসের শিক্ষা থেকেই জানা যায় যে এই চরমপন্থী উন্মাদনায় পথ চলায় বিপর্যয় ঘটে। আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম যে আমি আমার সাধ্যমত এক নতুন জাতীয় শক্তি জাগ্রত করব এবং এক নতুন পরিবেশ রচনা করব। আমার এই অন্তর্নিহিত মনোভাবই আমাকে ছাত্র সমিতি গঠনে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আমার এই সংগঠন কার্যে ৺আনন্দ মোহন বোস ছিলেন আমার সঙ্গে, আমার ফিরে আসার কয়েকমাস আগেই মিঃ বোস লণ্ডন থেকে ফিরে আসেন এবং কলকাতায় একটি ছাত্র সমিতি গঠন করেন। তিনিই ছিলেন তার প্রেসিডেন্ট। আনন্দ মোহন বোস ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম ছাত্রদের মধ্যে একজন। তাঁর জন্ম ময়মনসিংহে জিলায়: বয়সে আমার চেয়ে এক বছরের বড়। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। যোগ্যতার ক্রম বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় তাঁর স্থান ছিল ষষ্ঠ। আই. এ., বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং প্রেসটাদ রায়চাঁদ জলপানি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ গৌরব অর্জন করে সাফল্যের মুকুট ধারণ করেন। তিনি কেম্ব্রিজে যান এবং সেখানে তিনিই হলেন ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম র‍্যাংগলার। তালিকায় তাঁর নাম ছিল অষ্টাদশ সংখ্যায়। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী বাগ্মী পুরুষ। লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক সভায় তিনি বক্তৃতা করেছিলেন। সেই সভায় মিঃ কঁসেট উপস্থিত ছিলেন। মিঃ বোস এমন শক্তিশালী ও মনোজ্ঞ ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন যে মিঃ কঁসেট সে বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন যে তার মত বক্তা হাউস অব কমন্সে ৬ জনের বেশী নেই। এই রকম একজন সুযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে তার দেশবাসী অনেক কিছু বড় কাজ আশা করেছিলেন। আনন্দমোহন জনসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন এমন ঐকান্তিকতার সহিত যে কাজে তিনি লেগে গেলেন যে তার সহ-প্রতিযোগীদের আর কারও মধ্যে সে ঐকান্তিকতা পরিলক্ষিত হয়নি। আদালতে ব্যারিষ্টাররূপে তাঁর পসার জমেই জমে ওঠে। কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল দেশের কাজে সমর্পিত। আমার মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁর আইন ব্যবসায়ের কাজ ও জনসেবামূলক—এই দোটানার কাজের চাপ তাঁর ব্যবসায়িক কাজে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। (ক্রমশঃ)

যকৃতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায় অব্যর্থ ফলপ্রদ

আমলা ঘৃত কুমারী

আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
নীলকণ্ঠ কুটীর • কুতুল পুকুর • বারাসত • ২৪ পরগনা

সুভাষচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধী

—সন্তোষ কুমার অধিকারী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গান্ধীর নেতৃত্বে নয়, গান্ধীর নীতিতে সুভাষচন্দ্রের সংশয় ছিল। তাই কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়ে গান্ধীজিকে নেতা হিসেবে তিনি বরণ করেছেন, তবু সত্যকার সংগ্রামের মত প্রতিমুহূর্তে চেষ্টা করেছেন গান্ধীজিকে বাস্তব রাজনীতির পথে টেনে আনতে। কিন্তু শুরুতে যা ছিল সংশয়, পরবর্তী কালে তাই দাঁড়িয়েছে মতান্তর, এমনকি রাজনৈতিক বিরোধে।

গান্ধীর বিধায়িত সংগ্রামনীতি শুধু সুভাষকে নয়, সেদিন বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন সকলকেই, এমনকি দেশবন্ধু দাসকেও বিচলিত করেছিল। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে সারাভারতের মানুষ কাঁপিয়ে পড়ল। আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন হঠাৎ একটি সামান্য ঘটনাকে (চৌরা চৌরী) কেন্দ্র করে গান্ধীজি আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। কারণ তাঁর বিবেকে আঘাত লাগল।

মাইকেল এডওয়ার্ডস-এর বিশ্লেষক চোখে—"The British felt that they had little to fear from Gandhi himself.....so the Government obliged Gandhi by treating him with considerable respect—jailing him occasionally to keep up appearances—while they took much more positive action against terrorists...whom they really feared."

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের ওপর সুভাষচন্দ্র অনেকখানি নির্ভর করেছিলেন। তার পরিচয় গান্ধী সম্পর্কে এই সময়ে তাঁর যে মনোভাব ছিল তার থেকেই সুস্পষ্ট। গান্ধী-বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষ ব্যক্তিগতভাবে গান্ধী সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। একসময়ে তিনি লিখেছিলেন—"কংগ্রেসকে গান্ধীজি যে শুধু নিয়মতান্ত্রিকের বাঁধনের মধ্যে আনলেন, তা'ই নয়; কংগ্রেসকে তিনি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ দিলেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, কংগ্রেসকে তিনি সংগ্রামমুখী করলেন।..... দুর্ভাগ্যবশতঃ গান্ধীজি অনেক গুরুতর ভুলের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—হিমালয়ের মত বিপুল ভুল—'Himalayan blunders'। আজও যে তিনি মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে বসে আছেন, তার কারণ এ নয় যে, তাঁর বিচারে ভুল ছিল না কিন্তু তাঁর সাফল্যও এত বেশী ছিল যে দেশবাসী তাঁর সমস্ত ভুল ক্ষমা করতে পেরেছে।"

কিন্তু হিমালয়ের মত বিপুল পরিমাণ ভুলই করলেন গান্ধীজি। আন্দোলন যখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে তখন হঠাৎ তিনি জানালেন আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়—"To sound the order of retreat just when Public enthusiasm was reaching the boiling point, was nothing short of a natoinal calamity।" জনতার উৎসাহ ও উত্তেজনা যখন চরমমুহূর্তে পৌঁছেছে, তখন পশ্চাদপসরণের নির্দেশকে ভাতৃঘাতী দুর্দৈব ছাড়া আর কোন ভাষাতেই ব্যক্ত করা যায় না।

১৯২২-এর পর ১৯২৮ সালে দেশ আবার সংগ্রামমুখী হয়ে উঠেছিল। ১৯২৮ সালেই সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদ একটি সুস্পষ্ট আকার নিল। এবং গান্ধীবাদের সঙ্গে তাঁর মতের বৈষম্যও প্রকাশ্য হয়ে উঠল। এই সময়ে সাইমন কমিশন বয়কট নিয়ে বৈঠক, দেশব্যাপী তুমুল উত্তেজনা; অথচ গান্ধী সাবরমতী আশ্রমে সুতো-কাটায় ব্যস্ত। সুভাষ ছুটে গেলেন গান্ধীর কাছে। চেষ্টা করলেন তাঁকে টেনে আনতে। কিন্তু গান্ধীজির উত্তরে সুভাষ নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। গান্ধী বললেন—"আমি ত কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না"।

ডিসেম্বরে কলকাতা অধিবেশনে তরুণ সুভাষ গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে সোচ্চার করে তুললেন। কিন্তু গান্ধী মতিলাল নেহেরুর সহযোগিতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবকেই গ্রহণ করালেন। সুভাষের সঙ্গে গান্ধীর এই মতবিরোধ আরও সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল লাহোর কংগ্রেসে। পূর্ণস্বাধীনতাকে অন্তিম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেও গান্ধী নির্দেশ দিলেন যে কর্মবিধির, তা হবে—

চরকার সুতো কাটা
খাদির তৈরী বস্ত্র পরা এবং
অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করা।

সুভাষের প্রস্তাব ছিল সমাজতান্ত্রিক ভারতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা। সে প্রস্তাব উপেক্ষিত হল।

অর্থাৎ গান্ধী স্বাধীনতার সংগ্রামকে যখন চরকায় সুতো কাটা ও অস্পৃশ্যতার সমস্যায় করে দিতে চাইছেন, তখন সুভাষ শক্তির পন্থা গ্রহণের জন্য ব্যস্ত। সুভাষ তখন ভাবছেন, ভারতবর্ষে শক্তির অভাব কোনদিন হয়নি। কিন্তু সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নেতার অভাব ঘটেছে। দর্শনচিন্তার পথ থেকে স্বদেশচিন্তার পথে এবং নিষ্ক্রিয় নীতিচর্চার ছায়া থেকে প্রত্যক্ষ বিপ্লবের পথে দেশকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবল নেতৃত্বের প্রয়োজন।

১৯৩০ সালে কারাগার থেকে অসুস্থ অবস্থায় সুভাষচন্দ্রকে ইউরোপ যেতে হল চিকিৎসার জন্য। ১৯৩০ সাল থেকেই সুভাষকে কারাগারে রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে গান্ধী-আরউইন চুক্তি, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক, দেশব্যাপী সংগ্রাম এবং ধর্মঘটের গান্ধীজির আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘটনাগুলি ঘটে। সুভাষ নিরুপায় বেদনায় ছটফট করছেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য গান্ধীজির হঠাৎ আবেদনকে তিনি বর্ণনা করলেন এইভাবে—যুদ্ধক্ষেত্রে চরম মুহূর্তে সেনাধ্যক্ষ তাঁর সেনাবাহিনীকে হুকুম দিলেন দেশের অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য সুতো পুড়তে। সুভাষ বললেন,—এক সময়ে তিনিই দেশকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, সংগ্রামের পথে কিন্তু এখন সংগ্রামের পথে তিনিই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে এক যুক্ত বিবৃতিতে সুভাষ বললেন,—"আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই, যে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গান্ধী ব্যর্থ হয়েছেন। কাজেই এখন নতুন ভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। কংগ্রেসকে নতুন ভাবধারায় সংগঠিত করার জন্য নেতৃত্বের বদল হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ, তাঁর জীবনব্যাপী নীতিকে পরিত্যাগ করে গান্ধী নতুন কর্মপথ বেছে নিতে পারবেন, এমন আশা করা অসংগত।....."

সুভাষ বললেন,—"গোলটেবিল বৈঠকে কেবল সময়ের অপচয় করা হয়েছে। শুধু আলোচনার মাধ্যমে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নজির ইতিহাসে নেই। যুক্তির জন্যে ভারতবাসীকে রক্তদানের ব্রত নিতে হবে। যুদ্ধ ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।"

১৯৪৪ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত "দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল" গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র গান্ধীচরিত্রের যে আলেখ্য রচনা করেন, তার মধ্যেই তাঁর মনোভাবও স্পষ্ট। সুভাষচন্দ্র গান্ধীর প্রশস্তি গেয়ে বললেন—'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মূলতঃ তাঁরই সৃষ্টি। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রও তাঁর রচনা। আগে যা ছিল শুধুমাত্র একটি বক্তৃতামঞ্চ, গান্ধী তাকে পরিবর্তিত করলেন জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে।—তবু তাহলেও তিনি পুরোমাত্রায় সজীব ও সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর দেশবাসীর প্রয়োজনমত বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না।

তাই স্বরাজ আজও সুদূরস্বপ্নই রয়ে গেল।..... কিন্তু পবিত্র-চরিত্র গান্ধী তাঁর এত জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও স্বরাজ অর্জনে ব্যর্থ হলেন কেন?

"কারণ নেতার শক্তি ত তাঁর জনপ্রিয়তায় নয়; সে শক্তি নির্ভর করে চরিত্রের দৃঢ়তায়।....তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ, তিনি তাঁর নিজের দেশের মনকে যতখানি বুঝেছেন তার, প্রতিপক্ষের হৃদয়কে ততখানি বুঝতে পারেন নি। তিনি ব্যর্থ কারণ, তিনি তাঁর হাতের সবগুলি তাসই প্রতিপক্ষের টেবিলে বিছিয়ে দেন। কিন্তু রাজনৈতিক যুদ্ধে কূটনীতিকে বাদ দিয়ে জয়লাভ করা অসম্ভব। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে তিনি সবল হননি, কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী স্বার্থচিন্তাকে আপাতদৃষ্টিতে একতার বন্ধনে টানতে চেয়েছেন। ফলে রাজনীতির সংগ্রাম আরও দুর্বল হয়েছে! সবশেষে, তাঁর ব্যর্থতার কারণ, গান্ধীজির মধ্যে বিমুখী ব্যক্তিত্বের মিলন ঘটেছে। একদিকে তিনি দাসত্বে বদ্ধ জাতির নেতা, অন্যদিকে তিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে নীতিধর্মের প্রচারক হয়ে দাঁড়াতে চান। এই বিমুখী ব্যক্তিত্বের জন্যই তিনি কখনও ইংরাজের চরম শত্রু

—(চার্চিল) কখনও যা ইংরাজদাসত্বের শ্রেষ্ঠ পুলিসম্যান — (বিশ এলেন উইলকিনসন।)

১৯৩৮ সালে হঠাৎ সুভাষচন্দ্র ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সভাপতি হিসেবে সুভাষচন্দ্র নিজেকে নিয়োজিত করলেন কংগ্রেস ও দেশের মধ্যে আপোষ-বিরোধী মনোভাবকে গড়ে তুলতে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পর্যটন করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে আলোচনা করে সুভাষ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, আর একটি মহাযুদ্ধের কাল এগিয়ে এসেছে। অন্তর্দৃষ্টি দূরদর্শী সুভাষ এও বুঝেছিলেন যে, এই যুদ্ধে ব্রিটিশ দুর্বল হয়ে পড়বে। ব্রিটিশকে আঘাত করে স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার পক্ষে এ এক স্বর্ণ সুযোগ।

গান্ধীজি সুভাষের এ মনোভাবে খুশী হলেন না। তিনি ধরে আছেন যে, জাতীয় আন্দোলনের সময় এটা নয়। তিনি চাচ্ছেন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়ায় আসতে। কাজেই সুভাষের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতি তাঁকে বিপর্যস্ত করল।

আর একদিক থেকেও মতবিরোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। গান্ধী ধাদিকেন্দ্রিক গ্রামীণ শিল্পের প্রসারের জন্য তাঁর জীবন নিয়োগ করেছেন। অন্যদিকে আধুনিক বৃহৎ-শিল্পের প্রতি তাঁর নিদারুণ বিরূপতা। আর সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে "বি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি"র সৃষ্টি করলেন। যার উদ্দেশ্য ভারতে শিল্পোন্নতির কাজকে ত্বরান্বিত করা। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন দ্রুত শিল্পায়নের প্রসার।

কাজেই ১৯৩৯ সালে গান্ধী পট্টভি সীতারামাইয়াকে তাঁর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে আশীর্বাদ জানালেন। কিন্তু সুভাষ পট্টভিকে পরাজিত করে ত্রিপুরি কংগ্রেসে নির্বাচিত হওয়ায় গান্ধীজি অত্যন্ত বিচলিত এবং ঈর্ষিত হলেন। স্বভাবধৈর্য্য তাঁর ভেঙে গেল। গান্ধীজি জানালেন —"পট্টভির পরাজয় আমারই পরাজয়—...যাহাহউক সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন।....."

১৯৩৯ সালে মার্চ মাসে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতির আসন থেকে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব আনলেন যে, অবিলম্বে ব্রিটিশ সরকারকে চরম পত্র দেওয়া হোক। চরম পত্রে ছ'মাসের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়ার দাবি জানানো হবে। ব্রিটিশ এ দাবি মানবে না, কাজেই চরম আন্দোলনের জন্যও এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

সুভাষচন্দ্রের এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন গান্ধী। গান্ধীকে সমর্থন করলেন নেহেরু। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হ'ল। ক্রমশঃ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হ'ল যে, সুভাষচন্দ্র দেখলেন, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কেউই তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না এমন কি সুভাষচন্দ্রের নামে ব্যক্তিগত ভাবে দুর্নাম ছড়ানো হতে লাগল। ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারেও সেই অসহযোগ। সুভাষ গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েও সফল হলেন না। অবশ্য তাঁর চিঠির উত্তর দিলেন গান্ধী—

"—.....তুমি মত ব্যক্ত করেছ যা আমার এবং অন্যান্যদের মতের এত বিপরীত যে, আমি দুইমতের ব্যবধান ঘোচানোর কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হয়-কোন রকম মিশ্রণ না ঘটিয়ে এই ধরণের চিন্তাধারা দেশের সামনে তুলে ধরা উচিত। সততার সঙ্গে তা করা হ'লে কোন রকম তিক্ততা দানা বাঁধবেই বা কেন, আর তা দৃষ্টিকটুতেই পর্যবসিত হবে কেন—আমি বুঝতে পারছি না।.....

"তুমি বলেছ দেশ এখন যতটা অহিংস, এমন আর কোনদিন ছিল না। এ সম্পর্কে আমার মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে বাতাসে আমি শ্বাস গ্রহণ করি, তাতে আমি হিংসার গন্ধ পাচ্ছি। তবে হিংসা একটা সূক্ষ্ম রূপ নিয়েছে। আমাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস হিংসার একটি সূক্ষ্ম দিক।—

"এই অবস্থায় আমি অহিংস গণসংগ্রামের পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি না।"

ওপরের চিঠিটি দেখেন গান্ধী এপ্রিল মাসের ২ তারিখে। গান্ধীর অনুগামী কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের পূর্ণ অসহযোগিতার বাধ্য হয়ে সভাপতির পদ থেকে এপ্রিল মাসের ২১ তারিখে সুভাষচন্দ্র বিদায় নিলেন।

ভারতীয় সমাজবাদের ধারা

—নির্মল সেনগুপ্ত

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, 'যত মত তত পথ'। লেনিন বলেছেন, 'পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই যে সমাজবাদের লক্ষ্যে পৌঁছবে, তাতে তাঁর কোনো সংশয় নেই। কিন্তু সব পথ ঠিক এক রকম হবে না। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজবাদী বিবর্তনে সবারই নিজস্ব কিছু অবদান থাকবে।' মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, 'গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, এতে দুর্বলতম ও প্রবলতম ব্যক্তির সমান সুবিধা থাকবে।'

গান্ধীজী গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর যে ধারণার কথা বলেছেন, আজকে আমাদের সমাজবাদী ধারণার সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই। সমাজতন্ত্রের ইতিহাস যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরাই জানেন চৌষট্টি কলার মতো সমাজতন্ত্রও চৌষট্টি রকমের। সব ধর্মের মূল কথা যেমন ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো, তেমনি সব সমাজতন্ত্রেরই মূল কথা হল সম্পদের সমবণ্টন ও সামাজিক শ্রেণী বিলোপ। যে সব দেশ সমাজবাদের পথে গেছে, তারা সকলেই এইখান থেকে কাজ শুরু করেছে। আমাদের দেশ সমাজবাদের পথে পা বাড়িয়েছে, সম্পদের সমবণ্টন এবং সামাজিক শ্রেণী বিলোপের কাজ আমাদের দেশেও চলেছে। কিন্তু সামাজিক শ্রেণী বিলোপ অপেক্ষাকৃত গৌণ। এখন মুখ্য হল দরিদ্র জনগণের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো।

আপাততঃ এটাই আমাদের সমাজবাদ। আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম—এই লক্ষ্যেই পরিচালিত। আমাদের সমাজবাদ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ। মহাত্মা গান্ধী যে গণতন্ত্রের কথা বলেছেন, তার মধ্যে মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বললে তার আওতায় উভয়ের চিন্তাধারাকেই নিয়ে আসা যায়।

যে সব দেশে সমাজবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত, যেমন—রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং চীন—সেখানে প্রশ্নটা সমাজবাদের, অর্থাৎ তারা আগে থেকেই স্বাধীন ছিল, তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়তে হয় নি, লড়তে হয়েছে শ্রেণী-বৈষম্য বিলোপের জন্য। আমাদের দেশে দুটো প্রশ্নই একসঙ্গে এসেছে, অর্থাৎ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র জনগণের অবস্থার উন্নতির কথাটাও ভাবতে হয়েছে। আমরা যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি, তখন দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতির কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছি। স্বাধীনতা আমাদের কাছে প্রথমাবধি দুটি রূপ প্রতিভাত হয়েছে—একটি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অপরটি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনও সম্পূর্ণ নয়।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংগ্রামও শুরু হয়েছিল ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর পদার্পণের সূচনা থেকে। রাষ্ট্রীয় মুক্তির দাবীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এর অর্থনৈতিক দিকটাও তুলে ধরেছিলেন চম্পারণ জেলায় কৃষকদের ও আমেদাবাদের সূতীকল শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী পূরণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। অর্থনৈতিক সংগ্রামের আর একটি দিক ছিল সর্দার প্যাটেলের বারদৌলি সত্যাগ্রহ। আমরা দেখেছি, এর মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপান্তর ঘটেছে, এইসব দেখে শুনে এক শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তখন কংগ্রেস থেকে সরে গেছেন। তাঁরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধ চালিয়েছেন ঘটে, কিন্তু জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না।

এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সম্পূর্ণ চরিত্র বদল হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নিষ্পীড়িত মানুষ গান্ধীজীর পতাকাতলে সমবেত হল। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস হ'ল জনগণের কংগ্রেস। গান্ধীজী এই কথাটাই বলেছিলেন ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকের সময়কার একটি ভাষণে—Above all the Congress represents in its essence the dumb semi-starved millions scattered over the length and breadth of the land in its seven lakh villages. Every interest which in the opinion of the Congress is worthy of protection has to subserve the interests of these dumb millions.

১৯২৯ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল এই কথা: 'ভারতীয় জনগণের এই দারিদ্র্য ও দুর্দশা শুধুমাত্র বৈদেশিক শোষণের জন্যই নয়। ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক গঠনও এর জন্য দায়ী। বিদেশী শাসকরা এটাকে সমর্থন করেছে তাদের শোষণের সুবিধার জন্য। সুতরাং ভারতীয় জনগণের এই দুর্দশা ও দারিদ্র্য দূর করতে হলে, যেটা অপরিহার্য তা' হ'ল সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানো এবং অসাম্যগুলি দূর করা। ১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, জনগণের শোষণ বন্ধ করার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষের প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। শ্রমিক কৃষকের ন্যায্য মজুরীর কথা বলার সময় একথাও বলা হয়েছিল যে, মৌল শিল্প ও কৃষাক, খনিজ সম্পদ, রেলপথ, জলপথ, জাহাজ ও অন্যান্য সকল প্রকার যানবাহনের মালিকানা বা কর্তৃত্ব হবে রাষ্ট্রের।

জওহরলাল এক সময় নিজেকে বলেছিলেন a Socialist and a Republican. তিনি বলতেন, সমাজবাদ ছাড়া এই বিরাট দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, অবনয়ন ও অধঃপতন -কিছুতেই রোধ করা যাবে না। সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যার আছে, সে অবশ্যই জনগণের পাশে দাঁড়াবে, তাঁর সংগ্রাম হবে জনগণের সংগ্রাম। স্বাধীনতার অর্থ হবে জনগণের শোষণের অবসান।

জওহরলাল নিজেকে সমাজবাদী বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু গান্ধীজী নিজেকে সমাজবাদী বলেন নি। ১৯৩৩-৩৪ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রী দলের অভ্যুদয়ের সংগে কে কতখানি সমাজবাদী তা' নিয়ে ঢের বিতর্ক হ'ত। গান্ধীজী নিজেকে সমাজবাদী না বললেও একথা বলতেন, জওহরলালের মতো তিনিও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ চান। জওহরলাল শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধী, গান্ধীজীও শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধী। নৈতিক সমাজবাদ ভারতে চলতে পারে কিনা, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, যারা জমিতে শ্রম দেয়, জমিতে তাদের অধিকার অবশ্যই আছে। জমির মালিক হবে সে-ই, যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি চাষ করে।

এক সময় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে গান্ধীজীর বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল। আমরা জানি গান্ধীজী ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছুই রাখেন নি, সবই ত্যাগ করেছিলেন। অপর পক্ষে যে সব সমাজবাদী নেতা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন, তাঁরা সর্বত্যাগী ছিলেন না। তিনি যেন তাঁদের খোঁচা দেবার জন্যই বলেছিলেন, "চেয়ে দেখ, আমিই প্রকৃত সমাজবাদী, কারণ দরিদ্রদের সেবা করার জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করেছি। তোমরা বড় লোকের ছেলেরা আমাদের সম্পত্তি

থেকে বঞ্চিত করতে চাও, নিজেদের সম্পত্তি পরিত্যাগ না করেই। এটা আমি কিছুতেই তারিফ করতে পারি না।' এর উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন, গান্ধীজীর সমাজবাদ 'সেন্টিমেন্টাল,' তাঁদের সমাজবাদ সায়েন্টিফিক।

এই ধরণের আলোচনা এখন আর শোনা যায় না, এই সব আলোচনার সার্থকতাও এখন নেই। আন্তর্জাতিক সমাজবাদে ইতিমধ্যে বহু রূপান্তর ঘটেছে; আমাদের দেশেও কে সমাজবাদী, কে সমাজবাদী নয়, এই কথা নিয়ে এখন আর কেউ আলোচনা করেন না। আলোচনার প্রয়োজনও তেমন নেই। কারণ সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম এখন সমাজবাদভিত্তিক। উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত। মৌল শিল্পে বেসরকারী কর্তৃত্ব একেবারেই নেই। প্রধান প্রধান যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থা রাষ্ট্র পরিচালিত। ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি সব কিছুই এখন জনস্বার্থে নিয়োজিত। সমাজবাদের বহুবিধ সংজ্ঞার মধ্যে এগুলি অন্যতম। এই সব ব্যবস্থা যদি শহরকেন্দ্রিক, তবে পল্লীকেন্দ্রিক অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে। আপাতত এই হল ভারতীয় সমাজতন্ত্রের চেহারা।

একটা যুগে বলা হ'ত, সমাজবাদের গাছ ভারতের মাটিতে জন্মাবে না। এই কথার লক্ষ্য ছিল ইউরোপীয় সমাজবাদ, আরও স্পষ্টভাবে, মার্ক্সবাদ। সত্যি কথা বলতে, মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা এদেশে তেমন প্রাধান্য লাভ করে নি। কিন্তু সমাজবাদের বীজ ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন চিন্তাধারার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। মহাভারতকার স্বীকার করেছিলেন, দারিদ্র্য তিলে তিলে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়। দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য যেমন কীর্তিত হয় নি, তেমনি বলা হয়েছে, তুমি ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে। কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায়, তোমার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই ভোগ করবে, বাকীটার প্রতি তোমার লোভ থাকবে না। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ.....' এই কথাটার এ রকম ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে। উপনিষদে তাঁরও গুণ কীর্তন করা হয়েছে, যিনি সকলকে আপনার মতো ক'রে দেখেন—'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।'

চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খিলজির দরবারের কবি আমীর খুসরো বলেছিলেন, 'দরিদ্র চাষীর অশ্রুসজল চোখ থেকে যে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ে, তাই মণি মুক্তা হয়ে শোভা পায় বাদশার মুকুটে' বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন সমষ্টির সুখেই ব্যক্তির সুখ।—'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব,—এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি' বিবেকানন্দ ইউরোপ আমেরিকাতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নতুন যুগের হাওয়া বইছে সোস্যালিজ্‌ম, এনার্কিজ্‌ম্‌ নিহিলিজ্‌ম্‌ প্রভৃতির মধ্যে।

বিবেকানন্দের আগে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। সেই যুগে সমাজবাদ কথাটা উচ্চারিত হয় নি। কিন্তু বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তিনি ইংল্যাণ্ডের সাম্য চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং সেই চিন্তাকে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষণীতে উপস্থিত করেছিলেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে। এই মঙ্গল হুড়াহুড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার

এর পর ১৩ পাতায় দ্রষ্টব্য

সাম্প্রতিক

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

—যশস ঘোষ

আবার বসন্ত এলো। চৈত্রের বিকেলে ঝরা পাতা উড়িয়ে, আম্রমুকুলের গন্ধে দিগন্ত আকুল ক'রে আবার বসন্ত এলো বাঙালীর জীর্ণ জীবনে। পথ চলতে আজকাল হঠাৎ চোখে পড়ে রক্তাক্ত বদনের হাসিমুখ, বেলা-শেষের উদাসী আলোয়, ছ-ছ করা অথবা হাওয়ায় মনে হয়, ঘুন ধরে গেছে। যেখানে যাওয়ার ছিল যাওয়া হয়নি, যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর কথা ছিল, সেখানে আজও পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি। তিরিশটা বছর কেটে গেল, তবু আজও পথ খুঁজে পাবো মানুষ—এক বিশাল দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষ; শুধু জিনবাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি বাদের ক্ষয় ক'রে চলেছে প্রতিনিয়ত।

আগে নুন আনতে পান্তা ফুরোতো—আজ পান্তাও নেই, নুনেও টান পড়েছে—নবম সত্যাগ্রহের পথে চলেছে মানুষ। হঠাৎ নামা-অন্ধকারে কলোলিনী কলকাতা প্রায়শঃই দুঃস্বপ্নের নগরী! বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিষ্ঠাত্রী অবিদ্যার অনাচার! বিধানসভা সেবার এক্সচেঞ্জের প্রতীক! এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সামনে দীর্ঘ লাইন—বেকার ভাতার তদারকীতে কিছু ভাগ্যবানের ব্যস্ততা আর বঞ্চিতদের বেকার অপেক্ষা। রোজকার কাগজে শুধু ডাকাতি, নরহত্যা, রাহাজানি, ট্রেনডাকাতি আর শা কমিশন, বক্স কমিশন, দত্ত কমিশন খুন বদল, মত বদলের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি! সংগ্রামে চলছে অসংখ্য কর্মক্ষেত্রে আর লক আউট শুদ্ধ সংস্থার সংগ্রামী শ্রমিকের বুভুক্ষু স্লোগান্ বিশ শতকের উন্নত ষ্ট্রাটেজিকে ব্যঙ্গ করে চলেছে। শতকারদোর উষার সম্প্রদায় চেউয়ের মতো ভাসিয়ে দেবে সমস্তাকীর্ণ অবসাদকে—একদালের দরদী হিতাকাঙ্খীরা তাঁদের ফিরে যেতে উপদেশ দিচ্ছেন—কিন্তু বাঁচার পথ দেখাতে পারছেন না। ঘরে বাইরে, গ্রামে গঞ্জে, হাটে বাটে, অন্তর বন্দরের প্রতিটি প্রান্তে শুধু হতাশা, আর অসন্তোষ, শুধু নিরন্ন মানুষের মিছিল।

তবু, এরই মধ্যে বসন্ত এসেছে! বলত, কি দিয়ে আজ বরণ করবো তোমাকে? আমাদের ভাণ্ডার শূন্য, দীর্ঘদিনের বন্ধুর পথ-পরিক্রমায় আমরা ক্লান্ত, বিধ্বস্ত! শতাব্দীর কান্নায় কোকিলের মধুর ডাক আমাদের মরমে পশেনা, ঝরা ফুলের রাশিকে মনে হয় বাসি হকের মতো কালচে লাল। হাতে হাতে রজনীগন্ধার ঠিক আজ ফিকিং ঘটল, বেল-ফুলের মালা লেদন কার্ডের শুভ্রতায় লীন। শুধু স্বপ্ন আছে—মানুষের মতো বাঁচার স্বপ্ন, মানুষকে ভালোবাসার স্বপ্ন—অনিদ্র রাতের নিরালা অবসরে যা নেমে আসে দুচোখ জুড়ে—ছড়িয়ে পড়ে চেতনার প্রতিটি কোষে—মানুষকে বাঁচার প্রেরণা জোগায়, শক্তি জোগায় রাত্রশেষের আসন্ন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। বসন্ত, তোমার স্থান হোক্ আমাদের সেই রাতের স্বপ্নে, সেই নিদ্রাহীন মুহূর্তে, প্রতিনিয়ত ক্ষয় হয়েও যাতে আমরা অন্ততঃ বেঁচে থাকতে পারি।

দশ পয়সা কিলো দরে লবণ চাই

সংগঠন কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে প্রদত্ত সাম্প্রতিক একটি চিঠিতে জানানো হয়েছে যে, বাজারে দশ পয়সা কিলো দরে লবণ পাওয়ার দাবীতে তাঁরা মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে লবণ সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখযোগ্য গান্ধীজী ছিলেন এই জাতীয় লবণ সত্যাগ্রহের পথিকৃত।

পরীক্ষার খাতা পাওয়া গেল মুদীর দোকানে

বি-এ-, বি, কম পাট এথান পরীক্ষার ট্যাবুলেশন শীট পাওয়া গেছে বালিগঞ্জের এক মুদীর দোকানে—ঠোঙার আকারে। ঘটনাটা আকস্মিক হলেও একেবারে নতুন তা জোর করে বলা যায় না। বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও অরাজকতা দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে বিলম্ব ও অভূতপূর্ব গণফেল ও গণপাশের যে সব দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যেই জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তাতে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, এর আগেও হয়তো অন্য কোন অর্থকরী রূপে বিভিন্ন পরীক্ষার খাতার সদ্গতি হয়েছে—তবে এবারের মতো ধরা পড়েনি এই যা। এ অবস্থার এখনই অবসান প্রয়োজন—অন্যথায় দেশের সম্মুখে এক ভয়াবহ ভবিষ্যত ঘনিয়ে আসতে পারে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় অধিগ্রহণ বিল পাশ করিয়েই কি রাজ্যসরকার এ অনিবার্যতার মোকাবিলা করতে পারবেন ?

ডানকুনি মেলা

আগামী ১৭-২০ মার্চ পর্যন্ত ডানকুনী হুগলীর স্থানীয় শিশুসংস্থা 'বৈশালী'র চতুর্থ বর্ষপূর্তি' উৎসব উপলক্ষে কৃষি শিল্প বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ডানকুনী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত উৎসবে সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকার একটি প্রদর্শনী ও একটি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রকাশ।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী নগেন্দ্র চন্দ্র ধর

প্রবীণ বিপ্লবী নগেন্দ্র ধর ৮৯ বৎসর বয়সে তাহেরপুরে (নদীয়া জেলা) নিজ বাসভবনে গত ৫ই মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। বিপ্লবী অনুশীলন দলের কর্ম্মী হিসাবে তিনি তাঁহার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কারা নির্যাতন তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। শেষ জীবনে তিনি ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতেছিলেন। বিপ্লবী ধরের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোকার্ত্ত পরিবারকে জানাই সমবেদনা।

পরলোকে বিপ্লবী প্রমথ মজুমদার

বিপ্লবী যুগান্তর দলের কর্ম্মী ময়মনসিংহের প্রমথ মজুমদার (খোকা মজুমদার) হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৪ঠা মার্চ্চ আর, জি, কর হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৮ বৎসর। দেশবিভাগের পর তিনি ব্যারাকপুরে সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী প্রখ্যাতা কংগ্রেস কর্ম্মী ও সমাজসেবী রেণু মজুমদার কয়েক বছর আগে লোকান্তরিতা হন। উদারতা ও বন্ধুবাৎসল্যই ছিল লোকান্তরিত বিপ্লবীর জীবন ছন্দের বৈশিষ্ট্য। শোকসন্তপ্ত পরিবারপরিজনদের সাথে আমরা প্রয়াত বিপ্লবীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

গ্রাম-বাংলা

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রাম-উন্নয়ন ভাবনা

—বেগম দিলদার জাহান

(পূর্বানুবৃত্তি)

গ্রামজীবনের প্রতিটি বিভাগে ব্যাপক ও সুচিন্তিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এবং সে প্রচেষ্টা গ্রামের মানুষদেরই শুরু করতে হবে। যেসব কারণের জন্য গ্রামে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে তা তাদের অনুধাবন করতে হবে। এবং ঐসব কারণ একে একে দূর করার জন্য তৎপর হতে হবে। প্রতিটি কর্মক্ষম ব্যক্তিকে সামাজিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় উৎপাদনমূলক কর্মে নিয়োগ করা গ্রামীণ পরিকল্পনার মূলাধার হবে। গ্রামীন সম্পদ কাজে লাগানোর উপর জোর দিতে হবে

পল্লী উন্নয়নের অসংখ্য পরিকল্পনার পিছনে অর্থ বিনিয়োগ করে সর্বসাধারণের অর্থের অপচয় যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সাবধানতা প্রয়োজন। এবং প্রতিটি কাজের শুরুত্ব নির্ণয়ের মানদণ্ড হোক—কম খরচে বেশী মানুষের স্থায়ী উপকার।

সরকারের ৩০/৩২টি দপ্তরের অনেকগুলি দপ্তর গ্রামের কাজের দায়িত্বে রয়েছে। বর্তমান সরকারের ৩৬ দফা কর্মসূচীতেও গ্রামের কথা আছে অনেক। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি ঘোষিত প্রতিশ্রুতিগুলি রূপায়ণের পথে এগোলেই এক বিপুল কর্মপ্রবাহ শুরু হতে পারে গ্রাম জুড়ে। গ্রামের মানুষ তারই প্রতীক্ষায় আছে।

গ্রামের কাজে বাধাও আছে অনেক। সম্ভবতঃ প্রধান বাধা ভূমি মালিকানার বৈষম্য। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে সেই বাধা সাহসের সঙ্গেই মোকাবিলা করা হচ্ছে। অন্য ক্ষেত্রেও সেই রকম সাহসী পদক্ষেপ দেখতে চায় গ্রামের মানুষ। সেচ খাল বা জলনিকাশী খাল কাটা, হাসপাতাল তৈরী করা, গ্রামের রাস্তা বা সেতু নির্মাণ বা অন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছুটা সাহস ও দৃঢ়তা গ্রামের মানুষ দেখতে চায়।

আমি গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে এমন কি গ্রামে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের পথে বিরাট বাধা গ্রাম্য দলাদলি। "ভিলেজ পলিটিক্স" কথাটা গ্রামে গেলেই শুনতে পাওয়া যায়। এ রাজনীতিতে হীন প্রতিযোগিতা, ব্যক্তি বা দলকে হেয়, অপমানিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করার মানসিকতা তীব্র এবং প্রকটভাবে দেখা দেয়। এই দলীয় কারণেই আসে গ্রামের কাজে বাধা। যে বাধায় আটকে গ্রামের স্কুল উঠে যায়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয় না, পাম্পখানা, রাস্তা, সেতু বা অন্য কোন কল্যাণমূলক কাজ বানচাল হয়ে যায়। মামলা-মোকদ্দমাও একটি জটিল গ্রাম্য ব্যাধি। বাপের ভিটে, চাষের জমি পুকুর, বাগান, বাড়ী নিয়ে শুরু হয় মামলা। শরীকানা স্বত্বে জবর দখল, বলপূর্বক দখল অথবা দখল থেকে উৎখাত করার চেষ্টা থেকে হাজার হাজার দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার উৎপত্তি হয়। মামলার পিছনে উস্কানী, মদত ও প্ররোচনা দেয় গ্রামবাসীরাই।

এইসব গ্রামীণ নেতিবাচক প্রতিবিধান করে অগ্রগতি, যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় গ্রামে গড়তে হবে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। গ্রামীন প্রশাসন কাঠামোর রদবদল ঘটানো প্রয়োজন। তা করা গেলে গ্রামের সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটবে। যা গ্রামের মানুষকে জীবন সম্পর্কে একটা নতুন উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ করবে। তা হলে সেই দৃঢ় ভিতটা পাওয়া যাবে, যে ভিতের কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

"যদি দেশের অগণিত পেছিয়ে পড়া মানুষ, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার যোগ্যতা অর্জন না করে অথবা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যদি সুপরিকল্পিতভাবে সে রকম কোন পটভূমিকা সৃষ্টি করা না হয় তাহলে বহু শতাব্দী ব্যাপী শোষণ ও অবিচারের ফলে যে জাতির অধিকাংশ মানুষ হতোদ্যম, পরনির্ভরশীল তাদের নতুন সমাজ গঠনের কাজে উৎসাহী ও সক্রিয় করে তোলা যাবে না"।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীকীরোদ দত্ত

১৯০৯ সালে ৬ই মে মিঃ সে. পি. বিচক্রফট্‌ মামলার রায় দিলেন। অরবিন্দ মুক্তি পেলেন এ-ছাড়া দেবব্রত বসু, নিখিলেশ্বর রায়, হেমেন্দ্র সেন, শচীন্দ্র সেন, নগেন্দ্র বক্সী, নলীনি গুপ্ত, বিজয় নাগ, ধরণী গুপ্ত, নগেন্দ্রপূর্ণ সেন, প্রতাপ হে, দিনদয়াল বসু, বিজয় ভট্টাচার্য, সুধ সাহা, হেম সেন, প্রভৃতি ১৮ জন মুক্তি পেলেন। বারীন্দ্র এবং উল্লাসকর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। যাবত জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুন গো, বিভূতি সরকার, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর ঘোষ, উদ্ধবনাথ বক্সী, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্র নাথ বসু, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল এবং ইন্দুভূষণ রায়। ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন পরেশ মৌলিক, শিশির ঘোষ, এবং নীরাপদ রায়। ৭ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন অশোক নন্দী বালকৃষ্ণ হরিকানে এবং শিশির কুমার সেন। কৃষ্ণজীবন সান্যাল ১ বৎসর কারা দণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

হাইকোর্টে আপীল করা হল। তিনজন হল প্রধান বিচারপতি জেনকিন্স এবং বিচারপতি কার্ণ্ডাফ্‌ এর এজলাসে। বারীন্দ্র এবং উল্লাস করের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যাবৎ জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হল। হেমচন্দ্র এবং উপেন্দ্রনাথের পূর্ব দণ্ডই বহাল রইল। অন্যান্যদের যাবৎ জীবন দণ্ড হ্রাস পেয়ে ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিবর্তিত হল। বালকৃষ্ণ হরিকানে মুক্তি পেলেন। হাইকোর্টে মামলা চলা কালে অশোক নন্দীর মৃত্যু হল। বিচারপতিদের এক মত হতে না পারায় বিচারপতি হ্যালিংটনের সম্মুখে বিচারে ইন্দ্রনাথ নন্দী, সুশীল সেন, কৃষ্ণজীবন সান্যাল মুক্তি পেলেন।

বোমার মামলা এই ভাবে শেষ হল এবং বিপ্লব উদ্যোগের প্রথম পর্বও এই ভাবে শেষ হল। বিপ্লবের এই পর্বে সবচেয়ে আশ্চর্য অরবিন্দ স্বয়ং। শিক্ষা, দীক্ষায় তিনি ছিলেন পুরদস্তুর সাহেব, পিতৃ-পুরুষ থেকে তিনি পেয়েছিলেন ইংরেজীয়ানা সংস্কৃতির অধিকার। পাঁচ বৎসর বয়স থেকে তিনি বাঙালী জীবন থেকে অপসারিত দীর্ঘ ২১ বৎসর পরে হঠাৎ ভারতে ফিরে তিনি কি করে মনে প্রাণে, ভাবে, পোষাক পরিচ্ছদে একজন খাঁটি বাঙালী হয়ে উঠলেন এইটাই অরবিন্দের জীবনে সবচেয়ে আশ্চর্য। শুধু তাই নয় সেই বাঙালীয়ানার সাধনায় তিনি হলেন বিপ্লবী। অগ্নি মন্ত্রের উপাসক তিনি হলেন বিপ্লব আন্দোলনের মন্ত্রকবি, সে দিনের শাসক বর্গের দৃষ্টিতে এক বিভিষিকা এর কারণ বোধ হয় এই যে মাতৃভূমিকে তিনি সমগ্র অন্তর দিয়েই ভালবেসে ছিলেন। শুধু অরবিন্দের একার নয় এই মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসাই ছিল মানিক তলার বীর বিপ্লবীদের অমূল্য সম্পদ সমগ্র বিপ্লবযুগ ধরে বীর সাধকদেরও সম্পদ ছিল ইহাই। ১৯০৬ সালে অরবিন্দ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনীকে লিখে ছিলেন—"প্রিয়তমা মৃণালিনী, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ কতকটা মাঠ ক্ষেত, বন, পর্বত এবং নদী বলিয়া জানে। কিন্তু আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। যার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্ত পানে উদ্যত হয় তাহলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?"

অরবিন্দের এই সাধনাই ছিল মানিক তলার বীর বিপ্লবীদের সাধনা। এই সাধনা ছিল ১৯০২ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সমগ্র বিপ্লবযুগের সাধন, এই সাধন, বলেই তাঁরা ছুটে ছিল অসাধ্য সাধন করতে। প্রাণের রক্ত দিয়ে তাঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে ছুটে ছিল কোন বাধাই তাঁদের পথ রোধ করতে পারে নি।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা সেদিন ছিল তাদের মুখ্য লক্ষ্য ওই ছিল তাদের ধ্যান, এই ছিল তাদের মন্ত্র। এই মন্ত্র আত্মবলির মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন মানিকতলায়। আর এই পথেই তাঁরা দীক্ষা দিয়েছিলেন তরুণ বাঙলাকে। মানিকতলার নিকট এ মৃত্যু মহাযজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করেই

মহামহিমময়ী গরীয়সী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল বাঙলার তারুণ্য। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে তরুণ বাঙলা নিষ্ঠাভরে করেছে মৃত্যুর সাধনা কোন নির্যাতনকেই তারা নির্যাতন বলেই গণ্য করেন নি, দিন কেটেছে অনাহারে, রজনী কেটেছে নিদ্রাহীন। দিবস-রজনী ধ্যান এবং জপের মন্ত্র ছিল তাদের ভারতের স্বাধীনতা। জাতির মানিকতলার কাছে দীক্ষা পেয়ে ছিল এই জপের মন্ত্র আজ স্বাধীন ভারত সেই মানিক তলাকে ভুলবে কি করে?

জাতীয় জীবনে মানিক তলার যজ্ঞ সার্থক হয়েছে বিদেশীর শাসক তার শোষণ ছেড়ে বিদায় নিয়েছে চির-কালের মত বিপ্লবী বাংলা, বিপ্লবী ভারত জীবন মরণ সংগ্রাম করে আত্ম ত্যাগ ও স্বার্থ বলির মধ্যে দিয়ে আজ অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছেছে। সাধনা তাদের সার্থক হয়েছে, কিন্তু সেই মানিক তলা? সে আজ উপেক্ষিত কেন? এ কথা ভুললে চলবে না যে মানিক তলার যজ্ঞাগ্নি থেকে বিচ্ছুরিত একটা অগ্নি কণাই সেদিন সমগ্র ভারতে জাগিয়ে ছিল বিপ্লবের আগুন। এই যজ্ঞবেদীর বেদীমূলে বীরের দল তাদের দুরন্ত পথ যাত্রা শুরু এঁকে গিয়েছেন জাতি তাকেই লক্ষ্য করে এগিয়েছে তার জয় যাত্রার পথে। মৃত্যু শঙ্কাহীন আহ্বান তাদের ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে জাতি ও জীবনে আকাশে ও বাতাসে অর্ধশতাব্দী কাল ব্যাপী। সেই ইতিহাস কি মুছে যাবে জাতির স্মৃতি থেকে? অন্ধকারে নিভৃতে গোপনতার মধ্য দিয়ে যে জয় যাত্রা শুরু হয়ে ছিল তা দিনের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠবে না?

না, জাতি তার সেই অন্ধকার জীবনকেই অন্ধকারের মধ্যেই নিভে যেতে দিতে পারে না, কারণ সে হবে তার মৃত্যু। মৃত্যু পথ যাত্রীদের সেই সাধন পিঠের স্মৃতি রক্ষার দায়িত্ব জাতিকে গ্রহণ করতেই হবে। কারণ এই পথেই নতুন ভারতীয় জাতি সৃষ্টি হবে তাই মানিক তলার স্মৃতি রক্ষার দায়িত্ব সমগ্র জাতির।

শুনেছি জনতার কণ্ঠে আজ আবার ওঠছি বিপ্লবের জয়ধ্বনি। শহীদের আগমন অনুরণিত হচ্ছে জাতীয় জীবনে। জাতীয় জীবনে মুরারী পুকুর, মুরারী পুকুরেই শেষ হয় নি। অরবিন্দ থেকে ক্ষুদিরাম। ক্ষুদিরাম থেকে বাঘাযতীন, বাঘাযতীন থেকে ভগৎ সিং এবং ভগৎ সিং থেকে নেতাজী সুভাষ পর্যন্ত—মজঃফরপুর থেকে কাঙ্গি-পাড়া কাঙ্গিপাড়া থেকে গৌহাটি এবং গৌহাটি থেকে কলকাতা বাজার কলকাতা বাজার থেকে চট্টগ্রাম সবই মানিকতলার সাধনার সৃষ্টি। তাই জাতীর জীবনে এই গোপন ইতি-হাসকে নতুন আলোক সম্পাত করে জাতীকে নব জীবনে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব সমগ্র জাতির।

---

১২ পাতার শেষাংশ

আছে। কাহার এত মঙ্গল? হাকিম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি মাথায় খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে তুলুক, আমি তুলিব না। এই নয়শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে আমি কাহারও জয়গান করিব না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের সঙ্গে আজকের মিল নেই। তাঁর আমলের রাজা, ভূস্বামী, মহাজন প্রভৃতিরা এখন আর নেই। বর্তমান যুগে হাকিম শেখ, রামা কৈবর্ত ও পরান মণ্ডলেরা সে যুগের মতো নিঃস্ব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ থেকে শুরু ক'রে মহাত্মা গান্ধী জহরলাল পর্যন্ত যে সমতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমাদের সমাজতন্ত্রের পথ অনেকটা সেই পথ ধরেই চলেছে।

——

(contd from 2nd. cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—Calcutta		
Chakraborlty Jatish	167/10, Beliaghata Main Road, Cal-10	200	1. 10 76
Chakrabortty Kshitish,	60/1, Jalbag Colony, Cal-30.	200	
Chakrabortty Pravat Chandra,	2, Bidhan Palli, Cal-32.	200	
Chakrabortty Ram Ranjan,	18, Thakurdas Banerjee Rd, Cal-56.	200	
Chakraborty Rash Behari,	4/5, Rathtola Govt. Colony, Cal-56.	200	
Chakrabortty Subodh Ranjan,	5, East Barist Goyt. H. Estate. Cal-65.	200	
Chakrabortty Sreenath,	50, Prafullanagar, Cal-56.	200	
Chatterjee Bibhuti Bhusan,	38, Nepal Bhttacharji St. 1st. Lane, Cal-26.	200	
Chatterjee Birendra Kumar,	20, Strand Rd., (2nd Floor) Cal-1,	200	
Choudhury Probhat Kumar,	1/150, Jatindranagar, Cal-56.	200	
Choudhury Prantosh,	1/137, Sree Colony, Cal-47.	200	
Choudhury Ramesh Chandra,	147, West Putiary, Cal-41.	200	
Das Ajoy,	21, Jatin Das Rood, Cal-29.	200	
Das Bikash Chandra,	53, R. N. Guha Road, Cal-25.	200	
Das Hari Kanta,	28/1, Mahatma Gandhi Rd, Cal-41	200	
Das Naresh Chandra,	521, Purba Singhi Road, Cal-32.	200	
Das Prakash Chandra,	51, R. N. Guha Road, Cal-28.	200	
Das Sital Chandra,	10/6, Sodepur 1st. Lane, Cal-41.	200	
Das Shyamapada,	113, Sitaram Ghosh St.. Cal-9.	200	
Das Sudhir Ranjan,	6 1, Brindaban Mullick Lane, Cal-9.	200	
Das Trailokya Nath,	61/D, TollyGunj Road, Cal-33.	200	
Das Gupta Smt. Maya, Wd/Late Prfulla Ranjan	Baguihati, Cal-59.	200	
Das Purkayastha Priti Ranjan,	62/1, Abinash Ch. Banerji Lane, Cal-19	200	
Dey Krishna Chandra,	3, Maniktola Main Rd., Cal-54.	200	

(क्रमशः)

21 MAR

Regd No. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—৯.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

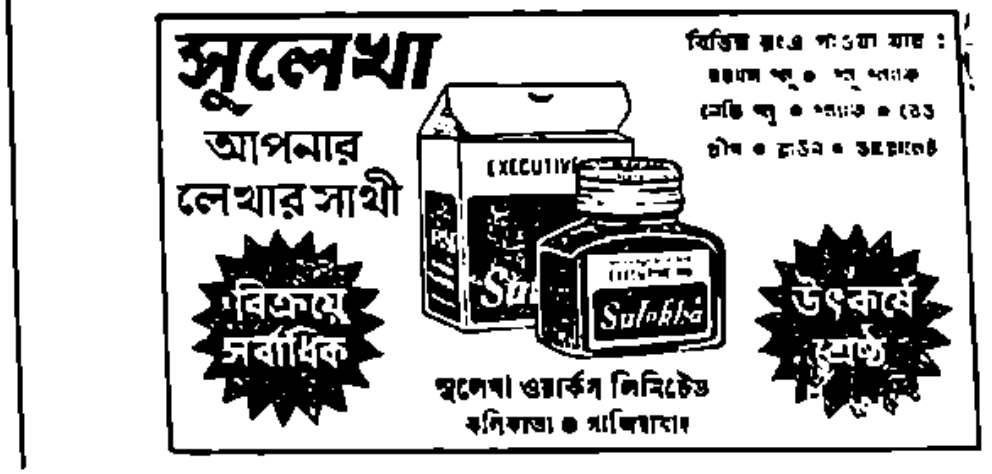

23 MAR 1978

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীসাহি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বোম্বাই—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীহরিপদ গুপ্ত।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৩নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১১ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

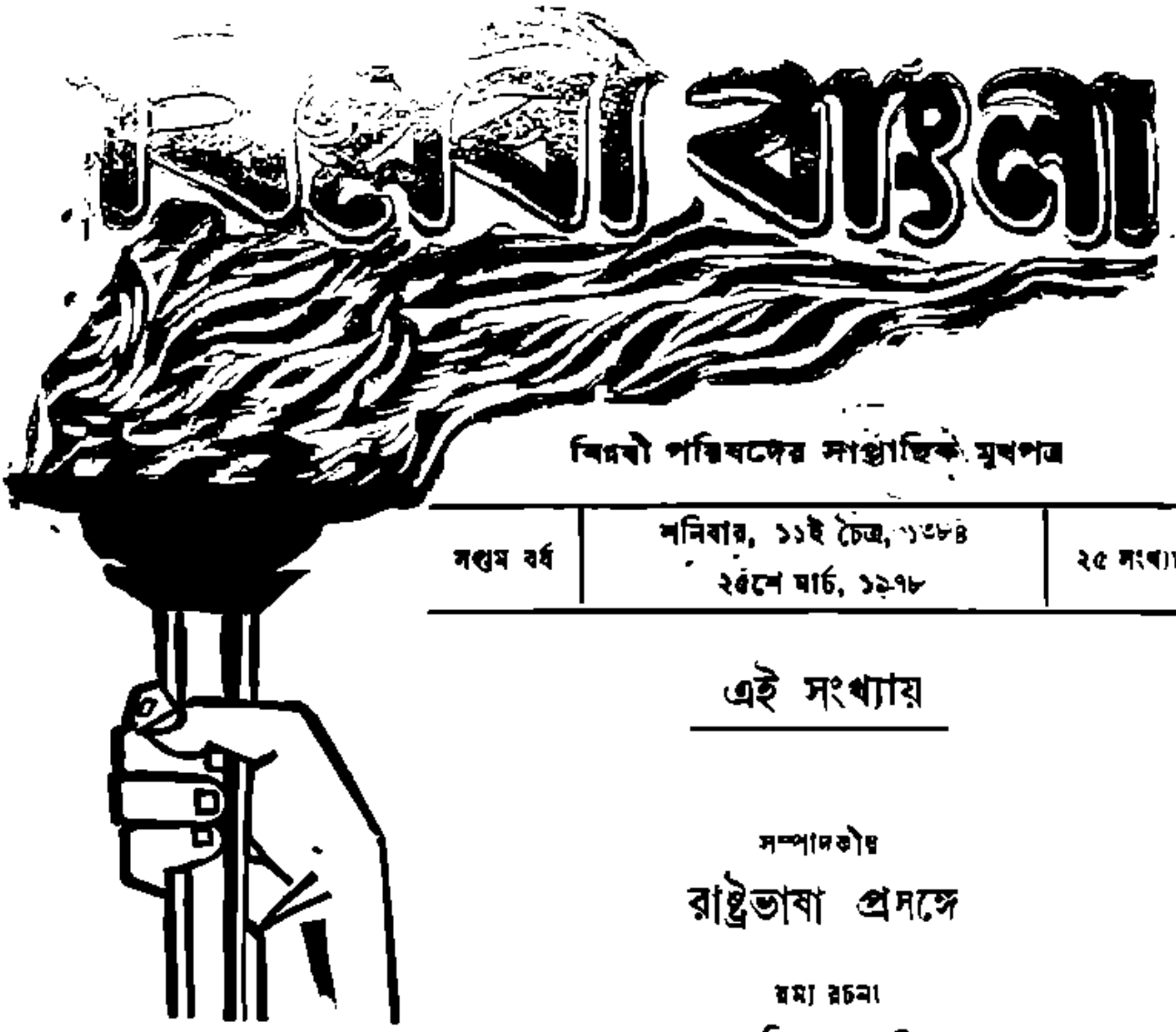

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ১১ই চৈত্র, ১৩৮৪ ২৬শে মার্চ, ১৯৭৮	২৫ সংখ্যা

'ভাবতাম যে দেশ শুধু মাটি আর আকাশ। কিন্তু এখন বুঝেছি যে জন্মভূমি মানুষ, সে দেখা দেয়, হাসে, কাঁদে, বুকে জড়িয়ে ধরে।'

তার চেয়েও বেশী—

জন্মভূমি সাক্ষাৎ মা।'

—দ্বিজেন্দ্রলাল

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে

মর্ম্ম রচনা

আমি মধ্যবিত্ত

আলোচনা

নেতৃত্ব

পর্য্যালোচনা

বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার তুলকালাম

বিপ্লবী কার্যকলাপ

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

গ্রাম-বাংলা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt. –Calcutta		
Dey Pratap Chandra	116, Garfa Main Road, Cal-32.	200	1. 10 76
Dey Sailendra Kishore	G-5/104, Central Govt. Suff Qr , Cal-54.	200	
Dey Santosh Kumar	10/98/2, Bejoygarh, Cal-32.	200	
Dey Suresh Chandra	130, Picnic Road, Cal-37,	200	
Dhupi (Das) Jiban Krishna	46, Durga Charan Mitra St , Cal-6	200	
Dutta (Datta) Adhir Ranjan	15/1, Hindusthan Road, Cal-29.	200	
Dutta Kshirode Lal	134/A, Baithakkhana Road, Cal-9.	200	
Dutta Rabindra Nath	136/C. L M. Bhattacharjee Rd., Cal-14.	200	
Dutta Samaresh Chandra	136, Middle Road, Cal-14.	200	
Dutta Sukumar	15/10, Mondalpara Lane, Cal-50.	200	
Ganguly Santosh Ranjan	1/4, Nritya Gopal Chatterjee Lane, Cal-2	200	
Ghosh Amal Kumar	120, Swinhoe Lane, Cal-42.	200	
Ghosh Jitendra Kumar	Ganguli Bagan (G.B.T. Block) 12 & 5, Cal-47.	200	
Ghosh Nagendra Chandra	69 G, Rly. Qr Panchanantola, Cal-19.	200	
Ghosh Sukhamoya	16/3, Mahajatinagar, Cal-51.	200	
Ghosh Sushil Chandra	32/8, Chandi Ghosh Road, Cal-40.	200	
Ghosh Hari Gopal	27, Old Filth Road, Bandhbnagarh, Cal-28.	200	
Guha Ajit Kumar	45, Gangapuri, Purbaputiary, Cal-33.	200	
Guha Nirmal Chandra	82, Jodhpur Park, Cal-68	200	
Kali Smt. Nirupama	319/63, Jessore Road, Calcutta	150	
Wd./L. Surendra Narayan Kali			
Roy Narendra Chandra	2/63, Naktola Govt. Scheme, Cal-47	200	
Kundu Mathura Mohan	8/A, Kabul Krishna Soor St., Cal-5.	200	
Lahiri Atul	M.I.G.H Estate, Block-V, V.I.P. Road. Cal-54.		

(contd. on 3rd. cover)

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ

গত ১লা মার্চ থেকে রাজধানী নয়াদিল্লীতে সর্বভারতীয় ভাষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। এর উদ্যোক্তা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং। দুইজনই তাঁদের সুন্দর সুন্দর স্তোকবাক্যে ভারতের অহিন্দী ভাষাভাষীদের অভয় দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যে হিন্দী ভাষার মাধ্যমে ভারতের ঐক্য গড়ে তোলা এটা তাঁরা প্রচ্ছন্ন রাখেন নি। বরং তাঁরা তাঁদের বক্তৃতায় তা' সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন। শ্রী দেশাই তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, Language is a vital factor to forge unity and solidarity of India. And every patriotic and self-respecting Indian would love to have a common link Language that had it origin in India. প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সংযোগরক্ষাকারী ভাষা গ্রহণ করতে হবে, তবে লোকে যাতে মনে না করে যে তাদের উপরে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

সম্মেলনের সভাপতিরূপে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিং সকলকে আশ্বস্ত করে বলেছেন ভারতের সকল ভাষাই তাঁর নিকট প্রিয়। তবে হিন্দী ছাড়া আর কোন ভাষাই সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হতে পারে না। তিনি আরও বলেছেন যে বহু ত্রুটিপূর্ণ ত্রিভাষা সূত্র যা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমূহ গ্রহণ করেছেন তাতে হিন্দীর উন্নয়নে প্রভূত বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে।

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, জনতা সরকার ত্রিভাষা সূত্র বর্জন করে একটা কিছু করতে যাচ্ছেন। কিন্তু সেটা যে সঠিক কি তা' তাঁরা সুস্পষ্টভাবে এখনও বলেন নি।

এ বিষয়ে আমরা জনতা কর্তৃপক্ষকে এবং এ দেশের হিন্দীপ্রেমীদের একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ১৯৬৩ সালে সরকারী ভাষা আইন যখন প্রণয়ন করা হয় ঐ আইনের বিধান ছিল যে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে হিন্দী এবং ইংরেজী উভয় ভাষাই সরকারী কার্যে ব্যবহৃত হবে, এমন কি অহিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও হিন্দী ও ইংরেজী উভয় ভাষাই প্রণয়ন করতে হবে। এর ফলে অহিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যের জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। দক্ষিণ ভারতে অগ্নিতে আত্মাহুতি দানের কয়েকটি ঘটনা ঘটে। ফলে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেন যে হিন্দী ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন বাধ্যতা-

মূলক করা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দেন যে কেন্দ্রে ইংরেজী ভাষা ও হিন্দী পাশাপাশি চলবে এবং অহিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যগুলির সম্মতি ছাড়া হিন্দীকে সম্পূর্ণ ভাবে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। সেদিনের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু প্রথমে এই প্রতিশ্রুতি দেন এবং পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তার পুনরাবৃত্তি করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সেদিন তাঁদের পাশেই ছিলেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে এই ব্যবস্থায়ও অহিন্দী ভাষাভাষীদের উপর যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে। হিন্দীভাষীরা যে সুবিধা পাচ্ছেন তাঁদের মাতৃভাষার মাধ্যমে অহিন্দীভাষীদের তা পেতে হচ্ছে অন্য একটি বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে। কিন্তু সেদিকে বিন্দু মাত্র দৃষ্টিপাত না করে হিন্দীপ্রেমীরা 'আংরেজী হটাও' আন্দোলন সেদিন থেকে আজও চালিয়ে যাচ্ছেন।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে আজও আবার যদি হিন্দীপ্রেমীদের জবরদস্তী আরম্ভ হয় তার ফল কি হবে বলা যায় না। আমরা জনতা সরকারকে প্রতিবেশী পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে এ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ভাষা জাতীয় ঐক্যের সহায়ক কিন্তু এই ভাষাপ্রেম ভুল পথে চালিত হলে তা ঐক্যের সহায়ক না হয়ে এক্য ভেঙে পড়তেও পারে। এর জলন্ত, পাকিস্তানের উর্দু ভাষার প্রতি অতি-উৎসাহই পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙে তা থেকে বাংলাদেশের উদ্ভবের কারণ। সুতরাং জনতা সরকারকে এ সম্পর্কে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের মনে হয়, সমগ্র ভারতে হিন্দী ভাষার একক প্রতিষ্ঠার সময় আজও আসে নি। আগে হিন্দী ভাষাকে সমগ্র ভারতের বিশেষ ভাবে অহিন্দী ভাষাভাষীদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। হিন্দীর একক প্রতিষ্ঠার ফলে অহিন্দী ভাষাভাষীরা যে অসুবিধায় পড়বেন তার প্রতিকার সম্পর্কেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

যকৃতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ এক মাত্রন ডাকমাশুল
প্রাপ্তিস্থান:- শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
শ্রীকণ্ঠ কুটীর • কুমুদ পল্লী • মেদিনীপুর • পশ্চিমবঙ্গ

আমি মধ্যবিত্ত

—সতীভূষণ সেন

অন্যের চোখ দিয়ে না দেখলে পুরোপুরি বোঝা যায় না কতটা বদলে গেছি। কিম্বা কোন একটা crisis না আসলে।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতাব্দীর প্রথমে বিধাতা যেন শক্তিশক্তি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন আমাদের বঙ্গে। তারপর কবে যে জোয়ার শেষ হল, ভাটার টান এল, টেরও পাই নি। দিন বদলের ছন্দের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারিনি। টানে টানে কোথায় যে পৌঁছে গেছি, প্রথমে বুঝলাম যখন এমারজেন্সি এসে আছড়ে পড়ল। বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনশক্তি যে কলসীর তলায় এসে ঠেকেছে বোঝা গেল। যাক স্বাধীনতা হরণ করেছেন বলে ইন্দিরাকে খুব একচোট গালাগাল দিলেন অনেকে। ওঁদের বাক স্বাধীনতা অন্তত ক্ষুণ্ণ হয়নি, বুঝতে কষ্ট হল না। দেখলাম দৈনিক কাগজ আগের মতই প্রকাশিত হচ্ছে, Blank সম্পাদকীয় নিয়ে নয়, ছাপানো সম্পাদকীয় সহ। অফিস কাছারীর administration টাইট হয়েছে, নিয়মানুবর্তীতা অভ্যাস করছেন সকলেই। ট্রেন ঠিক সময়ে আসে, আফিস ঠিক সময়ে খোলে। বিক্ষোভ মিছিলে রাজপথ বন্ধ হয় না। এর সঙ্গে মাঝে মধ্যে কিসফাস শোনা যায় মধ্যরাত্রের আতঙ্কের কাহিনী, কৌতূহল, পুলিসের গাড়ী, মিলের আনাগোনা, বন্ধ জানালার পেছন থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকিঝুঁকি। বাঘে ধরল কাকে জানা যায় না।—সেই সব দিনের স্মৃতি আজ অস্পষ্ট। দুঃস্বপ্নের পরে ঘুম ভেঙে মানুষ শিউরে ওঠে, ভাবে উঠেছিলাম বলে মনে পড়ছে না। চোখে হয়ত এখনো ঘুম, শক্তি নেই যে উঠে দাঁড়াব। বড় ক্লান্ত আজ বাঙালী মধ্যবিত্ত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত প্রতিনিধি, আমাদের সাংবাদিক সমাজ। ওঁদের অবস্থা পর্যালোচনা করলেই, আমাদেরকেও চেনা যাবে। ওদের চোখ দিয়েই আমরা পৃথিবীকে দেখি, যেটুকু দেখান সে টুকুই দেখতে পাই। যে খবর flash করেন, চোখ ধাঁধিয়ে যায়, বুঝতে পারি এর চেয়ে জরুরী আর কিছু নেই। যেটা Blackout করেন, দেখতে পাইনা। সে ঘটনার কোন মূল্য নেই পৃথিবীতে। জরুরী অবস্থায় ওঁদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল। "খবর এনে কি করব, ছাপাতে কি আর দেবে?" খবর সংগ্রহ না করবার একটা অজুহাত ছিল। আজ তো সেনসারের কাঁচি নেই, এখন কি কৈফিয়ৎ দেবেন?—যে কোন প্রথম শ্রেণীর কাগজের একবাসের ফাইল নিয়ে বসুন, সংবাদ কতটুকু পান খুঁজে দেখুন। প্রথমেই দেখুন কতখানি জায়গা জুড়ে আছে বিজ্ঞাপনে, আর কতটুকু আছে পাঠ্যবস্তু। পাঠ্যের মধ্যে কতখানি সরকারী Hand out বা 'ঢাক,' আর কতটুকু দেশের সংবাদ। আবার সংবাদ ঘাঁটলে দেখবেন, তার বারো আনা পাওয়া গেছে সাংবাদিকের চরণযুগল না চালিয়ে, শুধু মাত্র টেলিফোন ঘুরিয়ে। এই তো তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা আর পরিশ্রমের পরিচয়। এরাই সুরেন্দ্রনাথের Bengalee ও হেমেন্দ্রকুমার Forward এর উত্তরসাধক। দেশের জনমত গঠনের গুরুভার বহন করছেন।

আর, শিক্ষাবিস্তার করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এযুগে যাঁরা vice-chancellor এর আসন অলংকৃত করেছেন, কেতাবী বা academic বিদ্যায় তাঁরা কারো চেয়ে অযোগ্য নন। প্রত্যেকেই নিজের বছরে Firstclass first or second হয়েছিলেন, ডক্টরেট পর্যন্ত প্রতি পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে এসেছেন। বিদ্যার দিক দিয়ে আশুমুখুজের চেয়ে খাটো নয় কেউ। খাটো নিশ্চয়ই অনেক বিষয়ে, কিন্তু মার্কশীটে তার পরিচয় পাওয়া যাবে না। নইলে সে যুগে পড়াশুনার যে Atmosphere ছিল কলেজে আর স্কুলে, এ যুগে তার চিহ্নও নেই কেন? কেন বছর দিন যায় তবুই বইয়ের ভারে ছেলেমেয়েদের পিঠদাঁড়া নুয়ে পড়ছে? পড়ার আনন্দের

পরিবর্তে চাইছে তারা পড়া থেকে পালিয়ে বাঁচতে? পরীক্ষার আগে ক'টি ছেলের মধ্যে দেখা পাবেন আগের দিনের উন্মত্ত উত্তেজনা? কেন ছেলে করছেও দেখবেন না সেই হৃদয়বিদারক লজ্জা? যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একদা আগামী দিনের সুন্দর জগতের আহ্বান জানিয়েছিল, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের আকর্ষণ করেছিল, সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ আততোষের শিবরাত্রির নিভে যাওয়া শলতেটি নিয়ে ভবিষ্যতের ভরাবহ তমসার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।—শিক্ষাকে আজ আমরা কোন মর্য্যাদাই দেই না, দেই অর্থকে, কিম্বা অর্থের vulger প্রদর্শনীকে। শিক্ষকের মাসিক অর্থমূল্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে কাড়ুদারের নীচে।

বিশ শতাব্দীর প্রথম থেকে যত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে দেশে, স্বাধীন চিন্তার সুযোগে বাধাবন্ধহীন বিতর্ক করেছে, সকলের মূলে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিই ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়। যখন আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলাম, তখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অধিকার করেছিলেন, একটি বিশিষ্ট, স্পষ্টবাদী, বাগ্মী পূর্ণাঙ্গ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যার Alma Mater ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই তুলনায় উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীগুলি পিছিয়ে পড়েছিল। জাতির ভিত্তি বা Base হয়ে গিয়েছিল অতীব দুর্বল। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সংগঠনে তারা পড়ে গিয়েছিলেন পেছনে। বিপ্লবীদলেও এই ভারসাম্যের অভাব অনুভব করেছি। নিম্নবিত্ত বিকশিত হওয়ার সুযোগ পান নি; উচ্চবিত্তের মধ্যে বিকশিত হওয়ার আগ্রহের অভাব ছিল। বাংলার ব্যবসায়ী শ্রেণী শিল্পজগতকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, সেখানেও পাইয়োনীয়ার ছিলেন মধ্যবিত্তই।

বিপ্লব আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, সর্বত্রই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মধ্যবিত্ত। তাই তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় manoeuvre করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অন্যদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। স্বাধীনতার ফসল ঘরে তুলে আনতে এরাই ছিলেন অগ্রণী। লোকসভা পূর্ণ করলেন, বিধানসভা অধিকার করলেন, রাজনৈতিক দলগুলি 'ভরাডুবিকবৎ' আয়লকীয় মত হাতের মুঠোয় চলে এল। স্থাপিত হল নতুন এক রাজবংশ সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে, কোন পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত।

মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সিঁড়ি বেয়ে ভর ভর করে উপরে উঠে যাওয়া। এক এক ধাপ উপরে উঠতে লাগলেন, আর ততই রাষ্ট্রক্ষমতার লোহার বাঁধনে আটকে যেতে লাগলেন। উচ্চতর জীবনযানের আলোয় পেছনে ছুটলেন কেউ কেউ, লোভের ফাঁদে পড়লেন অনেকে। শিল্পপতিদের সঙ্গে বিরোধ বাধল, লোকসভায় 'সমাজবাদ' শব্দটি ঘন ঘন উচ্চারিত হতে লাগল। শিল্পপতিরা ভয় পেয়ে গেলেন, ভূস্বামীরা আত্মসমর্পণ করে মধ্যবিত্তের সমাজভুক্ত হয়ে গেলেন। শেষটায় শিল্পপতিরা সংগঠিত হয়ে নতুন রাজবংশের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেললেন। বিভিন্ন শিল্প গোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর গোপন সমঝোতা হল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যারই 'সমাজবাদ' প্রতিষ্ঠিত করে থাকুন নতুন শাসক গোষ্ঠী, বিত্তবানদের ক্ষতি হয়, এমন কিছু করেন নি। বরং শিল্পপতিদের সংঘবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। শিল্পপতিরাও তাদের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য নব রাজবংশের রাজসুবাদারদের আহ্বান করেছেন। স্থাপিত হয়েছে 'ম্যানেজারি এজেন্সি,' যেখানে মাইনে পত্তর সরকারী চাকরির চেয়ে বেশী। প্রাইভেট সেক্টারের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলিরও শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে প্রাইভেট সেক্টারের চাঁদায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেই। স্বাধীনতার পরে সাহেবরা পাড়ি দিলেন দেশে। তাঁদের বাগান খনি আর কারখানা, যা এতদিন যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাচ্ছিল আর দোহার ছিল পাড়ছিল, সেগুলো জলের দামে বিক্রি হয়ে গেল যুদ্ধোত্তর যুগের নতুন ধনপতিদের কাছে। এই সব বাগিচার আখের পুরানো মেশিন দিয়ে কি হবে কি ওরা? Scrap করে জাপানে চালান দেবে?—মোটেই নয়। দুদিন যেতেই দেখলেন সরকারী প্রচার পত্র স্বদেশী কিনুন, Buy

Swadeshi! লোক সভায় বিল পাশ হল, বিদেশ থেকে ভোগ্যপণ্য আমদানী বন্ধ। স্বদেশী জিনিষ কিনতেই হবে আপনাকে, কোয়ালিটি যাই হোক, দাম যতই পড়ুক। আবার সোনার ডিম পাড়তে লাগল বাগান, কারখানা খনি।

শাসক ও শিল্পপতি দুই গোষ্ঠীর স্বার্থ আজ অভিন্ন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল আর্থিক কাঠামো শক্তিশালী করে গড়া উভয়েরই লক্ষ্য। উভয়েই ধনীকৃষক বা কুলাক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক। শাসক প্রধানতঃ ভোট পাওয়ার জন্য, শিল্পপতি শিল্পের কাঁচামালের প্রয়োজনে। ধনী কৃষকের পক্ষেই সম্ভব কলের লাঙল ব্যবহার, সেচ সার বীজ ও ওষুধের জন্য অর্থ লগ্নী করা, এবং উৎপাদন বাড়ানো। কৃষি এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই মালিকের প্রধান দুশ্চিন্তা, সংঘবদ্ধ শ্রমিক নিয়ে, কারণ ওদের Exploit করা কঠিন। সেই দুশ্চিন্তার মোটা অংশ শাসককেও বইতে হচ্ছে। কখন আইন করে Rod চালাবে কখন সাধু হয়ে অল্প স্বল্প Carrot বিতরণ করবে স্থির করতে হচ্ছে।

শাসকের একটাই জাত, নাম কংগ্রেস, জনতা, মার্ক্সিস্ট বা আতীকেন্দ্রাবেদ যাই হোক না কেন। শাসক নিজের স্বার্থেই ধনপতিকে রক্ষা করেন। ধনপতিও নিজের স্বার্থেই শাসককে ধনবল ও জনবল দিয়ে সাহায্য করেন। নইলে যে রাজ্য চলাতলে যাবে, শিল্পপতির রাজ্যও যাবে, শাসকেরও যাবে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জীবনরস সংবৃদ্ধিত হয় শ্রমিককে বঞ্চিত করে। সংগঠিত শ্রমিককে বঞ্চিত করতে হলে আগে তার বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করতে হবে। সেই আইন শাসককে পাশ করতে হবে, তা তিনি দক্ষিণপন্থীই হোন আর কট্টর বামপন্থীই হোন। সমর্থন করতে হবে শ্রমিক নেতাকেও, যদি সেই নেতা শাসকদলের অন্তর্ভুক্ত হন। তখন কে দাঁড়াবে শ্রমিকের পাশে?

সর্বদেশে ও সর্বকালে মধ্যবিত্তই দরিদ্রের দুঃখের ভাগ নিয়েছে। জীবনের সব আনন্দ ও সৌন্দর্য নিঃশেষ করে দিয়ে, জ্ঞান ও কৃষ্টির বর্তিকা জ্বালিয়ে পথ দেখিয়েছে। এরাই জাতির মেরুদণ্ড, নীতির ধারণার, সমাজের রক্ষক। আজ আমাদের উপর তলা ম্যানেজমেন্ট ক্যাডারের জলুসের দিকে ছুটছেন, মনে প্রাণে হয়েছেন ধনিক বণিক, নীচের তলা ছুঁকছেন আর চাইছেন obdicate করতে। আর কেউ কাজের ভার নিক, এই বাসনা।

বাংলার মধ্যবিত্ত আজ পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, এগুতে পারছে না। তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, এগিয়ে যাবার নতুন মানুষ আসছে। ইতিহাসের চাকা থেমে থাকবে না।

সতর্কীকরণ

হুগলী জেলার মুখ্য কৃষি অধিকারিক জানাচ্ছেন যে হুগলী জেলার খানাকুল ব্লকের জালপোতা এবং নন্দনপুর এলাকায় কিছু জমিতে বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা গেছে। এ ব্যাপারে কৃষক ভাইদের জানান যাচ্ছে যে, এই রকম পোকার আক্রমণ দেখা গেলেই তাঁরা যেন স্থানীয় কৃষি কর্মীর সাথে যোগাযোগ করেন।

—: মুদ্রণ-প্রমাদ :—

'বিপ্লবী বাংলা'র গত সংখ্যায় (৭ম বর্ষ / ২৪ সংখ্যা) 'সাম্প্রতিক' কলমে 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' শীর্ষক রচনাটির লেখকের নাম মলয় বোষ। নামটি ভুল ছাপা হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার তুলকালাম

—শান্তিশরণ রায়চৌধুরী

গত কিছুদিন আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলের সভা বসেছিল। সেখানে এক দল ছাত্র উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদের কতকগুলি দাবী আদায়ের জন্য। সভাদের কোন কাজ কর্ম করতে না দিয়ে 'ঘেরাও' করে রেখেছিলেন। দুই চারজন সভ্য বেসতিক দেখে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন। যুবকরা তাদের নাকি মৃদুস্পর্শে স্বস্থানে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর খবরের কাগজে প্রকাশ, কথামালার রাখালের মত নেকড়ে বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য 'বাঁচাও 'বাঁচাও' রব তুলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

পূর্বে এক নিবন্ধে আমরা বলেছি এই বিশ্ববিদ্যালয়টির মর্যাদে কত। শিরে সর্পাঘাত করলে, তাদের বাঁধার জায়গা থাকেনা বলে একটা কথা আছে। কোন অঙ্গের চিকিৎসা করলে, এই রুগ্ন প্রতিষ্ঠানটি সুস্থ হয়ে উঠতে পারে, স্বয়ং ধন্বন্তরি চিকিৎসকশিরোমণি বিধানচন্দ্র বেঁচে থাকলে সফল হতেন কিনা বলা শক্ত। কিন্তু চিকিৎসা করতে হলে, রোগীর রোগ নির্ণয় করাই প্রথম ও প্রধান কাজ। এই ছাত্র আন্দোলন একদিনে সৃষ্টি হয়নি। অনেক সঙ্গত কারণেই তারা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। যৌবনসুলভ মাত্রাধিক্য যে কখনও কখনও ঘটেছে কারো কারো দ্বারা একথা সত্য, এবং একাজ কোন চিন্তাশীল মানুষই সমর্থন করবেনা। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার হল, অধ্যক্ষগুলির অযোগ্যতা, অপদার্থতা, কর্তব্যজ্ঞানহীনতার জন্য ও তাদের কোন শাস্তি পেতে হয়নি। পরীক্ষার খাতা পরীক্ষকদের হেপাজত থেকে বেপাত্তা হয়ে যাবে এবং সেই দুষ্কর্ম গোপন রেখে খুশীমত গড়পড়তা নম্বর দিয়ে ফল প্রকাশ করা হবে, এ কাজের নিন্দা করার মত ভাষা নেই। সারাবছরের মধ্যে নির্দ্ধারিত পাঠ্যতালিকা শেষ করা হবে না, পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত প্রশ্নদিয়ে ছাত্রদের হতাশ করা হবে, এর যুক্তি কি? পরীক্ষা দিয়েও নিষ্কৃতি নেই। একে ত সময়মত পরীক্ষা নেওয়া হবেনা, নেওয়ার পর কখন ফল প্রকাশিত হবে, কেউ তা জানেনা। ফল প্রকাশের মধ্যেও অমার্জনীয় ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবে। আর যারা এজন্য দায়ী, বহাল তবিয়তে তারা চাকুরী করবে, বাড়তি মাইনে ও বোনাসের দাবীর জন্য আন্দোলন করবে। সব কাজ কর্ম অচল করে রেখে, অথচ কার্য্য প্রাপ্য শাস্তি না পেয়ে, তাদের দাবীই মানা হবে, এটা মানুষ কতদিন নীরবে দেখবে? আর যারা দেশের ভবিষ্যৎ, তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে, অথচ তারা টুঁ শব্দটি করবেনা, এটাত যৌবনের ধর্ম হতে পারে না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে জানা যায়, এত শত কাণ্ড করে, এত অবিচার, পীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করেও, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ঘোষিত হয়, তাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়না বছরের পর বছর কেটে গেলেও। যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যায় তারা ভাগ্যক্রমে বেকারী পীড়িত এই দেশে একটী কর্মসংস্থান করার ব্যবস্থা করতেও সক্ষম হয়। তাদের বিফল মনোরথ হতে হয় এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের অভাবে। এমন তাজ্জব ঘটনা কোন সভ্য দেশে ঘটতে পারে বলে আমাদের জানা নেই। কেউ কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছে এই কলঙ্কময় ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে বলতে পারেন? অবস্থাটা একতরফা চলতে থাকলে অন্ত পক্ষ থেকে ধৈর্য, শুভ্রতা, বিবেচনা আশা করা বাতুলতা মাত্র। আর একটী বলার ব্যাপার হল, আন্দোলন করলে, শেষ পর্য্যন্ত ছাত্রদের দাবী বহুল পরিমাণে মেনে নেওয়া হয়। সুতরাং তাদের বিশ্বাস জন্মেছে, একটী মুষল পর্য্যন্ত না গেলে কোন বিচার পাওয়া যাবে না। ৪৫ হাজার ছাত্রের মধ্যে ৪০ হাজার ছাত্র ফেল করল কেন, কোন গূঢ় কারণে, তার কোন তদন্ত হয়েছে কি? যারা এজন্য দায়ী, তাদের কোন সাজা দেওয়া হয়েছে কি? ছাত্ররা যে এজন্য খুব একটা দায়ী নয়, সেটা প্রমাণিত হয় প্রায় পঞ্চাশ নম্বর গ্রেস দেওয়ার

নীতি স্বীকারের মাধ্যমে। সেটা শিক্ষকসমাজ, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ছাত্রদের কোন শ্রদ্ধা নেই, আস্থা নেই, নেই তাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক। কাজেই ছাত্রদের তরফ থেকে কোন সম্মান তারা পাবার অধিকার হারিয়েছেন, তাদের কৃতকর্মের ফলেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ, ছাত্ররা উদ্ধত হয়েছে অনেক পরিমাণে, পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়েছে অনেক বেশী হয়তো, পড়াশুনা করে, কৃতকার্য্য হলেও জীবনে শিক্ষার কোন সম্মান দেখতে পায় না, এমন কি সম্মানসহ সার্টিফিকেট না পাওয়ার জন্য বহু কষ্টে সংগৃহীত চাকুরী টিক হাতছাড়া হয়ে যায়। তারপরও তাদের সব কিছু হজম করতে হবে বলে যারা মনে করেন, তাদের বহু উচ্চাদ বই আর কিছু বলা যায় কি ?

মূল সমস্যাগুলির কিছুটা তুলে ধরা গেল, তার দূরীকরণের জন্য কয়েকটী ব্যবস্থার কথা বলা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধিটা তাদের সাধ্যের সীমা অতিক্রম করেছে কিনা। করে থাকলে আয়তন ছোট করতে হবে। সময়মত পরীক্ষা নিতে হবে। সঠিক বিবেচনা করে পরীক্ষার তারিখ নির্দ্ধারণ করতে হবে। সর্বপ্রধান বিবেচ্য হল কলেজগুলিতে পাঠ্যতালিকা শেষ করা হয়েছে কিনা। শিক্ষকদের গলদ থাকলে, তাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করতে হবে কর্ত্তব্যহীনতার দোষে। পরীক্ষার দিন একবার নির্দ্ধারিত হলে, ভূমিকম্প, মহামারী যুদ্ধ প্রভৃতির মত দুর্ঘটনা না ঘটলে, কোনমতেই তার পরিবর্ত্তন করা হবে না। কোন পরীক্ষক খাতা হারিয়ে ফেললে, তার বিরুদ্ধে আইন সম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজন হলে তার ডিগ্রী কেড়ে নিতে হবে এবং কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার প্রবেশাধিকার চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে। সিনেমার বহির্ভূত প্রশ্ন করে যারা ছাত্রদের ঘাবড়ে দেন, তাদের ভবিষ্যতে আর প্রশ্নকর্ত্তা করা হবে না। সার্টিফিকেট সময়মত দিতে না পারার কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজন মত Computer এর ব্যবস্থা করতে হবে। এতে কাজকর্ম হবেও তাড়াতাড়ি এবং ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাও থাকবে না।

আমরা জানি একদল লোক চৈ চৈ করবে যে এর ফলে চাকুরীর প্রার্থীতা কমবে, যেমন অতীতে কোন কোন রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয়ে এই ধুয়া কেউ কেউ তুলেছিল। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবন যেখানে দিন দিন বিপন্ন হয়ে পড়ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষার আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে, স্নাতকোত্তরীর ক্ষেত্রে পরিণত হবার উপক্রম হচ্ছে পবিত্র বিদ্যামন্দির, তখন এই সব বাজে কৈফিয়তে কান দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। অযোগ্য অপদার্থকে চাকুরী দেওয়ার জন্য দেশের ভবিষ্যৎ যারা, তাদের জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলতে হবে, এমন অদ্ভুত আবদারের কানাকড়িও মূল্য দেওয়া উচিৎ নয়। সর্বোপরি, যে যার ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য পালন করে, শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতেহবে, যেমন ছিল আগের দিনে। শিক্ষকদের ট্রেডইউনিয়ন নেতা হওয়া চলবে না। শিক্ষাতনগুলিকে 'রাজনিতিকতা' বিকাশের অঙ্গনে পরিণত করা চলবেনা তাদের পক্ষে। ছাত্রদের পড়ানোর কাজে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। কোন রাজনৈতিকদলের এজেন্ট হয়ে তারা তাদের কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। ছাত্রদেরও দলীয় রাজনীতির শিকার হয়ে অবয়বস্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন করতে হবে। শিষ্টাচার, বিনয়, আদর্শ, সততা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী আয়ত্ত করতে সচেষ্ট থাকতে হবে। দুই দলই যদি দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন, তবে একাজ কঠিন অসম্ভব হবেনা। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে দেশের ভবিষ্যৎ আদর্শনিষ্ঠ নাগরিক গড়ে তোলাই তার প্রধান কাজ, ছাত্রকেও ভুললে চলবেনা যে শিক্ষালাভ করার সার্থকতা পূর্ণ হবে সেইদিন, যেদিন সে আদর্শ দেশসেবক হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলে, দেশের ও দশের প্রকৃত সেবক রূপে রূপায়িত করতে পারবে নিজেকে।

সরকারের পক্ষে করণীয় হবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। অর্থসাহায্য দিয়ে, সঠিক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা করে, সুশৃঙ্খল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তুলতে সতত সজাগ দৃষ্টি রাখা। দেশে মানুষ তৈরী করতে না পারলে তাদের পরিত্রাণ নেই, এই অমোঘ সত্য হৃদয়ঙ্গম করে কাজ করতে হবে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই।

গ্রাম-বাংলা

প্রদর্শনীতে রাজ্যপাল

মাননীয় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীটি. এন. সিং পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত দশদিন ব্যাপী একটি মেলার উদ্বোধন করেন। মেলাটি ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ঠা মার্চ, ৭৮ পর্যন্ত চলে। মেলায় কৃষি বিভাগ আয়োজিত মণ্ডপটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৃষি প্রদর্শনীতে পুরুলিয়া জেলায় বর্তমান কৃষি চিত্রটি তুলে ধরা হয়। জেলার কৃষক ভাইরেরা কৃষি প্রদর্শনীর মাধ্যমে চাষবাসের অনেক নতুন তথ্য জানতে পারেন। তাঁরা জেলা কৃষি আধিকারিক ডঃ নিত্যানন্দ ত্রিবেদীর কাছে প্রতিটি ব্লকে কৃষি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার দাবী জানান। উক্ত কৃষি প্রদর্শনীতে সবজি প্রদর্শন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়।

বসিরহাট ব্লক কৃষিক্ষেত্রে কিষাণ মেলা

সম্প্রতি বসিরহাট ব্লক কৃষি ক্ষেত্রে একদিনের কিষাণ মেলা অনুষ্ঠিত হোল উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কৃষি বিভাগের উদ্যোগে। মেলায় জেলার বিভিন্ন ব্লকের শতাধিক কৃষক প্রতিনিধি যোগদান করেন। একটি সবজি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা রাখা হয়। কৃষক প্রতিনিধি দের বাছাই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। রাজ্যের যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (বিষয়ভার প্রকল্প) শ্রীকিরণময় দত্ত এবং আলিপুর রেঞ্জের যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা শ্রীসুশীল চক্রবর্তী অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কৃষক ভাইরেরা মুখ্য কৃষি আধিকারিক শ্রীবিমলেন্দু সাহুলীর কাছে কিষাণ মেলা ও কৃষক প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ নজর রাখার জন্য অনুরোধ জানান। এ ধরণের অনুষ্ঠান গ্রামে গ্রামে করা উচিত বলে তারা জানান। সবজি প্রদর্শনীতে লঙ্কা, আলু, বেগুন, টমাটো, কুমড়ো, ঝাড়, বীট, পেঁপে, বাঁধাকপির জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

মাটি পরীক্ষার প্রয়োজন আছে

মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে সার প্রয়োগে শস্য ফলন যে বাড়ে সে কথা অনেক কৃষক ভাইরেরাই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। মেদিনীপুর পশ্চিম, মেদিনীপুর পূর্ব, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার চাষ যোগ্য জমির মাটি পরীক্ষার জন্য মেদিনীপুর মৃত্তিকা পরীক্ষাগারে বছরে পঁচিশ হাজার মাটির নমুনা পরীক্ষা করে সারের সুপারিশের সুবিধা ঐ সব এলাকার কৃষক ভাইরেরা নিতে পারেন। মাটির নমুনা আজই পাঠান। দেশের অন্যের নমুনা পাঠিয়ে জমির দোষ উপযোগিতা পরীক্ষাও করিয়ে নিতে পারেন এ বিষয়ে এলাকার কৃষি কর্মী এবং জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

নয়াগ্রাম ব্লকে কৃষক প্রশিক্ষণ

সম্প্রতি মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলায় নয়াগ্রাম ব্লক কৃষি সম্প্রসারণ করণ আয়োজিত ভি. পি. এ পি কার্যক্রমের অন্যতম শুষ্ক অঞ্চলে চাষবাস বিষয়ে খড়িকা মাধ্যমিক বি এম এস. সি. উচ্চ বিদ্যালয়ে তিন দিন ব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। এতে যোগদান করেন ৬০ জন কৃষক। বর্ষা ভিত্তিক অন্তত দু ফসল চাষের সম্ভাবনা, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, উন্নত মানের জৈব সার প্রস্তুত, শস্য রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলে।

প্রশিক্ষণ শেষে কৃষক ভাইরেরা নানা সমস্যার কথা উত্থাপন করেন যার মধ্যে অন্যতম উন্নত মানের বীজ সরবরাহ, সেজন্য সুবর্ণরেখা নদীর এ পারে একটি বীজ খামার একান্ত প্রয়োজন এবিষয় জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিকের।

চারদিনের প্রশিক্ষণ

১৯ থেকে ১২ই মার্চ, ১৯৭৮ উত্তর ২৪ পরগণার কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত সন্দেশখালি দুই নং উন্নয়ন সংস্থার সন্দেশখালি গ্রামে চর্মশিল্প আহ্বায়কদের প্রশিক্ষণ, কৃষক প্রশিক্ষণ এবং মহিলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সেদিনে শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। বিভিন্ন দিনে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ, তৈলবীজ ও ডাল শস্যের চাষ, শস্য রক্ষা, শস্য সংরক্ষণ পুষ্টি, বনসৃজন, পশুপালন, সবজি সংরক্ষণ, সমাজীনের খাবার, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং হাতে কলমে শিক্ষাও দেওয়া হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন চারু রঞ্জন সেন, মানিক ব্যানার্জি অজয় দত্ত, সুবল ঘোষ, ছবি ব্রহ্ম, মিস নীহার সরকার এবং স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থার পশু চিকিৎসক ও সহকারী বিভাগীয় বন আধিকারিক কলিকাতা।

চারদিনের এই অনুষ্ঠানটি এ, ই, ও মানিক লাল ব্যানার্জী, জেলার প্রশিক্ষণ অধিকারিক উত্তম মজুমদার এবং গ্রামবাসীদের একনিষ্ঠ সহযোগিতায় ফলেই সাফল্য মণ্ডিত হতে পেরেছে।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত।

নেতৃত্ব

॥ কৌটিল্য ॥

নেতৃত্ব কি গাছের ফল? না টুক করে পাকা ফলের মত মাটিতে পড়ে? এটা অবিসংবাদিত সত্য যে, কোন একটি বিশেষ নেতৃত্ব তার পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে বহু বাধা বিঘ্ন, ঝড়, ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে। এই অতিক্রমণের পর্যায় অনিবার্য্য দুঃখ দ্বারা সমাচ্ছন্ন। ব্রিটিশ অধীনতার যুগে যে ধরণের নেতৃত্ব সম্ভব ছিল, স্বাধীন ভারতে তা সম্ভব নয়। এর একটা গুণগত পরিবর্ত্তন ঘটেছে। রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকেরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এই পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে যে-সব শক্তিগুলি ইতিপূর্বে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি তারাও নতুন বেশ ধারণ করে, আসরে নেমেছে, অর্থাৎ নেতৃত্বের আসরে নেমেছে। রাজনৈতিক আসরে ইতিপূর্বে যারা ছিল তারাও আছেই, উপরন্তু নতুন নতুন রঙের নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। কে বা কারা এ-জাতীয় নেতৃত্বের জন্মদাতা, সে বিচার করে লাভ নেই. ডি. এম. কে., আন্না ডি. এম, কে,, সি. এন. ডি. স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ, আরো ছোট-খাট অনেক আছেন—এদের কারুরই অস্তিত্ব প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ছিলনা। এদের জন্মক্ষণ যখনই হোক্, এরা যে, কোন না কোন একটা বিশেষ সময়ের নিজেদের জড়িয়ে ভারতের মাটিতে দাঁড়াতে চাচ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের সমাজ-জীবনে কোন-না-কোন একটা স্তরে এদের বীজ উপ্ত ছিল তাই এরা অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পেয়েছে, এদের বাড়-বাড়ন্ত দেখে মনে হয় এরা সযত্নে সেবা। ভারতে নব্য হিন্দুবাদ আটলোরে কাপড় পরে দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়বাদ দেখা দিয়েছে। আদিবাসী উন্নয়নবাদের নামে আদিম মানবতাধার দেখা দিয়েছে। বাস্তবে এই সব সমস্যা ছিল বলেই এর বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে। এদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট অর্থনীতিবাদের নামে বিশ্বব্যাপী যে আন্দোলন আছে, তারাতো রাজনৈতিক আসরে ইতিপূর্বেই ছিল, তারা এবারে বেশী সুযোগ পেয়েছে, তারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রাদ্ধ করতে করতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গহ্বরে ঢুকে পড়েছে। উদ্দেশ্য, শত্রু নিধন না আত্মবিলোপ, কোনটা? তা ঠিক জোর করে বলা যায় না।

কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের মতা বলো এই যে এ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, আর পরিবর্ত্তনের কোন সময়-সীমা নেই। একেবারে রাতারাতি ভোল পাল্টানো নীতির দৃষ্টান্ত আছে, ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন থেকে. রাশা-ক্রান্তি জন যুদ্ধে পরিণত করা, হঠাৎ পাকা সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল সাহেবকে জনতার কারাগারে বন্দী করেন। অতীতে এ সব দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এই বন্দীদশার থাকাকালীন সময়ে পূর্ব ইয়োরোপটি পূর্ব জার্মানী সমেত, সোভিয়েৎ শিবিরে চার্চিল সাহেব ঢুকিয়ে দিলেন। আজ অবিভক্ত পূর্ব ইয়োরোপে বহু মানুষের বাবার পদবী, মাতৃভাষার সুর খুব ক্ষীণ হলেও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। যাক সে সব প্রসঙ্গ। কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বের মুখে আমরা শুনলাম, এ আজাদী ঝুটা হ্যায় এই অপূর্ব আপ্তবাক্যটি যাতে আমরা না ভুলি, তার জন্য রাস্তায় ঘুলো মাৎ ঘুলো মাৎ বলেও অনেক চীৎকার পাৎকার হয়েছে। গায়ে আফ্রিদীদের মত উড়নায় ঢুলে পড়ি সেজন্য যে একদিন লম্বা লড়াই, হামলা লড়াই ছিল তা আবার নবীন বেশে দেখা দিল। নামকিং-এর পথ, আমাদের পথ'। পথ কাহার কোন্ দিকে বলা মুস্কিল। ইতিমধ্যে আর একদল বললেন, 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। পার্লামেন্ট—অর্থাৎ সংসদ শূয়োরের খোঁয়াড় সুখের বিষয় ইদানিং আজাদী সাচ্চা হয়েছে। সংসদও আর শূয়োরের খোঁয়াড় নেই। আজ বুর্জোয়াদের গঠনতন্ত্রের মধ্যে যে মৌলিক অধিকার লিখিত আছে, তাহাকে রক্ষা করবার জন্য ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি উঠে পড়ে লেগেছে। তার কারণ নিশ্চয়ের মত যদি বুর্জোয়ারা

সব স্বাধীনতাই লোপাট করে দেয় তবে অস্তিত্ব বিলোপ করে যাবে। তাই বুর্জোয়াদের কাছ থেকে নারকেলের খাঁসটা বার করে নাও। শ্রেণী সংগ্রামের খুলটা অবশ্যই জীইয়ে রাখতে হবে। ইতিমধ্যেই দেয়াল-জোড়া 'সত্যাগ্রহের' বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ও শ্রেণী সংগ্রামের স্বপক্ষে লিখিত আইন জারি হয়েছে। এই ভাবের আইন কারা মানবের আমরা জানি না।

তবে ভাক না দিলে রাজনৈতিক আসর গরম রাখা যাবে না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে গ্রাম থেকে রাজনৈতিক অনভিজ্ঞ মানুষকে শহরে টেনে এনে নির্দিষ্ট এলাকায় ঢুকিয়ে দিতে হবে। এবং বক্তৃতার উত্তেজনায় আইন ভঙ্গ করিয়ে নিরীহ জনসাধারণকে গুলির মুখে ছেড়ে দিতে হবে। এইগুলিদিষ্ট মানুষেরাই হলো বড় রাজনৈতিকপুঁজি। নির্বাচনের দিন এদের ছবি ছেপে ভোট চাইতে হবে। মার্কস অবিশ্যি এ-জাতীয় রাজনৈতিক পুঁজির কথা বলেননি। তিনি অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পুঁজির কথাই বলেছেন। এবং সে পুঁজি শ্রমিকদের খাটুনির ওপর দিয়েই সৃষ্টি হয়। আর একটি কথা বলেছেন, শ্রমিক শ্রেণীর শেকল ছাড়া আর কিছুই নাকি হারাবার নেই। আমাদের ভাগ্যভাল, যে আর মার্কস নেই। এবং বিশ শতাব্দীর শেষের দিকে আণবিক শক্তি সৃষ্টি হয়ে, বিশ্ব শিল্প ও শ্রমিক সমাজের মাঝে কি পরিমাণ ঐশ্বর্যের বিপ্লব সৃষ্টি করেছে তা দেখলে তিনিও হতভম্ব হয়ে যেতেন। আজ শ্রমিক শ্রেণী এতই সঙ্ঘবদ্ধ এতই সরব হয়ে উঠেছে যে, সমগ্র বিশ্ব সমাজকে তারা যেন হাতের মুঠোর মধ্যে আটকে ফেলেছে। আজ দুনিয়ার মালিক দল এদের চাহিদা মেটাতে ওঠা-নামা করে। এমন নজীরও আছে যে, পাকা সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ডে, সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক সমাজ সপ্তাহে চার দিনের কাজ করে সাতদিনের মাইনে পেতেন। ফলে মুদ্রাস্ফীতি এমন হলো যে ইংল্যাণ্ডের নাভিশ্বাস দেখছিল। তাই ইংল্যাণ্ডে আপোষে wage breeze মেনে নিয়েছে। তারপর বর্ষের বর্ত্তমান অর্থনীতিতে মালিকরা যা মারবার তা তো মেরেছেনই। তারপর বোতাম ওপর পাকের আঁটি বোনাস, ডি. এ., ওভার টাইম এর মিলিত চাপে অর্থনীতি গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম। বেতনের কথা আজ আর শ্রমিক সমাজ বলেন না। ও যা আছে, তা তো আছেই, কাউ নিয়ে মারা মারি অর্থাৎ ডি. এ, বোনাস, ওভার-টাইম দাও তবেই সবঠিক আছে। মালিকের প্রথম প্রথম এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল। পরে দেখল, এই সুযোগে তারও কিছু লভ্য হয়। কাঁচা মালের দর, পুঁজির সুদ, শ্রমিকের বেতন, আবকর, আকস্মিকীকর, অতিরিক্ত অন্যান্য খরচা মিলিয়ে যা দাঁড়ায়—তার ওপর কয়েক শতাংশ বৃদ্ধি করে বাজারে মাল ছেড়ে দাও। যার খাবার সে খাবে। যার কেনবার সুযোগ আছে সে কিনবে। এই হলো বর্ত্তমান মালিক সমাজের মনোবৃত্তি। এই মালিক ও শ্রমিকের টানা হ্যাঁচড়ার ফলে ও দর কষাকষির ফলে বাজারে শতকরা সত্তর ভাগ মানুষের ক্রেতা হিসেবে কোন স্থান নেই পক্ষান্তরে বিলাস দ্রব্যের এমন প্রাদুর্ভাব হয়েছে যে সাধারণ মানুষকে চোখ বন্ধ করে দেখতে হয় কোন্ পথে যাই। এ হচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ দাবী দাওয়ার যুগ। আর দাবী দাওয়ার সমস্যাটিকে জীইয়ে রাখতে গিয়ে মধ্যে দুএকটা ধর্ষণ করতেই হবে। একেত্রেই শ্রমিক সমাজ সাধারণভাবে কাজে নামায়। একজনের কাজ তিন জনে করে এবং সময়ের কাজ সময়েতে না করে ওভার টাইমের জন্য অপেক্ষা করে। মালিক যতই বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাজের ফাঁকি ধরার চেষ্টা করুক না কেন, শ্রমিকের কাজের চুরি কিছুতেই ধরতে পারে না। সাধারণ অল্প পুঁজির মালিকেরা এই ঝামেলার পথে যায়না। কাজেই বেতনের সঙ্গে ওভার টাইম দিয়ে কাজ আদায় করে। ফলে সে অতিরিক্ত মূল্য উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর চাপায়। মুদ্রাস্ফীতির সূত্রগুলো এমনি করে গোপনে কাজ করে। সে শ্রমিক সমাজ আজকার নেই। সব পাকা মাথার রাজনীতিকেরা এদের পেছনে বুদ্ধিপরামর্শ দানের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে আর সেই পাকা মাথার বুদ্ধিদাতারা হলেন, ইউনিয়নের কর্ত্তারা। গত তিরিশ বছরে এইসব পাকা বুদ্ধি ওয়ালার এত আমদানী হয়েছে

যে মাথায় ঠোকাঠুকি শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতি যোগিতার ফলে কাজ-কর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। উৎপাদন সুষ্ঠু ভাবে হয় না। বাজারে চাহিদার তুলনায় মাল কম, অতএব মূল্য বৃদ্ধি। পক্ষান্তরে বয়স্কুশলী শ্রমিকদের কোন বয়সের নির্দিষ্ট হিসেব নেই। তাই তারা সুদীর্ঘকাল চাকরী করে, অল্প নতুন কর্মীর চাকুরীর পথ আটকে রাখে। এতেকরেও বেকার সমস্যা এক রকম বৃদ্ধি পায়।

[গত তিরিশ বছর ধরে ভারতের শ্রমিক জগতে এই খেলাই চলেছে, দায়িত্ব নেই, দাবী আছে। এই বিষচক্রের যাঁরা আমাদের শ্রমিক সমাজ যেমন পড়েছে, তেমন পড়েছে আমাদের রাজনীতিকেরা। সত্য কথা বলার সাহস নেতাদের নেই পাছে আম জনতা ক্ষেপে যায়। খালি চাটু বাক্য আর অবাস্তব বুলি দিয়ে জাগ্রত জনগণকে বশ করার চেষ্টা চলেছে। Capital intensive শিল্পে বাজারে উৎপাদিত মালে আসতে যেমন দেরি হয়, তেমন আবার শ্রমিক সমাজকে বেতন, ভাতা দিতে-দিতে শুধু নোট ছেপে কাজ করাতে হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে যদি অমন Capital intensive শিল্প বিশটা গড়ে ওঠে তবে শ্রমিক সমাজকে, কাঁচা মালের উৎপাদককে, আর সেবেস্তার আমলাদের কত হাজার কোটি টাকা দিতে হয়েছে, একবার ভেবে দেখুন। বাস্তব ক্ষেত্রে Capital intensive শিল্প বিশটার অনেক বেশী হয়েছে। পাঁচটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা, আর বাজেটের দিকে লক্ষ্য রাখলেই, বা এর ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করলেই এত বছরের অর্থনীতির চিত্রটি পাওয়া যাবে। রাজনীতিকেরা অবশ্য জনতাকে স্পষ্ট-এ বলেনি যে, দেশ গড়তে গেলে এমন কাঁপতি টাকার আমদানী হবে, এবং দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এই নিরুপ সত্যটা প্রকাশ করলে ত নেতাদের জনপ্রিয়তার ঘাটতি দেখা দেবে। রাজনীতিকেরা চুপ করে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলেন। এদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে দেশে আন্দোলনের ঢেউ এর পর ঢেউ আসতে লাগল। যারা ক্ষমতাসীন দল তারা যেন ক্ষমতায় থেকে-থেকে হাঁপ ধরে পড়েছেন। হয় তারা ধোকা বহনে অক্ষম হয়ে-পড়েছিলেন অথবা তাদের নতুন কোন চিন্তা গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিলনা। ক্ষমতা যে নিত্য-নতুন তার চেয়েও আর একটা বড় শক্তিকে চায় একথাটা ক্ষমতাসীন দল ভুলে গিয়েছিলেন অথবা নতুন একটা কিছু পাবার আশায় তারাও উন্মুখ হয়েছিলেন।

[সত্তর দশক বড় বড় কয়েকটা ঘটনাকে সাক্ষাৎ করেছে। বাঙ্গলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, এক কোটি লোকের উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে আগমন, তারপরে সারা ভারতবর্ষব্যাপী হেলে ধর্মঘট। আর ধর্ম-ঘটের নামে অনুষ্ঠিত তুলকালাম কাণ্ড। এর পরে ভারতের অর্থনীতি একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সীন দানা সৃষ্টি হবার মুখেই আবার জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কয়েকটি নেতার জনতাকে ডাক বিধ্বস্ত অর্থনীতি এমনিতেই খাদি খাচ্ছিল, তারপর হেলের ধর্মঘট আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। এরই অব্যবহিত পরে নব-নির্মাণ সমিতি গুজরাটে, সংঘর্ষ সমিতি বিহারে সৃষ্টি হলো। খাদ্যের বন্ধ আন্দোলন, সমান্তরাল সরকার সৃষ্টির জন্য আন্দোলন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাড়ি ঘেরাও করে পদত্যাগ পত্র আদায়। ভারতীয় গণতন্ত্রের এ এক অদ্ভুত চেহারা। তারপর জনতা জমায়েত করে, সরকারী দপ্তর ঘেরাও। তা বাদেও ধর্মঘট ও পদস্থ কর্মচারীদের অফিসে অফিসে ঘেরাও ত আছেই। গণতান্ত্রিক অধি-কারের অপজাত সৃষ্টি এই ঘেরাও, ঘেরা বলা ভালো। যে রাজনৈতিকদল শুধু নির্বাচনের মধুর লোভ দেখিয়ে দল ভর্তী করেছে বিপদের দিনে দেখা গেল এরা অর্থাৎ নির্বাচিতেরা সব খড়কুটোর মাল। এদের অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কোন আদর্শে বিশ্বাস নেই। আত্মবিশ্বাস নেই। সুযোগ সন্ধানীর দল, মৃত জনতার চালে গুঁড়িয়ে গেল। দলছুটের খেলা শুরু হলো। কংগ্রেসের যারা এতদিনে দুধ-কীরের সন্তানীর এত আমদানী হয়েছিল যে এদের ভাগে প্রকৃত আদর্শবাদী কংগ্রেস কর্মীদের খুঁজে পাওয়া যেতো না। বিপদ একদিনে আসেনি, দিনে দিনে

শহরে কলায় বিপদ বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল, আদর্শবিহীন যুবকেরা কংগ্রেসে ভীড় জমিয়েছিল। জনপ্রিয় নাম হলো বস্তানীকংগ্রেস। হাজার হাজার কর্মীর নীরব সাধনায় বড় কংগ্রেস এই ভাবে সুবেরারবারা অধিকৃত হলো।

ফলে কংগ্রেসের মর্য্যাদা বৃদ্ধি দূরের কথা, ভয়ে ভীত মানুষ নিরাপদ দূরত্বে বাস করতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় একদিন বক্তৃতায় গর্ব করেছিলেন যে, এবারে তার মন্ত্রীপরিষদে একটিও জেলখাটা লোক নেই, সব নতুন রক্ত। এই নতুন রক্ত কি চিজ তা দেশবাসী টের পেয়েছে।

আসল সমস্যা ত এখানে নয়, আরো গভীরে। যারা কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশের মধ্যে চান না তারা তো অবশ্যই এর দোষ বর্ণন করবে। আর কাজ করতে গিয়ে ভুল হয় না এমন ইতিহাস কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেখানেই কর্মযজ্ঞ সমাধা হবে সেখানেই ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবে। কিন্তু ত্রুটি বিচ্যুতিকে অতিক্রম করে যদি চিন্তাশীল নেতৃত্ব এগিয়ে যেতে পারে তবেই জাতিকে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারে। জয়প্রকাশ নারায়ণ লোকনায়ক হয়েছেন বলে দাবী করেন, অথবা কেউ কেউ তার পক্ষে দাবী করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি লোকের মন বোঝেন না। লোক চরিত্র যদি তিনি বুঝতেন তবে দোষহীন, দুর্নীতিমুক্ত সমাজের কথা বলতেন না। এটা যেমন অলীক কল্পনা যেমন সোনার পাথর বাটি। সমাজ মানেই হলো শ্রেণী বিন্যাস, স্তর বিন্যাস, এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এই দ্বন্দ্ব কখনও সূচীমুখে উপরিতলে আসে, কখনও অধোমুখে নিম্নতলে অবস্থান করে। একের প্রতি অন্যের সংঘাতের প্রবৃত্তি অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আজ তিনি উঠে-পড়ে লেগেছেন, সে দুর্নীতি বিগত বিহারের খরার সময় ছিল, সে সময় রিলিফের বালপত্র খোলা বাজারে বিক্রি হয়েছে। যাদের পাবার তারা বঞ্চিত হয়েছে। কই সেদিন ত তিনি সংঘর্ষ সমিতি করে আন্দোলনে নামেন নি। তখন ইন্দিরা হঠাও স্লোগানের জন্ম হয়নি।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাকে বলে তখনও পরিস্ফুট হয়নি। অথবা যে শক্তি ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তখনও সন্দেহ হয়ে উঠতে পারে নি। যেদিন ভারত ইন্দিরার নেতৃত্বে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় সেদিনই ইন্দিরার নেতৃত্বের পতনের সূত্রপাত হয়। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় যে-নীতি tilted ছিল, সে-নীতি আর tilted থাকল না। সে-ই নীতি একটা সুনির্দিষ্ট গতিতে বিশেষ পরিণতির দিকে পরিচালিত হতে লাগল। ভারতের মাটিতে তথাকথিত 'পপুলেশন প্লিজ' আন্দোলন পরিচালিত নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল। দুধ কীরের কংগ্রেসীরা এই ষড়চক্রের খেলা বুঝতে পারলেন না, অথবা বুঝেও তারা মোটামুটি নিষ্ক্রিয় ছিলেন অথবা নিজেদের ঘেউলিয়া অবস্থা তীব্রভাবে অনুভব করলেন। বিভিন্ন ঘটনার সংযোগে কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্বের অগ্নিপরীক্ষা শুরু হল এবং জাতীয় নেতৃত্ব এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। অথচ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নেতৃত্ব সঠিক চিন্তাই করেছে কিন্তু যারা একে বাস্তবে রূপ দেবে তারা হয় অলস, অকর্মণ্য নয় ভাবের ঘরে চুরি করেছে। অথবা তাদের কর্মের ক্ষমতা আত্মঘাতী কলহের দ্বারা কলুষিত হয়েছিল। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এই আত্মঘাতী বিলাসধর্মী প্রাদেশিক নেতৃত্বের কার্য্য পদ্ধতির কিছু আলোচনা করব। নেতৃত্বের পতন এবং অভ্যুদয়ের কার্য্যকারণ ও ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান করব।

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

বাহ্য ডাকাতির পরে ঢাকা সমিতির বিশিষ্ট সদস্যদের উপর সরকারের দৃষ্টি পড়ে। শশী সরকার ও অমৃত হাজরার নামে ওয়ারেণ্ট বের হয়। তাঁরা ফেরার হন। শশী সরকারকে গ্রেপ্তার করার জন্য এক হাজার টাকা এবং অমৃত হাজরার জন্য পাঁচশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সমিতির সংগঠন এমন সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী ছিল যে পুলিশ দীর্ঘদিন পর্যান্ত এদের একজনকেও ধরতে পারে নাই। তর্ক সরকারী গোয়েন্দাদের চোখে ধুলি দিয়ে অমৃতবাবু এই সময় ঢাকা থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে ঢাকা, গৌহাটী থেকে চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী থেকে মেদিনীপুর সর্বত্র যাতায়াত করতেন।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা এবং বরিশাল অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে সমিতির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ১৯১০—১৯১৩ সালের মধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ফেরার অবস্থায় অমৃতবাবু ছিলেন দলের সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী। বিভিন্ন স্থান থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার ভারও এজন্য তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। এই সময় ফরাসী চন্দননগর ছিল সকল বিপ্লবীদের অস্ত্র সংগ্রহ-কেন্দ্র। বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ মানিকতলার কর্মীরাও চন্দননগর থেকেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতেন। যে দুইটি রিভলবারের সাহায্যে কানাই লাল দত্ত এবং সত্যেন বসু রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন, তাও চন্দননগর থেকে সরবরাহ করা হইয়াছিল। চন্দননগর থেকে এই রিভলবার সংগ্রহ সম্পর্কে শ্রীমতিলাল রায় বলেন, "বিপ্লবযুগের প্রথম ভাগ চন্দননগরের বিশিষ্ট অধিবাসী কিশোরী মোহন সাঁপুই ফ্রান্স হইতে ধারাবাহিক ভাবে রিভলবার আমদানি করতেন। এই কিশোরীবাবুর নিকট হইতেই মানিকতলা বাগানের বারীন্দ্রকুমার রিভলবার ধরিদ করতেন।" কিশোরীবাবু ফ্রান্স থেকে মোট তেইশ বাক্স রিভলবার সংগ্রহ করেন। প্রথম ছয় বাক্স বন্টনের পর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে জানতে পারেন। শ্রীমতিলাল রায় এ সম্পর্কে আরও জানান যে সাঁপুই মহাশয়ের কৃপায় চন্দননগরের বিপ্লবীগণ এই সময় বহু রিভলবার সংগ্রহ করে রাখেন। বাঙলার বিভিন্ন বিপ্লব সমিতিগুলিতে এই সমস্ত রিভলবার ছড়িয়ে পড়ে। এই সংবাদ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের গোচরে এলে তারা ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে চুক্তি করে চন্দননগরে অস্ত্র আইন পাশ করে নেন। কিন্তু ততক্ষনে বহু রিভলবার বিপ্লবীদের হস্তগত হয়েছে।

এর কিছু অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই অমৃতবাবু একবার চন্দননগরে যান। কলকাতায় সতীশ সেন নামে এক বিপ্লবী কর্মীর সঙ্গে অমৃতবাবুর পরিচয় ছিল। সতীশবাবুর নিবাস ছিল শ্রীরামপুরে। তিনি আত্মোন্নতি সমিতির বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। কলকাতায় থেকে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। চন্দননগরের মতিলাল রায়ের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয় ছিল। অস্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি অমৃতবাবুকে মতিবাবুর নিকট নিয়ে যান। অমৃতবাবুর এই চন্দননগর যাত্রা সম্পর্কে মতিবাবু লিখেছেন, "একদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীরামপুরের সতীশ চন্দ্র সেনগুপ্তের সহিত এক সুপুরুষ তরুণ আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। সতীশবাবুর সহিত আমার পরিচয় আমার ছাত্র ও শিষ্য অরুণ চন্দ্রের বাসায়। অরুণ চন্দ্র এই সময় রিপন কলেজে

বি, এ, পড়িতেছিল। তাহাকে মাঝে মাঝে দেখিবার জন্য তাহার বাসায় উপস্থিত হইতাম।" অমৃতবাবু বলেন "সতীশবাবু আমাকে তরুণ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বললেন যে ঢাকার অনুশীলন সমিতির ইনি একজন সুযোগ্য কর্মী এবং বাঘা ডাকাতির একজন পলাতক আসামী। কলকাতায় আইন্ ক্লাসে পড়েন। ইহার নাম অমৃত হাজরা বর্তমানে বিপ্লবী মহান শশাঙ্ক নামে পরিচিত।"

মতিলাল রায়ের সহিত অমৃতবাবুর এই পরিচয় সূত্রেই চন্দননগর দল অনুশীলনের সহিত মিলিত হয়।

১৯০৬ সালের বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করে সমগ্র বাংলাদেশে তখন স্বদেশ প্রেমের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। উন্নত চরিত্র তরুণ দল নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলছেন। এই সকল সংগঠনে একদিকে যেমন লাঠিখেলা ও ছোরা খেলার ব্যবস্থা ছিল অন্যদিকে তেমনি জাতীয়তামূলক সাহিত্য এবং ইতিহাসের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। বাঙলাদেশে সেদিন যেন স্বদেশীর বান ডেকেছিল।

এই স্বদেশীযুগ আরম্ভ হইবার পূর্বেই চন্দননগরে তরুণদের এক শক্তিশালী সংগঠন ছিল। সংগঠনের নাম ছিল "সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়"। স্বামী বিবেকানন্দের বীর বাণী আশ্রয় করে এই তরুণ দল দরিদ্র নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে ছিল। বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীমতিলাল রায়, সাগর কালী ঘোষ, ননী পাল এবং সত্যচরণ কর্মকার।

পূর্বে বলা হয়েছে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রতবসু প্রভৃতি কর্মীবৃন্দ মূলঅনুশীলন সমিতি থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন হয় যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। মিত্তির সাহেব তখনও নিখিলবঙ্গ বিপ্লব সমিতির প্রেসিডেন্ট। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় বিপ্লব প্রচেষ্টা অনেকটা এই উপদলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যুগান্তর প্রকাশের সঙ্গে বিপ্লব উদ্দেশ্যে এই দলের লোক সংগ্রহের কাজও চলতে থাকে। অবিনাশ, দেবব্রত, বারীন্দ্র প্রভৃতি এরপর কলকাতার বিভিন্ন স্থানে এবং শ্রীরামপুর আড়বেলিয়া প্রভৃতি কলকাতার সন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে যাতায়াত করতেন। এরা স্থানীয় যুবকবৃন্দের সহিত আলাপ আলোচনা করে তাদের বিপ্লব সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতেন। মাঝে মাঝে এরূপ অভিযানে সখারাম গণেশ দেউস্করও যোগ দিতেন। এরূপ এক অভিযানে ১৯০৭ সালের বিজয়া দশমীর দিনে বারীন্দ্রকুমার চন্দননগরে উপস্থিত হন।

সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক

অপ্রকাশীর ডাকে সম্প্রতি সারা ভারতে 'লোকশক্তি দিবস' পালিত হয়েছে। উক্ত দিবসের এক বাণীতে শ্রীনারায়ণ হাজারে ও যুবকদের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালের আরম্ভ 'সর্বাত্মক বিপ্লব'কে সম্পূর্ণ করার আহ্বান জানান। সামাজিক অন্যায় ও কুসংস্কার এবং স্বৈরতন্ত্রের অবসানের মাধ্যমে সার্বিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করাই লোকশক্তি দিবসের সার্থক হোক—এই ছিল জয়প্রকাশজীর বাণীর মর্মার্থ।

(contd. from 2nd. cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—Calcutta		
Majumdar Smt. Amiya Wd./L. Bidhu Bhusan Majumdar	58, Chandi Ghosh Rd., Cal-40.	150	1. 10 76
Majumdar Gopinath	86/35C, Rafi Ahmed Kidwai Rd., Cal-13.	150	
Majumdar Jamini Kanta (Mazumdar)	4, Jatindas Nagar, Cal-56.	150	"
Majumdar Smt. Manorama Wd./L Dinesh Chandra	42/16, Dum Dum Rd., Cal-74.	150	24. 1. 74
Moitra Smt Kanaklata, Wd /L. Jatindra Nath Moitra	R.I.G.H. Estate, Plot-6, 37, Belgachia Rd,, Cal-37.	100	5. 2. 74
Mukherjee Prafulla Kumar	4/68, Netaji Nagar, Cal-40,	200	
Mukherjee Smt. Surama Wd./L. Mohit Kumar Mukherjee	2, Poddarnagar, Block-5, Cal-12.	200	
Nandi Nagendra Nath	50/1, Sree Gopal Mallick St., Cal-12.	200	1. 10. 76
Nath Hari Bhusan	183, Raypur Road, Cal-4.	200	
Pal Nand Gopal	BRX, Block-2, Flat-2B, 17, Bagmari Lane, Cal-54.	200	
Pathak Patanjali	2/B, Simlaipara Lane, Cal-2.	200	
Roy Biresh Chandra	28, Nabin Kundu Lane, Cal-9.	200	
Roy Chaudhuri Keshab Lal	P-3, Block-B (East) Jayashree Park, Behala, Cal-34.	200	
Roy Choudhury Sudhanya Kumar	2/101, Paschim Putiary Colony, Cal-41.	200	"
Saha Jasboda Lal	16/1, Deshpriyanagar, Patpara, Cal-50.	200	"
Samaddar Dakshina Ranjan	A-38/A, Rabindranagar, P.S. Matiaburz, P.O. Battola.	200	
Sanjal Bhobesh	85/D, Raja Dinendra St , Cal-6.	200	"
Sanyal Bijoy Kumar,	5/18, Bejoygarh Colony, Cal-32.	200	
Sarkar Jogendra Nath	96/B, Manicktola Main Rd., Cal-54.	200	
Jyotish Chandra	1-3, Housing Estate, 401, Tangra Rd., Cal.	200	

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

28 MAR 1978

CENTRAL LIBRARY

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীসাহি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। এজেন্সী সচিব—শ্রীধীরেন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৩নং বক্সদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পার্টনার্সিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

শিক্ষক পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ১৮ই চৈত্র, ১৩৮৪ ১লা এপ্রিল, ১৯৭৮	২৬ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

। সম্পাদকীয় ।

উদ্বাস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি চাই

নারায়ণী সেনা

। সতীন্দ্রকুমার সেন ।

গণতন্ত্রের চেহারা কি ?

। ক্ষীরোদ দত্ত ।

সংহতি ও স্বাতন্ত্র্য

। সুবোধ মজুমদার ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক নলিনী মোহন গাঙ্গুলী ।

। গ্রাম-বাংলা ।

মালদহের আম ও প্রকল্প

। নিমাই চাঁদ কুমার ।

। সাম্প্রতিক

আনন্দের চেহারা

মলয় ঘোষ

"সকল অভাবের মূল শিক্ষার অভাব। আলোক বিনা কোন কাজই অগ্রসর হয় না। শিক্ষাই হইল সেই আলোক।

—রাজা রামমোহন

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—Calcutta		
Sarkar Narendra Nath	2, Dum Dum Rd., Cal-30.	200	1. 10. 76
Sarkar Sishu Ranjan	1, Kali Charan Ghosh Rd., Cal-50.	200	"
Sarkar Smt. Snehalata	17/7, Raja Raj Kissu St., Cal-6.	100	
Wd./L. Patit Paban Sarkar			
Sarkar Upendra Nath	10, Regent Park, Cal-32.	200	
Seal Lakshmi Kanta	64/2, Biren Roy Rd. East, Cal-8.	200	
	Govt. Scheme No. 1, Plot-4		
Sen Debendra Nath	17, Ultadanga Main Rd., Cal-4.	200	"
Gupta Smt. Kalyani	A-97, Bagha Jatin Colony, Cal-32.	100	
Wd./L. Santosh Kumar Sengupta			
Gupta Prafulla Ranjan	314, Netaji S. C. Bose Rd., Cal-47.	200	
Gupta Smt. Sova Sengupta		150	12. 2. 77
Wd./L. Sitangshu Sengupta			
Gupta Subodh Cumar	142, Prince Golum Hossian Rd., Cal-32.	200	1. 10. 76
Talukdar Ranjit	32/8, Chandi Ghosh Rd., Cal-40.	200	"
Zaman Smt. Zabeda	35/A, Syed Amir Ali Avenue, Cal-17.	100	28. 7. 77
Wd./L. Capt. Zaman			
	Widows' & Unmarried Daughters' Pension		
Chatterji Smt. Nagendra Bala (Debi)	58/4, Bechu Chatterji St.,	100	30. 8. 77
Wd./L. Gopal Chandra Chatterji	Calcutta-9.		
Chatterji Smt. Usha Rani	39, Tollygunj Rd., Calcutta.	200	12. 10. 77
Wd./L. Bankim Chandra Chatterji			

(contd. on page 16)

সম্পাদকীয়

উদ্বাস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি চাই

গত ২৩শে নভেম্বর রাজ্যসভায় সি,পি,আই সদস্য শ্রীকল্যাণ রায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত রাজনৈতিক উদ্বাস্তুদের প্রতি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই আলোচনার উত্তরে পরিষদকে জানিয়েছেন যে বর্তমান জনতা সরকারের শাসন-কালে ব্যাপক উদ্বাস্তু আগমন ঘটেনি। সুতরাং এ নিয়ে পরিষদের বিশেষ চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রস্তাব এবং উত্তর যদি এখানেই শেষ হত, আমাদের বলার কিছু ছিলনা। কিন্তু ব্যাপারটি নিয়ে এমন কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যে সে সম্পর্কে আমরা কয়েকটি কথা না বলে পারছি না।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, উদ্বাস্তু আগমন ঘটেনি বটে তবে বর্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী ৭০১২ জনকে পুনরায় বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন যে যারা ভারতের অভ্যন্তর থেকে বাংলাদেশ আক্রমণ করার জন্য ভারতে আসতে চেয়েছিলেন তিনি তাদেরই মাত্র বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমাদের প্রশ্ন—তিনি কি করে জানলেন ভারতের অভ্যন্তর থেকে তারা বাংলাদেশ আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যেই এখানে আসতে চাইছিল? কি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তিনি এ সম্পর্কে সত্যাসত্য নির্ণয় করার জন্য? ১৯৪৭ সালে পাকিস্থান-মূল্যে ভারত যেদিন স্বাধীন হল সেই দিন থেকেই বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লোক নিজেদের বাস্তুহারা মনে করে আসছে। তারা সেদিনের পূর্ব পাকিস্থানে অসহায় মনে করে এখানে ছুটে আসছিল আশ্রয় চেয়ে। এখানে বসে তারা ভারত বিরোধী অথবা পাকিস্থান বিরোধী কোন কার্যই করেনি। এমন কি ভারত পাকিস্তান সংগ্রামের সময়ও বাস্তুহারা দল পাকিস্থান বিরোধী কার্য্য করেছিলেন বলে জানা যায় না। তারা চেয়েছিল একটু আশ্রয়, তারা চেয়েছিল সামান্য একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই। আর তাই পেয়েই তারা সন্তুষ্ট ছিল। আজ প্রধানমন্ত্রী তাদের কি নূতন পরিচয় পেলেন যে তিনি তাদের বাংলাদেশ আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত করলেন? প্রধানমন্ত্রীর নিজের কথা শুনেই আমরা যদি সন্দেহ করি, প্রধানমন্ত্রী যাদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ আক্রমণকারী আখ্যায় আখ্যায়িত করে, তাঁর জিম্মাদার সেখানে নিয়ে তাদের বলি দিয়ে হত্যাদের কার্য্য সম্পাদন করেছেন, অবস্থা দেখে এ সন্দেহ করা কি অন্যায় হবে? প্রধানমন্ত্রী বলেছেন পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই কি সহানুভূতির নমুনা?

আমরা জানি পাকিস্তানী ইসলামী শাসনে এই সহানুভূতির অভাব ছিল বলেই সেদিন এক শ্রেণীর নরনারী বাস্তুহারা হয়ে ভারতের দরজায় আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিল। একবিন্দু সহানুভূতির বাষ্পই মাত্র তারা এখানে আশা করেছিল। বাস্তুহারা দল কোন দিনই এখানে বসে বাংলাদেশের ফিরে যে সংগ্রামের আয়োজনে লিপ্ত হয় নি। তবে আজ প্রধানমন্ত্রীর এ সন্দেহ কেন?

তাছাড়া ১৯৭৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন হল ভারতের বাইরে যারা পরিত্যক্ত হয়েছিল তাদের কি ভারত থেকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি? প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেদিন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভারতের নেতৃবৃন্দ, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভারতবাসী নরনারী। তারা এত শীঘ্র সে প্রতিশ্রুতি ভুলে যাবেন প্রধানমন্ত্রী এটা আশা করেন কি করে? আজ ভারত থেকে বাস্তুহারা দল বিতাড়িত, ভারতে তাদের প্রবেশাধিকার নেই কিন্তু একদিন তারাও আমাদেরই সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবং হাতে হাত ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়েছে। আমরা এত শীঘ্র সেটা ভুলে যাব কি করে? প্রধানমন্ত্রীই বা কি করে ভুললেন? প্রধানমন্ত্রী কি নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির কথা ভুলে গিয়েছেন?

প্রধানমন্ত্রী আমাদের জানিয়ে দেন, তাঁর জিয়াবন্ধু তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা সেখানে যাতে নিপীড়িত না হন সেদিকে তিনি দৃষ্টি দেবেন। জিয়া বন্ধুর এই আশ্বাসে প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত হয়েছেন, তাঁর কথায়ই তার প্রমাণ পাচ্ছি কিন্তু বন্ধু তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন কিনা, অথবা কতটুকু করেছেন প্রধানমন্ত্রী তার কোন সন্ধান নিয়েছেন কি? সে দেশের অবস্থা বাইরে থেকে আমরা যা বুঝছি তাতে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার অনুকূল অবস্থা সেখানে আছে বলে আমাদের মনে হয় না। গত ২৪শে নভেম্বরে ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন খাদ্য সাহায্য বণ্টনের ব্যাপারে বাংলাদেশকে "Troublesome" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে মানবাধিকার সেখানে বিপন্ন এবং সেখানে কোন নির্বাচিত গভর্ণমেণ্ট নেই। আরও বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে গত অক্টোবরে সামরিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার পরে ৩৭ জনকে হত্যা করা হয়েছে। আরও ৫৫ জন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। আজ পর্যন্ত তারা বেঁচে আছেন কিনা সংবাদে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। এ ছাড়া আরও কয়েক শত ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। মার্কিন সূত্রের এই সংবাদ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে নাগরিক জীবনে সুস্থতা নেই, সেখানে একটা অনিশ্চিত অবস্থা চলছে। এই অসুস্থ পরিবেশে নূতন করে ইসলামিক রাষ্ট্রের ঘোষণার পরেই এক শ্রেণীর নাগরিক নিজেদের বিপন্ন বোধ করবে এবং ভারতের কাছে আশ্রয় চাইবে এটাই স্বাভাবিক। এর প্রতিকার বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা। প্রধানমন্ত্রী তার জিয়াবন্ধুকে সে পরামর্শ দিয়েছেন কি? আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবৃতি আশা করি।

রাজ্য সভায় প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে আরও কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। শুধু প্রতিবেশী বলে নয়, অন্যান্য বহু কারণে সেখানে যা ঘটছে তার প্রতিক্রিয়া ভারতে দেখা দিতে বাধ্য। সুতরাং সে সম্পর্কে ভারতের

নীতিও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এজন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটা সুস্পষ্ট বিস্তারিত বিবৃতি আশা করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আমাদের নিরাশ করেছেন। অবাঞ্ছিত প্রবেশকারীদের তিনি ভারতে প্রবেশ করতে দেন নি কিন্তু গোপন পথে ভারত সরকারের অজ্ঞাতে যারা ভারতে প্রবেশ করেছে তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী তা আমাদের জানান নি। এতদিন পর্যন্ত এই শ্রেণীর নাগরিককে উদ্বাস্তু বলেই গ্রহণ করে আসা হয়েছে। কবে পর্যন্ত এদের উদ্বাস্তুহারা এবং কবে থেকে অবাঞ্ছিত বলে চিহ্নিত করা হল প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে তা জানা যায় না। কিছুদিন আগে শ্রীজগজীবন রাম এক বিবৃতিতে আমাদের জানিয়েছেন, ভারত সরকার উদ্বাস্তু আগমনে উৎসাহ দেবে না কিন্তু যারা একবার প্রবেশ করেছে তাদের তাড়িয়েও দেবে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে বর্তমান বৎসরে পূর্ব বৎসরের তুলনায় অধিক সংখ্যায় উদ্বাস্তু বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও অনুরূপ কথা বলেছেন। সংশ্লিষ্ট রাজ্য কর্তৃপক্ষের এই সমস্ত উক্তি প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির সঙ্গে মেলে না। এরূপ অবস্থায় আমরা কি প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি সুস্পষ্ট বিবৃতি আশা করতে পারি না? উদ্বাস্তু আগমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখান হোক এ আমরা চাই না কিন্তু প্রকৃত অবস্থা খোলাখুলিভাবে আমরা জানতে চাইলে সেটা কি আমাদের অন্যায় হবে?

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে জানিয়েছেন লণ্ডনে জিয়াবন্ধুর সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করেছেন। তখন তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছেন যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুগণ যেন নিপীড়িত না হন। কিন্তু এতদিন পরে আজ আবার সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু কেন? আমরা জানি তাঁরাও ভারত সরকার সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু স্বীকার করেন না, অন্য দেশেও তা থাকুক তা তাঁরা চান না। সংখ্যালঘু ছিল সাম্রাজ্যবাদীর সৃষ্টি। সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তেই ইংরেজ শাসিত ভারতে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এই সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু সীমা ধরেই ভারত বিভাগ করেছে। কিন্তু সে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত তো শেষ হয়েছে। আমরা চাই ভারতে যারা থাকবে তারা সবাই হবে ভারতীয় এবং ভারতবাসী। আর বাংলাদেশে যারা থাকবে তারাও সবাই হবে বাঙালী। অন্য কোন পরিচয় তাদের নেই। প্রধানমন্ত্রী কি তাঁর জিয়া বন্ধুকে এই পরামর্শটি দিতে পারেন না?

যকৃতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ একশতাংশ ডাকমাশুল
প্রাপ্তিস্থান: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
শ্রীকণ্ঠ কুটীর • কুমার পুকুর • যশোহর • ১৪ পয়সার

গণতন্ত্রের চেহারা কি ?

—ক্ষীরোদ দত্ত

গত একবছর আগেকার কথা। হঠাৎ একটা ঝড় উঠল ভারত আকাশে। সে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল ঘরবাড়ী, লতাপাতা যা ছিল সবই। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার জমাটীও উড়ে গেল সে ঝড়ে। তিনি আশ্রয়হীন হয়ে পড়লেন। দেশের একদল লোক বলতে লাগল সমুচিত শাস্তিই হয়েছে। গণতন্ত্র ধ্বংস করেছিল, জরুরী অবস্থা হাতে নিয়ে যা খুশী তাই করেছিল, মিসা প্রয়োগ করে লক্ষ লক্ষ লোককে আটক করেছিল, সুতরাং তার এই দশা ঠিকই হয়েছে।

প্রকৃতির রাজ্যে শূন্যতা নেই তাই ইন্দিরার ঘর যেন সেখানে গড়ে উঠল জনতার ঘর, সে গৃহের ভূত থেকে মাইকযোগে প্রচারিত হতে লাগল ইন্দিরার কুৎসা। দেশের সবকিছু অভাবের জন্য ইন্দিরাজী দায়ী। তিনি যখন গিয়েছেন এবারে আর কোন ভাবনা নাই। এবারে আমরা সবাইকে সুখী করব, দেশ থেকে অভাব দূর করব, গণতন্ত্রকে রক্ষা করব, গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করব, দ্রব্যমূল্য হ্রাস করব, মানুষের মুখে হাসি ফোটাব, এবার ভারতকে আমরা স্বর্গরাজ্য করব। এমন সুখরোচক প্রতিশ্রুতি আর কেউ কখনও দেয় নি, সবাই ভাবল আর আমাদের ভাবনা নেই।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি এবং কাজ এক নয়। গদীতে বসেই জনতা সরকার তাদের কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু দেখা গেল কাজে এবং প্রতিশ্রুতিতে শুধু যে কারাক তাই নয়, একটা আরেকটা একেবারেই বিপরীত। জনতার নাম দেখেই জাতি মনে করেছিল এ জনতা এবং জনগণ একই। কিন্তু তাদের বুঝতে বিলম্ব হল না, এ জনতা সে জনতা নয়, নামেই এটা জনতা সরকার। এটা জনগণের সরকারতো নয়ই জনগণ এর সামনে পিছনে আশে পাশে ডানে বাঁয়ে কোথাও নাই। তারা বুঝলেন মোরারজী, রাজনারায়ণজী, চরণ সিংজী এরা কেউই তাঁদের নয়। তাঁরা ভাবতে লাগলেন এবার তাদের কি করণীয়। তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছে একজন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীকে নিয়ে। ইন্দিরাজী ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন সুতরাং এবার তাকে কবর দিতে হবে। তাই বিপুল আড়ম্বরে মহা সমারোহে আরম্ভ হল ইন্দিরাজীকে কবর চাপা দেওয়ার কাজ, শাহ কমিশন বসানো হল, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এম, পি দের স্বাক্ষ্য চলল কমিশনের সম্মুখে, সবাইয়ের মুখে এক কথা ইন্দিরাজীর মত নচ্ছার আর ভূ-ভারতে কখনও হয়নি কখনও হবে না। জনতা সরকার ভাবল আর কি চাই এইতো আমাদের কাজ হচ্ছে, তারা ভুলে গেলেন নিজেদের পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা। জনতা সরকার মনে করল শাহ কমিশনই তাদের অভীষ্ট কার্যে পৌঁছে দেবে, আরও জোরদার করে চলল কমিশনের কাজ। আজও সেই কাজ চলছে। হয়তো সরকারের আয়ুকাল পাঁচ বছর ধরেই এই কাজ চলবে।

কিন্তু জনতা সরকার তাদের প্রতিশ্রুতির কথা ভুললেও জাতি সে কথা ভোলেনি। জনতা সরকার যেমন ইন্দিরাজীকে অভিযুক্ত করেছিলেন শাহ কমিশনের আদালতে, জাতি জনতা সরকারকে অভিযুক্ত করল জাতির আদালতে। জাতি বিচার করে জনতা সরকারকে চরম শাস্তি দিল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে। জাতির রোষাগ্নি যে তাদের উপর পড়েছে সেটা তাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন দেখে, ত্রিপুরার নির্বাচন দেখে। কিন্তু সেদিন তারা ছিল ইন্দিরা নির্যাতনের আনন্দে এমনভাবে আত্মহারা যে সেদিকে নজর দেবার সময় ছিল না।

এইভাবে দশমাস কেটে গেল, এল ভারতের জাতীয় জীবনে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। একসঙ্গে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, আসাম প্রভৃতি পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচন। জনতা একবছর ধরে জাতিকে অবহেলা করেছে। তাই জাতি এবারে প্রতিশোধ নিল তার উপরে। জাতি স্পষ্টভাবে এবারে জানিয়ে দিল জনতা সরকার তাদের অবাঞ্ছিত, এ সরকারকে তারা চায়না। বহুনিন্দিত ইন্দিরা বরং তার কাছে কাম্য কিন্তু জনতা কোন ক্রমেই নয়। জাতির নির্দেশ সুস্পষ্ট, এর মধ্যে দ্বিধা সংকোচ কিছু নেই। বিশ্ব দেখল একবছর আগে যে হাওয়া বইছিল

(এর পর ৭ পাতায় দেখুন)

সংহতি ও স্বাতন্ত্র্য

—সুবোধ মজুমদার

(এক)

একটা দ্বন্দ্ব লেগেই আছে কেন্দ্রীয় সংহতি আর আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে। নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী কেউ বা বলে কেন্দ্রিকতার পক্ষে, আবার কেউ বা বলে আঞ্চলিকতার পক্ষে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের মূলস্থিত দর্শনটির দিকে তাকায় না কেউ।

এটা তো ঠিক যে সুষ্ঠু ব্যক্তি ব্যতীত গড়ে উঠতে পারে না কোনো সুষ্ঠু সমাজ, আবার সুষ্ঠু সমাজ ব্যতীত গড়ে উঠতে পারে না কোনো সুষ্ঠু ব্যক্তি। তবে কোন্‌টা আগে? না, একই সঙ্গে গড়ে উঠবে দুটোই?

অপরাপর গ্রহগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু সমগ্র পৃথিবীটাকেই ধরা যায় একটা অঞ্চল ও সমাজ ব'লে। কারণ অন্যদের তুলনায় পৃথিবীর আছে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আবার বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী পৃথিবীর মধ্যেও গড়ে ওঠে বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর অঞ্চল ও সমাজ। দেশ, মহাদেশ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয় এগুলোকে।

এসবের মধ্যেও আবার বিভিন্ন ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গড়ে ওঠে বিভিন্ন অঞ্চল, সমাজ, সম্প্রদায় প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর সংস্থাগুলি। সামগ্রিক জীবনযাপনের তাগিদে এ সবকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রজাতি। স্বভাবতঃই দেখা যায় একটা রাষ্ট্রজাতির মধ্যে অবস্থান করে বিভিন্ন অঞ্চল, সমাজ, সম্প্রদায় প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর সংস্থা। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় না শাসন ব্যাপারে ক্ষুদ্র সংস্থাগুলির প্রতি সুবিচার করা। অতএব প্রয়োজন হয় আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন ও স্বাধীনতার।

এখানেই দেখা দেয় দ্বন্দ্ব ও সঙ্কট। কেন্দ্রীয় শাসকরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে উদ্‌গ্রীব। আঞ্চলিক শাসকরাও নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে উদ্‌গ্রীব। উভয় শ্রেণীই স্বার্থনিষ্ঠ দৃষ্টি পরিহার ক'রে, দেশের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের কথা ভুলে গিয়ে মেতে ওঠেন ব্যক্তিগত ও দলগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে।

এখানে মূলগত চিন্তাটা হচ্ছে—সংহতি ছাড়া টেকে না সুস্থ দেহ, স্বাতন্ত্র্য ছাড়া টেকে না সুস্থ মন, আর সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের সমন্বয় ছাড়া টেকে না আনন্দময় প্রাণ। সমাজ জীবন ব্যতীত ব্যক্তির দৈহিক বা মানসিক সুখ পূর্ণতা লাভ করে না, অতএব সমাজ জীবন অপরিহার্য। সমাজ-জীবনকে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান করতে হলে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থকে সমন্বিত ক'রে একটা কেন্দ্রীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত করতে হয়। এখানে সতর্ক থাকতে হবে কোনো প্রকার অতিকেন্দ্রিকতা বা অতিদোষ যেন না অনুপ্রবেশ করে প্রশাসন ব্যাপারে। কারণ, অতিকেন্দ্রিকতা দোষ ক্ষতিগ্রস্ত করে কেন্দ্র ও অঞ্চল উভয়কেই, তেমনি আবার অতিস্বাতন্ত্র্য দোষ ক্ষতিগ্রস্ত করে অঞ্চল ও কেন্দ্র উভয়কেই।

এই তত্ত্বটি সম্যক্ উপলব্ধি করতে হলে আমাদের তাকাতে হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও দর্শনের দিকে। বস্তু-জগতের সৃষ্টির মূলে রয়েছে কোনো অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম সত্তা। এই একক সূক্ষ্ম সত্তাটি ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে বহুতর ও স্থূলতর সত্তার দিকে। বিভিন্ন অতি সূক্ষ্ম শক্তি-গতি-কণার সমন্বয়ে সংগঠিত হয় একটি পরমাণু। শক্তি-গতি-কণাগুলো হচ্ছে এক একটি আঞ্চলিক শক্তি, আর পরমাণুটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় শক্তি-সংস্থা। শক্তি-কণাগুলির আত্মবৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হলেই রক্ষা পায় পরমাণুটির অস্তিত্বও। শক্তিকণাগুলি বিচ্ছিন্ন হলে বিস্ফোরিত হয় পরমাণুটিও। সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায় শক্তিকণাগুলিও।

অতএব সমগ্র বিশ্বকে মনে করতে হবে একটি অঞ্চল বা সংস্থা। সমগ্র মানবজাতিকে মনে করতে হবে একটি সমাজ। প্রত্যেকটি মহাদেশকে মনে করতে হবে দ্বিতীয় বৃহত্তম অঞ্চল বা সংস্থা। প্রত্যেকটি দেশ বা রাষ্ট্রকে মনে করতে হবে তৃতীয় বৃহত্তম অঞ্চল বা সংস্থা।

প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী একটি দেশ বা রাষ্ট্রকেই বলা হয় বৃহত্তম আঞ্চলিক ও প্রশাসনিক সংস্থা। ভারতবর্ষও হচ্ছে একটি বৃহৎ দেশ, অঞ্চল রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র হচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ও প্রশাসনিক শক্তি। এর অভ্যন্তরে

আছে অনেকগুলি বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতর অঞ্চল বা রাজ্য বা প্রদেশ। এই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সুসংহতির ওপর নির্ভর করে ভারতবাসী জনসাধারণের সুখ, সমৃদ্ধি, কল্যাণ। কেন্দ্রীয় সুসংহতি নির্ভর করে আঞ্চলিক সুসংহতি ও সংগঠনের উপর।

এখানে প্রশ্ন ওঠে—কোন নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রিত করা হবে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে, অর্থাৎ কিসের ভিত্তিতে সংগঠিত হবে ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক অঞ্চলটি এবং কোন নীতি অনুযায়ী অঞ্চলগুলি কেন্দ্রিত হবে বৃহত্তর ও বৃহত্তম সংস্থার অধীনে? ইংরেজরা এই দেশকে কেন্দ্রীভূত ও বিতন্ত্র করেছিল শোষণ-দমনের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ব্রিটেনের উন্নতির জন্য শাসনের উদ্দেশ্যে। ভারতবাসীর কল্যাণ সাধনের চিন্তা কোনোদিনও করেনি তারা। তখন ভারতের ধনীশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে সমর্থন করত ইংরেজদের কর্মপদ্ধতিকে। কিছু কিছু দূরদর্শী মধ্যবিত্ত দেশী মানুষও ছিল ইংরেজ-সমর্থকদের মধ্যে। সেসব লোকরাই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কখনও হয় অতিকেন্দ্রিকতাবাদী, আবার কখনও হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী। ভারতের সাধারণ লোক চিরদিনই চায় নিজেদের সুখ শান্তি মর্যাদা নিয়ে একত্র হয়ে থাকতে।

আজকের ভারতের প্রশাসন যে অতিকেন্দ্রিকতা দোষে দুষ্ট তা অতি সুস্পষ্ট। গ্রামের নিরীহ লোক দূরের প্রাদেশিক কেন্দ্র কলকাতায় এসে কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলিতে দরবার করতে না পারলে সুবিচার পায় না, পেতে পারে না। পরে আবার সুদূর দিল্লীতে গিয়ে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় দপ্তর গুলোতে দরবার করতে না পারলে কলকাতায় প্রাপ্ত সুবিচার হয়ে যায় ব্যর্থ। যদি ধরে নেওয়া যায় সকল আমলা-কর্মচারীরা সত্যনিষ্ঠ, কর্মঠ লোক, তথাপি তাঁরা পারবেন না জনসাধারণের প্রতি সুবিচার করতে এই প্রতিকূল শাসন-কাঠামোর মধ্যে।

ফলে আজ ক্রমবর্ধমান হারে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে জাতীয় সংহতি। দেশপ্রেম হচ্ছে জাতীয় সংহতির মূল, আর দেশপ্রেম জন্ম লাভ করে জাতীয় আদর্শবোধ, জাতীয় সংস্কৃতিবোধ আর পারিবারিক গৌরব-বোধ থেকে। আমাদের কেন্দ্রিকতাদুষ্ট সরকারগুলোর নায়করা স্বীয় ক্ষমতা লাভের জন্য আর তা রক্ষার জন্য এত সময় ও সম্পদ অপচয় করেন যে দেশপ্রেম সৃষ্টি করার জন্য কিছু করা আর সম্ভব হয় না তাঁদের পক্ষে। দেশ-প্রেমের ভিত্তি পারিবারিক গৌরববোধ থেকে, আর সেটা অনেকাংশে নির্ভরশীল পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা ও আদর্শবাদের ওপর। কিন্তু এটা সম্ভব নয় আধুনিক ধনিকবাদী গণতন্ত্র ও দলীয় নির্বাচন পদ্ধতির কাঠামোর মধ্যে।

আজকের পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকার উভয়কেই চলতে হবে নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক গণতন্ত্রের পথে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে অনুকরণ না ক'রে বরং পাশ্চাত্য জগতকে পথ প্রদর্শন করবেন তাঁরা। তাঁরা ক্ষুদ্রতম অঞ্চল থেকে বৃহত্তম অঞ্চল অর্থাৎ রাজ্য সংগঠন করবেন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবেচনার ভিত্তিতে। দেখতে হবে প্রতিটি অঞ্চল যেন অবশ্য-প্রয়োজনীয় অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা উপভোগ করে। ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র যে নিহিত রয়েছে বৈচিত্র্যের মধ্যে একথা যেন ভোলেন না আমাদের নেতারা। স্বাতন্ত্র্য যেমন রাজ্য-সরকারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন, তেমনি আবার ক্ষুদ্রতম আঞ্চলিক সরকারের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন একথাও মনে রাখবেন তাঁরা। ক্ষুদ্রতম অঞ্চলকে যুক্তিসংগত স্বাতন্ত্র্য না দিলে রাজ্য-সরকারও যুক্তিসংগত স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারেন না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে।

বর্তমান ভারতের আর্থিক, সাংস্কৃতিক সর্বপ্রকার দুর্নীতির মূল হচ্ছে দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির অভাব। আর দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির শত্রু হচ্ছে অতিকেন্দ্রিকতা—রাষ্ট্রীয় অতিকেন্দ্রিকতা এবং রাজ্যীয় অতিকেন্দ্রিকতা। এই অতিকেন্দ্রিকতা বিষ দিয়ে গেছে ব্রিটিশ সরকার। ১৯৪৭ সনে তৎকালীন জাতীয় নেতারা নেতাজীর অভ্যুদয়ের আতঙ্কে সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত ক্ষমতা লাভের আশায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন এই বিষকে। কিন্তু আজকের ভারতে সে সমস্যা নেই, কারণ স্বয়ং রাষ্ট্রপতি সভীব রেড্ডিই নেতাজীর আবির্ভাব কামনা করেন। অতএব

তাঁরা নিশ্চয়ই পরিহার করবেন ব্রিটিশ প্রদত্ত এই মহাবিষ।

আধুনিক ভারতীয় নেতাদের পক্ষেও সহজ হবে না অতিকেন্দ্রিকতার মহাবিষ পরিহার করা। এই মহাবিষের সঙ্গে জড়িত আছে যে নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ: ক্ষমতা ও সুযোগ বিকেন্দ্রিত হলে যে তাঁরা আর পারবেন না অগণিত নরনারীর ভাগ্যবিধাতা হতে, পারবেন না যখন তখন যেখানে সেখানে খ্যাতি কুড়োতে, পারবেন না অযোগ্য স্বজনকে রাতারাতি ধনকুবের বা খ্যাতিমান ক'রে তুলতে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির পূজারীর পক্ষে, জড়বাদী আদর্শের অনুসরণকারীর পক্ষে সম্ভব নয় এই লোভ সম্বরণ করা।

নেতারা যদি বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন তাহলে অতিসহজেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করতে পারবেন যশ বা সম্পদকে। বেদান্তবাদী মনে করেন সকল নরনারী একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মের সন্তান, অতএব সকলেরই আছে আনন্দ লাভ করার সমান অধিকার। সব মানুষেরই জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে আনন্দ। ধন দৌলত, যশ মান, আমোদ-প্রমোদ, উপভোগ-সম্ভোগ সবকিছুরই পরম লক্ষ্য হচ্ছে আনন্দ। আনন্দ ব্যক্তিগত লাভের বস্তু নয়, এটা হচ্ছে একটা সামাজিক বা দলগত লাভের জিনিষ। আনন্দ উদ্ভূত হয় নিজেকে এবং সমাজের অন্যান্য অধিবাসীকে সুখী করার প্রচেষ্টা থেকে। এই সমাজ যত বড় হয়, অর্থাৎ সুখের অংশীদার যত বেশী হয়, আনন্দও তত গভীর ও নিবিড় হয়। সুখ কী? সুখ হচ্ছে—দেহ ও মনকে সুস্থ রেখে, অর্থাৎ দেহ ও উপভোগ-সম্ভোগের সহজ যোগ্যতা বজায় রেখে, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলনের ফল। এই সুখের জন্য সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতিই হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার লক্ষ্য, আর আনন্দ লাভের জন্য সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতিই হচ্ছে সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক জ্ঞানের লক্ষ্য।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকার আজ অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন। তাঁরা আজ পৃথিবীকে দেখাবেন নিজেদের গণতন্ত্রানুরাগ। ভারত সরকার জাতীয় সংহতি কতটা ভালবাসেন তা প্রমাণিত হবে তাঁরা রাজ্যগুলোকে কতটা স্বাতন্ত্র্য দেন তার দ্বারা। রাজ্য সরকার কতটা স্বাতন্ত্র্য ভালবাসেন তা প্রমাণিত হবে তাঁরা অঞ্চল গুলোকে কতটা স্বাতন্ত্র্য দেন তার দ্বারা। রাজ্য যদি কেন্দ্রের কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা কেড়ে আনতে চায় তাহলেও রাজ্যসরকারের উচিত হবে অঞ্চলগুলোকে স্বাতন্ত্র্য দিয়ে দেওয়া। তখন অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলে মিলে সংগ্রাম করবে ভারত-রাষ্ট্রের অতিকেন্দ্রিকতা দোষ মোচন ক'রে জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে।

(৪ পাতার শেষাংশ

আজ সে হাওয়ার লেশ মাত্র নেই। আজ সেখানে আবার ইন্দিরা হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। জনতা সরকার এই এক বছর ধরে গণতন্ত্রের চাক পিটিয়েছেন কিন্তু আজ এই উল্টা হাওয়ার মধ্যে তাঁরা কি আরও চার বছর গদীনাসীন হয়ে থাকতে চান? আমরা জানতে চাই এ সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য কি বলে।

আমরা জানি গণতন্ত্রের জন্যই গণতন্ত্র নয়, জাতির কল্যাণের জন্যই গণতন্ত্র। যে গণতন্ত্র জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারেনা সে গণতন্ত্রই নয়। তবুও কি জনতা সরকার এই গণতন্ত্রের জোরেই বহাল তবিয়তে গদী আঁকড়ে বসে থাকবেন? তাঁরা জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারছেন না এবং দেশের হাওয়াও বদলে গেছে এ অবস্থায় গদীতে বসে থাকার কোন সার্থকতা আছে কি? তবুও যদি তাদের সন্দেহ থাকে গদী থেকে নেমে এসে নতুন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখুন জাতি তাদের চায় কিনা। যে আশীর্বাদ নিয়ে ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে তাঁরা সিংহাসনে বসেছিলেন ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে সে আশীর্বাদ তাদের জন্য অব্যাহত আছে কিনা একবার পরীক্ষা করে দেখা আমরা তাদের কর্তব্য বলে মনে করি। এটাই হবে প্রকৃত গণতন্ত্র, ভারতে এই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই আমরা চাই। তা নয় তো উচ্চকণ্ঠে শুধু গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি করলেই ভারতে গণতন্ত্র আসবেনা।

গ্রাম-বাংলা

মালদহের আম ও প্রকল্প

। নিমাই চাঁদ কুমার ।

আমাদের দেশ এক অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। সমস্যা আমাদের দারিদ্র। বেকার সমস্যা অথবা কর্ম-সংস্থানের প্রশ্নও বড় আকারে দেখা দিয়েছে। মুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। স্বাভাবিক প্রয়োজনভিত্তিক প্রকল্প ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষীতে মালদহের আমের কথায় আসছি জলে আর ডাঙায় মালদহ। জলে আম, ডাঙায় রেশম। মালদহের আম ও রেশমশিল্প স্থানীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘদিন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমানে শুধু আমের কথা আলোচনা করব।

সমগ্র মালদহ জেলায় অসংখ্য আমবাগান রয়েছে। নানান প্রকারের আম এখানে প্রচুর হয়। তার মধ্যে ফজলী আমের ফলন সর্বাধিক। ফজলী আমকে এখানকার cash corp বা নগদ ফসল বলা যেতে পারে। তিনমাস যাবৎ আমের মরসুম চলে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক আমের উপর নির্ভরশীল। বহুলোকের জীবিকা উপার্জন তথা ডাক-কাপড়ের প্রশ্নও জড়িত আছে, এর সঙ্গে। বাগানের মালিক, স্থানীয় আম ব্যবসায়ী, গাড়োয়ান, বিভিন্ন শ্রেণীর মজুর প্রভৃতি এই সময় উপার্জন করার একটা পথ পান। মরসুমে বাঁশের কুড়ি তৈরীর একটা হিড়িক পড়ে যায়। কারণ, চালান দেবার জন্য প্রচুর কুড়ির প্রয়োজন হয়। আর প্রয়োজন হয় কুড়ি সেলাই করার দড়ির।

স্থানীয় কিছু যুবক প্রতিবছর ২/৩ জন অথবা ৩/৪ জন মিলে চালানী ব্যবসা শুরু করেন। এ ছাড়া বাঁরা নিয়মিত আমের ব্যবসা করেন, তাঁরা তো আছেনই। বাইরের ব্যবসায়ীও এইসময় এখানে এসে বাগান কেনেন ও আম চালান দিয়ে থাকেন।

আজকাল মালদহের আম বেশীরভাগ চালান করা হয় কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল, জামসেদপুর, শিলং, সোহাগী প্রভৃতি অঞ্চলে। পাটনা দিল্লীর দিকেও যায়। রেল ওয়াগন ও ট্রাকে আম চালান করা হয়। পূর্বে কলকাতা অঞ্চলে যাঁরা আম চালান দিতেন তাঁদের লোকার পন্থা পারাপারের ব্যাপার ছিল। সেটা ছিল খুব কষ্টসাধ্য ও ঝামেলার ব্যাপার। তাছাড়া আম এসে কয়েক ঘন্টার মধ্যে যদি বিক্রী করা সম্ভবপর না হয়, তবে ব্যবসায়ীদের খুব লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়। গঙ্গায় সেতু হবার পর গঙ্গা পারাপারের ঝামেলা আর নেই।

নতুন যুবকেরা যাঁরা দু-একবছর আমের চালানী বা ব্যবসা করছেন তাঁদের প্রায়ই বলতে শুনেছি, খুব লোক-সান হয়ে গেল, আর চালানী কারবার করবো না, এ ব্যবসার পথে যেন কেউ পা না বাড়ায়, ইত্যাদি। লোকসানের কারণ স্বরূপ তাঁরা বলেন, সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়ে লাভ তো থাকেই না; উল্টে লোকসান। শেষটা মরশুম পরিশ্রম করে শেষে হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

তবু আম চলবে এবং বাইরে চালান দিতে হবে। চালান করতে লাগবে প্রচুর কুড়ি। আর লাগবে কুড়ি সেলাইয়ের জন্য প্রচুর দড়ি বা স্থানীয় ভাষায় সুতরী বা সুতলী।

পূর্বেই বলেছি, মালদহের অর্থনীতিতে আমের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাই আমকে বাঁচাতে হবে। তাহলে বাঁচবে সকলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মালদহের আম আজও অবহেলিত। এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

অতিরিক্ত ট্রাক বা লরী ভাড়া চালানী ব্যবসায়ে লোকসানের অন্যতম কারণ। তাই যেন ওয়াগনে যাতে আমের চালানের ব্যবস্থা চলতে দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে হয়, রেলমন্ত্রকের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আম অহেতুক ওয়াগন-অভাবে স্টেশনে যেন পড়ে না পচে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

১) আম থেকে আমসত্ত্ব, জ্যাম, জেলী, আচার, ইত্যাদি তৈরী করার জন্য নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে, দেশে বিদেশে এই সকল জিনিষের খুবই চাহিদা আছে।

২) আর একটি প্রকল্পের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। কুড়ি সেলাই করার জন্য যে প্রচুর দড়ি অথবা সুতরী বা সুতলীর দরকার হয় সেকথা আগেই বলেছি। এই দড়ি নির্মাণ করার বড়ো কারখানা মালদহে স্থাপন করা এখনই প্রয়োজন। একটি বড় কারখানা স্থাপন না করে জেলার বিভিন্ন জায়গায় অপেক্ষাকৃত ছোট কারখানা কয়েকটা স্থাপন করা যেতে পারে। উক্ত ১নং এবং ২নং শিল্প প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান প্রশ্নের কিছুটা সুরাহা হবে এবং মালদহের অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রাণের সঞ্চার হবে বলে আশা করা যায়।

আমাদের দেশে যেমন Tea Board Coffee Board আছে, সেইভাবে আমের সংরক্ষণ, অপচয় নিবারণ, অনভিপ্রেত রোগ ও কীটের হাত থেকে উদ্যানের জন্য একটি Mango Board [illegible]

নারায়ণী সেনা

—সত্যভূষণ সেন

"গ্রামে গ্রামে চিকিৎসক, আধা চিকিৎসক (Para Medical) ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং বেসরকারি চিকিৎসা পেশার অতিরিক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পল্লী স্বাস্থ্য বাহিনী গঠন করা হবে। দরিদ্র পল্লীবাসী প্রথমে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।"

১৯৭৭ সালে নির্বাচনী ইস্তাহারে জনতা দল, গোরক্ষা থেকে মদ্যপান নিরোধ পর্যন্ত যে সব উচ্চাঙ্গের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেগুলি আপনাদের চোখে পড়েছিল কিনা জানি না। সেই প্রতিশ্রুতি পত্রের এক কোণায় উপরের প্রতিশ্রুতিটিও ছিল। ভোট যারা দিতে যায়, কেউ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পাঠ করে মনস্থির করে না। আকাশে বাতাসে একটা হাওয়া আসে যাকে উপেক্ষা করা চলে না। ভাববারই সময় পায় না কেউ। এই হাওয়াটার নাম নির্বাচনী উত্তাপ। প্রার্থীরা সভা করেন, শোভাযাত্রা করেন, পোষ্টার ফেষ্টুন লাগান, শুধু এই নির্বাচনী উত্তাপ জাগিয়ে তোলার জন্য। নির্বাচনের পরদিন পোষ্টার ফেষ্টুন যেমন হারিয়ে যায়, প্রতিশ্রুতিগুলিও ভুলে যান সকলেই। ছাপানো 'বয়ানে'র কথা কারও মনে থাকে না।

ইন্দিরা-বিজয়ী রাজনারায়ণ সেই প্রকৃতির মানুষ নন। কোন কথা একেবারে ভুলে যাওয়া তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এক লাখ ভোটের ব্যবধানে হারলে তিনি বলতেন এক লাখ ভোটের ব্যবধানে জিতেছি। এবার জয়লাভ করে প্রথমেই তিনি গেলেন বিন্ধ্য পর্বতের মহাতীর্থে, মানত রক্ষার জন্য পাঁচ বছরের সঞ্চিত কেশ মুণ্ডিত করলেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রীত্বে অতিরিক্ত হওয়ার পরে, বাটিয়ায় বসে টুলখানি টেনে নিলেন [তিনি গ্রাম্য জীবনযাত্রা প্রণালীতে বিশ্বাসী], পড়লেন দলের নির্বাচনী ইস্তাহার। পল্লী স্বাস্থ্য বাহিনীর পরিকল্পনাটি মনে হল বহু সম্ভাবনাপূর্ণ। কাজের রূপায়ণের জন্য ঘটটি একটা চক এঁকে ফেললেন।

পরিকল্পনাটি হল এই রকম। প্রতি ১০০০ হাজার গ্রামবাসীকে নিয়ে গঠিত হবে একটি সোষ্ঠি বা Community. যার জন্য একজন গোষ্ঠি-স্বাস্থ্য-কর্মী বা Community Health Worker সংক্ষেপে C.H.W. নিযুক্ত হবেন। কর্মীকে নির্বাচিত করবেন ঐ গোষ্ঠির গ্রামবাসীরা। এমন একজনকে নির্বাচিত করবেন যার উপরে সকলের বিশ্বাস এবং যিনি পল্লীবাসীর সেবার কাজে আগ্রহী। মনোনয়নের পরে তিনি নিকটবর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিন মাস কাল সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করবেন। এই তিন মাস মাসিক ভাতা পাবেন ১০০ টাকা হিসাবে। শিক্ষান্তে কাজে যোগ দিলে তাঁর বেতন হবে মাসিক ৫০০ টাকা। অতিরিক্ত আরো ৫০ টাকার ওষুধ পাবেন পল্লীবাসীদের মধ্যে বিতরণের জন্য। রোগ সাধারণ ম্যালেরিয়াই হোক কিম্বা হোক গুরুতর মানসিক, সকলেই তাঁর চিকিৎসাধীনে থাকবেন। তবে সাধারণ রোগই তাঁর দায়িত্ব, গুরুতর কিছু হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা। দিনে দু তিন ঘটার মত কাজ হবে এই চিকিৎসার, সেই জন্য বেতন ৫০০ টাকা। বাকি সময়ে নিজের কাজ করবেন।

পরিকল্পনাটা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মাথায় এসেছে চীনের Bare foot ডাক্তারদের কাহিনী শুনে। এইখানে বলে রাখা ভালো যে চীনের Bare foot ডাক্তারেরা মোটেই Bare foot নন। জুতো মোজা, প্যান্ট, সার্ট পরা রীতিমত ভদ্রলোক। ওদেশে পল্লীর মানুষরা খাওয়ায় ভাল, অসুখ বিসুখেও কম ভোগে। Bare foot ডাক্তারদের কাজটা হল Sanitary Inspectorদের মত। চীনের পল্লীবাসীরা সকলেই কমিউনের [commune] কর্মী। সবাইকেই মাঠে কাজ করতে হয়। মাইনে পান কতটা কাজ করলেন সেই হিসাবে। Bare footরাও মাঠের কাজের হিসাবে মাইনে পান। তবে স্বাস্থ্যের কাজ করতে

পরে চাষের কাজে যে ক্ষতি হয়, সেটা হিসাব করে পুষিয়ে দেওয়া হয় 'কমিউন' থেকে। এক একটি কমিউনে বিশেষ ছ চারটি রোগেরই প্রাদুর্ভাব হয়, সেইগুলির প্রতিষেধক ও চিকিৎসা জানলেই মোটামুটি চালিয়ে দেওয়া যায়। যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে হয় না। তবে ওদের রিক্রুট করা হয় উচ্চতি বয়সে, যার মেধা থাকে, যে পরিশ্রমী সে অবসর সময়ে ডাক্তারী পড়ে পুরো ডাক্তার হওয়ার সুযোগ পায়।

আমাদের দেশে অবস্থাটা বিপরীত। আমাদের গ্রামীণ 'স্বাস্থ্য কর্মী' মাশোয়ারা পাবেন মাসিক ৫০ টাকা। কাজ করুন আর নাই করুন কেউ দেখতে আসবে না কারণ ওদের ওপরে কোন সুপারভাইজার নেই। মাসের পর মাস, সারাদিন খেটে মরলেও একটি পয়সা বেশী পাবেন না। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পিছিয়ে পড়িয়ে [তিন মাসে যতটা পারে] দায়েক করে ছেড়ে দিয়েছে, আর কোন দায়িত্ব নেই তাদের। যারা কাজে নামলেন, এলেন পরিণত বয়সে, পড়াশুনা করে ডাক্তারী পাশ করবার বয়স নয় সেটা। সুযোগও নেই পড়াশুনা করবার। দিল্লীর স্বাস্থ্য বিভাগ স্থির করে দিয়েছেন 'সিলেবাস' (Syllabus), দিল্লীর নির্মাণ ভবন তৈরী করে দিয়েছেন ওষুধের বাক্স। এর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই কারও। বাংলার জলাভূমিতে যে সব রোগের প্রাদুর্ভাব, রাজস্থানের উষর মরুতে তার নামও শোনেনি কেউ। এই সব অসুবিধা প্রথমটায় থাকবে।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন, রাজনারায়ণের এই পরিকল্পনার সমর্থক নন। কবিরাজী, ইউনানী, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী সিস্টাই আর যোগ, প্রত্যেকেই এক একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটির সঙ্গে অন্যটির মিল খায় না। সবগুলিকে মিলে একজন ডাক্তার দাঁড়াবেন কি করে? অ্যালোপ্যাথিতে কুইনিন, সর্পিকাশীতে বাসক সিরাপ, আয়ার্বেদে ঘেলের মোরব্বা,' এ চিকিৎসাতো পল্লীর ঠাকুরমারাই করে থাকেন। সেই কাজের জন্য আবার একটা নতুন সংগঠনের কি প্রয়োজন? R.H.S. কর্মীদের কাজ চালাবার জন্য উপর আলা কেউ নেই। তাঁরা যে নামের পেছনে R. M. P. বা Registered Medical Practitioner লিখে, সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে Practice করতে বসে থাকেন না, তার নিশ্চয়তা কি? হাতুড়ে ডাক্তার তো অনেক আছে গ্রামে গ্রামে, আবার দেব?

এখন দেখা যাক CHW ও কর্মীরা নিজেরা কি বলেন। কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে মাস ছয় হল। প্রথম দুই একটা ব্যাচ শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরেও গেছেন গ্রামে। কাজে লেগে গেছেন। তপসিলী ও অনুন্নত [Backward] শ্রেণী থেকে যেসব কর্মী নেওয়া হবে, তাদেরই যখন সেবার প্রয়োজন বেশী। কিন্তু দেখা গেল বেশীর ভাগ এসেছেন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। উচ্চতি বয়সী তরুণরা আকৃষ্ট হয় নি। তাঁদের উন্নতির কোন আশা নেই বলে। কাজে যোগ দিয়ে অবশ্য সকলেই খুসী, বেকার সমস্যার তো আশু সমাধান হয়ে গেছে।

"শুনেছিলাম ২০০ টাকা মাইনে দেবে, এখন দেখছি মাত্র ৫০। এই আক্রা গণ্ডার বাজারে খাবোই বা কি, বাল বাচ্চাকে খাওয়াবোই বা কি?"

"টেবিল চেয়ার আর একটা আলমারী যদি দিত, তবে সাজিয়ে গুছিয়ে clinic খুলে বসা যেত।"

"বাংলোর উর্দ্ধনীমা আবার কেন? রিটায়ার করা মানুষেরই তো কাজ এটা"

কর্মীদের মনোভাব তো মোটামুটি বুঝলেন। এবার গ্রামের রোগীদের সঙ্গে পরিচয় করা যাক। —"আমরা গাঁয়ের বোকা হোকা মানুষ, আমরা আবার কি বলব? শহরের সব এলেমদার বাবুরা সেবার এসে নাসবন্দীর গুনগান করলেন, বললেন নাসবন্দী করলে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। দেখলাম কথাটা বলেছেন ঠিক, বিশ্বাস

করলাম। এবার শহরের অন্ত বাবুরা এসেছেন, বলছেন ওষুধ না খেলে আমাদের আর দুঃখ যাবে না। তাদের কথাও বিশ্বাস করলাম। বিশ্বাস না করলে ছোট মুখে বড় কথা হবে না?. ওষুধ নিশ্চই খাবো, বিনে পয়সায় পাচ্ছি যখন।"— অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্বিকার আমাদের গ্রামের মানুষ।

তারা জানে আসল ব্যাধি তাদের অন্তরে। আসল প্রয়োজন তাদের ভাল ভাত। শহরের এলেমদার বাবুরা এই সহজ কথাটা বোঝেন না দেখে অবাক হয়ে যায়। বুঝতে গিয়ে আবার কি বিপদ টেনে আনবে, ভেবে চুপ করে থাকে।

"আমিই তো দেশ। দেশবাসীকে আমি জানি। তাদের মনের কথা আমার মুখে ভাষা পায়।" রাজ নারায়ণ। [ONRECORD—Sunday Statesman 26. 3. 78] গ্রামে শতকরা ৮০ জনেরই যে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না, একটি "তারা" ফোটে না কোনদিন, তাদের সর্বরোগের মূলে যে উপবাস, সেই খবর তাঁর চেয়ে বেশী কে জানে? শুধুমাত্র নির্বাচনী ওয়াদা পূরণের জন্ত এতবড় একটা বাহুল্য নিরর্থক পরিকল্পনা নিয়ে মাঁকড়ে থাকবেন, তাই বা বিশ্বাস করি কি করে? পার্লামেন্টে একসময় ঘুত ভাঁড়াভিই করে থাকুন, আর যতই ক্যাপাবি করুন জনসভায়, মানুষটি পণ্ডিত এবং অতিশয় বুদ্ধিমান। সোস্যালিষ্ট পার্টির একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা তিনি। পলিটিক্যাল ক্ষমতার ভাবি চিন্তা নিয়ে বিরোধের সম্ভাবনায় কি খাঁচ খেয়েছেন? তার জন্তই প্রস্তুত হচ্ছেন?

ভারতে গ্রামবাসীর সংখ্যা ৫০ কোটি। প্রতি বাজারে একজন, মোট ৫ লক্ষ বাজার কর্মী। পাঁচ লক্ষের একটা রাজ-নারায়ণী সেনা-বাহিনী গঠন করছেন রাজ-নারায়ণ।

———

(১৫ পাতার শেষাংশ)

সঙ্কেতকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনা। তথা কথিত আন্দোলনকারী বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়, তারা কিংবা নিষ্ঠাবান স্বদেশ প্রেমিকগণ যারা দেশের জনগণের দুর্দশা মোচনের জন্ত কাজ করেন, তারা সে পরিবেশ রচনা করেন নি।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গড়ে উঠার এক বছরের মধ্যে যে আদর্শ নিয়ে সংস্থা গড়ে উঠেছে তার কিছু কিছু লাভ করার প্রথম এক মহাসুযোগ দেখা দিল, প্রতিক্রিয়াশীল শাসন কর্তৃপক্ষই অনেক সময় গন-আন্দোলনের সৃষ্টিকর্তা হয়ে পড়েন। অবশ্য তারা এই অভিযোগ অস্বীকার করবেন কিংবা এর জন্ত কোন দায়দায়ীত্বও তারা নিতে চাইবেন না। কিন্তু একথা ঠিকই যে তারাই এর বীজ বপন করেন এবং যথা কালে তা নিশ্চিত রূপেই জন মতকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং গণ দাবীকে অগ্রসর করে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার উর্ধ্বসীমা বয়সসীমা তৎকালীন ভারত সচিব মাকুইস অব সেলিসবেরী র আদেশ অনুযায়ী ২১ থেকে ১৯শে নামিয়ে দেওয়ার সমগ্র ভারতবর্ষে এক ক্ষোভ দায়ক অনুভূতির সৃষ্টি করে। মাকুইস অব সেলিসবেরীর এই ঘোষণাকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় ছাত্রদের আশা আকাঙ্খাকে উড়িয়ে দেওয়ার এক সুপরিকল্পিত প্রয়াস বলেই এদেশে মনে করা হয়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এ ব্যাপারে নিয়ে এক জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার সঙ্কল্প গ্রহণ করল, ১৮৭৭ সালে ২৪শে মার্চ তারিখে টাউন হলে এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হল, মহারাজা স্যার নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সারা বাংলার প্রতিনিধিগণ এই সভায় যোগদান করেন। কেবলমাত্র কলকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণই যে এই সভায় যোগদান করেছিলেন, তা নয়। এদেশের দূর দূর অঞ্চল থেকেও প্রতিনিধিগণ সভায় সমবেত হয়েছিলেন। এমন কি কেশব চন্দ্র সেন যিনি তার জীবনে কখনও কোনও রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন নি, তিনিও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে নিয়েই সভার সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়।

(ক্রমশঃ)

সাম্প্রতিক

আনন্দের চেহারা

॥ মলয় ঘোষ ॥

দোলের আগের দিন পূর্ব কলকাতায় একটি হঠাৎ গণ্ডগোল বেঁধে গেল দুইদল যুবকের মধ্যে। প্রথমে ইট পাটকেল, কাঠের টুকরো, ক্রমশঃ সোডার বোতল, বাঁশ এর বিবর্তনের মাধ্যমে যখন দু একটা 'পেটোয়' পৌঁছে যুদ্ধটা বেশ জমে উঠতে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে মুক্তিমান বেরসিকের মতো ঘটনাস্থলে 'কালো জ্যানের আবির্ভাব ও এক অঙ্কের যবনিকাপতন। পরে পুলিশীসূত্রে জানা গেল, হোলীর চাঁচড় উৎসবের আনন্দাতিশয্যেই এই গণযুদ্ধের সূত্রপাত।

এ' ঘটনা আজকাল মানুষের গা সহা হয়ে গেছে। বরং বেশ উপভোগ্যই হয়ে উঠেছে বলা যায়। আলোচ্য ঘটনাটিতেও কৌতূহলী জনতার অভাব ছিলনা। তাদের মধ্যে দু একজন অতি উৎসাহী এক আধটা ইট ছুঁড়তেও কসুর করেননি—নেহাৎই পর আনন্দের কারণে। মানুষ, বিশেষতঃ কলকাতার মানুষ আজকাল আগের চেয়ে অনেক বেশী forward। হোলীর আনন্দে মেতে উঠতে, এমনকি রাজ্জান হারাতেও তাঁদের উৎসাহের অভাব নেই। আসলে জীবনটা তো নশ্বর। এই আছি, এই নেই—'হেসে নাও দুদিন বই তো নয়, কে জানে কার কখন সন্ধ্যে হয়'। তাই সন্ধ্যে হওয়ার আগেই যতোটা পারো আনন্দ করে নাও।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এতো আনন্দ কিসের। কবি বলেছিলেন, 'এত ভদ্র বঙ্গদেশ, তবু রক্তে ভরা'। তবু তো কবি আজকের এই বঙ্গদেশকে দেখেননি। মানুষের এতো অভাব, এতো কষ্ট, হতাশা, যন্ত্রণা—তবু রক্তের সীমা নেই। তাও সে' রক্ত যদি 'আপনাতে আপনি বিশ্বাসি' হতো, যদি সীমাবদ্ধ থাকতো সামাজিক অনুশাসনের গণ্ডীতে, তার একটা মানে পাওয়া যেতো। এখানের উৎকট আনন্দ যদি অপরজনের সবিশেষ নিরানন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা কি ক'রে সহ্য করা যায়। ঘোপড়াপড়া জামাকাপড়ে চলেছেন ইন্টারভিউ দিতে, জল ভরা বেলুন এসে লাগলো আপনার গায়ে—ক্রতগামী বাস বা ট্রামের মধ্যেও, সিক্ত পরিধানে বিধ্বস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরতে হলো—ইন্টারভিউ উঠলো শিকেয় আবার তবে চাল আসবে কে জানে। আমার সামনেই সেদিন ট্রামের জানলার ধারে বসা জনৈক মহিলার চশমার ওপর এসে আছড়ে পড়লো অজানা কোন্ আনন্দাভিলাষীর প্রীতি উপহার, চশমার কাচকেটে রক্তারক্তি।—ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না! এই চলবে—এই চলবে! হোলির পনের দিন আগে থেকে এর শুরু, পনেরদিন পরে গিয়ে শেষ। আনন্দের নামে এক মাস ব্যাপি এই বর্বরতার অর্থ কি?

শুধু কি তাই? কলকাতারই কোনো কোনো অঞ্চলে অদূর ভবিষ্যতে অট্টালিকার প্রায় অদৃশ্য বাতায়নতল থেকে নারীহৃদয় তরল যাহা পথচারীমূহুর্মুহু শতধারায় এসে পড়ে পথচারীদের মাথায়—পূজার পাঁঠাগুলির মতো! রাস্তার পাক তুলে ঢেলে দেওয়া হয় নিকট পরদেশবাসীর শরীরে! চাঁচরের পোড়া ছাই তেল দিয়ে মেখে অথবা জানা অজানা বীভৎস রঙ আর আলুমিনিয়াম কালার, আচমকা মাখিয়ে দেওয়া হয় ভীতত্রস্ত পথচারিকের মুখে পরম স্নেহভরে। এর ওপর আছে হাসপাতালের প্রলম্বিত অভিযান—পথে পথে, পাড়ায় পাড়ায়—কাদাজলে, কাটা ঢোল, ছেঁড়া বাস্ত, বিকট বাঁশি ও সিঙ্গাড়ী, ঘোড়ার রাশভি, বেলুনের সম্ভার ও আরও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সদস্য বিস্তর যিছিল—ধ্বনিশ্রুতি, ছোটোখাটো হাতাহাতি থেকে বড়োরকমের দাঙ্গা—পুলিশী গ্রেপ্তার—লাঠিচার্জ ইত্যাদি ইত্যাদি!

আজ থেকে চারার বছর আগে এইদিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হোলিখেলায় মেতেছিলেন ব্রজের গোপীনীদের সঙ্গে—আর তার পর, মাত্র ৪৯২ বছর আগে মানুষের সংসারে আবার আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য রূপে—মানুষকে পথ দেখাতে—পরমতম জীবনের প্রতি ঐশ্বরিক স্বত্বার উজ্জীবনে। 'জীবে প্রেম' করার মন্ত্র, ঈশ্বরোপাসনা প্রকৃত পথ নির্দেশ করে দিয়ে গেলেন এই যুগাবতার।

আজকের মানুষ—বিংশ শতকের শেষ পাদের মানুষ, সেই পরম পুরুষের ত্যাগ, স্নেহ, বীর্য আর মানবতাবোধেরই একান্ত উত্তরাধিকারী। আনন্দ আছে—বিশ্বব্যাপী আনন্দধারার অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তাও আছে, দৈনন্দিনের যন্ত্রনাগুলোকে ভুলতে, না পাওয়ার বেদনাকে সাময়িক হাসি আর উপভোগের রঙে মিলিয়ে দিতে—বেদনার অশ্রুজলকে আনন্দাশ্রুর মাঝে বিলীন করতে। শুধু কিছু সংযম প্রয়োজন—প্রয়োজন সামাজিক চেতনার, পারস্পরিক বিশ্বাসের, মানুষের প্রতি দায়িত্ব বোধের। তাহলেই আনন্দ, পরিণত হবে পরমানন্দে, ফাগুয়ার রঙীন উল্লাস পৌঁছে দেবে দেহ থেকে দেহাতীতে, রূপ থেকে রূপাতীতে; করতলে আমলকীবৎ প্রত্যক্ষ হবে জীবন—আশায়, আনন্দের, ভালবাসায়।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

১৮৭৪ সালের জুন মাসে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ছাত্র সংগঠনের কাজে হাত দেই। এই কাজের মধ্য দিয়ে তাদের উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে গভীরভাবে এই ধারণা জাগ্রত হল যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্রভাবে সংগঠন ও তা জ্ঞাপন করার জন্য তাদের একটা সমিতি থাকা প্রয়োজন। এই সমিতির মাধ্যমে তাদের জন-জীবনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্রিয় ভাবে মনোযোগী করে তোলা সম্ভব। অবশ্য তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি ছিল। মহান কৃষ্ণদাস পালের পরিচালনাধীনে এই সমিতির কাজ বর্ষ চলত। কৃষ্ণদাস্ পাল ছিলেন সমিতির সেক্রেটারী, এই সমিতি যখনই প্রয়োজন হত, তখন সাধারণের স্বার্থের বিষয়ে জোরাল ভাবে সমর্থন করত কিন্তু মূলতঃ ও নীতিগত ভাবে এই সমিতি ছিল তুখোমীদের সমিতি। এই সমিতির গৃহীত কর্মপন্থার মধ্যে কোন সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন করা বা জনগণের কাছে সরাসরি ভাবে আবেদন করে কোন জনমত গঠন করার বিষয় কিছু ছিল না। সুতরাং অধিকতর গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত আর একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সুস্পষ্ট প্রয়োজন ছিল, এবং এ কথা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দও স্বীকার করেছেন। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে মহারাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অতি বিশিষ্ট নেতাগণ এই নতুন সমিতি গঠনের উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই সমিতি গঠনে উৎসাহ দান করেছেন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমি বলতে পারি যে এই সমিতি ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মধ্যে আগাগোড়াই যার-পর-নাই সু-সম্পর্ক ছিল; এবং এটা সম্ভব হয়েছিল প্রধানতঃ কৃষ্ণদাস পালের প্রভাবে ও দৃষ্টান্তে। কৃষ্ণদাস ছিলেন তৎকালীন বাংলা বা ভারতের প্রধানতম রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম, মিঃ আনন্দ মোহন বোস এবং আমি একযোগে এই কাজে লাগলাম। আনন্দ মোহনের চেয়ে আমার অবসর ছিল একটু বেশী, তবে আমরা দুজন আলাপ আলোচনা করেই কাজ করেছি।

আমাদের এই নতুন সংগঠনকে জনপ্রিয় করে গড়ে তোলার কাজে আর একজন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন যিনি তখন সে রকম পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না। আমার মনে হয় বর্ত্তমানেও হয়ত তিনি অপরিচিতই রয়ে গিয়েছেন কিন্তু তাঁর স্মৃতিকে বিস্মৃতি থেকে জাগ্রত করা প্রয়োজন। ইনি হচ্ছেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। দ্বারকানাথ একজন শিক্ষকরূপে জীবন আরম্ভ করেন এবং যৌবনেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে মতান্তর ঘটায় যে ফাটল ধরে এবং যার ফলে দুটি উপদলের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে দ্বারকানাথ বিরোধী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সক্রিয় ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তোলার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। সেবার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ছিল তাঁর সত্য বলে যে কাজ তিনি গ্রহণ করতেন তার জন্য সমস্ত মন-প্রাণ তিনি ঢেলে দিতেন। আমাদের এই নতুন সমিতির সংগঠনে তাঁর সহযোগিতা আমাদের কাছে ছিল অতি মূল্যবান। যতদিন তাঁর স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য ছিল, তিনি অক্লান্ত ভাবে নিষ্ঠার সহিত সমিতির জন্য কাজ করে গেছেন। তিনি আর ইহজগতে নেই। কিন্তু তাঁর বন্ধুগণ প্রণতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁর স্মৃতি বহন করে আসছেন।

এক বছর ধরে প্রস্তুতির পরে ১৮৭৬ সালে ২৬শে জুলাই তারিখে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের (বর্ত্তমানে "ভারতসভা"—অনুবাদক) প্রতিষ্ঠা হয়। সমিতির নামকরণ নিয়ে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে অনেক উৎকণ্ঠাপূর্ণ

চিন্তা-ভাবনার সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ও এই রকমের একটা সমিতি গঠনের বিষয় চিন্তা করেছিলেন—যা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতামতকে ব্যক্ত করবে। দ্বারকানাথ তখনও পর্যন্ত উকিল সভার সদস্য ছিলেন, তাঁদের এই চিন্তা তৎকালে খুব একটা সমর্থন না পাওয়ায় পরিত্যক্ত হয়। তাঁদের এই প্রস্তাবিত সংস্থার নাম বেঙ্গল এসোসিয়েশন রাখা হবে বলে স্থির হয়েছিল। আমরা মনে করলাম, এই রকম একটা নাম বা এই জাতীয় অন্য কোন নাম আমাদের সংস্থায় রাখলে তা আমাদের কাজের পরিধি বিস্তারকে সীমাবদ্ধ করে ফেলবে। কারণ, আমাদের মনে যে ধারণা কাজ করছিল তা হল এই যে, আমাদের এই এসোসিয়েশন একটি সর্ব ভারতীয় আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে কাজ করবে। ভারতীয় বাঙালী নেতাদের মনের মধ্যে তখন ম্যাজিনির শিক্ষার প্রেরণায় এক মিলিত ভারতের ধারণা, অন্ততঃ পক্ষে সমগ্র ভারতকে একটি মাত্র রাজনৈতিক মঞ্চে আনয়ন করার আবেগ, দৃঢ়ভাবে বাসা বেঁধেছিল। সুতরাং আমরা আমাদের এই নতুন রাজনৈতিক সংস্থার নাম 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' রাখা স্থির করলাম।

উদ্বোধনী সভার অনুষ্ঠান কালে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যার প্রতি এই বিবরণ লেখার চলতি পথে এক পলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যাওয়া উচিত। সে যুগে রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জির পরেই ভারতীয় খৃষ্টানদের মধ্যে সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন বাবু কালীচরণ ব্যানার্জি। পরবর্তীকালে এই কালীচরণ বাবু ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হলেও উদ্বোধনের সময় কিন্তু তিনি এই সমিতি গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর আপত্তির প্রধান যুক্তি ছিল এই যে ইণ্ডিয়ান লিগ নামে এই জাতীয় আর একটি সংস্থা মাত্র কয়েকমাস আগে গড়ে উঠেছে। তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে আমি উত্তর দিলাম এবং সেই জনসভা এই নতুন সমিতি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করল।

ইণ্ডিয়ান লিগ অনেক ভাল কাজ করেছে। 'অমৃত বাজার' পত্রিকার বাবু শিশির কুমার ঘোষ, 'রায়ত্ এণ্ড রায়ত্'র ডাঃ মনমোহন ঘোষ এবং বাবু মতিলাল ঘোষ—এরা ছিলেন ইণ্ডিয়ান লিগের প্রাণ পুরুষ, তবে পরে এই সংস্থা আর টিকে থাকেনি, এবং এর নেতৃস্থানীয় সদস্যগণ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে যোগদান করেন।

উদ্বোধনী সভায় আমাকে যোগদান করতে হয়েছিল আমার পারিবারিক জীবনের এক মর্মান্তিক শোক ছায়ার মধ্যে। ২৬শে জুলাই তারিখে সকাল ১১ টার সময় আমার পুত্র মারা যায়। আমার মনে একটা ধারণা ছিল যে সভার কাজ নিবিঘ্নে চলবে না, সংস্থা গঠনের প্রস্তাবে বিরোধিতা আসবে। আমার ব্যক্তিগত শোক সত্ত্বেও আমার স্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন নিয়ে আমি মনকে দৃঢ় করলাম এবং স্থির করলাম যে উদ্বোধনী সভানুষ্ঠানে যোগদান করব। সভায় আমার এই শোকের কথা কেউ জানতেন না, যদিও পরের দিন সে কথা ব্যাপকভাবে সকলে জানতে পারলেন। গভীর শোকের মধ্যেও আমার জন-জীবনের স্বার্থ বিজড়িত কর্তব্য পালনের ঘটনা একমাত্র এইটিই নয়। আমার প্রিয়তমা পত্নী পরলোক গমন করেন ১৯১১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। তারপরেই ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে সেই বছরের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভায় যোগদান করি, এবং পণ্ডিত বিষেণ নারায়ণ ধরকে সভাপতি পদে নির্বাচিত করার প্রস্তাব যে ভদ্রলোকের উত্থাপন করার কথা ছিল তিনি উপস্থিত না থাকায় সে কর্তব্য আমাকেই সম্পাদন করতে হয়েছিল। আমার কিন্তু পণ্ডিত বিষেণ নারায়ণের কর্মজীবন সম্পর্কে মোটামুটি একটা সাধারণ ধারণার চেয়ে বেশী কিছু জানা ছিলনা।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বাস্তবিকই একটা বড় রকমের অভাব পূরণ করল। সমিতি দ্রুত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ-ভাবনার উপর আলোকপাত করা এবং শিক্ষিত বাঙালীদের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণের মিলনকেন্দ্র রূপে উঠল। মিঃ আনন্দমোহন বোস সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। আর অক্ষয়কুমার সরকারকে নিযুক্ত করা হল সহকারী সম্পাদক রূপে। অক্ষয়বাবু ইতিমধ্যেই বাঙালী লেখক হিসাবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন, আমি নিজে কোন পদ

গ্রহণ করিনি। তবে আমি সমিতির মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশী সক্রিয় সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। সরকারী চাকরী থেকে আমাকে বরখাস্ত করার জন্য আমি নিজেকে পিছনেই রাখতাম। তবে খুব উৎসাহের সঙ্গেই সমিতির জন্য কাজ করে গিয়েছি। এর চেয়ে বড় আনন্দের বিষয় বা কর্তব্য আমার কাছে আর কিছু ছিলনা। সেই উষাকালে যে মহান আদর্শ আমার মনকে অধিকার করে বসেছিল তা এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই আমি লাভ করতে পারব বলে মনে করতাম সে আদর্শ কি ছিল তা এই ভাবে বুঝিয়ে বলা যায় :— ১) দেশের মধ্যে জনমত গঠনের জন্য একটি শক্তিশালী সংস্থা গঠন ২) সর্বজন পোষিত একটি মাত্র রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা, ৩) হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন এবং সর্বশেষে তৎকালীন বড় বড় গণ-আন্দোলনের মধ্যে দেশের জন সাধারণকে টেনে আনা। এই আদর্শের জন্যই আমি কাজ করেছি, আরও অনেকে করেছেন, কারণ, এই আদর্শ তখন গড়ে উঠেছিল এবং প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ও স্বদেশ প্রেমিক ভারতীয়ের কাছে তা এক সম্পদের অধিকার রূপে দেখা দিয়েছিল; আজ এই প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তা অর্জিত না হয়ে থাকে, তা হলেও আমার এই আত্মপ্রসাদ আছে যে তা এক নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যেই লাভ হবে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রকৃত পক্ষে এই আদর্শকে উজ্জীবন রাখতে সহায়তা করেছে। অতীতের মনীষীদের সাধনার সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপেই সেই আদর্শ দেখা দেয়। আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাধারার সঙ্গে পাশ্চাত্যের চিন্তা ও কর্মের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে যে পরিবেশ রচিত হয়েছে তারই মধ্যে সে আদর্শ গড়ে ওঠে।

ম্যাজিনির রচনাবলী আমার মনের উপরে গভীর রেখা পাত করেছে। তাঁর স্বদেশ প্রেমের পবিত্রতা, উচ্চ আদর্শ, সর্ব বিস্তারী মানব প্রগতি, যা তিনি তাঁর অন্তরের গভীর আবেগ নিয়ে হৃদয় গ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করেছেন, আমাকে এমন ভাবে নাড়া দেয় যে আমি ইতি পূর্বে সে রকম আলোড়ন আর কখনই অনুভব করিনি। আমি তাঁর বিপ্লবাত্মক শিক্ষাকে বর্জন করেছি, কারণ ভারতীয় পরিবেশে তা উপযোগী নয় এবং শান্তি পূর্ণ নিয়ম শৃঙ্খলার পথে স্বাভাবিক ক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে তা হানিকর। কিন্তু তাঁর শিক্ষার আর একটা দিক আছে। তিনি ছিলেন পরার্থে উৎসর্গীকৃত এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন স্বদেশ প্রেমের এক অতি উচ্চ দৃষ্টান্ত, ত্যাগ এবং মানবতার পূজারী, তাঁর জীবনের এই চির কালীন শিক্ষার দিকটা আমি আমার সমস্ত সাধনা ও শক্তি দিয়ে গ্রহণ করেছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে উচ্চতম নৈতিক আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ, ইটালীর ঐক্য স্থাপয়িতা, মানব প্রেমিক এই ম্যাজিনিকেই আমি বাংলার যুব সমাজের কাছে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করেছি। ম্যাজিনি ইটালীতে যা তাঁর ঐক্য শিক্ষা দিয়েছেন। আমরাও চাই সমগ্র ভারতবাসীকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে। বাংলার যুবকদের নিজেদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করে স্বদেশের মুক্তির জন্য নিজেদের উপযোগী করে গড়ে তুলতেই আমি চেয়েছি। কিন্তু তা হবে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি নিষ্ঠা রেখে। ম্যাজিনি সম্পর্কে আমি তাদের কাছে বক্তৃতা করেছি। কিন্তু বিপ্লবাত্মক লক্ষ্যকে পরিহার করেই তাঁকে গ্রহণ করতে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছি। তাঁর আত্মত্যাগের আদর্শকেও গঠন তান্ত্রিক ক্রম বিকাশ পদ্ধতিকেই অবলম্বন করতে বলেছি। খ্যাতনামা বাঙ্গালী লেখক বাবু যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ এবং বাবু রজনী কান্তগুপ্তকে আমার বক্তৃতার সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ম্যাজিনির জীবনী ও কীর্তি আমাদের নিজেদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে বলি যাতে, যারা ইংরেজী জানেন না তারাও সহজে ম্যাজিনি সম্পর্কে জানতে পারেন। অনতিবিলম্বেই আমি ম্যাজিনিকে বাংলার তরুণদের নিকট জনপ্রিয় করে তুললাম, এর পরিণতিতে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেনি; কারণ যে অবস্থার মধ্যে বৈপ্লবিক স্পৃহা জাগ্রত হয় সে অবস্থা তখন এদেশে ছিলনা। বিপ্লবের পরিবেশ সরকারই রচনা করে যারা যুগের

(এর পর ১১ পাতায় দেখুন)

(contd. from 2nd. cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—Calcutta		
	Widows' & Unmarried Daughter' Pension		
Choudhury Smt. Nilima	5/2, Dakshinpara Rd., Cal-28.	150	1. 4. 77
Wd./L. Sripati Chondhury			
Daw Smt. Minati	1/1B, Kali Prasanna Nyayaratna Lane, Cal-36.	100	11. 7. 77
D/o. L. Menoka Bala Daw & L. Phani Bhusan Daw			
Dutta Smt, Champaklata	62, Ram Dulal Sarkar St.. Cal-6.	150	13. 8. 75
Wd./L. Bhuban Behari Dutta			
Goswami Smt. Anjana	Baithakkhana Rd , Cal-9.	200	20. 5. 77
Wd./L. Pran Ballav			
Nag Smt. Maya	2/11, Adarsha Pally, Cal-40.	100	4. 8. 77
Wd./L. Makhanlal Nag			
Sarkar Smt. Mukti Rani	1, Narikelbagan, Cal-32.	200	10. 9. 77
Wd./L. Sudhir Ch. Sarkar			
Kundu Smt. Bimala	5, Sarat Ghosh Garden Lane, Cal-31.	100	1. 10. 76
Wd./L. Ramlal Kundu			
	AMENDED CASES		
Bhattacharya Shyamapada	3/32, Bagha Jatin Colony, Cal-32.	200	13. 9. 73
Dasgupta Debendrajit	30, Nepal Bhattacharya St., 1st. Lane, Cal-26.	200	6. 9, 75
Ganguli Probodh Kumar	33/48, Nobin Ch. Das Rd., Cal-50.	250	10. 12. 76
Home Roy Sourindra Kishore	50, Debinibas, Cal-28.	200	20. 9. 73
Nandi Kanailal & Smt. Suniti	65/6, College St., Cal-12.	400	1. 1. 78
	NEW SANCTION		
Chatterjee Santosh Kumar	10, New Parnasree Rd., Cal-60.	200	17. 11. 77

(contd. on 3rd. cover)

(contd. from page 16)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—Calcutta		
	NEW SANCTION		
Birendra Nath Ghosh	23E, Nakjala Lane, Cal-47.	200	3. 1. 78
Aich Bhowmik Smt. Jyotsna	244/E, Vivekananda Rd., Cal-6.	100	1. 10. 76
Wd./L. Dibyendra Sekhar	2nd. Floor		
Banerjee Chitta Ranjan	100/3, Jessore Rd., Cal-28	200	
Banerjee Smt. Benoy Bala	19, Prasanna Kumar St., Cal-6.	400	1. 1. 78
& Shri Girindra Mohan			
Banerjee Santosh Kumar	16A, Picnic Garden 3rd. Lane, Cal-39.	200	1. 10. 76
Basu Smt. Rani	Jadavpur T. B. Hospital, Cal-32.	40	
Wd./L. Mukunda Lal			
Basu Satya Ranjan	43, Mohendra Ch. Garden Rd. Cal-40.	200	
Bera Smt. Gouri	1, Brindaban Ghosh Lane, Cal-2.	150	21. 11. 77
Wd./L. Sital Chandra Bera			
Bhattacharya Jagadish Chandra	51/1B, Prince Golam Hossain Saha Rd., Cal-32.	200	1. 10. 76
Bhattacharya Pulin Behari	21/55, Canal East Rd., Cal-67.	200	,,
Bhowmik Manindra Kumar	Mahajatinagar, Block-III, Cal-51.	200	
Biswas Amulya Kumar,	38, Dr. Nilmoni Sarkar Rd., Cal-50.	200	,,
Biswas Bimal Kumar	14/D, Jaymuddin Mistry Lane, Cal-27.	200	
Biswas Thako Prasad,	45, Satish Mukharjee Rd., Cal-26.	200	
Chakrabortty Jitenera Nath	Subhas Palli, Nimta, Cal-49.	150	,,
Chakraborty Smt. Manorama	L/106, Netaji Colony, Cal-50,	150	27. 12. 77
Wd./L. Madhusudan			
Chakrabortty Nalini Kanta	1/72, Ghosh Bagan Lane, Cal-2.	200	1. 10. 76

(ক্রমশঃ)

Regd No. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

e/3k

4 APR 1979

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

— সম্পাদক মণ্ডলী —
[illegible] (সভাপতি) শ্রীসুশীল চ্যাটার্জী, শ্রীনারায়ণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীসাতি গোপাল রায়চৌধুরী
বিধায়ক বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীঅরবীন ঘোষ। ম্যানেজার—শ্রীনগেন্দ্রগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবীরেন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বন্ধুরাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৩৮৪ ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৮	২৭ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

এই সংখ্যায়

ওরা বেরিয়ে পড়েছে
শ্রীমতী তুলসী সেন

সংহতি ও স্বাতন্ত্র্য
। শ্রীপ্রবোধ মজুমদার

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে
জনমানসে পৌঁছাতে হবে
। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দাস

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

রাজনৈতিক পেন্সান মঞ্জুরীর তালিকা

ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই।

—বঙ্কিমচন্দ্র

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt. –Calcutta		
Chakravarty Smt. Ramprova w/o Late Manmath Nath	19, Mansatala Row, Kidderpore Calcutta-23	200	24-8-77
Chatterjee Purna Chandra	24/3B, Ramesh Mitra Road Calcutta-25	200	1-10-76
Chatterjee Rabin	58/1G, Raja Dinendra Street Calcutta-6	125	
Chaudhury Amulya Bhusan	46, Durga Charan Mitra Street Calcutta-6	170	
Chaudhury Smt. Basanti w/o Late Sukhendu Bikas	10/16, Netaji Nagar] Cal-40	100	17-5-77
Chaudhury Jadav Chandra	65A, Sova Bazar Street Calcutta-5	200	1-10-76
Das Chitta Ranjan	2/4, Mall Road, Calcutta-28	160	
Das Debendra Nath	22/2, Sahapur Refugee Camp Calcutta-53	160	
Das Gouranga Chandra	36A, Muraripukur Road. Calcutta-4	170	
Das Surendra Nath	Block H-15, New Alipore Calcutta-53	150	
Das Prankumar	'Shilpa Kutir' 49A, Kali Temple Road, Calcutta.26	170	
Das Gupta Amuly Ranjan	91/9 Bosepukur Road, Cal-42	200	"
Dastidar Dhirendralal	Basudebpur, Deshapriyanagar Calcutta-56	175	
Datta Ajit Kumar	52/1, Regent Colony, Cal-40	165	
Datta Arabinda	7, Kamalpur Colony, West Calcutta-28	165	

(contd. on 3rd cover)

ওরা বেরিয়ে পড়েছে

—সত্যভূষণ সেন

গ্রেপ্তার করবার সময় ছেড়ে দেখেন নি। পেটটায় এমনই তপ্ত সেঁকে দেওয়া হয়েছিল যে প্লেনের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে পৌঁছে দিয়ে এলেন নিরাপদ আশ্রয়ে। পৌঁছে দিয়ে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, সোৎসাহে প্রস্তাব করলেন সরকার। —যে বেরিয়ে পড়েছে তার পথ রোধ করবে কে?

ঘটনাটা ঘটেছিল ৭৭ এর জানুয়ারীতে।—লাল রং এর একখানা বেনৌ সিক্সটীন গাড়ী ছুটে চলেছিল প্যারিসের এয়ার পোর্টের দিকে। সামনে পেছনে পুলিশের মোটর সাইকেল পাহারা, ভেতরে একজন দীর্ঘদেহ পুরুষ। তার চোখে সোনার চশমা, একজোড়া গোঁফ ঝুলে পড়েছে। চেষ্টা কিছু কম করেন নি পুলিশের বড়কর্তা, আইন মাফিক বিচার করে মানুষটিকে ঝুলিয়ে দিতে। তা, সব সময় কি আইন মানতে গেলে চলে; নইলে পশ্চিম জার্মানীও এই মানুষটির Extradition দাবি করেছিল। সেখানে তার বিরুদ্ধে ১২টি হত্যার মামলা, ১১টি বোমেজ নেওয়ার চার্জ আর একটি বোমা বিস্ফোরণের দায়িত্ব, এতগুলি মামলা ঝুলছে। ইজরায়েল সরকার Extradition চেয়েছিল; সেখানেও তখন খানেক ঐ জাতীয় মামলা। তবু ফরাসী সরকার নিজেরাও বিচার করলেন না, ওদের হাতেও অর্পণ করলেন না আসামীকে। 'তুরন্ত' পুলিশ প্রহরায় নিরাপদ আশ্রয়ে নির্বাসিত করলেন। দেশে দেশে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠলো। পশ্চিমী দুনিয়া আরব বিমান ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে লড়বে কি করে, খোদ ফরাসী সরকারই যদি ওদের সাহায্য করেন?

আসল ঘটনার যবনিকা উঠেছিল ২১শে আগষ্ট ৭২ সালে। ভালগাছের মত রোগা লম্বা একটি পুরুষ মিউনিক এলেন। পশ্চিম জার্মানীর কারখানায় কারখানায় তখন অতিথি বিদেশী কারিগরদের সমাবেশ, তদুপরি লক্ষ লক্ষ দর্শক সমবেত হয়েছেন অলিম্পিক খেলা দেখবার জন্য। সেই ভিড়ে হারিয়ে গেলেন পুরুষটি, একটি ছোট বাসবহুল হোটেলে নাম রেজিস্টারী করলেন। নামটা ভুল, পাসপোর্টও ভুয়া। আসল নাম আবু দাউদ, বয়স ৩৬। আরব মুক্তি যোদ্ধাদের সর্বস্বীকৃত প্রতিনিধি, 'আলফতে'র কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য। এবং 'আলফতে'র গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী বাহিনী 'কালো সেপ্টেম্বরী'দের নেতা।

১৯৬৯ সালে, জেরুজালেমের এই বাস্তুহারা শিক্ষক 'আলফতে' দলে যোগ দেন। শান্ত স্বভাবের মানুষ, কথা বলেন কম। বিশেষত্বও কিছু চোখে পড়েনি কারও। অন্ততঃ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গেরিলা নায়করূপে স্বীকৃত হওয়ার মত কোন গুনই দেখা যায় নি। তবে মাথাটা ছিল পরিষ্কার, পরিশ্রমও করতেন অসাধারণ। নিজে আরামের স্বাদ চান না, ছাত্রদেরও আরাম করতে দিতেন না।—"আরাম যদি চাও কেরানীর কাজ নেও। গেরিলার জীবন তোমার জন্য নয়। গেরিলার জীবন হবে তপস্বীর জীবন; সবরকম কোমলতা বিসর্জন দিয়ে একটা মিশন নিয়ে বাঁচতে হবে। যদি চাও, এসো, আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো"—এই মানুষটির উপর ভার পড়েছিল 'আলফতে'র intelligence ও Counter-intelligence বিভাগ গড়ে তুলবার। আবু তার সংগঠনে রিক্রুট নিতেন খুব বাছাই করে। নিজের মাথা ছিল পরিষ্কার, কাজে নামলে বাধা কি কি আসতে পারে ভাবতেন, প্রতিবিধান কি হতে পারে চিন্তা করতেন। নিরলস ট্রেনিং দিয়ে প্রত্যেকটি ছেলেকে নিখুঁত করে, তবে কাজে নামতে দিতেন।

বাস করত জর্ডন রাজ্যে, কিন্তু গেরিলারা নিজেদের জন্য শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেছিল। তাদের পুলিশ শান্তিরক্ষা করত, তাদের কোর্টে বিচার হত, অপরাধীর শাস্তিও দিত নিজেরাই। গেরিলা ক্যাম্প তো যুদ্ধক্ষেত্র, জীবন মরণ নিয়ে খেলা। জর্ডনের বাদশা হুসেনের আইন সেখানে চলত না।—এই নিয়ে খিটি মিটি বেধে উঠল; শেষে সেপ্টেম্বর মাসের তমসাচ্ছন্ন রজনীতে বাদশার বেদুইন ফৌজ আক্রমণ করল গেরিলাদের। হাজার হাজার গেরিলা নিহত হল, অবশিষ্ট যারা রইল নির্বাসিত হল জর্ডন রাজ্য থেকে। নেমে এল অন্ধকার। বিপাকের রজনীর বিভীষিকার পরে ওদের জন্য কোন শুভ্র উষার শুকতারা রইল না। প্রতিজ্ঞা করলেন 'আলফতে' নেতৃবৃন্দ, এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিহিংসা নিবেন। চাই উপযুক্ত বদলা। গঠিত হল, 'আলফতে'র প্রথম সন্ত্রাসবাদী শাখা, কালো সেপ্টেম্বরী দল।

মাস দুইয়েক পরে রয়া নবেম্বর, সেপ্টেম্বরীদের হাতে প্রথম বলি হলেন জর্ডনের প্রধানমন্ত্রী ওসফি টেল;

কায়রোর এক হোটেলে নিহত হলেন। তার পর সুরু হল পঞ্চমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গুপ্ত সংগ্রাম। যাদের তত্ত্বাবধান ও নির্দ্দেশে জর্ডনের রাজা গেরিলাদের আক্রমণ করেছিলেন, তাদের দেশেই সুরু হল নরহত্যা, বিমান ছিনতাই সাবোটাজ; ঘটনার পর ঘটনা। প্রত্যেকটি আক্রমণ সফল, প্রতিটি ঘটনা আবুদাউদের পরিকল্পনা ও নির্দ্দেশনার ফল।

একবছর পরে, কালো সেপ্‌টেম্বর দিবসের বার্ষিক তিথিতে, আবু মিঃ মিউনিক পৌঁছলেন, সেপ্‌টেম্বরীদের সব চেয়ে বড় আঘাতের পরিকল্পনা নিয়ে। হোটেলে বসে পরিচালিত করলেন ৮ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে। ৪ঠা সেপ্‌টেম্বর বিকালে, অলিম্পিক ক্রীড়াবিদের মত 'সোয়েটের সুট পরে, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও হাতবোমা নিয়ে, তারা ট্যাক্সি করে পৌঁছে গেল ইহুদী ক্রীড়াবিদদের বাড়ীর কাছে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে। পরদিন ভোর চারটাতে ইহুদীদের কোচ এর ঘুম ভেঙ্গে গেল দরজার দুম দাম শব্দে।—"এখানে কি ইহুদী ক্রীড়াবিদরা থাকেন? জার্মান ভাষায় এই প্রশ্ন শুনে তিনি দরজা একটু ফাঁক করলেন, তৎক্ষণাৎ বিপদের আভাষ পেয়ে দরজা বন্ধ করতে না করতে গেরিলাদের রাইফেলের গুলিতে প্রাণ হারালেন। নিহত হলেন রেফারিও চ্যাম্পিয়নও। পনের জন ক্রীড়াবিদ পলায়নে সক্ষম হলেন। বন্দী হলেন নয়জন। এক পল্টন জার্মান পুলিশ বাড়ীটি ঘিরে ফেলল। গেরিলারা ইহুদী ক্রীড়াবিদদের প্রাণের বিনিময়ে, ইজরায়েলে যে ২০০ জন গেরিলা বন্দী আছে তাদের মুক্তি দাবি করলেন। ইজরায়েল সে দাবি অগ্রাহ্য করল; আলোচনা চলতে লাগল জার্মান সরকার ও গেরিলাদের মধ্যে। যে T. V বসানো হয়েছিল অলিম্পিক খেলা দেখাবার জন্য, বিশ্বের মানুষ সেই T v তে এই নিদারুণ নাটকীয় ঘটনাবলীর মূক দেখতে লাগল কম্পমানে।

শেষটায় জার্মান সরকার এক ফন্দী বের করলেন। বন্দীদের নিয়ে গেরিলারা যাতে যে কোন দেশে চলে যেতে পারেন, তার সুযোগ দিতে রাজি হলেন। সন্ধ্যার সময় দুখানা হেলিকপটারে উঠে গেরিলাদল বন্দীদের নিয়ে মিলিটারী বিমানবন্দরে গেলেন। সেখানে একখানা লুফ্‌থান্সা প্লেন আলাদা নিয়ে তৈয়ারী ছিল। হেলিকপটার থেকে লুফ্‌থান্সায় উঠতে যাচ্ছেন গেরিলারা এমন সময় অন্তরাল থেকে sharp shooter দল গুলি চালাল। দুজন গেরিলা নিহত হতে না হতে, গেরিলাদের গ্রেনেডের ঘায়ে বন্দীরা একজনেই নিহত হলেন। সেই ধ্বস্তাধ্বস্তিতে মোট পাঁচজন গেরিলা নিহত ও তিন জন বন্দী হলেন। নিহত একজনের কাছে আবু দাউদের হোটেলের ঠিকানা ছিল। পুলিশ যখন পৌঁছালো তখন পাখী উড়ে গেছে।

মিউনিক অভিযানের শেষটুকু শুনতে বাকি। বন্দী তিনজন গেরিলাকে মুক্ত করা। সহজেই কাজটা সমাধা হল। লাইব্রাসের আকাশে ১১জন যাত্রী ও বিমানকর্মী সহ একখানা লুফ্‌থান্সা বিমান ছিনতাই হল। আবু দাউদ বন্দী তিনজনের মুক্তি দাবি করলেন। এবার জার্মান সরকার বিনা প্রতিবাদে দাবি মেনে নিলেন। মিউনিক পর্বের অবসান হল।

এরপর বহুদিন আর এই আরবদেশের তালগাছটির দেখা পাওয়া যায় নি। হঠাৎ একদিন শোনা গেল জর্ডনের রাজধানী আম্মান শহরে বন্দী হয়েছেন আবু দাউদ। সৌদী আরবীয় আল্‌খা ও শিরস্ত্রাণে সজ্জিত, ছদ্মবেশে কোন ত্রুটি ছিল না। স্ত্রী পরিচয়ে একটি বোরখাপরা মেয়ের সঙ্গে ট্যাক্সি করে যাচ্ছিলেন, সন্দেহ করবার কোন কারণ ছিল না। পথের মোড়ে মোড়ে সৈন্যদলের পিকেট, ফটিন মাফিক নাম-কা-ওয়াস্তে সার্চ্চ করছিল, ধরা পড়ার কোন কথা নয়। মেয়েটি গাড়ী থেকে নামতে বৈকল্যে বোরখার পা আটকে পড়ে যায়, আর পিস্তলটি বেরিয়ে পড়ে! ধরা পড়লেন দুজনেই। —আরবদেশের পুলিশ, সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অভিনব এক পদ্ধতিতে, পেটের কথা বের না করে ছাড়ে না। নইলে দাউদের মত লোহার মানুষও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে জর্ডনের মন্ত্রীপরিষদের আগামী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে, ২০ জন সঙ্গী নিয়ে হানা দেওয়ার একটা পরিকল্পনার রূপ দেওয়ার জন্যই তিনি আম্মানে এসেছেন। উদ্দেশ্য ছিল যে পঞ্চাশ জন 'আলফতে'র সদস্য জর্ডনে বন্দী আছেন তাঁদের মুক্ত করা।

আবু দাউদ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। তাঁর মুক্তির জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখল 'আল ফতে'। হয়ত তারা দাউদের স্বীকারোক্তির কথা জানতে পারে নি, কিম্বা সেটাতে কোন গুরুত্ব দেয় নি। স্বীকারোক্তি যদি দিয়েই

থাকেন বাদুড়, দলের সকলের নামও যদি প্রকাশ করে থাকেন, নিপীড়নটাও তাঁর উপরে নিশ্চয়ই সেই রকম কঠোরই হয়েছিল। দাউদের উপর তারা বিশ্বাস হারায় নি।...অকস্মাৎ একদল গেরিলা হানা দিল সাউদী আরবের পার্টুমের দূতাবাসে। ডোজ সভা থেকে দুজন আমেরিকান ও একজন বেলজিয়ান রাষ্ট্রদূতকে অপহরণ করল। মুক্তি পণ দাবি করল আবু দাউদ ও রবার্ট কেনেডির হত্যাকারী সিরহানের মুক্তি। শেষটায় দাবি কমিয়ে এনে শুধুমাত্র আবু দাউদের মুক্তি চাইল। জর্ডনের বাদশা সেই দাবিও অগ্রাহ্য করলেন। তখন দূতাবাসের সেলারে নিয়ে গিয়ে বন্দী তিনজনকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করল গেরিলাদল। তারপর আত্ম সমর্পন করল।... একজন সেপ্টেম্বরী মুখপাত্র বিবৃতি দিলেন—আশা করছি ভবিষ্যতে আমাদের দাবিগুলির যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হবে।

আবু দাউদকে মুক্ত করার দ্বিতীয় চেষ্টা হয় মিউনিকের ঠিক এক বছর পরে। এবারেও সাউদী আরব দূতাবাস আক্রান্ত হল; আক্রান্ত হল প্যারিসের দূতাবাস। ১৩জন সাউদী দূতাবাস কর্মচারীকে বন্দী করে, মুক্তিপণ চাওয়া হল দাউদের মুক্তি। এবারও জর্ডন সরকার রাজী হলেন না। কিন্তু গেরিলারাই এবার নরম হল, বন্দীদের কোন ক্ষতি না করেই মুক্তি দান করে চলে গেল।

এর পর অকস্মাৎ আরব রাজনীতির মোড় ঘুরে গেল। ৭০ সালের ইমকিপুর লড়াই সুরু হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বাদশা হোসেন আবু দাউদ সহ জর্ডনে আবদ্ধ আল-ফতে বন্দীদের বিনাসর্তে মুক্তি দিয়ে দিলেন। যদিও তখন পর্য্যন্ত কাগজে কলমে 'আল-ফতে'র মৃত্যু তালিকায় প্রথম নামটি ছিল জর্ডনের বাদশা হুসেনের। ...যারা মনে করেছিলেন কালো সেপ্টেম্বরীরা এবার দাউদকে হাতের মধ্যে পেয়েছে, কঠোর শাস্তিই দেবে, তারাও ভুল করেছিলেন। সেখানেও যখন গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল, তখন ফিলিস্তিনি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন আবু দাউদ। মিউনিকের সকল অভিযানের নায়কের চেয়ে জনপ্রিয় মুক্তিযোদ্ধা নেতা দ্বিতীয় একজন ছিলো না।

৭১ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত আবু দাউদ পশ্চিম এসিয়াতেই ব্যস্ত ছিলেন। এর পর হঠাৎ প্যারিস চলে গেলেন। মিউনিকের পাঁচবছর পরে এই প্রথম ইউরোপে পদার্পন। মহম্মদ সালে নামে একজন নেতৃস্থানীয় 'সেপ্টেম্বরী' প্যারিসে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। তারই শেষকৃত্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দুজনকে পাঠানো হয় বেইরুট থেকে। একজন আবু দাউদ। সম্ভবতঃ তাঁকে পাঠানোর প্রকৃত কারণ, 'সালের মৃত্যুর উপযুক্ত বদলা নেওয়ার পরিকল্পনা রচনা। সে যাই হোক, বেইরুটের ফরাসী গুপ্ত চরের কাছ থেকে সংবাদ আসে প্যারিসে। প্যারিস পৌঁছবার দুদিন পরে আবু গ্রেপ্তার হন।

তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ সমগ্র বিশ্বের সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় হেড লাইন সৃষ্টি করল। দাদ্দা প্রধান যা আছে, তাতে তাঁর কি শাস্তি হতে পারে সে বিষয়ে কারও মনে সন্দেহ ছিল না। পশ্চিমী দুনিয়া একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলেন, যাক্ এতদিনে বিমান ছিনতাই থামবে।

কিন্তু মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট গিসকার্ড [Giscard]। আবু দাউদের বিচারের আয়োজন করলে কিম্বা বিচারের জন্য Extradition এ সম্মতি দিলে, সমগ্র আরব দুনিয়ার রোষবহ্নি পড়বে ফ্রান্সের উপর। অথচ ফ্রান্স আরব দুনিয়া থেকে তেল আমদানী করেই বেঁচে আছে। সেই তেলের দাম বছরে ৪,৫০০ কোটি টাকা, দামটা মিটিয়ে দেয় নগদে নয়, জিনিষপত্র রপ্তানী করে। সেগুলো বিক্রি না হলে ফ্রান্সের সমগ্র অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। ফরাসী বিমান সস্তা এয়ার-ফ্রান্স দেশে দেশে উড়ে বেড়ায় আর টাকা কামায়। বিদেশের দূতাবাসে ফরাসী কর্মীরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। এবের স্বচ্ছন্দ গতি এক মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে, যদি আবু দাউদের কোন ক্ষতি হয়। —না, আরব গেরিলার ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতে পারে না ফ্রান্স। দাউদকে নির্বাসিত করাই নিরাপদ। তাকে টিউনিসিয়ায় নির্ব্বাসিত করলেন ফরাসী সরকার।

এরপর মাত্র একবার দেখা গেছে আবু দাউদকে। তখন তিনি মিশর সরকারের সম্মানীত অতিথি। তিনি বললেন, 'আমরা বেরিয়ে পড়েছি, সামনে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।' —তাঁর ললাটে জ্বলছিল মরুভূমির ভোরের আলো, পেছনে বাতায়নে পড়েছিল সুর্যাস্তাকা কালো চোখের মিনতি, নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরেছিল পথ, হুতাশের তালে তালে বাজছিল জয়ভেরী।

সংহতি ও স্বাতন্ত্র্য

—সুবোধ মজুমদার

(দুই)

অতিকেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা, অতিকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, অতিকেন্দ্রিক আবাসন ব্যবস্থা সবকিছুই হচ্ছে পাপাশ্রয়ী জীবনযাত্রার একান্ত অনুকূল। বিশাল রাষ্ট্রে, বিশাল কারখানায় আর বিশাল নগরে অপরকে শোষণ ও পেষণ করার স্বর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়। এককথায়, অতি-কেন্দ্রিক বিশাল রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য সাথী হচ্ছে বিরাট কারখানা ও জনাকীর্ণ মহানগরী, আর তাদের অবিচ্ছেদ্য সাথী হচ্ছে—অসম ধনবণ্টন, অনুৎপাদক উপার্জন, দুর্নীতি-ময় প্রশাসন, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, সামাজিক অবিচার, আঞ্চলিক অসংহতি, গৃহহীন নাগরিক প্রভৃতি অবাঞ্ছিত জিনিস। সর্বোপরি, অতিকেন্দ্রিকতা হচ্ছে মানবিকতার চিরশত্রু। সততা, সহনশীলতা, স্নেহ, মমতা, সংযম, তিতিক্ষা, ত্যাগ, উদারতা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলি কিছুতেই থাকতে পারে না অতিকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায়।

প্রথমতঃ আমরা দেখি অতিকেন্দ্রিক বিশাল রাষ্ট্রে কয়েকজন মাত্র লোক থাকে অতি-ধনবান, অতি-শক্তিমান ও অতি-খ্যাতিমান, আর অগণিত জনসাধারণ থাকে অতি-দরিদ্র, অতি-দুর্বল ও অতি-নগণ্য। অল্প কয়েকটা মহানগরীতে কেন্দ্রীভূত হয় বিশাল দেশের অধিকাংশ সম্পদ, আর সেই সম্পদের মালিক হয় অল্প কয়েকজন লোক। এই মুষ্টিমেয় অতিধনীরা নির্বাচন-কালে অর্থ সাহায্য দিয়ে নিজেদের অধীনে রাখে শাসক-শ্রেণীকে। ফলে রাষ্ট্রীয় আইনকে তারা ব্যবহার করে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো।

অতিধনীরা মহাভারতের পঞ্চান্ন কোটি অধিবাসীকে শুষে, পিষে, ঠকিয়ে স্ফীত করে নিজেদের কোষাগারকে। সেই বিপুল ধন তারা ব্যবহার করে বিলাসবহুল ব্যভিচার-পঙ্কিল জীবন যাপনে। অবশ্য আরও বেশকিছু লোক সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করে এদের ব্যভিচারী মানুষদের সহায়ক রূপে। তাদের অধোপার্জন হয় সম্পূর্ণ অনুৎ-পাদক। সেবা বা দ্রব্য কোনো কিছু উৎপাদন না করেই বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তারা। তার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে সারা দেশময়। দরিদ্ররা হয়ে যায় আরও দরিদ্র, ধনীরা হয়ে ওঠে আরও ধনী। অর্থের বলে এসব ব্যভিচারী পরগাছা লোকেরা উপভোগ করে বিপুল সামাজিক মর্যাদা। আমলা, উকীল, বিচারক, জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই খুব বিত্তশালী হয় এদের দলভুক্ত হয়ে। তখন কেরানী, দোকানীরাও নিজেদের আয় বাড়াবার জন্য বাধ্য হয় উৎকোচাদি গ্রহণ করতে। ফলে দেশময় বয়ে যায় ব্যভিচার দুর্নীতির বন্যা। বহু অনভিজ্ঞ তরুণ-তরুণী ধনবান ও মর্যাদাবান হওয়ার উদ্দেশ্যে সরল মনে বেছে নেয় এই ব্যভিচার-দুর্নীতিময় পথকে। তখন দেশের জনসাধারণের মধ্যে সংক্রমিত হয় উৎকট একটা ব্যভিচার-দুর্নীতি প্রবণতা। অতিকেন্দ্রিক ভারত-রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ করলেই সূর্যালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এই তত্ত্বটি।

শাসক যখন মনে মনে ইচ্ছে করেন প্রতিদিন তাঁর রূপ ও বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে পত্রের কাগজ, বেতার বার্তা আর দূরদর্শনের মাধ্যমে তাহলে অতিকেন্দ্রিকতার কোনো দোষই ধরা পড়বে না তাঁর চোখে। তিনি যদি চান দরিদ্র দেশবাসীর রক্তশোষা অর্থ দিয়ে সারাবিশ্ব উড়ে বেড়াবেন তাহলে অতিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে সমর্থন ক'রে তিনি যুক্তি দেখাবেন—রাষ্ট্র যত বিকেন্দ্রিত হবে ততই অসংহত ও দুর্বল হবে সেটি। এই যুক্তির বিপরীত ঘটনা-গুলো দেখেও দেখবেন না তিনি।

আমাদের সরকার জানেন কী ক'রে গড়ে উঠছে বিপুল-কায় অট্টালিকাগুলো, কী ক'রে কিছুসংখ্যক লোক অকস্মাৎ হয়ে উঠছে অগাধ সম্পদের মালিক, কী ক'রে একের পর এক আবির্ভূত হচ্ছে তাজমহল—বিনিন্দিত হোটেল গুলি, কাদের—পয়সাই বা রাজকীয় ভাবে চলছে সেগুলি। সরকার জানেন অতিস্ফীত ব্যভিচারী ধনিকরা জাতির সাং-স্কৃতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে নিজেদের পাপপঙ্কিল জীবন-পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে কী ভাবে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে। সরকার জানেন কারা

কেন আই,এ ও বি,এ, পরীক্ষা তুলে দিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী ও ডিগ্রী কোর্স প্রথা প্রবর্তিত করেছিল, এখন আবার তাও তুলে দিয়ে এগার-বার ক্লাসে প্রবর্তন করেছে। কারা আমলা কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে পরীক্ষা-গুলি পণ্ড ক'রে তরুণ-তরুণীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে তাও জানেন সরকার। কারা কেন কীভাবে অশ্লীল বই ও ছবিগুলি আমদানী ক'রে বা তৈরী করিয়ে কলুষিত করছে দেশের নৈতিক আবহাওয়া তা-ও অজানা নয় সরকারের। তথাপি কিছু করতে পারেন না সরকার, কারণ তাঁরা যে শাসনক্ষমতায় আসীন হয়েছেন, এবং ভবিষ্যতে হতে আশা করেন, ব্যভিচারীদেরই আর্থিক সাহায্য দ্বারা পুষ্ট হয়ে।

দ্বিতীয়তঃ অতিকেন্দ্রিক প্রশাসন-ব্যবস্থা, উৎপাদন-ব্যবস্থা ও আবাসন-ব্যবস্থার ফলে সর্বক্ষেত্রেই অসহায় বোধ করে সমষ্টির চাপে। সকল প্রকার কেনা-বেচা, আদান-প্রদানাদি কাজকর্মের মধ্যেই দেখা দেয় দালাল। এসব দালালরা কোনো প্রকার দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন না করেই উপার্জন করে বহু টাকা পয়সা ধনসম্পদ। এদের মাধ্যমেই উৎকোচ গ্রহণ করে আমলারা, ব্যয়বহুল করে তোলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে। জাতীয় মুদ্রা-স্ফীতির মূল কারণই হচ্ছে এই উৎপাদনহীন উপার্জন। এসব জেনেশুনেও সরকার কোনো চেষ্টাই করতে পারেন না প্রতিরোধ করার জন্য।

দেশবাসী জনসাধারণ যাতে ক'রে এসব অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর না হয়ে উঠতে পারে তজ্জন্য নিরক্ষর রাখা হচ্ছে তাদের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দশ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমা-তৎকালীন নেতৃবর্গ। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করার বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা বিগত তিরিশ বছরের মধ্যেও করেননি তাঁরা। সকল দেশবাসী যাতে করে' উৎপাদন-শীল উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করতে পারে তারজন্যও কোনো চেষ্টা করেন নি তাঁরা। শ্রেণী-স্বার্থ উদ্ধারের চাপে প'ড়ে ছোট ছোট উৎপাদন ব্যবস্থা আর ছোট ছোট কুটির-শিল্প ব্যবস্থার কথা ভুলে গিয়ে বড় বড় জাঁকালো সব পরিকল্পনার রূপায়ণে মন দিলেন তাঁরা। টাকার যোগাড় করলেন তাঁরা বেপরোয়া ধার ক'রে আর নোট ছাপিয়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে লাগল অতি দ্রুত গতিতে, আর তারই সঙ্গে তাল রেখে বাড়তে লাগল বেকার আর নিরক্ষরের সংখ্যা।

আমাদের নেতারা যে ইচ্ছে করে দেশের ক্ষতি করলেন তা ঠিক নয় মোটেই। অতিকেন্দ্রিকতার সুখ-স্বপ্নে তাঁরা বিভোর হয়ে ছিলেন ব'লেই ঘটতে লাগল এসব। কোটি কোটি লোক প্রত্যহ তাঁদের নাম খবরের কাগজে পড়ছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাদের বাণী শুনে কৃতার্থ হচ্ছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মাইল ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। নৈশ যাপন করছেন আলো-ঝলমল বিলাসবহুল দশ-বিশতলা প্রাসাদে। হাজার হাজার নরনারী নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত স্তবস্তুতি গুণগান করছে তাঁদের। কল্পনাতীত ঐশ্বর্যের মালিক হচ্ছে তাঁদের আত্মপরিজনরা। আর এসবই সম্ভব হচ্ছে অতিকেন্দ্রিকতার অমোঘ আশীর্বাদে।

অতএব অতিকেন্দ্রিকতার নেশা মদ ও আফিংএর চেয়েও প্রবলভাবে পেয়ে বসেছে আমাদের গণতান্ত্রিক জননেতাদের। সকল দলের সকল নেতাদেরই একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অতিকেন্দ্রিকতার মাধ্যমে বিপুল গর্বের আস্বাদ গ্রহণ করা। বহুলভাবে মাতাল হয়ে মার্ক্সবাদী ভুলে যান মার্ক্সকে, গান্ধীবাদী ভুলে যান গান্ধীকে, সুভাষবাদী ভুলে যান সুভাষকে। মার্ক্সের শ্রমিকবাদ, গান্ধীর বিকেন্দ্রবাদ, সুভাষচন্দ্রের সাম্যবাদ সবকিছু বিস্মৃত হয়ে তাঁরা কায়োমনে আত্মনিয়োগ করেন পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ সুনিশ্চিত করতে।

অতিকেন্দ্রিকতার মহাবিষ পরিহার করতে হলে প্রথমেই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে নির্বাচন-পদ্ধতিতে। ক্ষুদ্রতম অঞ্চল অর্থাৎ একশত ভোটদাতা দল-মত-জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নির্বাচিত করবেন তাঁদের যোগ্যতম প্রতিনিধি। এই রকম একশত জন প্রতিনিধি আবার নির্বাচিত করবেন একটি যোগ্যতম প্রতিনিধি। এরকম

একশত জন প্রতিনিধি আবার নির্বাচন করবেন একজন প্রতিনিধি। এভাবে নির্বাচিত হবে রাজ্য বিধান সভা, এবং রাজ্য বিধানসভার সদস্যরন্দ নির্বাচন করবেন কেন্দ্রীয় বিধান সভার সদস্যরন্দকে। তখন আর কোনো প্রয়োজন-ই থাকবে না রাজ্যসভার।

প্রত্যেকটি বৃহত্তম অঞ্চলে থাকবে একটি সামরিক কৃষি-প্রতিষ্ঠান, কয়েকটি সামরিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান, একটি শিক্ষা-সংস্থা ও একটি স্বাস্থ্য-সংস্থা। এদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে একটি শাসন-পরিষদ। এই পরিষদের থাকবে কিছু আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা, কিছু বিচার ক্ষমতা, কিছু শাসন ক্ষমতা। এরকম কতকগুলি অঞ্চল-পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে বৃহত্তর অঞ্চল পরিষদ। অঞ্চলগুলির পারস্পরিক ব্যাপারে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, বিচার ক্ষমতা ও শাসন ক্ষমতা থাকবে এই বৃহত্তর অঞ্চল-পরিষদের হাতে। এভাবে আঞ্চলিক ক্ষমতা, বিচার ক্ষমতা, আইন ক্ষমতা, ও শাসন ক্ষমতা বন্টিত হতে হতে শেষ অবশিষ্টটুকু যাবে কেন্দ্রের হাতে। কেন্দ্র পরিচালিত হবে অঞ্চল দ্বারা! কোনো দুর্নীতি বা ব্যভিচার চর্চা করার সুযোগ থাকবে না এই কাঠামোর মধ্যে। কোন অনুৎপাদক উপার্জনের অবকাশ থাকবে না এখানে। কুশাসন ও বেকারত্ব প্রবেশই করতে পারবে না এই সহজ স্বচ্ছ পরিবেশের মধ্যে। অসম ধন-বন্টন ও সামাজিক অবিচার নিজে থেকেই বিদায় নেবে এই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে। এটাই হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন পুরুষ শঙ্করাচার্যানুগামী বৈদান্তিক মতাবলম্বী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সাম্যবাদ।

এই সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সময় দেশ হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ নিরাপদ, কারণ প্রত্যেকটি একক বা অঞ্চল মনে করবে কেন্দ্র আমারই সৃষ্টি, আমারই সম্পদ, আমি আর কেন্দ্র অভিন্ন'। কেন্দ্রকে ধ্বংস করার তাঁর ওপর ভয় রয়েছে এরূপ কখনও ভাববে না। বর্তমান অবস্থা ঠিক বিপরীত। নিজেকে শক্তিশালী করতে গিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলছে কেন্দ্র, অঞ্চলগুলোকে করে ফেলছে নিজের শত্রু। কলকাতার শত্রু দিল্লী, আবার কুচবিহারের কলকাতা। বাইরের আক্রমণ দেখা দিলে জনসাধারণ কোনো কর্তব্যের তাগিদ অনুভব করে না দেশ রক্ষা করতে। সরকারী কর্মচারীরাও বোধ করে না দেশ রক্ষা করার জন্য কোনো বিশেষ দায়ীত্ব। কে কত আগে নিরাপদ দূরত্বে পালাবে হড়োহুড়ি পড়ে যায় তার জন্য। চীনা সৈন্য ভারত সীমান্ত অতিক্রম করতে না করতেই তেজপুরের শাসক পালিয়ে এসেছিলেন কর্মস্থান থেকে।

মানব জাতিকে আত্মহনন থেকে রক্ষা করতে হলে আজ না হোক কাল সকল রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা। অন্যান্য রাষ্ট্রকে পথ দেখাবে ভারতবর্ষ। ভারতের কেন্দ্রকে পথ দেখাবে রাজ্যগুলি। এমন দিন আসবে যখন বৈদেশিক আক্রমণ ও মারণাস্ত্র আবিষ্কারের প্রশ্নটা হয়ে যাবে একেবারেই অবান্তর। তখন আঞ্চলিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রগুলিই হবে যাবে সুসংহত।

যকৃতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ একমাত্রার জন্য
প্রতিষ্ঠান: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
[illegible]

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে জনমানসে পৌঁছাতে হবে

— ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারীর জীবনী ও বিপ্লবী কার্য্যাবলী ভিত্তি করে বহু পুস্তক ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তক অবিলম্বে এই মহানায়কের বিপ্লবী বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ণ প্রয়াসের প্রচেষ্টাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

এই দেশে রাসবিহারীর মত একজন লোকের আবির্ভাব বিস্ময়কর। এমন দুর্দম প্রকৃতি যা এতটুকু নোয়াতে পারে নি, এমন উগ্র পুরুষকার যা সকল সিদ্ধ উপেক্ষা করে নিজেকে অব্যাহত রেখেছে, এমন উন্নত শির যা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নি, এমন উৎকট বেগবতী ইচ্ছা যা সর্বদিক দুর্বলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে, পরাধীন ভারতে এমন একটী মানুষের আবির্ভাব ঐতিহাসিক ঘটনা। এই মহানায়ককে বাদ দিয়ে এবং তাঁর বিপ্লব প্রচেষ্টা উপেক্ষা করে ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস হতে পারে না; অথচ স্বাধীন ভারতেও রাসবিহারীর অবদান ঐতিহাসিকদের ও সরকারের দৃষ্টিগোচরে তেমন ভাবে এসেছে বলে মনে হয় না। এটা অত্যন্ত দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়, জাতির বৈপ্লবিক সাধনার প্রতি পদাঘাত।

১৯৪৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রাসবিহারী বসুর মহাপ্রয়াণ। জন্মেছিলেন ১৮৮৬ সালের ২৫শে মে বর্দ্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে। শৈশবেই মাতৃহারা হন। চন্দননগরে বাল্যজীবন ও কৈশোর কাটে। বালক রাসবিহারী চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু অদম্য দেশ-প্রীতির জন্য কলেজ থেকে বিতাড়িত হন এবং কলকাতায় এসে একটী স্কুলে ভর্তি হন। ১৯০৫ সালে সিমলার পিতার অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে দেরাদুনে ফরেষ্ট অফিসে বড়বাবুর চাকরী পেলেন এবং বিদেশী সাহেবদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দিতেন, তখন রাসবিহারীর বয়স মাত্র ২০। রাসবিহারী বসুর ছাত্রজীবনে বিশেষ মেধার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু রাসবিহারী বহু ভারতীয় ও বিদেশী ভাষা ঐ ভাষাভাষী লোকদের মত বলতে পারতেন। জাপানে যাওয়ার জন্য ছদ্ম নামে পাসপোর্ট সংগ্রহের সময় অভ্যর্থনা অফিসার ফরাসী মহিলার সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলে মহিলাকে মুগ্ধ করেছিলেন এবং কাজ হাসিল হয়েছিল। ভারতের যে কোন ভাষায় কথা বলতে রাসবিহারী বসুর কোন প্রকার অসুবিধা হত না। এই অদ্ভুত ক্ষমতা কি করে আয়ত্ত করলেন? তা রাসবিহারীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল, এটা তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

দেরাদুনে যেয়েই লালা হরদয়াল ও ভাইসেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসেন, পরে চন্দননগরের মতিলাল রায় ও অনুশীলন নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। কোন দলই রাসবিহারীকে দলভুক্ত করার চেষ্টা করে নি। রাসবিহারী নিজের প্রচেষ্টায়ই দল খুঁজে নিয়েছেন এবং দলের কর্মীরা রাসবিহারীকে নেতৃত্বে বরণ করে নিয়েছে। রাসবিহারীর নেতৃত্বেই, অনুশীলন সর্বভারতীয় সংস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং বিভিন্ন নামে অনুশীলনের শাখা দুনিয়ার সর্বত্র বিশেষ করে ইউরোপে ও আমেরিকার বিস্তার লাভ করে। নেতৃত্ব দেওয়ার মত বৈশিষ্ট্য রাসবিহারীর ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর নতুন রাজধানী দিল্লীতে রাজকীয় প্রবেশের দিন ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করে রাসবিহারী অতি নিপুণ রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংরেজ প্রশাসনের ভাস্তিকতা চূর্ণ হয়েছিল, সামগ্রিক ভাবে ঝিমিয়ে পড়া বিপ্লবী শক্তির নূতনভাবে স্ফুরণের উৎস সৃষ্টি হয়েছিল।

ইংরেজ সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য

রাসবিহারী বসু দেরাদুনে রাজ কর্মচারীদের সভায় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের নিন্দাসূচক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা শুনে গোয়েন্দা দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুশীল ঘোষ তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য রাসবিহারীকে দীর্ঘ দিনের ছুটি দিয়ে বাংলায় পাঠায়। এই সময় প্রফুল্ল চন্দ্র গাঙ্গুলী ও রাসবিহারী বসু কলিকাতায় একত্র বাস করতেন। প্রফুল্ল চন্দ্র গাঙ্গুলী তখন বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী। দলের নেতৃস্থানীয়দের নিকট গোয়েন্দা বিভাগের খবর সংগ্রহ করে দলকে অভ্যুত্থানের কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করা, নিজের নিরাপত্তার সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা প্রভৃতি সকল দিক লক্ষ্য করে চলার কৃতিত্ব কেবলমাত্র রাসবিহারীর চরিত্রেই দেখা যায়। দলের কর্মীদের রাসবিহারীর নেতৃত্বে ও কর্মক্ষমতায় অগাধ আস্থা থাকার ফলে সেই যুগেও অনুশীলন নেতৃত্ব গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে রাসবিহারীর যোগাযোগ সুনিপুণ হাতে একটি বিপ্লবী কৌশল মনে করতেন, রাসবিহারীর মধ্যে দুর্বলতার কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না নেতাদের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। গোয়েন্দা হেড অফিসে খবর পৌঁছাবার আগেই রাসবিহারী গোয়েন্দা বিভাগের কার্যকলাপ জানার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই হেতু রাসবিহারী হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ পরিকল্পনার নেতা দলের লোক দীননাথের বিশ্বাসঘাতকতায় গোয়েন্দা হেড অফিস জানার আগেই রাসবিহারী জানতে পারেন এবং এমন ভাবে গা ঢাকা দিলেন গোয়েন্দা সুশীল ঘোষ ও তার বিভাগ রাসবিহারীর কোন পাত্তা পেল না। রাসবিহারী সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে অভ্যুত্থানের আয়োজনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করলেন। প্রথম সারির বিপ্লবী নেতারা প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হলেন কিন্তু রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করার জন্য ইংরেজ সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ ও প্রভূত অর্থব্যয় এবং প্রলোভন দেওয়া সত্ত্বেও সমর্থ হয় নি। কখনও কাবুলিওয়ালা, কখনও পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী, কখনও রাজস্থানী জমিদার, কখনও সরকারি কর্মচারির পত্নী, কখনও রেলওয়ে কুলি, কখনও জমাদার, কখনও পূজারী ব্রাহ্মণরূপে রাসবিহারী সকল উত্তর ভারত পর্যটন করে অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে সংগঠন গড়ে তুললেন। পুলিশ সঠিক খবর পেয়ে রাসবিহারী বসু জেনেই গ্রেপ্তার করাতে রাসবিহারীর পোষাক পরিচ্ছদ দেখে এবং কথা শুনে এতটুকু সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ায় ছেড়ে দিয়েছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। এইভাবে বৈপ্লবিক জীবন রক্ষা করে রাসবিহারী যে শিল্পী ও নাট্যকারের এবং উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা যে কোন দেশে বিরল। কেবলমাত্র মহামতি লেনিনের পলাতক জীবনের ছদ্মবেশ সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তীর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ পরিকল্পনার বসন্ত বিশ্বাসকে সংগ্রহ করা, তাঁকে বোমা নিক্ষেপ শিক্ষা দেওয়া, বোমা সংগ্রহ করা, বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারীরূপে নিজের জন্য একটি পরিচয় পত্র সংগ্রহ করা, বোমা নিক্ষেপ সম্পন্ন করে বসন্ত বিশ্বাসকে লাহোর গামী গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে নিজে দেরাদুনে চলে আসা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অদ্ভুত উপস্থিত বুদ্ধি ও বৈপ্লবিক নির্বিকার চিত্তের পরিচয় দিয়েছেন রাসবিহারী বসু। ভারতে বহু বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এমন সুনিপুণ সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে বলে জানা যায় না।

(চলবে)

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

চন্দননগরের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগেই এই দলে যোগ দিয়েছেন। যুগান্তরের লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একদিন তিনি নিজেই এসে কলকাতা যুগান্তর কেন্দ্রে যোগ দেন। উপেন্দ্রনাথের নিকটই বারীন্দ্রকুমার ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষ চারুরায়ের সংবাদ জানতে পারেন। তিনি স্বদেশী সম্পর্কে সহানুভূতিশীল জেনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার মানসে বারীন্দ্রকুমার সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে একদিন চন্দননগরে উপস্থিত হলেন। চারুচন্দ্র এই সময়ে চন্দননগরের তরুণ দলের মনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে ছিলেন চারুবাবুর সঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের দীর্ঘ আলোচনা হল। বারীন্দ্রকুমার নিজের পরিচয় দিয়ে চারুবাবুকে জানালেন যে সমগ্র বাঙলাদেশ ব্যাপী বিরাট বিপ্লবযজ্ঞের আয়োজন চলছে তিনি চারুবাবুকে এই যজ্ঞের একজন হোতার আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন চারুবাবু স্বীকৃত হলেন এবং এইভাবে চন্দননগরে বিপ্লব সংহতির সূত্রপাত হল উকীল বনমালীসেন পুলিশ কোতোয়াল ক্ষুদিরাম কোলে, একনিষ্ঠ বিপ্লবীকর্মী শ্রীশ ঘোষ, বাবেন গোঁসাইয়ের হত্যাকারী প্রসিদ্ধ কানাইলাল দত্ত, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রবর্তক সঙ্ঘগুরু মতিলালরায়, সাগরকালী ঘোষ প্রভৃতি চারুরায়ের সঙ্গে বিপ্লব দলভুক্ত হলেন।

১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ কর্মীগণ যুগান্তর পত্রিকার পরিচালনা ভার অন্যান্যদের উপর দিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে বিপ্লবানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেন। পূর্ববঙ্গের লাট স্যার ফ্যামফিল্ড ফুলার এবং পশ্চিমবঙ্গের লাট এণ্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করবার জন্য কলকাতার কয়েকজন ধনী ব্যক্তি অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসেই কলকাতায় কানাইলালের ডাক পড়ল। কলকাতায় গোপীনাথ দত্ত লেনে তার থাকার ব্যবস্থা হল স্থির হল হেম কানুনগোর নিকট তিনি বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখবেন। ১৬ই এপ্রিল কানাইলাল চন্দননগর ত্যাগ করে কলকাতায় এলেন। ১লা মে মানিকতলা বোমার মামলা সম্পর্কে তিনি গ্রেপ্তার হন। চারুচন্দ্রকেও ফরাসী গভর্মেণ্ট ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তুলে দেন।

কিন্তু এই প্রথম আঘাতেই চন্দননগর দল বিপর্যস্ত হয়ে পড়লনা। মে মাসের মধ্যভাগে চন্দননগরের শ্রীশ ঘোষ, উত্তরপাড়ার সমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্করের ভাগিনেয় বাবুরাম সাভারকার এবং মতিলাল রায় চুঁচুড়া স্টেশনের নিকটে এক আম বাগানে মিলিত হয়ে মানিকতলার অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন, স্থির হল শ্রীশচন্দ্র বিপ্লবদলকে জীবন্ত করে রাখবেন, অমরেন্দ্রনাথ বিপ্লবী সংহতি পুনর্গঠন করবেন, বাবুরাম পরামর্শদাতা থাকবেন এবং মতিবাবু চন্দননগরে থেকে বিপ্লব কর্মের সকল দিক যাতে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করবেন।

চারুচন্দ্র ফরাসী প্রজা এই কারণে প্যারিস পার্লামেণ্টে আন্দোলন উপস্থিত হলে চারুবাবু মুক্তি পান কিন্তু মুক্তির পরে বিপ্লব কর্মের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ল।

মানিকতলা মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী গমন করেন। কিন্তু যাবার আগে সুরেশচন্দ্র দত্ত নামক এক তরুণকে তিনি মতিবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যান। সুরেশবাবু তখন এম,এস,সি ক্লাসে রসায়নের ছাত্র. বোমা তৈরীর ব্যাপারে মানিকতলা বিপ্লবীদের তিনি সাহায্য করতেন। মতিবাবুর সঙ্গে সুরেশবাবুর পরিচয়ের পরে দুজনে পরামর্শ করে স্থির করলেন চন্দননগর থেকে অর্থের ব্যবস্থা করা হবে সুরেশবাবু বরাহ নগরে থেকে বোমা প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ করবেন। কিন্তু পরে শ্রীশচন্দ্রের উদ্যোগে এই ব্যবস্থা পরিবর্তীত হয় এবং চন্দন

নগরেই বোমা প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হয়। নগেন্দ্রনাথ এই কাজে সুরেশচন্দ্রকে সাহায্য করতেন। এইভাবে চন্দননগরে একটি শক্তিশালী বিপ্লবকেন্দ্র এবং বোমা নির্মাণ কারখানা গড়ে উঠল। নগেন্দ্রনাথ পরে মণীন্দ্রনাথকে বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়ে দেন। এর ফলে ক্রমেই চন্দননগর থেকে ভারতের সর্বত্র বোমা সরবরাহ চলতে থাকে। মানিকতলা মামলা সম্পর্কে কলকাতায় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের পর অনুশীলন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখা প্রকৃত প্রস্তাবে ভেঙে যায়। এর আরও একটি কারণ ছিল অনুশীলন সমিতির পূর্ববঙ্গ শাখা অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। বল পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ ডাকাতির দ্বারা পূর্ববঙ্গে অর্থ সংগ্রহ হত কলকাতা সমিতিতে দুএকবার ডাকাতির চেষ্টা হলেও পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবীরা প্রায় কোন ডাকাতি করে নাই। পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবী সমিতি পরিচালিত হত উকিল ব্যারিষ্টারদের চাঁদায় এবং বড়লোকদের স্বেচ্ছাকৃত দানে। কলকাতা সমিতি বড়লোকদের কাছ থেকে মোটা চাঁদা আদায় করত। এইভাবে নাড়াজোলের নরেন্দ্রলালখান, উত্তরপাড়ার মিত্র বাবু, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাই এবং কাঁথীর জমিদার নন্দর বিপ্লবীদলকে অর্থ সাহায্য করতেন। কিন্তু বোমার মামলা সম্পর্কে নরেন গোঁসাই ধরা পড়লে বড়লোকেরা সবাই হাত গুটালেন। প্রকৃত পক্ষে এরা সকলেই বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন ফলে তরুণদের মধ্যে অবশিষ্ট যারা রইলেন তারাও অর্থাভাবে দল পরিচালনে অক্ষম হলেন। এইভাবে বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের পর অনুশীলনের এই বিদ্রোহী দলের অস্তিত্বলোপ পায় এবং চন্দননগর অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঠিক এই সময়েই পূর্ববঙ্গ অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তাদের মিলন ঘটে। উভয় দলই এই সময় স্বতন্ত্র ছিল। চন্দননগরদলের হাসবিহারী বাঙলার বাইরে থেকে বিপ্লবী দলের আমীর চাঁদ, আউধ বিহারী বালমুকুন্দ প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে দিল্লীর বিপ্লবীদল পরিচালনা করেছিলেন। চন্দননগর সংহতিতে এই সময় বোমা প্রস্তুতের কাজ চলছিল। পূর্ববঙ্গ অনুশীলন সমিতির সংগঠন সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হয়েছিল এবং ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সরকারের সঙ্গে তাদের একটা পরোক্ষ সংগ্রাম চলছিল।

প্রকৃতপক্ষে অমৃত হাজরাই চন্দননগর ও অনুশীলনের এই মিলন ঘটায়। এ সম্পর্কে মতিবাবু লিখেছেন, "লোকটি মৃদুভাষী। মিষ্ট হাসি ঠোঁটে লাগিয়াই আছে। তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়াই বুঝিলাম সে দেশ কাজের লোক। ভদ্রলোক আরেকদিন আসিবে বলিয়া সতীশ সেনের সহিত প্রস্থান করিল শ্রীশচন্দ্রকে আমি এই কথা জানাইলাম।"

এর দুই একদিন পরেই অমৃতবাবু পুনরায় চন্দননগরে আসেন এবং মতিবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মতিবাবু লিখেছেন, "ধর্মপ্রাণ এই যুবক ক্রমে আমার অন্তরঙ্গ শিষ্যরূপে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিল। তাহারই কথায় আমি তদানিন্তন অনুশীলন সমিতির প্রধান নায়ক মাখনলাল সেনের সহিত সংযোগ স্থাপন করি।"

মাখন সেনের সঙ্গে মতিবাবু লিখেছেন, "শশাঙ্কের নির্দেশে আমি ও শ্রীশ চন্দ্র সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের কোন এক অন্ধকার সান্ধ্যস্নাতে গৃহে মাখন সেনের সহিত সাক্ষাৎ করি। মাখন বাবু সোনারঙ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বৈপ্লবিক ঘটনায় তিনিও একপ্রকার গা ঢাকা দিয়ে কলকাতায় বাস করছিলেন। মাখনবাবুর সঙ্গে বিপ্লবের কথা ব্যতীত অনেক ধর্মতত্ত্বের কথাও হয়েছিল।"

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন]

(পূর্বানুবৃত্তি)

কলকাতায় যত বৃহত্তম সভার অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে এই সভাটি অন্যতম। এদিনের সভায় একটি তাৎপর্য হল এই যে এই রকম অথবা এর চেয়েও বড় যত সভা হয়েছে সেগুলির পর মিলনের ভূমিকা ছিল এই সভার। আপাত দৃষ্টিতে আন্দোলনকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়, আন্দোলনের লক্ষ্য হল সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের বয়সসীমা বাড়িয়ে দেওয়া এবং পরীক্ষা গুলি সব একই সময়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আসল চিন্তা ও উদ্দেশ্য হল এই সিভিল সার্ভিসের আন্দোলনের ভিত্তির দিয়ে ভারতীয় জনগণের মধ্যে একটা ঐক্য ও সংহতির ভাব জাগিয়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে সমস্ত ভারতীয় গণের কাছে আবেদন করে বিভিন্ন প্রদেশকে এক রাজনৈতিক মঞ্চে আনয়ন করার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হল, সে সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল একই স্বার্থ বোধ ও প্রেরণায় সকলকে প্রথিত করে এক সাধারণ প্রচারে সকলকে শপথবদ্ধ করা। (এ রকম প্রচেষ্টা ভারতে ইতিপূর্বে আর হয়নি। এ হল আদর্শ আমাকে এই আদর্শ অভিভূত করে ফেলল।

বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করার জন্য আমাকে স্পেশাল ডেলিগেট রূপে নির্বাচিত করা হল। আমি নিজেই তা চেয়েছিলাম। ধারনাটি আমার মাথায়ই খেলে এবং বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে ঘুরে প্রচার কার্য চালনোর দায়িত্ব আমি নিজেই গ্রহণ করলাম। সেজন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে বেরিয়ে পড়লাম। বিশেষ তৎপরতা ও উদ্যমের সহিত আমি কাজে লেগে গেলাম। আমি তখন মেট্রো পলিটান ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপকের কাজ করতাম। গ্রীষ্মের অবকাশের সুযোগ নিয়ে আমি ১৮৭৭ সালের ২৬শে মে তারিখে উত্তর ভারত পরিভ্রমনে বহির্গত হলাম। আমার সঙ্গে গেলেন বাবু নগেন্দ্র নাথ চ্যাটর্জি। নগেন্দ্রনাথ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। বাগ্মী লোক বলে তিনি তখন যেন সুপরিচিত ছিলেন। বাংলা ভাষায় তিনি চমৎকার বক্তৃতা করতে পারতেন। বক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বের সমস্যই আমরা বক্তৃতা করতাম। আগে থেকেই এলাহাবাদের বন্ধু নীলকমল মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে এই পরিভ্রমন সম্পর্কে পত্রে যোগাযোগ করেছিলাম। মিত্র মহাশয় আমাকে সতর্ক করে জানিয়ে ছিলেন যে আমি বড় বেশী ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি, বিপদ আপদের আর বাকী আছে, আমি জনসভার করে বেরিয়েছি। সুতরাং পিছিয়ে যাওয়া আর চলেনা। আমরা সোজা আগ্রা চলে গেলাম, আমার বন্ধু স্বর্গত বাবু অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জি ছিলেন তখন আগ্রার একজন ম্যাজিষ্ট্রেট জজ।

অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জি ছিলেন আমার বাল্যের খেলার সাথী। তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন পরে বি. এল পাশ করে ওকালতী করার জন্য উত্তর প্রদেশে চলে যান। কিন্তু সেখানে তিনি অল্পকালের মধ্যেই মায়া ছেড়ে দিয়ে হেকে যোগদান করেন এবং বিচার বিভাগীয় কাজে লাগেন, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের একজন কট্টর ভক্ত। কলকাতা সে সময়ে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতার তাপে যেন সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আগ্রায় যখন ১৮৭৭ সালে তাকে দেখলাম, তখন দেখলাম যে তিনি পুরাতন বিশ্বাসেই ফিরে গিয়েছেন, তা তিনি ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসী

হোন বা হিন্দুমতেই বিবাহী হোন, তাতে কিছু যায় আসে না, লোক হিসাবে তিনি ছিলেন অতি চমৎকার এবং বন্ধু হিসাবেই ছিলেন অতি অমায়িক, তার গৌরবময় বিচার বিভাগীয় কর্মজীবন অকালেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যারা তাঁকে জানতেন তারা এখনও তাকে প্রীতির সহিত স্মরণ করেন এবং চিরকালই তা করবেন। তিনি ছিলেন তার আরও বেশী গৌরবের অধিকারী পুত্রের সুযোগ্য পিতা। সেজন্যও তিনি স্মরণীয়। স্বর্গত ডাঃ সতীশচন্দ্র ব্যানার্জি ছিলেন তাঁর পুত্র, সতীশচন্দ্র অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন। বাংলা এবং উত্তর প্রদেশের জনগণ তার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বহুদিন পরে অবিনাশ চন্দ্রের সঙ্গে আগ্রায় মিলিত হই। আমার দেশ-পরিক্রমার কার্যক্রম সেখানেই নির্ধারিত হয়।

এখানে একটা কথা বেশ মনে রাখার মত। তৎকালে কোন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে কোন রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদান করার এবং আলাপ-আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশে কোন সরকারী বাধা ছিল না। আমাদের আন্দোলন নিয়ে বাঁকিপুরে যে সভা হয়েছিল তাতে সরকারী অভিভাবকত্বে রক্ষণাধীন কোচবিহারের তরুণ মহারাজা উপস্থিত ছিলেন আর ছিলেন মেজর হিদায়েৎ খাঁন বাহাদুর সি. এস. আই। হিদায়েৎ খাঁন একজন সামরিক কর্মচারী ছিলেন। তিনি সভায় উত্থাপিত একটি প্রস্তাবও সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু সরকারের এই মনোভাব বেশী দিন থাকেনি। জনজীবন যত বিকাশশীল হয়ে উঠল এবং দেশাত্মবোধ যত জাগ্রত হতে লাগল, সরকারের মনোভাবও ততই পরিবর্তিত হতে থাকে, সম্প্রতি কিছুদিন আগে এক আদেশ জারি করা হয়েছে যে সরকারী কর্মচারীরা রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু তাতে কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন না। এর পরে কার্যতঃ দেখা গেল যে সরকারী কর্মচারীরা এই ধরনের কোন সভায় উপস্থিতই হন না। কারণ, সরকারী ঘোষিত আদেশ নামার যা-ই থাকুক না কেন, সরকারী কর্মচারীদের স্থায়ী মনোভাব হয়ে দাঁড়াল সর্বপ্রকার জন হিত কর্ম প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখা যদিও তাকে ঠিক অবিশ্বাস বলে বলা যায় না. আর অবশ্য পর্যায়ের কর্মচারীরা তাদের কর্তাদেরই অনুসরণ করতে থাকেন। "সর্বপ্রকার জন হিতকর কর্মপ্রচেষ্টা" কথাটি আমি বিশেষ বিবেচনা করে ব্যবহার করেছি। কারণ, রামকৃষ্ণ মিশনের মত সেবামূলক ও মানব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সংঘও—যার সঙ্গে রাজ নীতির বিন্দু মাত্র সংস্পর্শ নেই—গোয়েন্দা বিভাগের প্রখর ও সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। নতুন শাসন সংস্কার চালু হওয়ার পরে অবশ্য কর্তারা রাজনৈতিক ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে একটু বিচার বিবেচনা করে ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

আগ্রায় সিভিল সার্জিস সম্পর্কে রচিত স্মারক পত্র খানি উর্দুতে অনুবাদ করে লিথোগ্রাফ করে নেওয়া হল। স্মারক পত্র খানি আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম (এই স্মারক পত্র খানিই কলকাতা স্মারক পত্র নামে খ্যাত) এখানে স্থির হল যে আমাকে অবিলম্বে লাহোর যেতে হবে এবং উত্তর ভারতের প্রথম জনসভা পাঞ্জাবের রাজধানীতেই করতে হবে। আমাদের মনে হল উত্তর ভারতের অন্য কোন স্থান অপেক্ষা লাহোরেই আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের মত প্রকাশের চাট প্রদর্শন সবচেয়ে বেশী কার্যকর ও হৃদয় গ্রাহী হবে।

(ক্রমশঃ)

অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র প্রদর্শনী ও জনসভা

আগামী ২রা বৈশাখ ১৩৮৫, (ইং ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৮) বেলা ৩ ঘটিকায় চিত্তরঞ্জন স্ব. কলেজ একটি জনসভা হবে। আপনাদের সক্রীয় সমর্থন কামনা করি।

ইতি—

দীনেশ ঘটক

সম্পাদক, অনুশীলন সমিতি।

২/৪/৭৮

(contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—Calcutta		
Datt Mano Ranjan	2/12, Netajinagar, Calcutta-28	200	5-4-74
Debnath Kedareswar	35, Sree Gopal Mullick Lane Calcutta-12	200	1-10-76
Debi Bishnupriya w/o Late J. N. Bhattacharya	17B, Rammoy Road, Calcutta-35	165	
Debi Smt. Sudha Rani w/o Late Phanindra M. Mukherjee	80/1/2B, Grey Street, Cal-6.	100	
Dey Santosh Kumar	3/112, Jatindas Nagar, Cal-56	200	
Dey Smt. Sucharita w/o Late Mano Ranjan Dey	1/2, Jatindas Nagar, Cal-56	150	21-11-77
Ghosh Brojo Ballav	D/16, Bapujinagar, Calcutta-32	200	1-10-76
Ghosh Jugal Chandra	27/1/H/2, Dr. Suresh Chandra Banerjee Road, Calcutta-10	170	
Guha Anil Kumar	7, Regent Colony, Cal-40	150	
Guha Rathindra Nath	44, Debendra Ch. Road, Cal-15	155	
Kanungo Sudhir Kumar	64, Shambazar Street, Cal-4	200	1-4-77
Kundu Kshitish Chandra	Block—B, Flat—8. LIG Housing Estate, Dutta Bagan, 37, Belgatchia Road, Calcutta-37	150	
Majumder Smt. Anita w/o Late Birendra Nath	6/2D, Umakanta Sen Lane Calcutta-10	100	30-10-77
Majumder Smt. Asha w/o Late Subimal	11/9, C. I. T. Building Calcutta-10	100	10-11-77
Majumder Gopal Chandra	206, Bidhan Sarani, Room 20 Calcutta-6	293	1. 10. 77
Majumder Nitya Bandhu	21, Nandan Road, Cal-25	125	
Majumder Subodh Ranjan	P/481, Parnashri, Cal-60	100	
Mitra Sm. Jyotsna w/o Late Santosh Mitra	3/1, Akrur Dutta Lane Calcutta-12	100	

([illegible])

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

C/36 13 APR 1978

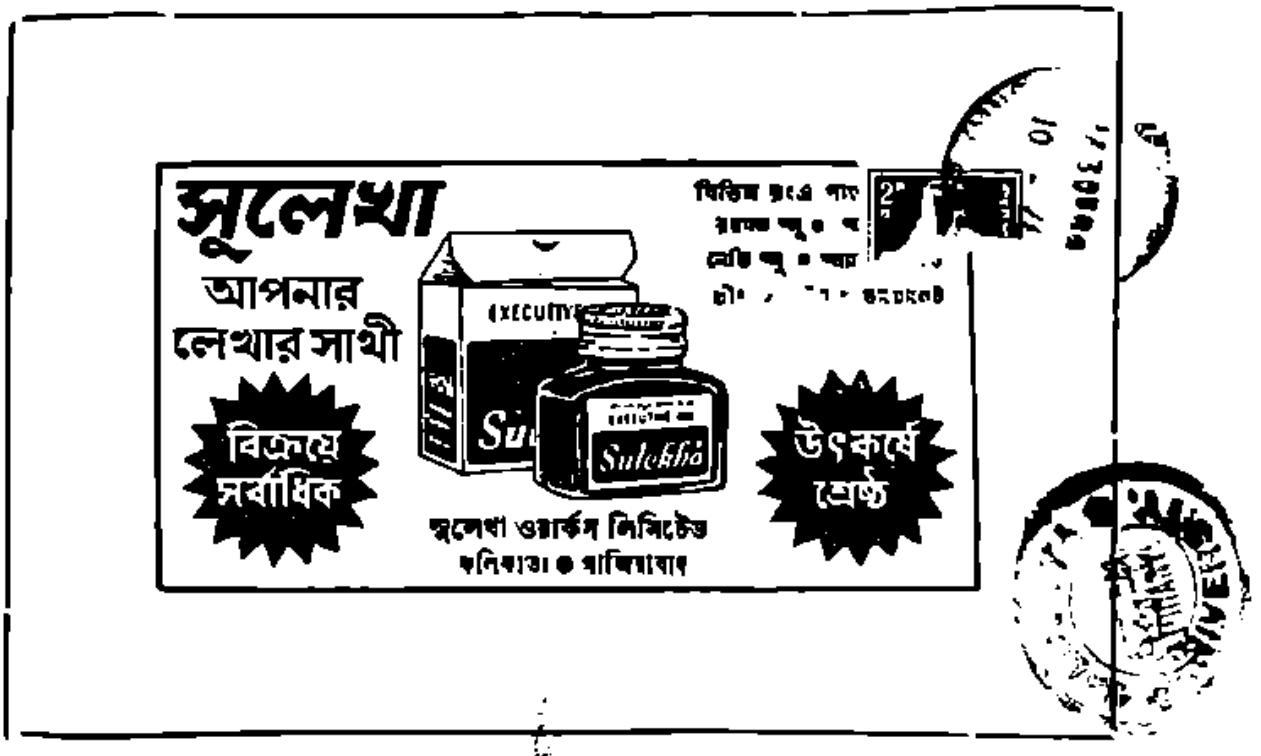

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলক চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেহালা—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবাসুদেব গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৫নং বক্তবরাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১১ এ, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০১

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ১লা বৈশাখ, ১৩৮৫ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৮	২৮ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

সংহতি ও স্বাতন্ত্র্য

। শ্রীসুবোধ বসুমল্লিক

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে
জনমানসে পৌঁছাতে হবে

। শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস

উদ্বাস্তু সমস্যা

শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জী

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। শ্রীকীরোদ দত্ত

আদর্শের অপমৃত্যু

। শ্রীদক্ষিণেশ্বর সেন

নেতৃত্ব

। কৌটিল্য

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

রাজনৈতিক পেন্সান মঞ্জুরীর তালিকা

• "Criticism একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয় সকলকে সাহায্য করবে। যেখানটা ভাল না বোধ হয় তা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবে। পরস্পরকে criticise করাই সকল সর্বনাশের মূল, দল ভাঙার এটি মূল মন্ত্র।" —বিবেকানন্দ

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—Calcutta		
Mukherjee Sm. Bijon Bala w/o Late Debendra Nath	122, Raja Dinendra St. Cal-4	100	1. 10. 76
Mukherjee Bisweswar	46, Durga Charan Mitra St. Calcutta-6	200	
Mukherjee Bisweswar	77. Ultadanga Main Road Calcutta-4	160	
Mukherjee Krishna Bhan	39, Manindra Goswami Lane Calcutta.6	150	
Mukherjee Makhan Lal	15, Kalibari Lane Calcutta-31	200	1. 10. 76
Mukherjee Nepal Caandra	1/98, Bijoygarh, Cal-32	200	,,
Mukherjee Nirmalendu	5/1, Mukherjeepara Lane Calcutta-27	200	13-7-77
Mukherjee Smt. Parul	2|86, Bidyasagar Colony Calcutta-47	200	1. 10. 76
Nag Smt. Prabha w/o Late Jeeban Ranjan	40/1/C, Broad Street Calcutta-19	200	11. 10. 75
Nag Smt. Kanaklata w/o Late Somendra Kr. Nag	A E 178, Salt Lake, Cal-54	200	1. 10. 76
Naha Smt. Sudharani w/o Late Hiranya Kr. Naha	28, Lotus Park, Calcutta-47	100	14. 10. 77
Nandy Jyotirendra & Smt. Parul	Bl. L/A, Flat—4, Govt. Housing Estate C. N. Roy Road, Cal.39	400	31. 12. 77
Nanda Manindra Nath	75/H/26, Beleghata Main Road Calcutta-10	200	1. 10. 76
Narayan Choudbury Jogesh Ch]	5/4, Dum Dum Road Calcutta-30	150	
Neogi Smt Manjusha w/o LateJnanendra Mohan	140, Satin Sen Nagar, Calcutta-35	150	13. 11.77

(contd. on 3rd cover)

সংহতি ও স্বাতন্ত্র্য

—সুবোধ মজুমদার

(তিন)

আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ধারিত সভ্যতা থেকেই যে অতিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা জন্ম লাভ করেছে একথা ঐতিহাসিক সত্য। তাই ব'লে কোনো অবিচ্ছেদ্য সংযোগ নেই এদের মধ্যে। যদি কিছু স্বার্থান্ধী বুদ্ধিমান ও সুচতুর লোক বহু মানুষকে দরিদ্র রেখে নিজেদের অতি ধনবান করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার না করত তাহলে হয়ত অতিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা আসত না কোনোদিন।

এসে যখন গেছে তখন দেখতে হবে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এই সর্বগ্রাসী দানবের কবল থেকে। কেন্দ্রের কাছ থেকে অকল ক্ষমতা নাও ক'রে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু সেই কাগুজে মুক্তিকে কার্যকরী করতে নির্ভর করতে হবে অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির ওপর। অর্থাৎ রাজ্য সরকার তাঁর অঞ্চলগুলোকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদান ক'রে একএকটি শক্তি কেন্দ্র গড়ে তুললেই শুধু কেন্দ্রের দেওয়া কাগজে লেখা স্বাধীনতাকে বাস্তব করা যাবে তা না হলে বেদনাময় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র। ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে যেমন ভারতের ধনিকরা এখন শোষণ করছে জনগণকে, তেমনি দিল্লীর হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে কলকাতার ধনিকরা পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে শোষণ করবে মাত্র। জনগণকে কিছুতেই শোষণমুক্ত করা যাবে না, দেশকে কিছুতেই সুসংহত শক্তিশালী করা যাবে না, যদি না আমরা ধনিকবাদী গণতন্ত্রের কাঠামো ভেঙে দিয়ে সাম্যবাদী গণতন্ত্রের কাঠামো স্থাপন করতে পারি।

ইংরেজদের ক্ষমতাচ্যুত করার ৩১ টি বছর পরে আজ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবটা একটু অবাস্তব মনে হতে পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু আজাদ-হিন্দ-ফৌজ আর আজাদ হিন্দ সরকারের যে নিশ্চিত লক্ষ্য ছিল এই সাম্যবাদ। বেদান্ত-বিদগ্ধ পরম পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিচালিত মুক্ত-ভারত-সরকার জানতেন ব্যক্তি-মানবের মুক্তি নিহিত আছে কোথায়।

বিলম্বে হলেও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পন্থা অবলম্বন করতেই হবে সমগ্র বিশ্বকে। নতুবা মানবজাতিকে রক্ষা করা যাবে না আত্মধ্বংস থেকে। এই পরম সত্যটা উপলব্ধি করেছেন ইউরোপ আমেরিকার মনিষীরাও। তবে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কোন্ রাষ্ট্র আগে অবলম্বন করবে বিকেন্দ্রিত সমাজ-ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের পন্থা? এই দ্বিধার মূলে আছে কায়েমী স্বার্থের অনিচ্ছা ও জনসাধারণের ভয়। বর্তমান ব্যবস্থার দ্বারা ক্ষমতায় আসীন তারা কিছুতেই রাজী নয় অন্য ব্যবস্থা আনতে। জনসাধারণ মনে করে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে যাবে-ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হওয়ার ফলে, তখন বিদেশী রাষ্ট্রগুলি এসে আক্রমণ করবে এই দেশটাকে।

এই আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। প্রতিটি অঙ্গ শক্তিশালী হলেই যে সমগ্র রাষ্ট্রটা শক্তিশালী হতে পারে, নতুবা নয়, এটা বোঝা কঠিন নয়। অঙ্গকে শক্তিশালী করতে হলে যে তাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া দরকার এটাই সুস্পষ্ট করে তোলা আমাদের বর্তমান লক্ষ্য। তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝানো অবশ্য দরকার যে একমাত্র গণশোষণ ও গণপ্রতারণার আগ্রহীরাই চায় রাষ্ট্রকে অতিকেন্দ্রিক করতে। যেমন:—দেশের কোটি কোটি লোককে ঠকিয়ে বা অভুক্ত রেখে গোপনে বিদেশে মাল পাচার করা সম্ভব হয় শুধুমাত্র অতিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে। আঞ্চলিক স্বাধীনতা সম্পন্ন রাষ্ট্রে সেটা সম্ভব হয় না কিছুতেই। আবার, দেশের অন্যান্য অঞ্চলকে ঠকিয়ে কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলকে অতি-উন্নত করাও সম্ভব হয় একমাত্র অতিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রেই। আঞ্চলিক স্বাধীনতা সম্পন্ন রাষ্ট্রে সেটা সম্ভব হয় না কিছুতেই।

এই অন্যায় উপার্জন বন্ধ করাও সম্ভব নয়। কারণ দেশের অধিকাংশ মন্ত্রী ও সংসদ-সদস্যই নির্ভরশীল এসব অন্যায়কারী ব্যবসায়ী বা তোষণকারীদের ওপর। রাজ্যের মন্ত্রী ও আইনসভা-সদস্যরাও নির্ভরশীল তাদের ওপর। ধনবাদী-গণতান্ত্রিক নির্বাচন-পদ্ধতি যতকাল

বিদ্যমান থাকবে ততদিন তাঁরাও বাঁধা থাকবেন কালো-বাজারী, চোরাকারবারী ভেজালকারীদের অঙ্গুলি সংকেতে চলতে। শুধু তাই নয়, সৎ ব্যবসায়ীদেরও অসৎ হতে বলবেন তাঁরা নির্বাচন তহবিলে টাকা পাবার আশায়। যেমন ঘুষখোর পুলিশ অফিসাররা চোর ডাকাত সৃষ্টি করে নিজেদের সুবিধের জন্য তেমনি মন্ত্রীরাও অসৎ ব্যবসায়ী সৃষ্টি করবেন নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখতে।

তথাপি সর্বসাধারণ নিজেদের সাময়িক স্বার্থে ভেবে দেখবেন এই অতিকেন্দ্রিক কাঠামো। তার আগে তাঁরা খুব ভালভাবে বুঝে নেবেন এই কাঠামোর মারাত্মক ত্রুটিগুলোকে। অতিকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থার একটি অনিবার্য অপরিহার্য কাজ হচ্ছে ক্রমশঃ বহুতর লোককে দরিদ্র ক'রে স্বল্পতর লোককে ধনী করা। বহু ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনষ্ট ক'রে গ'ড়ে ওঠে এক বৃহৎ ব্যবসা। বহু ক্ষুদ্র কারখানা বিনষ্ট ক'রে গড়ে ওঠে একটি বৃহৎ কারখানা। বহু ক্ষুদ্র দোকানকে বিনষ্ট করে গ'ড়ে ওঠে একটি মহানগরী। বহু ক্ষুদ্র বিদ্যালয় বিনষ্ট করে গড়ে ওঠে একটি বিশাল বিদ্যালয়। এইভাবে একটা সমাজ চলতে থাকে অবধারিত মহাপ্রলয়ের দিকে।

অথচ অতি সহজেই সমাধান করা যায় এই অর্থনৈতিক সমস্যাটিকে। প্রথমতঃ বন্ধ করতে হবে বিলাস-ব্যসন ও উচ্ছৃঙ্খল-প্রমোদে সহায়কারী দ্রব্যাদির উৎপাদন। দ্বিতীয়তঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে হবে বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে। তৃতীয়তঃ এই সঙ্গে আঞ্চলিক প্রশাসনিক-স্বাধীনতা সম্পন্ন বহু ক্ষুদ্র অঞ্চলও গড়ে তুলতে হবে দেশময়। ফলে প্রত্যেকটি অঞ্চলই উৎপাদন করতে পারবে নিজ নিজ অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, প্রত্যেকেই প্রণয়ন ও ব্যবহার করতে পারবে নিজের প্রয়োজনীয় আইনকানুনাদি, এবং প্রত্যেকেই সম্পন্ন করতে পারবে নিজ নিজ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় শাসন কার্য ও বিচারকার্য। এমতাবস্থায় কেন্দ্রে ব'সে আধিপত্য আর পাবে না শুতো টানতে।

তাছাড়াও, এই সাম্যবাদী গণতন্ত্রের প্রশাসন কার্যে থাকবে না কোনো জটিলতা। আমলাতন্ত্রী লালফিতার প্রভাব মুছে যাবে শাসন-বিভাগ, বিচার বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ এবং অন্যান্য সকল সরকারী ক্ষেত্র থেকে। ঘুষ দেওয়া নেওয়া, কালো বাজারে বেচা-কেনা, ভেজাল মেশানো, কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি সমাজ-বিরোধী কর্ম-গুলির কোনো অবকাশ থাকবে না আর সমাজে। আইন হয়ে যাবে সহজ ও সুস্পষ্ট, তাই উকীলের কোনো প্রয়োজন হবে না মামলা চালাতে। মামলার সংখ্যাও তখন কমে যাবে অনেক। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দালালের আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না সেই সহজ সমাজে।

বিগত তিরিশ বৎসর যাবৎ আমাদের জাতীয় নেতারা পাশ্চাত্য ধনবাদী গণতন্ত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলে আজ মনে হয় সাম্যবাদী গণতন্ত্র অনেক দূরে সরে গেছে আমাদের কাছ থেকে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর বিকেন্দ্রিক সমাজের পরিকল্পনা এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক সাম্যবাদের পরিকল্পনার মধ্যে নিহিত রয়েছে এই সাম্যবাদী গণতন্ত্র। মহাত্মাজীর বাস্তব মৃত্যু ঘটিয়ে এবং নেতাজীর কৃত্রিম মৃত্যু ঘটিয়ে ধনবাদীরা চেয়েছিল সাম্যবাদের গতি-রোধ করতে। তিরিশ বছর ধ'রে তারা সফলভাবে বাধা সৃষ্টিও করেছেও তারা। কিন্তু আর পারবে না তারা বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের অমোঘ প্রগতিকে প্রতিহত করতে। বিপ্লবীরা যদি নিজেদের চোখ থেকে ধনবাদী অঞ্জন মুছে ফেলে দিয়ে জনসাধারণের সহিত নিজেদের সহজাত সাম্য উপলব্ধি করতে পারেন তবে আর কেউ পারবে না সাম্যতন্ত্রকে প্রতিরোধ করতে।

আমাদের সংবিধান রচয়িতারা উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের জনমত চায় রাজ্যগুলির হাতে যেন থাকে রাজ্যীয় বিষয়ে যে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ণ ক্ষমতা। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে শুধু কেন্দ্রীয় বিষয় সমূহ ধার্যের পূর্ণ ক্ষমতা এবং কেন্দ্রীয় খরচ মেটাবার অধিক আয় করার পূর্ণ ক্ষমতা। এটাই স্থির হয়েছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সার্বভৌমতার

সেই সময়ে স্থির থাকলে দেশকে বিভক্ত করার প্রয়োজন হতো না তখন। যখন কেন্দ্রীয় নেতারা ক্ষমতার আসনায় বিভ্রান্ত হয়ে ভুলে গেলেন যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করাটাই হচ্ছে ভারতীয় ভূ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নির্দেশ, তখনই তাঁরা অঞ্চলকে অবদমিত করার পূর্ণ ক্ষমতা উপভোগ করার আশায় দেশকে করলেন বিভক্ত।

ভারতবর্ষ বিভক্ত না হলে কেন্দ্রের হাতে থাকত শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা দপ্তর, মুদ্রাদপ্তর, ডাক-তার-বেতার দপ্তর, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দপ্তর ও আন্তর্রাজ্যিক সম্পর্ক দপ্তর। সত্যি কথা বলতে গেলে এতটাও থাকার কথা ছিল না ক্ষমতা-হস্তান্তর সংক্রান্ত আলোচনার সময়। ১৯৪৬ সনের এপ্রিল মাসে যখন ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসেছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা করতে তখন কংগ্রেসও ভেবেছিল পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন রাজ্যগুলোর হাতে দেওয়ার কথা। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ প্রস্তাব করেছিলেন কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু (১) প্রতিরক্ষা দপ্তর, (২) জাতীয় যোগাযোগ দপ্তর, এবং (৩) বৈদেশিক সম্পর্ক দপ্তর। মুসলিম লীগও রাজী হয়েছিল এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে অবিভক্ত ভারতে বাস করতে। মহাত্মা গান্ধী আজাদ সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই প্রস্তাবের জন্য। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগে অতিকেন্দ্রিক উৎপাদন, প্রশাসন ও আবাসন ব্যবস্থা যে মারাত্মক এই সত্যটা অন্যান্য মনীষীদের ন্যায় মহাত্মাও উপলব্ধি করেছিলেন ভালভাবেই।

১৯৪৭ সালের পরে ধীরে ধীরে ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী নেতারা কেন্দ্রের হাতে নিয়ে নিয়েছেন প্রায় সবটুকু প্রশাসন ক্ষমতাই। নিজেদের অহমিকা পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে তাঁরা বিনষ্ট করেছেন জাতীয় সংহতি। রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী প্রমুখ দেশনায়ক থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত প্রায় সকলেই আজ ভুলে গেছে একজাতি একপ্রাণ একতার কথা। সাধারণ ভারতবাসী যখন অশিক্ষায় ও অনাহারে পচে মরছে নেতারা তখন বিশ্বময় ঘুরে বেড়িয়ে দেশের মান বাড়াতে গিয়ে নিজেদের অহমিকাকে পরিতৃপ্ত করছেন। অথচ সবাই তাঁরা জানেন বিকেন্দ্রিত সমাজ ব্যবস্থায় থাকবে না ভাষা-সমস্যা, থাকবে না মুদ্রা সমস্যা, থাকবে না মূল্য বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা। এমন কি, পারমানবিক মারণাস্ত্রও কোনো আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারবে না বিকেন্দ্রীভূত সমাজের অধিবাসীদের মধ্যে। কিন্তু ধনবাদী সাম্যবিরোধী সভ্যতার অঙ্গন আচ্ছন্ন করে রেখেছে নেতাদের দৃষ্টিকে। তাঁরা মনে করেন বিকেন্দ্রিত সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁরা হারিয়ে ফেলবেন তাঁদের সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি। একবারও তাঁরা ভাবেন না যে একমাত্র বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থায়ই সম্ভব হয় বুদ্ধ খ্রীষ্ট, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দের মতো সর্বজনীন মহামানবের আবির্ভাব। ভিতরে যাদের পদার্থ নেই কোন কেন্দ্রীয় শক্তিই পারে না তাদের বেশী দিন ব্যাভিমান রাখতে। ভিতরে পদার্থ থাকলে দক্ষিণেশ্বরের নির্জন পঞ্চবটি পীঠ থেকেও আকর্ষণ করা যায় সমগ্র বিশ্ববাসীকে।

এখানে মনে রাখতে হবে একটি জরুরী কথা। ব্রিটিশ সরকার আমাদের দেশে চালু করেছিল অনেক অপভাষা একটি হচ্ছে Self-government বা স্বায়ত্তশাসন। মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, প্রভৃতি স্থানীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণকে তারা বলত স্বায়ত্তশাসন। এটা খুবই ভুল—বড় নামের আড়ালে লুকানো রয়েছে ক্ষুদ্র জিনিসকে। স্বায়ত্ত শাসনের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে আঞ্চলিক সার্বভৌম ক্ষমতা। এক রাষ্ট্রের এক অঞ্চল শোষণ করতে পারে না অন্য অঞ্চলকে স্বায়ত্ত শাসন বহাল থাকলে পর।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে জনমানসে পৌঁছাতে হবে

—ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস

(২)

২১শে ফেব্রুয়ারী ইতিহাসের অনেক স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেরও একটী স্মরণীয় দিন। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ইংরেজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল সারা ব্রিটিশ ভারত। ভারতীয় সৈন্যরা, ভারতের ও বিদেশের ভারতীয় বিপ্লবীরা একত্রে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের জন্য সামিল হয়েছিল। ভারতের জনগণের ইংরেজের বিরুদ্ধে এই আপোষহীন বিক্ষোভ ধ্বংস করার জন্য নির্মম অত্যাচার করে ইংরেজ প্রশাসন। এই দিনটী এখনও সারা ভারতে স্বাধীনতার প্রথম গণদিবসরূপে উদ্‌যাপন করার ব্যবস্থা হয় না কেন? স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই দাবী তুলে না কেন? মুখর হয় না কেন? অথচ ভারতের বিপ্লবী প্রচেষ্টায় বিশেষ প্রধান স্থান অধিকার করেছে এই দিনটী। হিন্দু, মোসলমান, শিখ ও অন্যান্য সকলের রক্তস্রোত বহু জীবন অর্ঘ্য দিয়ে তর্পন করেছিল ভারতমাতার পদমূলে এই দিনটীর প্রস্তুতির জন্য, গড়ে উঠেছিল সর্বধর্ম ও সকল জাতির মিলনসূত্র। মোসলমান ও শিখ সৈন্যরা সিঙ্গাপুর ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এক সপ্তাহ নিজেদের শাসন কায়েম রাখে। এই অভ্যুত্থানে ৭০ জন সম্মুখসমরে আত্মাহুতি দেয় সারা ভারতে, ১০০ জনের বেশী ফাঁসি হয়, কয়েক শত বিপ্লবীর দীর্ঘ কালের কারাদণ্ড হয়।

রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল এই অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি। পেশোয়ার হ'তে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ২৯টি মিলিটারী ক্যানটনমেণ্টের সৈন্যবাহিনী এবং বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীরা অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীরা এই অভ্যুত্থান সফল করার জন্য এগিয়ে এসেছিল, বিভিন্ন ভাবে, সমুদ্র পথে, হাঁটাপথে দলে দলে লোক বিপ্লব প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছিল। ভারতের মত বিরাট দেশে এবং সারা পৃথিবী ব্যাপি বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু। প্রথম সারির বিপ্লবী নেতারা প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে যায়, কিন্তু রাসবিহারী বসুকে জীবিত ও মৃত যে অবস্থায়ই হউক না কেন ধরার জন্য ইংরেজ সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করতে ইংরেজ সরকার ব্যর্থ হয়। রাসবিহারী ইংরেজ প্রশাসনের মধ্যে থেকেই ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদ করার জন্য এই বিরাট সংগঠন প্রস্তুত করেন। পৃথিবীর কোন বিপ্লবীর জীবনে এই ধরণের প্রচেষ্টা হয়েছে কিনা সন্দেহ। দলের লোকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সারা ভারতব্যাপি গণঅভ্যুত্থান সফল না হলেও রাসবিহারী ভেঙ্গে পড়েন নাই, রাসবিহারী ঘুরে ঘুরে সমস্ত ঘাঁটিতে এই অবস্থায় কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে পরবর্তী কর্মপন্থার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালের ১২ই মে ইংরেজ প্রশাসন থেকেই ছদ্ম নামে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে গোপনে জাপান চলে যান। জাপান থেকেই পলাতক অবস্থায় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

১৯১৮ সালের প্রথম দিকে বৈপ্লবিক কাজের সুবিধার জন্য তোষিকার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯১৮ সালে রাসবিহারীর বিবাহের কিছু-

কাল পরে সমাপ্ত হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৫ সালের মে মাস হতে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত রাসবিহারী জাপানে পলাতক থেকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি চালিয়েছেন। পূর্ব এশিয়ার দুই মহান নেতা মহাচীনের মহানায়ক সান্‌ইয়াৎ সেন, জাপানের ব্ল্যাক ড্রাগন সমিতির নেতা ওহামা প্রমুখ অকুণ্ঠিত চিত্তে রাসবিহারীকে এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের অগ্রপথিকরূপে গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্ত করতে হবে এশিয়া, ভারতকে মুক্ত করতে হবে ইংরেজ তাড়িয়ে, ভারতের মুক্তি বিশ্বের মুক্তি রাসবিহারী এই চিন্তাধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে লেখক ও শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথমে হন টোকিও অন্তর্গত কোবুচিকান বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার শিক্ষক, পরে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এশীয় ঐক্য ও বিশ্বমৈত্রী বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে প্রভূত সাড়া পান ইংরেজী ও জাপানী ভাষায় ভারতের মুক্তি—এশিয়ার মুক্তি—মানবের মুক্তি এই মর্মকথা প্রচারে উদ্যোগী হন। বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং সমগ্র পূর্ব এশিয়াতে মুক্তি আন্দোলনের সংগঠন শুরু করেন। এমন সময় ১৯২০ সালে জাপান সরকার রাসবিহারীকে জাপানী নাগরিকরূপে গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী তোষিকা নিশ্চিত সুখী জীবন যাপন করার আশায় উৎফুল্ল হলেন। বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ ৫ বৎসর স্বামীর বিপদের কথা চিন্তা থেকে মুক্ত হলেন ভাবলেন। কিন্তু মাত্র এক বৎসর পরই ১৯২৪ সনে একটী শিশু পুত্র ও একটী শিশু কন্যার ভার রাসবিহারীর উপর অর্পন করে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

রাসবিহারীর স্ত্রী তোষিকার ত্যাগ ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। তোষিকার সঙ্গে রাসবিহারীর বিবাহ হওয়ার সময় তোষিকার পাঠাবস্থা, বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। রাসবিহারী একজন বিপ্লবী, তাঁর জীবন যে কোন মুহূর্তে শঙ্কাকুল হতে পারে, ইংরেজের হাতে পড়লে ফাঁসি নিশ্চিত এই সমস্ত বিপদ জানিয়াও সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য এবং এশিয়ার মুক্তির জন্য রাসবিহারীকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তোষিকা, নিজের সুখ-ভোগের প্রতি সামান্যতমও আকর্ষণ উপেক্ষা করে বিবাহিত জীবনের প্রায় ছয় বৎসর এই দায়িত্ব পালন করে স্বামীকে এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের অগ্রপথিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই মহিয়সী মহিলার অবদান স্বীকৃতি দিতে হবে। বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে তোষিকার স্থান নগণ্য নয়—এই সত্য তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য, এড়িয়ে চললে স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাসে খুঁত থাকবে। [চলবে]

অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র প্রদর্শনী ও জনসভা।

আগামী ২রা বৈশাখ ১৩৭৫, (ইং ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৮) বেলা ৩ ঘটিকায় চিত্তরঞ্জন স্থল, কলবার একটি জনসভা হবে। আপনাদের সক্রীয় সমর্থন কামনা করি।

ইতি—

দীনেশ ঘটক

সম্পাদক, অনুশীলন সমিতি।

২/৪/৭৮

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীঅরোদ দত্ত

অমৃতবাবু বিপ্লব আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। বিপ্লবের সাফল্যই ছিল তার জীবনের একমাত্র কামনা। চন্দননগর এবং অনুশীলনের মিলন ঘটলে এক সুদূর প্রসারী সাফল্য সম্ভব হবে, এই জন্যই তিনি মাখনবাবুর সঙ্গে মতিবাবুর মিলন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আলোচনার ফলাফল জানবার জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল। এজন্য পরদিনই তিনি চন্দননগরে উপস্থিত হলেন। মতিবাবুকে তিনি খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করলেন, "মাখনবাবুর সঙ্গে আলাপ করে আপনার কেমন মনে হল।" মতিবাবু সুস্পষ্ট ভাবে জানালেন আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু ধর্মতত্ত্বই আলোচনা হয়েছে।

এই দিনও মতিবাবুর সঙ্গে অমৃতবাবুর দীর্ঘ আলোচনা হল। অমৃতবাবু বলেন যে এই দিন মতিবাবুর সঙ্গে তাঁর আলোচনা বিশেষ ভাল লেগেছিল এবং এই দিনই মাখনবাবুর সঙ্গে দলের কি সম্পর্ক তা মতিবাবুকে খুলে বলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্টতা আরও নিবিড়তর হয়। এরপর বিবিধ বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের জন্য অমৃতবাবু প্রায়ই চন্দননগরে গিয়ে মতিবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং প্রয়োজন মত অস্ত্রাদি নিয়ে আসতেন। মতিবাবুও অমৃতবাবুকে নিজের লোক মনে করে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন।

এই যা তা হয়েছে যে ফলে চন্দননগরে বোমা প্রস্তুতের ভার অমৃতবাবুর উপর পড়ে এবং তিনি একজন উৎসাহী কর্মী বলে পরিচিত হন। ক্রমে চন্দননগর ও অনুশীলন দলের মিলিত সংগঠনের বোমার খোল নির্মাণের ভার তিনিই গ্রহণ করেন। অমৃতবাবু নিজ উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে বোমা নির্মাণ প্রণালীর বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। এ সম্পর্কে মতিবাবু লিখেছেন, "১৯১২ খ্রীস্টাব্দে অনুশীলন সমিতির সহিত আমার পরিচয় ক্রমেই দৃঢ় হয়। শশাঙ্ককে পাইয়া এতদিন যে বোমা টিনের কৌটাটে পিকরিক এ্যাসিড ভরিয়া তার জড়াইয়া কসফরাস ব্লাকের সাহায্যে আশুতায়ীর প্রাণ নাশের জন্য ব্যবহার হইতেছিল অতঃপর তাহা কাষ্ট আয়রণে (cast iron) নির্মাণ করার সুযোগ হইল। টিনে বিদীর্ণ হওয়ায় যে ফল লাভ হইত কাষ্ট আয়রণের খোলে বিস্ফোরক বস্তুর বিদারণে এইরূপ বোমার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। এই কর্মের কৃতিত্ব একমাত্র শশাঙ্কেরই।"

অমৃতবাবুর হাতে তৈরী বোমা সম্পর্কে সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এক ঔন্স বোমা অর্ধেক রেজিমেন্ট ধ্বংস করতে সক্ষম ছিল। চন্দননগর এবং অনুশীলন দলের মিলিত সাহায্যে এরপরে এই বোমাই সাহায্য করত। এইরূপ একটি বোমাই বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। চন্দননগরের বোমা নিয়েই যোগীন চক্রবর্তী শ্রীহট্ট গভর্নমেন্ট হাউস ধ্বংস করতে গিয়েছিলেন

অরুণাচল আশ্রমে অত্যাচারের জন্য শাস্তি বিধান করে মতিবাবুই গর্ডন হত্যার প্রস্তাব করেন।

অনুশীলন এবং চন্দননগর দলের পারস্পরিক সৌহার্দ্য যখন এইভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই সময় হঠাৎ একদিন শচীন স্যান্যাল কাশী থেকে কলকাতা আসেন এবং মাখনবাবুর ঠিকানা-সন্ধান করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মাখনবাবু এই সময় ৫৯নং পটুয়াটোলা লেনে থাকতেন। শচীনবাবু পূর্বে কলকাতা অনুশীলন সমিতিতে লাঠি খেলতেন পরে কাশী গিয়ে তিনি সেখানে স্বতন্ত্র ভাবে এক বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। কাশীর এই সংগঠনের নামও তিনি অনুশীলন সমিতি দেন।

১৯০৮ সালে বাঙলার বিপ্লববাদ আত্মপ্রকাশ করে এবং এর পর থেকে বিভিন্ন স্থান থেকে বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান চলতে থাকে। এর ফলে কাশীর শচীনবাবুর দল বাঙলার সঙ্গে সংযোগ সাধনে প্রয়াসী হয় এই উদ্দেশ্য নিয়েই শচীনবাবুর নিকট এসেছিলেন কিন্তু কয়েকবার সাক্ষাতের পরও মাখনবাবুর বৈপ্লবিক মত শচীনবাবুর নিকট সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য হয় নাই। উভয়ের মধ্যে আলাপ আলোচনা শেষ পর্যন্ত প্রায় তর্কবিতর্কে শেষ হত। শচীনবাবুর সঙ্গে মাখনবাবুর এই আলোচনায় অমৃতবাবু অনেক সময় নিরব দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকতেন। একদিন কলেজ স্কোয়ারে শচীনবাবুকে একাকী পেয়ে অমৃতবাবু তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। শচীনবাবুর উদ্দেশ্য জেনে অমৃতবাবু তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ আলোচনা হল। শচীনবাবু অমৃতবাবুর নিকট কাশী সংগঠনের জন্য একটি রিভলবার চাইলেন। অমৃতবাবু তা দিতে স্বীকৃত হলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে রাজাবাজার কেন্দ্রে অমৃতবাবুর বাসস্থানে গিয়ে শচীনবাবু রিভলবারটি নিয়ে এলেন।

শচীনবাবুর সঙ্গে কথা বলে ঐ দিনই অমৃতবাবু চন্দননগর চলে যান এবং মতিবাবু এবং শ্রীশ ঘোষের শচীন স্যান্যালের বিষয় সমস্ত কিছু জানালেন। পরদিন শচীনবাবু যখন রিভলবার নেবার জন্য রাজাবাজার কেন্দ্রে উপস্থিত হলেন। ঐ সময় মতিবাবু, শ্রীশবাবু এবং প্রতুল গাঙ্গুলীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতুলবাবু তখন কেয়ার জীবন যাপন করছিলেন। বিপ্লবীদের পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হল। আলোচনায় শচীনবাবু সন্তুষ্ট হলেন। স্থির হল অনুশীলন, চন্দননগর এবং কাশীর সংহতি একই সূত্রে চলবে। পূর্বদিনের অঙ্গীকার অনুযায়ী সকলের সম্মুখেই শচীনবাবুকে রিভলবারটি দেওয়া হল।

সুকিয়া স্ট্রীট থানার পাশে ১১৯/৪নং আপার সারকুলার রোডে এই সময় অমৃতবাবু থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল অনুশীলন সমিতির বাদুড়-বাগান কর্মকেন্দ্র। এর পরে মতিবাবু চন্দননগর থেকে নিয়মিত ভাবে এখানে যাওয়া আসা করতেন। একদিন শ্রীশবাবু বাসবিহারীকে নিয়ে এখানে উপস্থিত হন এবং সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন। এই বাদুড়বাগান কেন্দ্র সম্পর্কে মতিবাবু লিখেছেন, "এই বাদুড়বাগান বস্তিতে আমাদের বিপ্লবীদের শক্তিশালী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। এইখানে বসিয়া আমরা বাঙলায় বিপ্লবের আগুন ছড়াইতাম। এইখান হইতেই গোপীনাথ মৌলবী বাজারের ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার জন্য বোমা লইয়া প্রস্থান করলেন, এইখানে বসিয়াই প্রতুল গাঙ্গুলী, শচীন স্যান্যাল ও শ্রীশচন্দ্র ভারতব্যাপী বিপ্লবের চক্রজাল রচনা করিত।

উদ্বাস্তু সমস্যা

— শ্রীনিরঞ্জন হালদার

বিপ্লবী বাংলার ১৮ই চৈত্র সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য "উদ্বাস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নীতি চাই" পড়িয়া খুব অনুপ্রাণিত বোধ করিতেছি এবং আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। আশা করি যতদিন এ সমস্যার সমাধান না হয় আপনার পত্রিকা এ সম্বন্ধে সকল সংবাদ ধারাবাহিক ভাবে ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও লিখিতে থাকিবে।

১৯৪৮ থেকে আমি এই আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলাম। পঃ বাংলা লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর সভ্য হিসাবে তখনকার সরকারের তীব্র সমালোচনা করিয়াছি। ৺সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী ও ৺শীলা রায় প্রভৃতির নেতৃত্বে সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলনের মাধ্যমে বাস্তুহারাদের দৃঢ় সংগঠনকে গড়িয়া তুলিয়াছিলাম। পূর্বতন স্পীকার শ্রীঅপূর্ব মজুমদার, ডেঃ স্পীকার শ্রীহরিদাস মিত্রের মাধ্যমে বা সুহৃদ রাঁদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে কিছু কিছু সুবিধাও আদায় করিতে পারিয়াছিলাম।

দণ্ডকারণ্যের 'বেতিয়া' হইতে যে প্রায় ১০ হাজার বাস্তুহারা হাওড়া ষ্টেশনে ও হাওড়া ময়দানে আশ্রয় নিয়াছিলেন ও অবর্ণনীয় কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন তাহাদের লইয়া সত্যাগ্রহ করিয়া তাহাদের সাথে প্রেসিডেন্সী জেলেও কয়েক মাস বাস করিতে হইয়াছিল, অবশেষে তখনকার পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ৺ডাঃবিধান চন্দ্র রায়ের সাথে একটি চুক্তি করিয়া বেতিয়ার তাহাদের ক্ষেত লইয়া যাইতে ও তাহাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের অনেক সুবিধা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তার পর সুদীর্ঘ কাল কাটিয়াছে। কিন্তু দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয় নাই বিশেষতঃ চাষের জল দূরে থাক পানীয় জলের ব্যবস্থা হয় নাই অথচ রাস্তা, স্কুল প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সুদীর্ঘ ১০ বছর পরেও এখনও অনেক চাষার লোক জমির পাকা দলিল পর্যন্ত পায় নি। এটা করতে তো ২/৩ সপ্তাহের বেশী সময় লাগার কথা নয়।

পশ্চিম বঙ্গে বামপন্থী সরকার গঠনের পর বাস্তুহারা গণ স্বভাবতঃই অনেক আশ্বস্ত হয়েছেন এবং দলে দলে হাজারে হাজারে ফিরে আসছেন। তাদের আসতে না দেওয়া রাস্তায় আটকানো বা জোর করে ফেরত পাঠান খুবই নিষ্ঠুর ব্যবহার। এমন কি ৺ডাঃ বিধান রায়ও তাহা করেন নি।

যাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন বা যাঁহারা দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া আসিয়াছেন তাহাদের বর্ণনা মর্মান্তিক। পঃ বঙ্গ সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারকে চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া এবং দুই সরকার একত্রে দ্রুত পুনর্বাসনের, চাষের ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করুন তাহলে আর কেউ সর্বস্বান্ত হয়ে পশ্চিম বাংলায় আসতে উদ্গ্রীব হবেন না। পঃ বঃ সরকার ৪টি শিবির খুলিতেছেন সেখানে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা থাকবে এটা ভাল, তবে হাসনাবাদেই কেন একটা আশ্রয় শিবির খোলা হবে না, সেখানেও ১০০ হাজার উদ্বাস্তু এসেই-ছেন। তাদের জন্য সেখানেই শিবির খোলার বাধা কোথায়? তাদের আবার জোর করে শিবিরে পাঠানোর প্রয়োজন কি? শিবিরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হলেই উদ্বাস্তুরা সেখানে যাবার জন্য নিশ্চয়ই উৎসুক হবেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এ বিষয়ে বিশেষ কর্তব্য আছে। তাঁরা কেহই 'খণ্ডিত' স্বাধীনতার জন্য এত কষ্ট সহ্য করেন নি বা লড়েও ছিলেন না। দেশ ভাগ না হলে উদ্বাস্তু সমস্যাই হত না কিন্তু যখন সমস্যা হয়েছেই বিপ্লবী বাংলা পরিষদের একান্ত কর্তব্য উদ্বাস্তুদের আশু সমস্যা নিয়ে সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করা।

আর একটা কথা সরকার বলিতেছেন। আন্দামানে আর একজনও বাঙ্গালী নয়। কেন নয়? আন্দামানে না হলে নিকোবরে বা তখনকার ১০০০ দ্বীপের মধ্যে আর কোথায়ও নয় কেন। দণ্ডকারণ্যের জমি ভাল নয় জল দুষ্প্রাপ্য। আন্দামান নিকোবারে জমি জলও আছে। বাঙ্গালীদের পক্ষে আন্দামান নিকোবরের আবহাওয়া অনেক অনুকূল। তাছাড়া নেতাজীর নেতৃত্বে এই দ্বীপ গুলি ভারতের আগেই স্বাধীন হইয়াছিল সেখানে অন্ধ্রেরাও আসুক কিন্তু বাঙ্গালীর স্থান হইবেনা কেন?

১৯৫০ সালে আমি বেঙ্গল এসেম্বলীর মেম্বার ছিলাম— ৺নিকুঞ্জ মাইতি তখন কংগ্রেসের পুনর্বাসন মন্ত্রী—আমি তিন বছরের জন্য স্বয়ং নির্বাসনে যেয়ে আন্দামান নিকো-বরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে বিনা বেতনে সাহায্য করিবার প্রস্তাব দিয়াছিলাম কিন্তু তা গৃহীত হয়নি। আমি এক বছরের জন্য এখনও ঐ কাজ করিতে রাজী আছি। কেন্দ্রীয় সরকার তা গ্রহণ করিবেন কি?

আমার বয়স এখন ৮২ র কাছাকাছি—তবু ঐই বৃদ্ধবয়সেও আমার ক্ষুদ্র শক্তি এই কাজের জন্য দিতে শুধু রাজী নয় উদগ্রীব আছি। আশাকরি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই কর্তব্যপালনে উৎসাহের সাথে যোগ দেবেন।

আদর্শের অপমৃত্যু

—শ্রীসতীভূষণ সেন

লোকনায়ক জয়প্রকাশ আজ ব্যর্থ! জনতা দলের আধ্যাত্মিক গুরু, ক্লান্ত বিধ্বস্ত, ৭৫ বছর বয়সের চিরসংগ্রামী নেতা, মাথা নাড়লেন। বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন জানালা দিয়ে। অবশেষে মুখ খুললেন; আস্তে আস্তে, থেমে থেমে, বলতে লাগলেন। "আমার শরীর আর দিচ্ছে না ভাই। তা যদি না হত, তবে তোমাদের সঙ্গে থাকতাম কিছু না কিছু, করতে পারতাম নিশ্চয়ই। এবার আমায় বিদায় দেও দেশবাসী।"

কদমকুয়ার বাড়ী, পায়ের কাছে বসে প্রিয় কিষাণ দল। তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। নালিশ করতে এসেছিল নেতার কাছে, জনতা আর কংগ্রেসে কোন পার্থক্যই নেই। গ্রামোন্নয়নের কাজ, অশিক্ষিত পল্লীবাসীকে হাত ধরে পথ দেখানো, সে কাজের মানুষ জনতা দলে নেই। হয়ত বা কোথাও নেই। জনতা দলের একটা শাখাও গঠিত হয়নি বিহারে। সরকার যা স্থাপিত হয়েছে, তারা শুধু পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা রক্ষা করছে, আর তাই ব্লাকারদের মধ্যে 'পেট্রলেজ' বিতরণ করছে। আর যা দেখছি সে তো বারোভূতের নাচ।——জয়প্রকাশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। অনেক ইতঃস্তত করে শেষটায় বলেই ফেললো, তারা আপনি আবার আসুন, আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। আমরা কি করব, বলে দিন"—— মাসের পর মাস এমনিই চলছে কদমকুয়ায়। দূর দূর থেকে কিষাণদল আসে, স্বপ্ন-ভঙ্গের বর্ণনা দেয়, নেতাকে আহ্বান করে কর্মক্ষেত্রে নামবার জন্য। দিনের পর দিন বেশী করে অনুভব করেন জয়প্রকাশ, তিনি ফুরিয়ে গেছেন। জনতা সরকারের তিন মহারথী, মোরারজী, চৌধুরি আর বাবুজীর কাছে কদমকুয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তাঁদের বিশ্বাস নিজ নিজ জ্ঞান ও তপস্যার শক্তিতেই শিখরে আরোহণ করেছেন। জয়প্রকাশ আজ উদ্বৃত্ত। কিষাণদল, যারা পায়ের কাছে বসে আছে, আগামী কাল তাদের কাছেও উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বেন, যখনই তারা কাজে নামবে নতুন নেতৃত্বের আহ্বানে। জনতাকে চালাবার সাহস তাঁর আর নেই। জনতাকে গড়বার সাধও ধুলায় মিশে গেছে।

কয়েকদিন আগে ইন্দিরার পাকিস্তান বিজয়ের কাহিনী ঘোষিত হয়েছে। স্বভাবতই জনতা শিবির বিমর্ষ, ইন্দিরা শিবির উল্লসিত। এ উল্লাস ক্ষণস্থায়ী। কারণ সাধারণ নির্বাচনের এখনো অনেক দেরি, যদি কোন অঘটন না ঘটে। সুদীর্ঘ চার বছর; এই চার বছর জনগণের চোখের সামনে থাকতে না পারলেই ডুবে যাবেন রাজনীতির খেয়ায়। হিন্দি অঞ্চলেও একটা নির্ভরযোগ্য Base পাওয়া যাচ্ছে না। .....এমন সময় ভগবানের আশীর্বাদের মত এসে পড়ল 'ভারনালে'র উপনির্বাচন। নির্বাচনে হারলেও ডঙ্কা বাজিয়ে বিজয় নিশান উড়িয়ে দিলেন ইন্দিরা। উত্তর ভারতে ভিত্তি স্থাপিত করলেন। ৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনে যেখানে তিন লক্ষ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন, এবার ব্যবধান মাত্র ১৮ হাজার ভোটের। এই নির্বাচনে আরও প্রমাণ করল যে দেশের জনগণ ইন্দিরার কংগ্রেসকেই আসল কংগ্রেসের মর্যাদা দিয়েছে।

গতবছরের সেই স্বাধীনতার সংগ্রাম, হারানো স্বাধীনতা, ফেরে আনবার সংগ্রামের কথা কি জনগণ এর মধ্যেই ভুলে গেল? সহরের মানুষরা ভোলে নি; বোম্বাই, আমেদাবাদ ও হায়দারাবাদ সহরের ভোটদাতা 'জনতাকেই সমর্থন করেছে। ভুলতে আরম্ভ করেছে গ্রামের মানুষরা। তারাই তো দেশের পাঁচভাগের চার ভাগ; ৬২ কোটির মধ্যে ৪০ কোটিই বাস করে গ্রামে। স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছিল, কিন্তু পেটে দুটো বেশী পয়সা কি দিতে পেরেছে? না জিনিষপত্রের দাম নেমে এসেছে নাগালের মধ্যে? পাচ্ছে কি কাজ কিম্বা চাকরী, যে দুটো পয়সা হাতে নিয়ে সওদা করতে যাবে? তবে লাভটা কি হল ইন্দিরাকে হারিয়ে? লাভ যা হয়েছে, পয়সা যা এসেছে, তা এসেছে বড় কিষাণদের ঘরে। গত দুবছর ফসল উঠেছে বেশী [এ বছর তো আরও বেশী উঠবে], সংরক্ষণ মূল্য বেঁধে দিয়েছেন সরকার, মাল বাজারে এনে ঢালো আর টাকা নিয়ে যাও নগদা নগদ। টাকা যে এসেছে তার যোক্ষম প্রমাণ দেখবেন গ্রামে গেলে, দুর্বলের উপর উৎপীড়ন কী পরিমাণ বেড়েছে। কতো অতুগৃহ দাহ হচ্ছে এখানে, ওখানে, কত নিশাদ চণ্ডাল পুড়ে মরছে রোজ। টাকার গরমে উপর তলার মানুষদের sport এর স্পৃহা কেমন বেড়ে উঠেছে।

কেউ আশা করেনা যে মন্ত্র পড়ে রাতারাতি দুধ করে জিনিষপত্রের দাম কমিয়ে ফেলবে জনতা সরকার। একদিনে দেশের চেহারা পাল্টে দেবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নেই। কিন্তু যে পথে চলছি, সে আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, সেটা সকলেই বুঝতে পারে। কর্তাদের উদ্বেগ ও কাজে অস্থিরতা দেখলে ভিন্নতে ভুল করে না কেউ। ... জনতাকে আর ঠকানো বিশ্বাস করতে পারছে না, এ বছরের নির্বাচনে তারই ইঙ্গিত। এ ভোট ইন্দিরার সমর্থন নয়, এ ভোট জনতাকে বর্জন।

ইন্দিরা তাঁর কার্যকর্মের জন্য এখনো বিন্দুমাত্রও অনুতপ্ত হননি। জরুরী অবস্থা জারি করে, দেশবাসীর চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছিলেন। মুখ বেঁধে হাতে পায়ে শিকল পরাবার আয়োজন করেছিলেন। সে জন্য যদি একবারও দুঃখ প্রকাশ করতেন, তবু বুঝতাম। শুধু জরুরী অবস্থার 'বাড়াবাড়ির' জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং সম্পূর্ণ দোষ চাপিয়েছেন তাঁর ভাই বুদ্ধিহীন বা অধস্তন কর্মচারীদের উপর। দোষ তাঁরও নয়, তাঁর পুত্র সঞ্জয়েরও নয়। দেশের মানুষ তাঁর কথায় বিশ্বাস করেনি। মুক্ত হাতে বিদায় করেছিল গত বছর।

আজ দেশের মানুষ কি অন্যভাবে ভাবতে সুরু করেছে? তারা কি মনে করছে যে ইন্দিরা যদি এতই খারাপ তবে তিনি ৪২তম সংশোধনটা পাশ করিয়ে নিলেন না কেন? সেই সংশোধনে ছিল যে প্রধানমন্ত্রীর কোন অপরাধ, দেওয়ানী বা ফৌজদারী যাই হোক, মন্ত্রীত্বের সময়ে কিম্বা আগে পরে যখনই হোক, তার বিচার করা চলবে না। আইনটা পাশ করিয়ে নিলে তো শাহ কমিশনের সামনে অপরাধী হয়ে দাঁড়াতে হত না। আইনটা রাজ্যসভায় পাশ হয়েছিল, কিন্তু লোকসভায় উপস্থিত করা হল না কেন? দুই তৃতীয়াংশ মেজরিটি তো তাঁর ছিল। কিংবা ধরুন এই যে গত বছরের নির্বাচন, সেটা করাবার তো কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। আরো এক বছর স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করতে পারতেন এবং রাজ্যপাল খাড়িয়েও নিতে পারতেন। তবে কি ইন্দিরা ডিক্টেটারশিপ চান নি? দেশের ঊষবর্ধমান অরাজকতার মোকাবেলা করবার জন্য অস্থায়ী 'এমারজেন্সি' প্রয়োগ করেছিলেন?

এই ধরণের ছাপা সন্দেহ কি এসেছে মানুষের মনে? শাহ কমিশনের শুনানীর সময় আদালতে আর তেমন জনসমাগম হয় না। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় আর শাহ কমিশনের তদন্তসংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয় না। ভোট যুদ্ধে ইন্দিরাকে পরাজিত করার পরে, স্বভাবতঃই নিজের কাজের সমর্থনে জনগণ কমিশনকে স্বাগত করবে। ইন্দিরার রক্ত দর্শন করতে চাইবে। এত অল্প সময়ে সেই আগ্রহ কমে যাওয়ার কথা নয়। জনতা সরকার একবার তাকে গ্রেপ্তার করলেন, আদালত থেকে মুক্তি দিল। ইন্দিরা যদি দোষী তবে কেন তাঁকে শাস্তি না দিয়ে মুক্তি দেওয়া হল? আইনের গলদটুকু কারুর চোখে পড়ে নি, চোখেন উকিল বাবুরা। তারাও চোখেন কিনা সন্দেহ। নইলে মুন্সেফী আদালতের রায় জজসাহেবের এজলাসে উল্টে যেত না। আজ যদি আদালত বলে যে তাঁরা নির্দোষী, তবে তো ভোটদাতাদের বিচারটা ভুল হয়ে গেছে। এই রকম একটা সন্দেহের কালো ছায়া জন্ম নিয়েছে আজ সকলের মনে। সেটা বাড়তে বাড়তে চলেছে জনতা সরকারের প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যর্থতায়। ঘনীভূত হয়ে উঠেছে শাসকদলের অন্তর্দলীয় টানা পোড়েনের ফলে। বিরক্ত হয়ে উঠেছে দেশবাসী বারোভূতের পাগল নাচ দেখতে দেখতে।

এপ্রিলের গোড়ার দিকে জনতা দলের বৈঠক ডাকা হল, দল রক্ষার প্রয়োজনে। পক্ষপাতী মিলিত হলেন। খানাপিনারও আয়োজন ছিল, দুদিনের বৈঠক। সেই কি ছিল জানা যায় নি, আলোচনা যা হল তাও রুদ্ধদ্বারের ভেতরে। অবশেষে দলের সভাপতি চন্দ্রশেখর একটি বিবৃতি দিলেন। বললেন, "দলের নেতাদের মধ্যে যে গুরুতর মতবিরোধ আছে বলে শুনেছিলেন, সেটা সত্য নয়। আমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধই নেই। জনতা পার্টি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত। এখন থেকে সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে দলীয় শৃঙ্খলা আরোপ করে, সাংগঠনিক

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

নেতৃত্ব

(২)

॥ কৌটিল্য ॥

নেতৃত্ব আর ব্যক্তিত্ব গুণগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একক কিছু নহে। এ-দুয়ের সংযোগ যেমন ঘটে, তেমন আবার বিয়োগও ঘটে। ইতিহাসে এর দুই রকম দৃষ্টান্তই মেলে। যেমন রাশিয়ার স্টালিনের আমোল, আর স্টালিনের পরবর্তী আমোল। ওখানে ব্যক্তিত্বের অভাব নেই, কিন্তু নেতৃত্ব দেবার লোকের অভাব আছে। তাই যৌথ এবং সংযোগের প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে। যখন তখন টানে পোড়েনে এক যৌথ নেতৃত্বের কথা ওঠে। ব্যক্তিত্বে

(১০ পাতার পর)

কর্মধারার উন্নতি করা হবে। স্থির হয়েছে সরকারী ভবিষ্যতে আর বিবৃতি ও পালটা বিবৃতি দেবেন না। কোন মত পার্থক্য উপস্থিত হলে, সেই পার্থক্যের বিষয়গুলি দলীয় সদস্যদের গোচরে আনবেন।"—তা ঐক্যের অন্দরের দোরটা কাপড় সরসরকে দোরো বন্ধ হলেই আমরা কৃতজ্ঞ হবো।

জনতাদল শাসন ভার গ্রহণ করেছিলেন একবছর আগে। সেই শুভদিনে কৃতজ্ঞ জনতা আচার্য জয়প্রকাশকে লোকনায়ক উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কথা দিয়েছিলেন নেতা, জনতা শাসনের একবছর পূর্তি উৎসবে তিনি একটি সমীক্ষা প্রচার করবেন, কি কি করেছেন জনতা সরকার, আর কি কি পারেন নি। সেই থেকে আচার্য তাঁর কদমকুয়ার মন্দিরে প্রতিশ্রুতিত। আচার্য স্পষ্টবক্তা, সমীক্ষার নির্দিষ্ট সময়ও আগতপ্রায় বলবার কথা অনেক আছে, যা প্রকাশ্যে বলে ফেললে 'ঘরোয়া এটমবোমার মতই বিস্ফোরনের সম্ভাবনা। বিনতাদিনের বন্ধুরা ঘন ঘন তীর্থভ্রমণে যাচ্ছেন কদমকুয়ায়। মাকিনি জয়প্রকাশের আঙুলে, ভক্ত রাধানাথ গোয়েঙ্কা, সাঁইবাবার শক্তির প্রতীক একটি অঙ্গুরীয়ক পরিয়ে দিয়েছেন, মাথার উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছেন সাঁইবাবার মূর্তি, অলৌকিক আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে অনুক্ষণ ছাইয়ের ধারার মত।

পারলে একমাত্র অলৌকিক শক্তিই পারবে, জনতা দলকে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়া থেকে রক্ষা করতে।

ক্ষমতার কেন্দ্র যখন একেবারেই সংযোগ, তার সঞ্চালনীলতা হারিয়ে যায়, তখন সবাই মিলে এক 'হরিবোলা' যৌথ নেতৃত্ব সৃষ্টি করে। এর আভ্যন্তরীন পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের কাঁটাটা খচখচ করে একে অন্যকে বিঁধতে থাকে কিন্তু মুখ ফুটে বলার উপায় নেই। কেননা, কোন ব্যক্তিত্বেরই এমন ক্ষমতা নেই যে শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে তোলে। এই 'হরিবোলা' যৌথ নেতৃত্বের বাইরের পরিবেশ বস্তুটা বেশ মসৃণমাট বলে মনে হয়, আসল ভেতর কার জীর্ণ কঙ্কালসার নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাসটাকে ঢাকবার জন্য এই আস্ফালন। সব নেতৃত্বই মোটামুটি একটা পরামর্শের দ্বারা পরিচালিত হয় তার অর্থ এই নয় যে, কোন বিশেষ ব্যক্তির সাহস, দূরদৃষ্টি, ক্ষমতা প্রয়োগের সাবলীল স্বাধীনতা সবসময়ই কারণে অকারণে যাথাওনতে ছোটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আর এখানে "স্বাধীনতা" কথাটিকে স্বেচ্ছাচার অর্থে না-বোঝাই ভাল। কেননা, 'স্বেচ্ছাচার' কথাটি সব সময়ই নঞর্থক। আর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন স্বাধীন চিন্তা সবসময়ই সার্থক। চিন্তার কোন সার্থকতা না থাকলে তা সমাজ গ্রহণ করে না। এটা হতে পারে যে শুভচিন্তা সমাজে প্রসার লাভ করতে সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

যেখানে সাহসিকতা দরকার, সেখানে নেতৃত্বকে দ্বিধাহীন চিত্তে তা গ্রহণ করতে হবে, সঙ্কীর্ন সাময়িক সুবিধা-অসুবিধা দ্বারা পরিচালিত হলে চলবে না, নেতৃত্বের মধ্যে ভীরুতার কোন স্থান নেই। ভবিষ্যতের সফলতার দিকে দৃষ্টি রেখে বর্তমানের অসুবিধাকে পায় ঠেলে যেতে হবে। বর্তমানের বিপদকে উপেক্ষা করার অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতাই নেতৃত্বের গৌরবোজ্জ্বল দিক। কালে ভদ্রে নেতৃত্বের মাঝে এই তৃতীয় সাহসিকতার পরিচয় মেলে। বিপদকে উপেক্ষা করার দুর্দমনীয় ক্ষমতা ভারতে দুটি নেতৃত্বের মাঝে দেখা গেছে। এক মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী। আর ইন্দিরা গান্ধী। এক কথা স্বীকার করতেই হবে, এ দুয়ের নেতৃত্বের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। কর্মধারা ভিন্নতর খাতে, জটীলতার আবর্তের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। পাক স্বাধীনতার বিপদজনক পরিস্থিতি, আর স্বাধীনতোর ভারতের বিপদজনক পরিস্থিতি

সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের এটা সবাই স্বীকার করবেন। মহাত্মাজীকে পরাধীন ভারতের নেতৃত্ব দিতে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে, এবং সে বিপদকে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বাধীনোত্তর ভারতে দুটি বিপদ সামনে এসেছিল, একটা পণ্ডিত জওহরলাল আমলে আর একটা ইন্দিরা গান্ধীর আমোলে। চীন যুদ্ধের সময় নেহেরুজী যে জাতীয় দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন তা আজ আর কারুর অজানা নেই। তিব্বত গ্রাস করার পর চীন যদি ভারতের কাছ থেকে শক্তিশালী বাধা পেত তবে, এশিয়ার রাজনীতি আজ ভিন্ন পথে চলত। সীমান্ত যুদ্ধের কোন শক্তিগত মীমাংসা না করে, বিশ্বের কাছে নেহেরুজী অহিংসা শান্তি বাদী হতে পেরেছিলেন।

শান্তির সেই নিশানা নেহেরুজীর করে কোথায় হারিয়ে গেছে। তারপর লালবাহাদুরজীর আমোলে পাকীস্তান ভারত যুদ্ধ। তাও শুধু মীমাংসা আর আলাপে পর্য্যবসিত হয়েছে। তৃতীয় শক্তির নেতৃত্বে ইন্দিরাজীর আবির্ভাব এবং শক্ত হাতে হাল ধরে ইন্দিরাজী পাকীস্তানের রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলেন। আজ বাংলাদেশ একটা রাষ্ট্র। তৃতীয় নেতৃত্বের সময়কার ভারত অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। নেহেরুজীকে এমনটা দেখতে হয়নি। তার ওপর বৈদেশিক শক্তির অশুভ ছায়া এখানে লুকোচুরি খেলছে। মহাত্মাজীর তুলনায় ইন্দিরাজীর ক্ষমতা অনেক সীমাবদ্ধ। কিন্তু সমস্যার গোড়াপত্তন অনেক গভীরে, জটিলতার জট আরো সুদৃঢ় করে পাকানো।

দক্ষিণ ভারতে যেদিন গান্ধীজী মন্দির-প্রবেশ অধিকার আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সেদিন তাঁর ওপর বোমা পড়েছিল গান্ধীজী তিলমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেন নি। মৃত্যু ভয়, সমাজ ডুবে যাবার ভয় থাকলে কোন মহৎ কাজ করা যায় না। আক্রমণ ইন্দিরা গান্ধীর ওপর কম হয়নি, উড়িষ্যায় একবার চরেছিল, বরদা বোমার কথা আর আমার অবিদিত নেই। সেদিনও দক্ষিণ ভারতে কম হামলা হয়নি। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, রাজন্য ভাতা বিলোপের পর থেকেই 'ইন্দিরা হঠাও' স্লোগান ওঠে। তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, 'গরিবী হঠাও', সংবাদ পত্রের পাতায় এ সব তথ্য আজ পাওয়া যাবে। 'গরিবী হঠাও' কথাটা যে অন্তর্গর্ভ তা ইন্দিরা গান্ধী নিজেও জানতেন। ইচ্ছা করলেই গরিবী হঠানো যায় না। তার প্রস্তুতি পূর্বে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এসে সমস্ত পরিকল্পনাকে বিপর্য্যস্ত করে দেয়।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, সাধারণ বীমা জাতীয়করণ, রাজন্য-ভাতা বিলোপ, কয়লা শিল্পের জাতীয়করণ, জাতীয় সুতীবস্ত্র বোর্ড, কুটির শিল্প বোর্ড, শহরের সম্পত্তির সীমা নির্দ্ধারণ,—'গরিবী হঠাবার' সামান্যতম প্রয়াস মাত্র। যাঁদের মন রাতারাতি আশ্চর্য্যজনক দেখতে উৎসুক, তাঁদের মন এতে সন্তুষ্ট হবার নয়। তাঁরা যেন এসব ব্যাপারে আরো আশাহত হলেন। কিন্তু যাঁরা হাতে কলমে কাজ করেন তাঁদের নিছক হাততালির দিকে তাকালে হয় না। জনপ্রিয়তার নেশায় অবাস্তব কাল্পনিক কথা ফুলঝুরি ছড়ালেও হয় না, ইন্দিরাগান্ধী কি পরিস্থিতির মধ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন আজ দেশবাসী সব কথা ভুলে গেছেন দিল্লীর রামলীলা ময়দান থেকে শুরু করে পাটনা, নয়কারী প্রপুর, গুজরাটের নব নির্ম্মান সমিতি থেকে শুরু করে সংঘর্ষ সমিতি—সবই একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার দিক নির্দ্দেশ করে। এবং সে পরিকল্পনা গৃহ যুদ্ধের। এবং এর নেতৃত্ব দেবার জন্য স্বয়ং জয়প্রকাশ নারায়ণ এগিয়ে এসেছেন। হঠাৎ জয়প্রকাশ নারায়নের এই ভূমিকার সঙ্গে অন্ত অনর্থক অহক বিষয় জড়িয়ে আছে খাস দিল্লীতে জনসঙ্ঘ কি ভাবে এই গৃহযুদ্ধের এই মহড়া দিয়েছিল তা আজ সংবাদ পত্রের কবরে জীবিত আছে। ইন্দিরা গান্ধী মুর্দাবাদ, ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ'—এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির অবিরাম মুখোমুখী স্লোগানে দিল্লী তখন ধ্বনিত প্রতি ধ্বনিত।

(চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন]

(পূর্বানুবৃত্তি)

লাহোরে আমাকে আমার সর্বস্তরে স্বদেশবাসিগণ প্রীতি ও সহৃদয়তার সহিত স্বাগত জানালেন, হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকল শ্রেণীর লোকের কাছ থেকেই আমি তা লাভ করেছি। বন্ধুত্বের এই সুন্দর অভিব্যক্তি আমার নিকট এক সত্যের আবির্ভাব বলে মনে হল, আমার মনে হল একই শাসন ব্যবস্থা, একই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের বহু আকাঙ্খিত আদর্শ লাভের ভিত্তি ভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছে, জাতীয় জীবনের সার্বজনিক আশা আকাঙ্খা ও লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সারাদেশের বিভিন্ন প্রদেশকে একসূত্রে গ্রথিত করে একযোগে ঐক্য বদ্ধ ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে—এই হল আমাদের লক্ষ্য। লাহোরে এক জনসভা হল, সভায় বিপুল জন সমাগম হয়। সর্বশ্রেণীর লোক দলে দলে এসে সভায় যোগদান করেন। কলকাতার জন সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেই প্রস্তাব এবং সিভিল সার্ভিস সম্পর্কীয় স্মারক পত্র লাহোরের সেই সভায় গৃহিত হল। এই সভা ছাড়া আরও একটি জনসভার অনুষ্ঠান সেখানে হয়। সেই সভায় আমি ভারতীয় গণের মধ্যে ঐক্য ও সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তৃতা করি। সভায় লাহোর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি গঠন করা হল। এই সমিতির গঠনতন্ত্র কলকাতার "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের" ধাচেই তৈরী হয় এবং কলকাতা সমিতির সহিত যুক্ত হয়ে যায়। আমার মনেহয় পাঞ্জাবের সর্বশ্রেণী ও সম্প্রদায়ের জন্য এক সাধারণ বন্ধনরূপে গড়ে ওঠার এটিই ছিল সেখানে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। এই সমিতি প্রদেশের জন্য বহু উত্তম জন হিতকর কাজ করেছে।

পাঞ্জাবে অনেকের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল কিন্তু হায়, সে বন্ধুদের মধ্যে আজ আর কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু তাদের স্মৃতি আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে মূল্যবান সম্পদরূপে বহন করে চলেছি। সেখানে আমি সর্দার দয়ালসিং মজিতিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার এই প্রথম, অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের পরিচয় ঘনীভূত হয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যক্তিগত বন্ধুত্বে পরিণত হয়। প্রকৃত সৎ এবং মহাপ্রাণ যে সমস্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আমি এসেছি, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। হয়ত তাঁকে এবং তাঁর অন্তরের গভীরে অনুপ্রবেশ করা কঠিন ছিল। কারণ, তাঁর প্রকৃতিতে ছিল একটা আভিজাত্যিক সাবধানতা যা তাঁর অন্তরের খাঁটি সোনার মানুষটিকে সাধারণের কাছ থেকে আড়াল করে রাখত। আমি যে কাজের ভার নিয়েছি, তিনি সক্রিয় ভাবে সে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আমি তাঁকে লাহোরে একটি সংবাদ পত্র প্রকাশ করতে রাজি করালাম, তাঁর নামে কলকাতায় আমি "ট্রিবিউন" পত্রিকার জন্য প্রথম প্রেসটি ক্রয় করি। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক নিয়োগের ভারও তিনি আমাকে দিলেন। আমি ঢাকার স্বর্গত শীতলাকান্ত চাটার্জিকে সেই পদের জন্য সুপারিশ করলাম। শীতলাবাবু প্রথম সম্পাদকরূপে যে সাহসের পরিচয়

দিয়েছেন তাতে আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয়েছিল তা প্রমাণিত হল। তাঁর নির্ভীকতা, তাঁর সাহস, সমস্ত বিষয়ের গভীরে কি আছে তা খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতা এবং সর্বোপরি যে গুণটি একজন ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীর পক্ষে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকা প্রয়োজন—সেই উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত সততা, অতি সহজ তাঁকে স্বদেশসেবী লেখক শ্রেণীর প্রথম সারিতে স্থাপন করল।

ট্রিবিউন পত্রিকা অচিরেই জনমতের শক্তিশালী মুখপত্র হয়ে উঠল, সম্ভবতঃ পাঞ্জাবে বর্তমানে সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালীতারহীন পত্রিকা এই ট্রিবিউন। যে ভদ্রলোক এখন এই পত্রিকার সম্পাদনা করছেন তিনি প্রথম জীবনে আমারই সহিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার একজন সহযোগীরূপে কাজ করেছেন। সর্দারজি পাঞ্জাবের জন্য যে অবদান রেখে গেছেন, তা তাঁর এই পত্রিকা প্রকাশেই শেষ হয়নি। তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব দেশের স্বার্থে দান করে গেছেন। পাঞ্জাবের দয়াল সিং কলেজ পাঞ্জাবের এই সুযোগ্য সন্তানের কীর্তিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর অকাল প্রয়াণে তাঁর নিজ প্রদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সারা ভারত আজ শোকসন্তপ্ত।

যে কাজের কথা আমি উল্লেখ করেছি তাতে সর্দার দয়াল সিং মজিঠিয়ার সঙ্গে আর যারা বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ডাঃ সুরজবালী, পণ্ডিত রামনারায়ণ এবং—যদিও শেষে নাম করছি, তা হলেও গুরুত্বে কম নয়—আছেন বাবু কালী প্রসন্ন রায়। ডাঃ সুরজ বালী একজন অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট। তিনি কাশ্মীর স্টেটে এক উচ্চ সরকারী চাকরীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ ছিলেন একজন সুযোগ্য আইনজীবী। এই রামনারায়ণই সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি পাঞ্জাব চীফ কোর্টে একজন জজের কাজ করেছিলেন, অবশ্য তাঁর সে পদ ছিল অস্থায়ী। তবে তাঁর প্রতি সময় ব্যবহার করলে তিনি সে পদে স্থায়ী ও চূড়ান্ত ভাবেই নিযুক্ত হতেন। কালীপ্রসন্ন রায় ছিলেন একজন উজ্জ্বল আইনজীবী। আইন ব্যবসায়ের কাজে যোগ্যতা অর্জন করে তিনি লাহোরে চলে যান। সেখানে তিনি তাঁর আইন ব্যবসায়ের কাজ শুরু করেন। এডভোকেট হিসাবে লাহোর বারে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ বড় ছিলেন না। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র একজন আইনজীবিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন অমায়িক সহকর্মী এবং একজন উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রেমিক। সমস্ত রাজ-আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তিনি বাংলায় এসে স্বগ্রামে অবসর যাপন করতে বাধ্য হলেও জন-সেবামূলক কাজেই তিনি শরীর ও মন নিয়োজিত রাখেন। এই রকম একজন লোকের নাম বিস্মৃতির তলদেশ থেকে উদ্ধার করা উচিত। কিন্তু আমার মনে আশঙ্কা এই যে এদেশে জনসেবার কথা প্রায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই লোকে ভুলে যায়, কারণ, বর্তমান কালের রেওয়াজই হচ্ছে কেবল সমালোচনা করা, জনসেবা নয় বা জন-সেবাকে তাদিক করা নয়।

লাহোর ত্যাগ করে আমি ক্রমান্বয়ে অমৃতসর, মীরাট এলাহাবাদ, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলিগড় ও বেনারস ভ্রমণ করলাম, সব জায়গাতেই বড় বড় সভার অনুষ্ঠান হয়। সেই সমস্ত সভায় কলকাতার প্রস্তাব ও সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়াল গৃহীত হয়, এবং যেখানে সম্ভব হয়েছে কলকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে মিল রেখে এক একটি রাজনৈতিক সমিতি গঠন করা হল, লাহোর, মীরাট, এলাহাবাদ, কানপুর, এবং লক্ষ্ণৌয়ে এই রকম সমিতি গড়ে উঠলো। এই ভাবে এক সংগঠনের জাল বুনান হল। সংগঠনগুলির বন্ধন যে বেশ ভাল করেই গড়ে তোলা হয়েছিল, যার ফলে কলকাতা থেকে লাহোর পর্যন্ত বিশাল ক্ষেত্রে একযোগে সুসংবদ্ধ ভাবে সমস্ত প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়, পরবর্তীকালের ঘটনাবলীই তা প্রমাণ করেছে। পর বৎসরে আমি যখন এই কাজের জন্য মাদ্রাজ, বোম্বে এবং পশ্চিম প্রান্তের আরও কতকগুলি শহর পরিভ্রমণ করি তখন এই আন্দোলন এর সমস্ত কার্যকরী শক্তি ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে আরও বিস্তার লাভ করে। (চলবে)

(contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—Calcutta		
Paul Jamini Bhusan,	276, Gopal Lal Thakur Rd, Cal-35	200	1. 10. 76
Paul Nepal Chandra,	1/17, Rishi Bankim Ch. Rd. Cal-28	170	
Paul Prafulla Ranjan,	9-B, Dum Dum Road, Cal-30	160	
Paul Satish Chandra	3/3C, Paddapukur Rd, Cal-40	170	
Paul Chowdhury Bibbuti Bhusan,	97. Nandan Nagar, Cal-56	160	
Pal Chowddury Shyam Benode	12/1, Raja Manindra Rd. Cal-12	155	
Rakshit Smt. Pravabati	7/24, Bijoygarh Colony, Cal-12	200	
W/o. Late Ramanath Rakshit	104/C, Karaya Rd. Cal-17	125	
Rakshit Roy Smt. Ujjala,	104/C, Karaya Road, Cal-17	125	
W/o. Late Beupendra Kishore,			
Roy Gopen Chandra,	Paschim Barisha, Cal-63	200	19. 1. 77
	R. G. H. E. R/F G (1st Floor)		
Roy Chowdhury Smt. Reba	5/7, Mrtajinagar, Cal-40	100	1. 10. 76
W/o. Late Khagendra Nath			
Rudra Smt. Renukana,	Poddar Park, Block-9. 5. 7 Cal-45	100	27.11.77
W/o. Late Santosh Chandaa			
Rudra Smt. Kiron Bala	42, Ghola Rd. Cal-56	200	1.10.76
W/o. Late Manasha Charan			
Sarkar Ranjit,	1/1/16, Dum Dum Rd. Cal-2	150	
Sen Gupta Smt. Subarnabala,	Arjunpur Dum Dum, Cal-59	170	
W/o. Late Jitendra Nath			
Sen Gupta Subodh Chandra	29, Kankurgachi 2nd Lane, Cal-54	150	,,
Kushari Birendra Nath,	Nadikul Road. Nilta, Cal-49	250	29.12.76

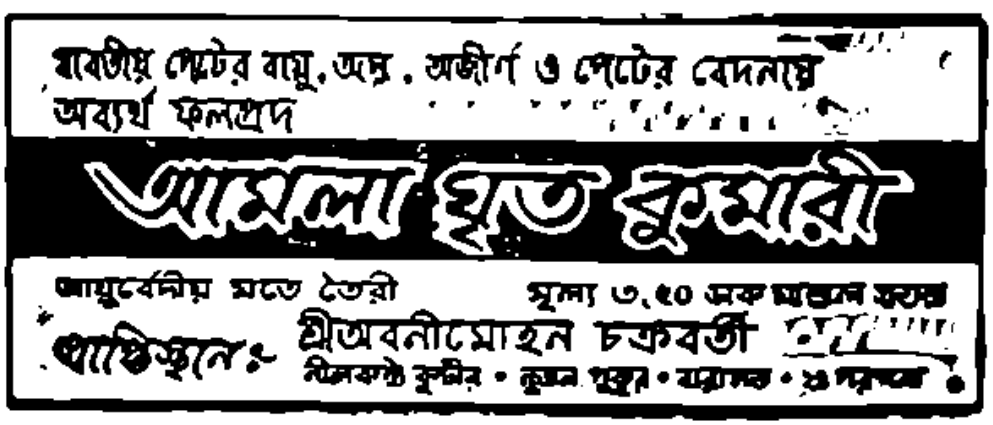

Rged No. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

19 APR 1978

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅনাদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীদুর্গা চ্যাটার্জী, শ্রীবারীশ রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি শঙ্কর রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীমনমোহন পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবাণী গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

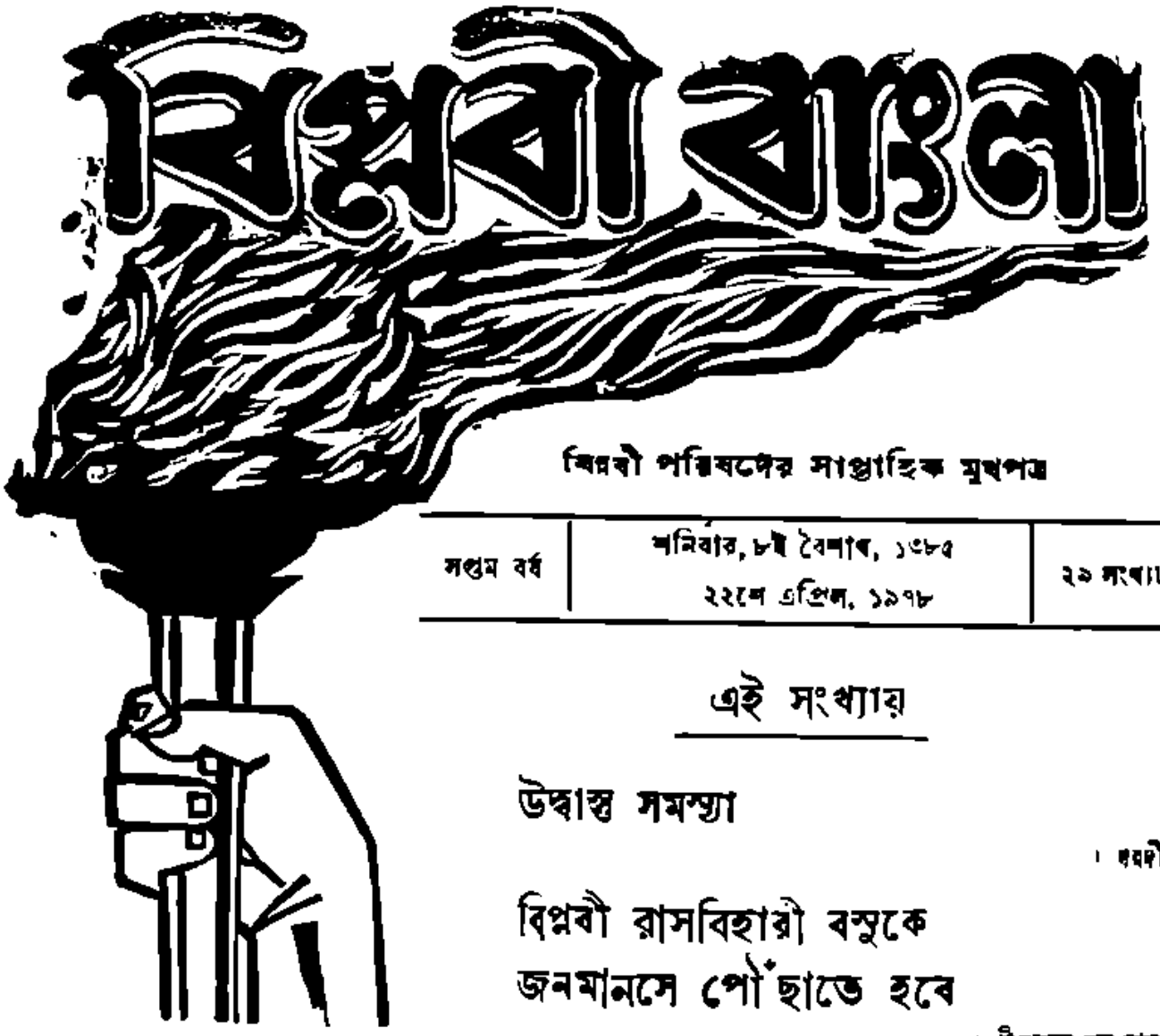

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৩৮৫ ২২শে এপ্রিল, ১৯৭৮	২৯ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

উদ্বাস্তু সমস্যা

। ধরণী

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে
জনমানসে পৌঁছাতে হবে

। শ্রীপ্রমেন্দ্র চন্দ্র দাস ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। শ্রীকীরোদ দত্ত ।

শাহ কমিশন বন্ধ কর

। পর্যবেক্ষক ।

নেতৃত্ব

। কৌটিল্য ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

রাজনৈতিক পেন্সান মঞ্জুরীর তালিকা

যে মানুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে সেই দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে যত্নবান হওয়া তার জীবনের সকল প্রকার ধর্ম।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—Howrah		
Banerjee Smt. Gouri w/o Late Tuni Lal Banerjee	Buxara Road, P. O. Santragachi	100	75. 10. 77
Bhattacharjee Smt. Parimal w/o Late Sasbit Kumar	P. O. & Vill. Babrhati P. S, Domjur	150	20. 7. 77
Chakraborty Ganesh Chandra	17/1, Ramlal Ghose Lane P. O. Liluah	200	1. 10. 76
Chowdhury Smt. Basana C/o Udvash Dutt Chowdhury House of Sital Das, Dhara	P. O. G, I. Press Colony Santragachi, Howrah	100	
Maji Smt. Golap Bala w/o Late Bishnupada Maji	Kantbilabash, P. O. Shyampur	100	16. 12. 77
Mazumder Smt. Santi Rani w/o Late Monoranjan C/o Subhas Ch. Mazumder	P. O. & Vill. Bhattanagar p. S. Liluah	150	7. 10. 75
Mitra Smt. Nihar Kana w/o Late Birendra Kumar	Block Development Office Udaya Narayanpur	100	1. 10. 76
	Hooghly District		
Banerjee Smt. Amiya w/o Late Nikhil Bandhu	F-5, Ganguly Bagan Govt. Qr. P. O. Mahesh, P. S. Sreerampur	100	1. 10. 76
Kar Roy Bhupendra Mohan C/o J. R. Roy Teacher	Kanaipur Ramkrishna Vidyapith P. O. Kanaipur	200	
Mondol Majhi Haripada	Nashinapur, P. O. Sihar P. S. Katalpur	170	
Mukherjee Smt. Gayatri w/o Late Pashupati	P. O. & Vill. Panchgora P. S. Pandua	100	8. 8. 74
Smt. Nikhil Rani	Govt, Colony (1) P. O. Makhla P. S. Uttarpara	100	1. 10. 76
Roy Smt. Parbati Bala	Vill, Radhakrishnapur P. O. Rajhati Bandur P.S, Khanakul	150	5. 11. 76

(contd. on 3rd cover)

উদ্বাস্তু সমস্যা

—দরদী

সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের পুনর্বাসন কেন্দ্র ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে পড়েছে। তাদের পশ দণ্ডকারণ্যে আর ফিরে যাবনা মরিতো বাঙলাদেশেই মরব। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এদের নিয়ে বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে এক কথায় সমস্যা সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছেন। "ওদের ফিরে পুনর্বাসন শিবিরে পাঠিয়ে দিন" অতি সোজা পথ—এসে যখন পড়েছে কেরত গাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেই সবসমস্যা চুকে গেল আর ভাবনা কি।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, সমস্যা সমাধানের পথ কি এতই সোজা? এদের আবার পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিলেই কি ছিন্নমূল নিরুপায় এই মানুষগুলির প্রতি জাতির কর্তব্য পালন করা হবে? স্বাধীনতার বলি এরা। আজ ত্রিশ বৎসর ধরে আমরা স্বাধীনতার সুখ সুবিধা ভোগ করছি। আর এরা আমাদের এই সুখ সুবিধার জন্যই দণ্ডকারণ্যের গভীর জঙ্গলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। পুনর্বাসন কেন্দ্রের ঘর সব ছেড়ে কেন তারা এই পনের বছর পরে সুন্দরবনের বাঘের মুখে পড়বার জন্য পালিয়ে এল সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তা একবারও কেউ ভেবে দেখল না। প্রধানমন্ত্রীকে আমরা এদের ত্রিশ বৎসর আগের পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। পূর্ববঙ্গে পল্লী জীবনের শান্ত পরিবেশে সেদিন তাদের দিনগুলি পরম আনন্দে না কাটলেও উন্নততর জীবনের আকর্ষণে এরা ঘর ছাড়া উদ্বাস্তু জীবন গ্রহণ করে নাই। যে রাজনীতির চক্রজালে এদের দরিদ্র গৃহগুলি সেদিন ভেঙে পড়েছিল তার উপর কোন হাত ছিল না। পূর্ববঙ্গে বসে একদিনের জন্যও তারা হয়তো দণ্ডকারণ্যের স্বপ্ন দেখেনি। দণ্ডকারণ্যে এক সময় রামসীতা বাস করতেন। তা সে সুখ স্বর্গবাসের স্বপ্ন তাদের জীবনকে মধুময় করে তোলে নাই। সেখানে যে বাঘ ভালুক আছে এ কথাও তাদের মনে হয় নাই। কিন্তু তাদের যেদিন তাদের উদ্বাস্তু জীবনে টেনে নিয়ে এল সেদিন তারা হয়তো মনে করেছিল দণ্ডকবনে যেমন রামসীতা লক্ষ্মণ কুটির বেঁধে ছিলেন তারাও না হয় তেমনি কিন্তু তবুও তো তাদের একটা আশ্রয় মিলবে।

পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে কাতারে কাতারে উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে পড়েছে এক শ্রেণীর লোকের ধারণা নিশ্চয়ই এটা স্বার্থান্বেষী লোকেদের রাজনীতির খেলা তা না হলে তারা পশ্চিমবঙ্গে এসে সমস্যার সৃষ্টি করবে কেন। কিন্তু এ কথাটি কারও মনে হচ্ছে না এই ত্রিশ বৎসর পরেও উদ্বাস্তুরা উদ্বাস্তু কেন। গৃহহীন বা কেন গৃহ পেলনা। এই জন্যই প্রধান মন্ত্রীকে আমরা জিজ্ঞাসা করছি প্রকৃত পুনর্বাসন তাদের হয়েছে কি? ভিখারী বিদায়ের বেলা তাদের অদৃষ্টে কখনও কিছু জুটেছে কি? যদি না জুটে থাকে তার কারণ কি এবং এজন্য দায়ী কে আমরা জানি এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত উদ্বাস্তু সমস্যাকে সমস্যা বলেই দেখা হয়েছে। উৎপাত যখন ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে কোনমতে তা থেকে রেহাই পাবার ব্যবস্থার সন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু প্রাণ দিয়ে দরদ দিয়ে এই ছিন্নমূল নর নারীর প্রাণের ব্যথা এক দিনের জন্যও কেউ অনুভব করে নাই। জাতির কল্যাণে স্বাধীনতার বলি এরা, এদের দুঃখ দূর করা সমগ্র জাতির দায়িত্ব এবং কর্তব্য এটা একদিনের জন্যও কেউ ভাবেন নাই। তাই নামে এদের পুনর্বাসন হয়েছে সত্যিকার পুনর্বাসন এদের হয় নাই। তাহলে আজ ত্রিশ বৎসর পরেও দণ্ডকবন দণ্ডকবন কেন। সেটা দণ্ডকপুরী হলনা কেন সেটা মনুষ্য বাসের উপযোগী হলনা। সেখানে রাস্তা পথ ঘাট স্কুল কলেজ ডাক্তারখানা হাসপাতাল কেন গড়ে উঠল না। আজ আবার এদের পুনর্বাসনের কথা চলছে কিন্তু এদিকে কারও দৃষ্টি নাই তাই আজও দেখছি কোথায় এদের পুনর্বাসন হবে দণ্ডকারণ্যে, না সুন্দরবনে না আন্দামানে এই কথাই সবাই ভাবছেন। আমরা জানি প্রকৃত পুনর্বাসন হল দুঃখ কষ্ট থেকে এদের মুক্তি। যদি তা দণ্ডকারণ্যেই সম্ভব হত কারও দুরদালিতেই এরা সেখানে থেকে ফিরে আসত না। রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক কোন চক্রই এদের সেখান থেকে টেনে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসতে পারতনা। সরকারও আজ সবত্রই এক অশুভ চক্রের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন কিন্তু উদ্বাস্তুদের নিজেদেরও যে কোন দুঃখ কষ্ট আছে এ কথা একবারের জন্যও তাদের মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমরা বলি এইটার উপরেই আজ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সরকার পক্ষ এবং বিরোধী দল উভয়কেই আমরা বলছি আপনারা সবাই মিলে আলোচনা করে কি কর্তব্য স্থির করুন। পুনর্বাসন কেন্দ্রকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলুন। তা না হলে দণ্ডকারণ্যে যতদিন অরণ্য থাকবে এই আশ্রয়হীন নরনারীর আশ্রয় কেন্দ্র সেখানে গড়ে উঠবে না আর সুন্দরবন যতদিন বন থাকবে সেখানেও উদ্বাস্তু কেন্দ্র সৃষ্টি হবে না সেখানে গেলেও এদের দুঃখ কষ্ট ঘুচবে না।

শাহ কমিশন বন্ধ কর

—পর্যবেক্ষক

অন্ধ বিধানসভার সদস্য শ্রী টি, অন্নু ধারাও প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক পত্রের মাধ্যমে দাবী করেছেন যে শাহ কমিশনের কাজ বন্ধ করা হোক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পত্রোত্তরে শ্রীরাওকে সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন শাহ কমিশনের কাজ কোন ক্রমেই বন্ধ হবেনা। প্রধান মন্ত্রীর মতে জরুরী অবস্থায় জাতির সঙ্গে যে চীনচাতুরী খেলা করা হয়েছে কমিশন তাঁরচাবে এবং রুক্ষতার সঙ্গে তারই আবরণ উন্মোচন করছেন। প্রধান মন্ত্রীর মতে এর ফল এই হবে যে ভবিষ্যতে আর কেউ এ ধরনের চাতুরীর ক্রীড়নক হবে না। আমরা কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর এ যুক্তি মেনে নিতে পারলাম না। আমরা জানি, ক্ষতস্থান উন্মুক্ত হলে তা থেকে দুর্গন্ধই বেরোয় এবং সে দুর্গন্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয় জীবদেহের পক্ষেও জাতি দেহের পক্ষেও নয় আর প্রধানমন্ত্রী চাতুরী খেলার কথা বলেছেন। জনতা সরকার কি জাতির সঙ্গে চাতুরী কম খেলেছেন? দ্রব্য মূল্য হ্রাসের প্রতিশ্রুতি রক্ষার কি হল? সে কি জাতির সঙ্গে চাতুরী খেলায় পরিণত হয় নি? দেশের সাধারণ অবস্থা যা তা দেখেতো আজ রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। রাজনৈতিক নেতাদের নিকট তিনি আবেদন করেছেন যে তারা যেন পারস্পরিক আলোচনা করে দেশ থেকে হিংসা দ্বেষের আবহাওয়া দূর করবার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থা যে জনতা সরকার করবেন সেটুকু ভরসা তিনি জনতা সরকারের উপর রাখতে পারছেন না। এমি জনতা সরকারের প্রশংসাবাদ রাষ্ট্রপতির এই প্রশংসা বাণীতে কি জনতা সরকার গৌরববোধ করছেন? রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে পত্রিকার পাতা খুললেই প্রতিদিনই তিনি দেখছেন কোননা কোন স্থানে ব্যাপক নরহত্যার কাণ্ড চলছে। এই সকল হত্যালীলা এবং জীবনহানী দেখেই অন্তরে ব্যথা পেয়ে রাষ্ট্রপতি এবারে বিভিন্ন দলনেতার নিকট আবেদন জানিয়েছেন। আজ জনতা সরকার আছেন, কাল তাদের স্থানে যারা আসবেন তারা যদি আরেকটা কমিশনের সম্মুখে জনতা সরকারকে অভিযুক্ত করেন এবং সেই বিচার আদালতে যদি বর্তমান রাষ্ট্রপতির উক্তি সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করেন সেদিন সেই কমিশন কি করবেন, এবং বিচার করে কি রায় দিবেন? প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই এ সম্পর্কে একটু ভেবে দেখবেন কি?

এ সম্পর্কে আরও একটি কথা আছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই তো বলেছেন তিনি গণতন্ত্রের উপাসক এবং গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যই তিনি সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জাতির ইচ্ছাই গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী তো জাতির ইচ্ছাই পূর্ণ করে থাকেন। সুতরাং শাহ কমিশনের কাজ চলা উচিত কিনা এবং পচা ঘেটে দুর্গন্ধ বার করা উচিত কিনা জেনে নেওয়া প্রধানমন্ত্রীর উচিত নয় কি? জাতি ইন্দিরা সরকারকে পাঁচ বছর দেখেছিল। সে সরকার জাতির আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারেনি। তাই ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে জাতি সে সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। জনতা সরকার সেদিন বড় বড় প্রতিশ্রুতির ডালি নিয়ে জাতির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল তাই জাতি ইন্দিরাকে প্রত্যাখ্যান করে জনতাকেই বরণ করে নিয়েছিল। এই জনতা সরকারকেও জাতি বৎসরাধিক কাল দেখবার সুযোগ পেয়েছে। এখনো তার জনতা মানকতা আছে কি না অথবা কতটা আছে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তা একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত কিনা প্রধানমন্ত্রী একবার তা বিবেচনা করে দেখবেন কি? অন্ততঃ শাহ কমিশনের কাজ ব্যাহত পরিচালনার আর কোন প্রয়োজন আছে কি না তা ভেবে দেখবার সময় এখন এসেছে বলে আমরা মনে করছি। আমরা মনে করছি এটা শুধু শ্রীরাওয়ের ব্যক্তিগত ইচ্ছা নয়, সমগ্র জাতির এক বৃহৎ অংশও এই ইচ্ছাই পোষণ করে। দক্ষিণ ভারতের সাম্প্রতিক নির্বাচনের পরেও কি প্রধানমন্ত্রী এ সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেন নি।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে জনমানসে পৌঁছাতে হবে

—ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস

(৩)

স্ত্রীর মৃত্যুতে রাসবিহারী বসু কর্মজীবন হতে বিচ্যুত হলেন না। শিশু কন্যা ও পুত্রের দায়িত্ব ওদের দাদু-দিদিমার (সোমা দম্পতি) উপর অর্পন করে এগিয়ে চললেন ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টায়। ১৯২৪ সালে স্থাপন করলেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লীগ। জাপান, ভারত, চীন, আফগানিস্থান, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে ১৯২৬ সালের ১লা আগষ্ট নাগাসাকিতে All Asia people's organisation গঠন করার উদ্দেশ্যে সভা করলেন। এই সংস্থার শাখা স্থাপন করলেন পিকিং, সাংহাই, ফরমোসা, কোরিয়া, টোকিয়ো, ইয়াকোহামা, নাগাসাকি, হিরোসিমা, ব্যাঙ্কক, জাভা, বালি, সুমাত্রা, হংকং প্রভৃতি স্থানে। ১৯৩৩ সালে গড়ে তুললেন ভারত জাপান মৈত্রী সমিতি এবং এশিয়ার বিপ্লবী-ছাত্রদের সমবেত করে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য স্থাপন করলেন টোকিয়োতে "ভিলা-এ শি য়া ন স"। ১৯৩৭ সালের ২৮শে অক্টোবর টোকিয়োর সাংকাইডোতে নিখিল এশীয় যুব সম্মেলনে রাসবিহারী ভাষণ দিলেন "এশিয়াবাসীর জন্য এশিয়া, সাদা মানুষ ফিরে যাও"। এই বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দিলেন। সারা পূর্ব এশিয়ার চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েত্‌নাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে আগ্রাসী পাশ্চাত্য দেশগুলি হতে শোষণমুক্ত করার জন্য আন্দোলন জোরদার হল।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বেধে গেল। রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে জানালেন পূর্ব এশিয়ার বৈপ্লবিক সম্ভাবনার কথা এবং জাপানকে এ্যাংলো আমেরিকান শক্তির বিরুদ্ধে যোগদান করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। রাসবিহারীর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হল। জাপান ১৯৪১ সালের শেষের দিকে এ্যাংলো আমেরিকান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাপানী নৌবহর আমেরিকান নৌবহর পর্যুদস্ত করে পার্লহারবার আক্রমন করে। রাসবিহারী Indian Independent League এর সভাপতি রূপে জাপানী সামরিক বিভাগের সঙ্গে পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়দের মিত্র রাষ্ট্রের নাগরিক গণ্য করার জন্য চুক্তি করলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে টোকিয়োতে জাপানবাসী ভারতীয়দের সভা ডেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য গঠন করলেন "আজাদ হিন্দ ফৌজ", নিজের একমাত্র পুত্র মাসাহিদে বসুকে সুদক্ষ বৈমানিক হয়ে সময়মত ভারতের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য জাপানী বিমান বহরে ভর্তি করে দিলেন। পিতার আশা পূরণ করার জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই মাসিদা সামরিক বিমান বহরের অফিসার হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে পৌঁছেই জার্মান সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে "আজাদ হিন্দ ফৌজ" গড়ে তুললেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল রাসবিহারী বসুর আই, এম, এ, যখন পূর্ব দিক হতে ভারতে প্রবেশ করবে, জার্মানীতে গঠিত আই, এন, এ ভারতে প্রবেশ

করবে পশ্চিম দিক থেকে। এই উদ্দেশ্যে আই, এন, এ, আফ্রিকা পর্যন্ত এসেছিল জার্মান সেনা-বাহিনীরসঙ্গে সঙ্গে।

১৯৪২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব এশিয়াতে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠার সময় রাসবিহারী বসুর ভাষণ বিশ্বের দিকে দিকে প্রচারিত হল। রাসবিহারী ঘোষণা করলেন, "স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, বিগত একশ বৎসর যাবৎ ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছি আমরা। সহস্র সহস্র ভারতবাসী আত্মোৎসর্গ করেছেন এই বিরাট সংগ্রামে। কিন্তু অস্ত্রের অভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারিনি আমরা। আজ মহান প্রাচ্যে "এশিয়াদের জন্য এশিয়া" এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জাপানী সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে আমরা পেয়েছি এক স্বর্ণ সুযোগ। আসুন এ সুযোগে ব্রিটিশের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করি আমরা।.....

আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করার জন্য পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা দলে দলে Indian Independent League অফিসে জমায়েত হতে লাগল এবং গড়ে উঠল বিরাট এক সশস্ত্র মুক্তি-বাহিনী।

১৯৪২ সনের ১৫ই জুন ব্যাংকক, জাপান, কোরিয়া, চীন, মালয়, শ্যাম, বর্মা প্রভৃতি সকল দেশের স্বাধীনতাকামী ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হল। এই সম্মেলনে জার্মান থেকে সুভাষচন্দ্র বাণী পাঠালেন—আজাদ হিন্দ ফৌজের ইয়োরোপীয় শাখার পক্ষে আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি আমি বিশ্বাস করি এই পথই জয়ের পথ এই সম্মেলনে গঠিত হল সংগ্রাম পরিষদ, সভাপতি নির্বাচিত হলেন রাসবিহারী বসু। মোহন সিংকে জেনারেল করা হলেও রাস-বিহারীকেই দিনরাত খাটতে হত। হঠাৎ ফৌজের মধ্যে দেখা দিল ব্রিটিশ পঞ্চম বাহিনীর কার্য-কলাপ। আভ্যন্তরীণ বিরোধ শুরু হল ফৌজের মধ্যে। এই বিরোধ মীমাংসার জন্য রাসবিহারীকে বৈঠকের পর বৈঠক ডাকতে হল। ভারতে প্রবেশের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর দপ্তর নিয়ে এলেন সিঙ্গাপুরে। রাসবিহারী অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় রাসবিহারী সিঙ্গাপুরে স্বাধীনতা লিগ ও সামরিক পরিষদের এক জরুরী বৈঠকে জাপানী কর্তৃপক্ষের সাহায্যে সুভাষচন্দ্রকে পাওয়ার জন্য চেষ্টার প্রস্তাব করলেন এবং গৃহীত হল। সুভাষচন্দ্র রাসবিহারীর আহ্বানে সাড়া দিলেন।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র জার্মানি থেকে কর্নেল আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং দীর্ঘ সাড়ে তিনমাস টর্পেডো-সঙ্কুল সমুদ্রের নীচ দিয়ে ভ্রমণ করার পর টকিয়োতে হাজির হলেন ১৩ই জুন, রাস-বিহারী তখন রোগ শয্যায় শায়িত। জীবনের প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে অনুভব করলেন উভয়ের অমন্য সাধারণ মহাসুভবতা। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে রাসবিহারী অসুস্থ অবস্থায়ই চলে এলেন সিঙ্গাপুরে। ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুর ময়দানে ৫০ হাজার ভারতবাসীর এক বিরাট সভায় রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী সম্বোধন করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক রূপে বরণ করলেন এবং ঘোষণা করলেন আমি বিশ্বাস করি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সংগ্রাম বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবে। আঠার বৎসর নিজের সকল স্বার্থ ত্যাগ করে যে স্বাধীনতা লিগ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলেছিলেন তা স্বইচ্ছায় ছেড়ে দিলেন তাঁরই মত বিপ্লবীর নিপুন হাতে। ইতিহাসের পাতায় এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়না।

নেতাজীর সুযোগ্য হস্তে নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পন করলেও রাসবিহারী দায়িত্ব এড়াতে পারলেন না, নেতাজী রাসবিহারীকে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করে নিলেন এবং আজাদ হিন্দ সরকারের সদর দপ্তর বর্মাতে স্থানান্তরিত করে ব্রিটিশ আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে লড়াই এর প্রস্তুতিতে নেতাজীকে রাসবিহারী সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন।

১৯৪৪ সালের ৮ই মার্চ আজাদ হিন্দ ফৌজ আরাকানের পথে ভারত ভূমিতে পদার্পন করে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্য ও পীড়িত অবস্থা সত্বেও রাসবিহারী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রণাঙ্গনের ক্লেশ বশতঃ অবিলম্বে টোকিয়োতে ফিরে গিয়ে রাসবিহারীর শয্যাশ্রয় করতে হল এবং শেষ নিঃশ্বাসের জন্য দিন গুণতে লাগলেন।

পনর বৎসর বয়সে রাসবিহারী মাতৃমুক্তির আদর্শে দীক্ষিত হন। ব্রিটিশের পশুশক্তিকে সামরিক বল প্রয়োগ ব্যতীত উচ্ছেদ করা যাবে না —এই সত্য রাসবিহারী উপলব্ধি করেছিলেন তখনই। এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণতি করার জন্য রাসবিহারী নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন সারা জীবন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় নেই।

জাপানে এসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুযোগ সুবিধার জন্য বাধ্য হয়ে রাসবিহারী বিবাহ করলেন। স্ত্রী তোষিকাকে গড়ে তুললেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরূপে। নিজের একমাত্র পুত্র মাসাহিদে বসু পিতার নির্দেশে যুদ্ধে যোগ করলেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে। তাইতো দেখা যায় রাসবিহারীর জীবনে ভারতে ব্রিটিশ সরকার উচ্ছেদই একমাত্র ধ্যান ছিল।

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হতে স্বাধীনতা লাভ অবধি রাসবিহারীর বৈপ্লবিক সামরিক অবদান জাতীয় বিষাগ্রস্থ অবস্থার পরিবর্তন করে সংগ্রামী বল এনে দিয়েছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির ভারত শাসনের নৈতিক বল ভেঙ্গে দিয়ে বিপ্লবীদের মনোবল বৃদ্ধি করে দেন ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করে রাজকীয় প্রবেশ দিনে। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী কোয়েটা হতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সামরিক বাহিনীকে সারা ভারত ব্যাপী অভ্যুত্থানে সামিল করার প্রয়াসের ফলে জনগণের বিক্ষোভ চরমে উঠে, ইহাই প্রকাশ পায় গান্ধীজীর ১৯২১ সালের পরবর্তী আন্দোলনে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল রাসবিহারীর গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামের ফলে। ইংরেজ সরকার বুঝেছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর আন্দোলনের ফলে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত বিক্ষোভ প্রশমিত হবে না, জ্বলে উঠবেই তাইতো মনে প্রাণে মৃত্যু হতে যথাসম্ভব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার্থে আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার নীতি গ্রহণে ইংরেজ জাতীর সুলভ কূটনীতির পরিচয় দিয়েছে।

একাধিক ইংরেজ লেখক তাদের লিখিত পুস্তকে বিশেষ করে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ও পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ওডায়ার তাদের আত্ম জীবনীতে রাসবিহারীর বৈপ্লবিক মুক্তি সংগ্রামের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, অথচ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিপ্লবী মহানায়কের অবদান বিষয়ে দেশবাসী এখনও সচেতন নয়। আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাতীয় সত্তায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে, সমাজ ও দেশ ক্লেদমুক্ত করতে চলে এঁদের কাহিনী ও চরিত কথা বর্ত্তমান যুগের যুবকদের মণিকোঠায় স্থান করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, তবেই জাতি নবজীবন লাভ করবে, এগিয়ে চলবে।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই বাহুড়বাগান বস্তিতে বসে প্রতুলবাবুর হাতের রিভলবার থেকে হঠাৎ গুলি ছুটে গিয়ে রাসবিহারীর হাতে বিদ্ধ হয়। ক্ষতস্থানের দাগ শেষ পর্যন্ত মুছে যায়নি। এই দাগের কথা পুলিশও জানত। পাছে ধরা পড়েন এ জন্য ফেরারী অবস্থায় রাসবিহারী দস্তানা পরতেন।

১৯১১ সালের পূর্বেই সমিতির নোয়াখালি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফরিদপুর জেলার দীনেশ বিশ্বাস প্রথমে নোয়াখালি জেলার সংগঠন ভার নিয়ে সেখানে যান। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে ফেরার শ্রীভুবন বসু এবং ভুলুয়া হাজারীর খগেন কাহালী তাকে নোয়াখালি শাখা প্রতিষ্ঠায় এবং সম্প্রসারণে সাহায্য করেন। ক্রমে নোয়াখালিতে অনুশীলন সমিতির এক শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে উঠে।

ভুবনবাবু সম্ভবত চৌপল্লী ডাকাতি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্যই ঐ স্থানে প্রেরিত হয়েছিলেন। ১৯১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর চৌপল্লী ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। সারদা গুহ খগেন কাহালী, মধুর চক্রবর্তী, সুরেশ শূর, প্রিয়নাথ সরকার, সুরেশ ভট্টাচার্য, অনুকূল চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন ডাকাতিতে অংশ গ্রহন করেন। অনুকূল চক্রবর্তী পরে রাসবিহারীর উদ্যোগে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় গিরিজাবাবুর (নগেন দত্ত) সহকারী ছিলেন। অনুকূলবাবুর নিবাস ছিল নোয়াখালি জেলার শ্রীরামপুরে। নোয়াখালি জেলার সতীশ চক্রবর্তী এবং অনিনী মিত্রকে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করা হয়েছিল। চৌপল্লী ডাকাতিতে যে অর্থ ও অলঙ্কার পাওয়া যায় তা প্রথমে হরিনারায়ণপুরে রাখা হয়। দীনেশবাবু পরে কুলি সেজে তাকে নোয়াখালি নিয়ে আসেন। ডাকাতিতে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রও দীনেশ বাবুই ঢাকায় পৌছে দেন।

এই সালেই সমিতির সদস্যগণ পানামে এক ডাকাতি করেন। নারায়ণগঞ্জের ওপারে সোনার গাঁওয়ের নিকট পানাম গ্রাম। এর নিকটে নরেন সেনের পৈত্রিক বাসভবন আমিনগাঁও। মদন ভৌমিক, প্রতুল গাঙ্গুলি, স্বদেশ বসু, শক্তি ভুঁইয়া, নরেন সেন, বীরেন চ্যাটার্জী প্রভৃতি ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন। ডাকাতিতে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে একখানা সোনার চৌকী পাওয়া যায়। পনের কুড়ি হাজার নগদ টাকাও পাওয়া যায়। এই সালে কুমিল্লাতে ডাকাতি করতে গিয়ে সমিতির কয়েকজন সদস্য ধরা পড়েন। এদের সংখ্যা দশ বারজন। মামলায় সকলেই দণ্ডিত হন। দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে রমেশ ব্যানার্জী ১৯২৬ সালে কুমিল্লায় মুসলমান দাঙ্গাকারীদের বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা হয় ১৯১৩ সালে। কিন্তু ১৯১২ সাল থেকেই উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হয়েছিল। এ্যাডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর যামিনী দাসের দুই পুত্র সত্যেন্দ্র এবং বীরেন্দ্র দলের সদস্য ছিলেন। যামিনীবাবু এই সময় তার কর্মস্থল ময়মনসিংহে ছিলেন। কিন্তু দুই পুত্র এবং মাতা ঢাকায় থাকতেন। এখানে একটি ট্রাঙ্কে লাঙ্গলবন্দ ডাকাতির কিছু অলঙ্কার, কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং কিছু বেনী পরিমাণ অর্থ নিহিত ছিল। ট্রাঙ্কটি অন্যস্থানে অপসারিত করতে গিয়ে কোন কারণে গিরিশের মার সন্দেহ হয়। এই

উপলক্ষ্যে গিরিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে মা জানতে পারেন যে তাঁর পুত্র বিপ্লবী দলের সদস্য। ভীত হয়ে তিনি স্বামীকে তার করে ময়মনসিংহ থেকে ডেকে আনেন। যামিনীবাবু এসে ট্রাঙ্কটি চাবি দিয়ে খুলতে বলেন। চাবি আনবার অছিলা করে গিরিন এসে সমিতির স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে সবকথা জানান। ট্রাঙ্কটি নিয়ে আসার জন্য মদন ভৌমিক, জ্ঞান দাশগুপ্ত এবং রমেশ আচার্য্যকে পাঠানো হয়। যামিনীবাবু মদনবাবুকে আটক করে ট্রাঙ্ক পুলিশের হাতে অর্পন করেন। জ্ঞানবাবু এবং গিরিন্দ্রকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু জ্ঞানবাবুকে কিছু দিন পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। গিরিনবাবু এবং মদনবাবুর বিরুদ্ধে মামলা চলে। মামলায় গিরিন্দ্র বলেন যে মদনবাবুর কোন সম্পর্ক নাই। ফলে মদনবাবুও মুক্তি পান। গিরিন্দ্র আড়াই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার উদ্যোগ আয়োজন চলছিল। গিরিন্দ্রের পিতা এবং মাতা জেলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী হবার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে।

১৯১১ সাল থেকেই মাদারীপুরে পূর্ণদাসের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবীদল গড়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ অনুশীলনের প্রভাব এবং আদর্শ এর পিছনে কাজ করছিল। জীতেন চাটার্জী, যতীন রায়, ধীরেশ চক্রবর্তী, জীতেন মুখার্জী প্রভৃতি অনুশীলনের সদস্যগণ মুন্সীগঞ্জের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এই সময় কাজ করছিলেন। মাদিকগঞ্জে ছিলেন সত্যেন দাস ওরফে সত্যেন বসু, রামদাস ওরফে উমেশ দে, প্রফুল্ল চৌধুরী প্রভৃতি। রামদাসের পৈতৃক বাসভূমি ছিল ময়মনসিংহ জেলায়। সমিতি থেকে রামদাসকে গোয়ালপুর জমিদার গৃহে রাখা হয়। উদ্দেশ্য ছিল জমিদারের বন্দুকগুলি হস্তগত করা। উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে সফল হয়েছিল। রামদাস ক্রমে ক্রমে এগারটি বন্দুক পার্টিতে এনে দেয়। কিন্তু এর পরে সে অনুশীলন সমিতি ত্যাগ করে পূর্ণদাসের দলে যোগ দেয়। পূর্ণদাসের দলের সঙ্গে মিলে সে মাদারীপুরের নিকটে কয়েকটি ডাকাতিতেও যোগ দিয়েছিল। এর ফলে এই বিপ্লবী দলের উপরে পুলিশের নজর পড়ে এবং ১৯১২ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় এদের অভিযুক্ত করা হয়। পূর্ণদাস, কালীপ্রসাদ ব্যানার্জী প্রফুল্ল চৌধুরী প্রভৃতি আসামী ছিলেন। কিন্তু স্বাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে সকল আসামীই মুক্তি পায়। রামদাস এই সময় বিপ্লবীদল ত্যাগ করে পুলিশের গুপ্তচর বৃত্তি গ্রহণ করে এবং পুলিশে সংবাদ দিতে থাকে। এজন্য অনুশীলন সমিতি থেকে রামদাসকে হত্যা করা হয়। হত্যাকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৪ সালে।

এই সালেই বাঙলার বাইরে বিপ্লবীদের সঙ্গে অনুশীলনের সংযোগ সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। ডাক্তার সাভারকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এন, ডি, সাভারকার শ্রীসাধাজলে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগাওকার, শ্রীজিম সাপর্দের পুত্র শ্রীসাপার্দ এবং মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের আরও কয়েকজন এই সময় ছাত্ররূপে কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করছিলেন। অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সদস্য শ্রীনলিনী কিশোর গুহ এদের সঙ্গে পরিচয় করে নিলেন। এর ফলে এরা সকলেই অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। লর্ড মিন্টোর উপরে বোমা নিক্ষেপ প্রচেষ্টা সম্পর্কে এ, ডি, সাভারকারকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীআশাবুলে সাঁতারা ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। শ্রীশচীন সান্যালের সঙ্গেও এই সময়েই সমিতির সংযোগ স্থাপিত হয়।

নেতৃত্ব

॥ কৌটিল্য ॥

পূর্বানুবৃত্তি

এদিকে মন্ত্রীপরিষদের সভ্যরা, অর্থাৎ যাঁরা মন্ত্রি-পরিষদের প্রাক্তন মন্ত্রীরা আজ আর কেউ জরুরী অবস্থার ধার ধারিত্ব নিচ্ছেন না। আগ বাড়িয়ে কে আর গালে চড় খায়, যখন সব দোষ এক জনার ঘাড়ে চাপানো যায়? ওদের গোসা, ওদের না জানিয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল। যুক্তির দিক থেকে ভালো কথা, নীতির দিক থেকে তখন পদত্যাগে কি বাধা ছিল? এই 'সুযশান' নেতা জয়জীবন রাম যাকে কংগ্রেস লালিত-পালিত করে এতটা ফলে-ফুলে পুষ্পিত করে তুলেছে তিনি হঠাৎ বিবেকের কামড় খেয়ে, আত্মজ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। এ এক বিষম কামড়। ফলে কংগ্রেস ছেড়ে এক দল গড়লেন। তার সবটাই ভাঙাচুরো। আজ জনতা সরকারের ছাই ফেলায় ভাঙা কুলোয় ওরা পরিণত হয়েছেন। তথাপিও স্থান নেই, চরণসিং ওকে বলছেন, —এই বার প্রতিবাদের ঝড়ে একদিন বাবুজিকে শুকনো খড়কুটোর মত উড়ে যেতে হবে। তপশিলী সমাজ আজ শুধু যাত্রাই যাদের আওতায় নেই। সেখানে অনেক তাজা তাজা নেতার ভীড়।

উনিশ মাসের জরুরী অবস্থায় আরো অনেকে মন্ত্রীত্ব চালিয়েছেন। এবেলা আর যৌথ দায়দায়িত্ব নেই, শুধু সৌভাগ্যের বেলায় সুনাম বাঁটোয়ারা দায়ভাগ আছে। অন্ধ্রাষ্ট্র মন্ত্রকের মন্ত্রী ছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি, তিনি সব দায়িত্ব ধুয়ে-মুছে, ওম্ মেটার ঘাড়ে ফেলে, একেবারে ধোয়া তুলসীপাতাটি হয়েছেন। তিনিও কিছুই জানতেন না, একথা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক বিশ্বাস করবেন না। কছুইতে কামড় দিয়ে বললেও সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবেন না। এখানে একটি লক্ষ্য করার বিষয়, কোন এক অজ্ঞাত রহস্য জনক কারণে, ওধাই, বি, চ্যাবনের নামটা কোন ক্রমেই জন সমক্ষে আসছে না। ধান্দাবাজ জয়জীবন রাম পাকা ফলটির মত কংগ্রেস থেকে টপ্‌কে পড়ে, নবতন্ত্র লাভ করে মহীরাবনের ব্যাটা অহীরাবনের মত ঘুঃ শুরু করলেন। এদিকে গভীর জলের মাছ শ্রীচ্যাবন, আরো গভীরে প্রবেশ করলেন। ইতিপূর্বে কংগ্রেস যখন কেন্দ্রে কোন দিন বিরোধীর ভূমিকায় ছিলনা, তখন কংগ্রেসের জন্য একটি রাজনৈতিক দর্শনবাদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এবং এমনি সূক্ষ্ম রাজনৈতিক দর্শন, যে এ প্রহসনের ফলে ভবিষ্যৎ কংগ্রেসীরা যাতে অনিবার্য নির্বীর্যবাদে ভুগতে পারে তারই ব্যবস্থা। তেজস্বীতাবিহীন বিরোধীতা রাজনৈতিক নিরামিষ ভোগমাত্র। চ্যবনজী আগে থেকেই সেরে রেখেছেন, constructive opposition." ব্রিটিশ যুগে বাঘাধরা রাজনীতিকদের মুখে 'responsive co-operation' কথা শুনেছি। অতিজ্ঞজন চিন্তাকরে দেখবেন সেই ব্রিটিশ যুগের responsive co-operation constructive opposition এ পরিণত হয়েছে কিনা। চায়কোনা ঘর জনতা পার্টি এই constructive opposition কথাটার তাৎপর্য ঠিকই বুঝেছে। এবং অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে তারা কাজে হাত দিয়েছে।

আমরা যতদূর জানি, সংসদের বিরোধীতার মধ্য দিয়ে একটি বিকল্প নেতৃত্বের বিকাশ লাভ করে। এবং সে বিকল্প নেতৃত্ব মানেই হলো সরকারী নেতৃত্বের দুর্বল স্থানে আঘাত করে নিজের (অর্থাৎ বিরোধী নেতৃত্বের মহিমা প্রচার করা। চ্যবনজীর প্রধান অসুবিধা হলো বিজয়ীর আসনে বসে চিন্তা শক্তি হ্রাস পেয়েছে। উপস্থিত মত তেজের সঙ্গে নিরপেক্ষের বক্তব্য জোরালো ভাষায় প্রকাশ করতে তিনি পারেননা। গান্ধীজী বলতেন, turn the defeat into a source of inspiration কিন্তু চ্যবন-জীর বক্তৃতায় কোথায়ও এমন আত্মবিশ্বাসের সুর বেজে ওঠেনা। যে সরকার এক কলমের খোঁচায় এতগুলো রাজ্য সরকারকে ফেলে দিলো, সেখানে কেন্দ্রের বিরোধী নেতা এমন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন যাতে চায়কোনা (জনতা)—মানে জনসঙ্ঘ, কংগ্রেস সংগঠন, বি, এল, ডি, অবিরাম সাইনবোর্ড বদলানো দল সোসালিষ্ট, নোতুন উপগ্রহ সি, এফ, ডি) দল বেদামাল হয়ে পড়ে। বহু দিন দুধ ক্ষীর খেতে খেতে কংগ্রেস দলের পক্ষ আর আন্দোলনে নামতে চান না। আদালতে দরখস্ত করে আইনের মুখাপেক্ষী হলেন, চ্যবন নেতৃত্ব। জরুরী অবস্থার রাজনৈতিক ভুক্তভোগীরা তাঁর জন্য, উগ্রপন্থার

নাশবন্দী বাতিল করার জন্য যে অপরাধ কংগ্রেস সরকারের হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আর একবার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামা উচিত ছিল। এক অপরাধের প্রতিশোধ আর একটি সুকল্পিত অপরাধ নয়। জন সাধারণের দরবারে অপরাধের জন্য যেমন ক্ষমা চাওয়া উচিত, ভুল বুঝে অনুতপ্ত হওয়া উচিত আত্মসমালোচনা হওয়া উচিত তেমনি নীতির দিক থেকে এ সব কাজ করার পরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখা উচিত ছিল। তাহলে সম্ভবতঃ চ্যবন নেতৃত্বকে কেউ দোষারোপ করত না।

এই নেতৃত্বের আত্মসমালোচনার ভাব জন সাধারণের মনে নোতুন চেতনার দ্বার খুলে দিতো। কেননা, এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির জন্য প্রাথমিক পর্যায় কোন দুই শক্তি দায়ী, কোন বিঘাতক শক্তি গোপন সুরঙ্গ পথে গৃহযুদ্ধকে আহ্বান করে নিয়ে আসার চেষ্টায় মত্ত ছিল —এর যথাযথ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ এই আত্ম সমালোচনার মধ্যে থাকত এবং জনসাধারণকে বোঝানো উচিত ছিল। চ্যবন-রেড্ডি সংযোগে যে নেতৃত্ব হঠাৎ গজিয়ে উঠল তারা এই গোপন ঘাঁটিতে সুরক্ষিত ভ্রষ্টাচারী শক্তিকে আক্রমন করা দূরে থাকুক বরং ভিতরে ভিতরে এক রকম পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। ভাবটা এই চামড়া বাঁচিয়ে চল। তা হয় না। রাজনীতি যেমন নির্মম, তেমন এর অনিবার্য গতিতে বহু দুঃখজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এ হাতড়াবিও যেমন সুতায়, তেমন আবার চেলেরমালাও উপহার পায়।' এ এক ধরণের আগুন নিয়ে খেলা। এই খেলায় নেতৃত্ব দেওয়া যেমন শক্তি, সাহস ও নির্ভীক পদক্ষেপের প্রয়োজন তেমন আবার কাপুরুষতাকে ঘৃণা করার মত শক্তিও থাকা প্রয়োজন। ইন্দিরাজী আজ নিঃশঙ্কচিত্তে জন সাধারণের সামনে দাঁড়াচ্ছেন। ভুল-ত্রুটির জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে সব মেনে নিচ্ছেন। পরাজয়ের গ্লানিকে প্রশান্ত চিত্তে মুছে ফেলে দিয়ে আবার সেই আম-জনতার দরবারে এসে দাঁড়িয়েছেন। দক্ষিণ-বেলে ওঁর জন্য যে-চরম উপহার তোলা হয়েছিল, তিনি তার উপযুক্ত জবাবই দিয়েছেন জনসাধারণের মধ্যে নোতুন প্রেরণার সৃষ্টি করে। নির্বাচন সব সময়ে বিজয় মালা নিয়ে আসে—এমন কোন কথা নেই। কংগ্রেস বেশে থাকতে গেলে বহুবার অ-কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতিহাসের দিক থেকে এর মধ্যে কোন নোতুনত্ব নেই। এটা একটা ঘটনা-ক্রম মাত্র।

১৯৭৭-এর নির্বাচনের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও বিশেষত্ব এইটুকু যে, যে শক্তি আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে সবল করে গৃহযুদ্ধের মহড়া দিয়েছিল, সে-শক্তি সমঝোতার ভিত্তিতে সম্মিলিত হয়েছিল। এবং জরুরী অবস্থাকে একটা রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিল। ষাট কোটি অথবা তারও কিছু বেশী লোকের ভারতবর্ষে 'নাশবন্দী'র মত ঘটনাকে পুঁজি করে যে সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচারে নামে তাদের বুঝতে হবে আর যাই থাক, সুস্থ রাজনৈতিক চিন্তা নেই। ষাট কোটি লোকের দেশে জনসংখ্যা সমানে বেড়েই যাবে, তার বৈজ্ঞানিক সমাধান নেই, অথচ সন্তান পৃথিবীতে এলে তার মুখের অন্ন জোগাবার দায়িত্ব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে রাষ্ট্রের বর্তাবে। এই দুরূহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য রাষ্ট্র যদি চেষ্টা করে তবে সেটা রাষ্ট্রের অপরাধ? জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক দিকটা যতই শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হচ্ছে ততই সবাই এ বিষয়ে সজ্ঞান হয়ে উঠছে। কিন্তু অশিক্ষার সাধারণ ধারা এর ভালও বোঝে না, মন্দও বোঝে না, শুধু বোঝে, ঈশ্বর দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। তাদেরকে কিছু বাধ্যবাধকতার মধ্যে না আনলে রাষ্ট্র জনসংখ্যার চাপে বিপন্ন হতে বাধ্য। এই বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে যেখানে অত্যাচারভাবে উৎপীড়ন হয়েছে সেখানে সুবিচার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের সুবিপুল জনসংখ্যার তুলনায় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কটা? যাই হোক, তুলনামূলক ভাবে স্বল্প হলেও তার বিচার হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে দ্বি-মত নেই। কিন্তু বিচারের প্রয়োজনে যা হচ্ছে তার নাম চরিত্র জনমনের একটানা পালা। এই পালা গেতে অনেক গায়েন জুটেছে তাদের উল্লেখ না-ই বা করলাম। অবশ্যই, পরস্পর বিদ্বেষ, অশোভন প্রতিযোগিতার ও ভুল সিদ্ধান্তের বয়ানগুলি আজ সাক্ষীর বেশে কমিশনের সামনে হাজির।

ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকেরা যখন সমস্ত ঘটনার মূল মর্ম উদ্ঘাটন করবেন, সমস্ত দলিল দস্তাবেজ খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ পাবেন, প্রকৃত বিচার বিশ্লেষণ নিরপেক্ষ চিত্তে করার সুযোগ যখন থাকবে, তখন তাঁদের রায় সঠিক হবে বলে

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন]

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমার উত্তর ভারত সফর রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক বড় সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করেছে। তা ছাড়াও এই সফর ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে যেমন অভিজ্ঞতা দিয়েছে তেমনি শিক্ষাও দিয়েছে। এই সফরের সময় আমি উত্তর ভারতের সমস্ত চিন্তাশীল নেতাদের সংস্পর্শে এসেছি। সেই চিন্তাশীল নেতাদলের দুজন এখন আর নেই, তাঁরা অতীত হয়ে গিয়েছেন। স্যার সৈয়দ আহমেদ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, পণ্ডিত বিশম্ভর নাথ, মাহমুদাবাদের রাজা আমীর হোসেন, বাবু জয়নারায়ণ সিংহ, বাবু হরিশ্চন্দ্র এবং বেনারসের বাবু রামকালী চৌধুরী—এরা ছিলেন এমন মানুষ যে, যে কোন সম্প্রদায়ের লোকই এঁদের নিয়ে গৌরব করতে পারেন। এঁদের সকলের চারিত্রিক প্রকৃতি বা মেজাজ এক রকমের ছিল না বুদ্ধিগত দীপ্তি-সামর্থও ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরণের; এমন কি রাষ্ট্র সম্পর্কীয় চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাঁরা সকলেই মাতৃ-ভূমিকে ভালবাসতেন এবং সেই মাতৃভূমির সেবায় সকলেই আগ্রহী ছিলেন।

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ। তিনি ছিলেন আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং বৃটিশ শাসনাধীন মুসলিম সম্প্রদায়ের সব প্রধান নেতাদের মধ্যে একজন। তিনি একটি ইংরেজী শব্দও জানতেন না। কিন্তু সে যুগের অন্য সমস্ত মুসলমান নেতাদের চেয়ে তিনি বেশী করে বুঝেছিলেন যে তাঁর সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য ইংরেজী শিক্ষা কত খানি প্রয়োজন, এই শিক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলার মত তাঁর যেমন ছিল সাহস, তেমনি ছিল সংগঠনের প্রতিভা। তাঁর এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এমন এক পরিবেশের মধ্যে ও দূর প্রসারী অভিমাত্রিক সামাজিক পরিবর্তনার উপর যার স্থায়ীত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তাঁর নামকে অমর করে রেখেছে। তিনি আমাকে অতি সৌজন্যের সহিত অভ্যর্থনা জানালেন। পরবর্তী কালে কংগ্রেসের আন্দোলন গড়ে ওঠার ফলে তাঁর সঙ্গে মত পার্থক্য দেখা দিলেও আমাদের বন্ধুত্ব অব্যাহত ছিল। আলিগড়ে সিভিল সার্ভিস আন্দোলন সম্পর্কে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই সভায় কলকাতার প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব গুলির মধ্যে একটি ছিল পরীক্ষাগুলি সব একই সময়ে গ্রহনের পক্ষে। তবে একথা উল্লেখ করতে হয় যে ১৮৮৭ সালের পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সদস্যরূপে তিনি সংখ্যাধিক্যের মত অনুযায়ী যে রিপোর্ট প্রস্তুত করা

(৯ পাতার পর

আমাদের বিশ্বাস। সে যাই হোক, বহু টাকা খরচ করে কালাধার উত্তোলন করা হয়েছিল, খুলে দেখা গেল কংগ্রেসের পিঠি চর্চা করার মত কিছুই নেই। অতএব লোকের মুখে চুন পড়ল। চার দলের বা তো বা বী রাজনীতি কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, আবার চিতা বাঘের মত পূর্বতন চকচকার ধারও ভুলতে চায় না। কংগ্রেস এবং ইন্দিরাকে দুশমন সাজিয়ে কিছু দূর এগোনো যায়, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে হাত দিলে দেখা যায়, আসল জমানো বক্তৃতা একেবারে গড় বাস্তব ঠিক তার উল্টো। ওই বক্তৃতা দিয়ে বাজী মাৎ করার দুর্ভোগকে কংগ্রেসকেও ভোগ করতে হয়েছে। নেহেরুজী একদিন যাদের কাছে যে কোন ল্যাম্পপোস্টে চোরাকারবারীদের ফাঁসীতে লটকাতে চেয়েছিলেন। যাদিষ হাতে নিয়ে দেখেন 'যাৎ' আর বাস্তবক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। চোরাচালানদারদের মিসা আইনে আটকাবার পর ব্যবসায় জগতের কু-স্বর্গ চকল হয়ে ওঠে। এবং তারা যে সমূলে ধ্বংস হয়নি তার প্রমাণ ১৯৭৭-এর নির্বাচনেই প্রমাণ করে দিল। জনতা দলের সবিত বাবী হলো ওরা নাকি গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছেন। কংগ্রেস সরকার নির্বাচন ঘোষণা করলেন, সংবাদপত্রের ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নিলেন, মিসা আইনের সব বন্দী ছেড়ে দিলেন (যাদের সম্বন্ধে আদালতে মামলা ছিল তারা বাদে) যে সমস্ত দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল তাও তুলে নিলেন। আর জনতার নেতারা তারস্বরে চীৎকার করে দেশবাসীকে জানাচ্ছেন তারা গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে এনেছেন। বাস্তব ইতিহাসের এমন নির্মম অপব্যাখ্যা আর কি হতে পারে।

———

হয় তাতে সই করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তার বন্ধু চন্দ্র মিত্র এবং রায় বাহাদুর চুনিলালের সঙ্গে যোগদান করেন নি। তারা একই সময় পরীক্ষা গ্রহণ করার মত সমর্থন করেছিলেন।

এত দীর্ঘ দিন পরে সেই পুরাতন মতান্তরের বিষয় আলোচনা করে কোন লাভ নেই সেই অতীতের বিষয় এখন প্রায় বিস্মৃতির অন্ধকারেই তলিয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে মত বিরোধ ঘটে তার ফলে আমরা তার ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি ও জোরাল সমর্থন হারালাম। তার পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন এই কংগ্রেস আন্দোলনের বিরোধিতার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। কিন্তু ফলে কি হয় আমাদের মধ্যে তিনি যত বড়ই হোন না কেন, সকলেরই শক্তি সামর্থের একটা সীমা আছে। প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশন বিলুপ্ত হয়ে গেল; কংগ্রেসই বেঁচে রইল এবং বাড়তে থাকল। যাক, অত কথার প্রয়োজন নেই। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যেন তার বৈরথ আমেদের গৌরবময় সৃষ্টির প্রতি ঋণ স্বীকার করতে ভুলে না যায়। কারণ, যে বীজ তিনি বপন করে গিয়েছেন, তার বৃক্ষ আজ ফল প্রসব করতে আরম্ভ করেছে। তার আলিগড় স্কুলের আজ আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয় হয়েছে। এই আলিগড় বিশ্ব বিদ্যালয় এমন এক সংস্কৃতি ও চিন্তার আলোক বিস্তারের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে যা ভারতে ইসলামকে আধুনিক ভাব ধারার পুষ্ট করেছে। এই ভাব ধারা দেশাত্মবোধের উজ্জ্বল আলোক প্রজ্জ্বলিত করে যে উৎসাহের সঞ্চার করেছে তা ভবিষ্যতে হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করার ইঙ্গিত যেন আজ ভাবেই বহন করছে।

উত্তর ভারতে প্রচার কার্যে আমি যে সাফল্য লাভ করি তাতে আমার বন্ধুগণ উৎসাহিত হয়ে আমাকে সেই বছরই ডিসেম্বরে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সালে শীত কালে বোম্বে রওনা হলাম। বোম্বের নেতাগণকে আগেই আমি কি কাজে যাচ্ছি তা জানানো হয়েছিল। তারা আমাকে প্রীতি ও সহৃদয়তার সহিত স্বাগত জানালেন। মিঃ বিষ্ণু গোবিন্দ কর্তিক, মিঃ কাশীনাথ ত্রৈম্বক তেলাং এবং মিঃ (পরবর্তীকালে স্যার) ফিরোজ শা মেটা তখন বোম্বের নেতা ছিলেন। দুঃখের কথা, তারা আজ আর কেউ বেঁচে নেই। বোম্বেতে জনসভা হল। সভায় সিভিল সার্ভিস প্রস্তাব ও আমার প্রতিবেদনের সারাংশ গৃহীত হল। এর পরে আমি সুরাট গেলাম এবং সেখান থেকে গুজরাটের প্রধান নগরী আমেদাবাদ যাই। দু জায়গাতেই সভা হল এবং কলকাতার প্রস্তাব গৃহীত হল। আমেদাবাদ থেকে বোম্বেতে ফিরে এলাম এবং সেখান থেকে গেলাম পুনায়। পুনায় আমি স্বর্গত মিঃ রানাডের অতিথি ছিলাম।

মিঃ রানাডে তখন একজন সাবজিনেট জজের কাজ করছিলেন। কিন্তু এই সরকারী পদে চাকরী করার জন্য তার মানসিক প্রবনতা কখনই আন্তর ছিলনা বা রাষ্ট্রীক কর্তব্য বোধকেও ব্যাহত করেনি। কংগ্রেসের মঞ্চে দর্শক হিসাবে তাকে সবসময়ই দেখা যেত। রাজার রাজ সিংহাসনের পেছনে যেমন থাকে মন্ত্রীর মন্ত্রণাশক্তি, তেমনি কংগ্রেসের সিংহাসনের পেছনে শক্তি রূপে ছিলেন তিনি। কংগ্রেস নেতাদের তিনি পরিচালনা করতেন, বুদ্ধি পরামর্শ দিতেন, উৎসাহ দান করতেন। তার সরল মধুর ব্যবহার বুদ্ধির দীপ্তি এবং খাঁটি দর্শনাত্মক স্বদেশ প্রেম তার সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাদের সকলকেই মুগ্ধ করেছে। পুনায় আমি তার অতিথি থাকা কালে তিনি আমাকে তার পরিবারেরই একজন বলে মনে করতেন।

পুনায়ও সভা হল এবং আমাদের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল। পুনা থেকে রওনা হলাম মাদ্রাজের দিকে। মাদ্রাজে আমি অতিথি হলাম ডাঃ রঙ্গাচারলু মহাশয়ের। মাদ্রাজের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তাদের মধ্যে ছিলেন মিঃ ভেঙ্কটসুব্বা রাও, মাননীয় হুমায়ুন বা বাহাদুর এবং আরও কয়েকজন। আমি তাদের জনসভা করে সিভিল সার্ভিসের প্রস্তাবিত বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করতে বললাম। যে কোন কারণেই হোক, জনসভা করা সম্ভব হলনা। তবে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে প্যাক্রিয়াপ্পার হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। সেই আলোচনা সভায় আমাদের প্রস্তাব ও প্রতিবেদন

গৃহীত হয়। গোহাটের মাদ্রাজের সঙ্গে আজকের মাদ্রাজের বেশ পার্থক্য আছে। আজকের মাদ্রাজ ভারতীয় জন জীবন বোধে অনুপ্রাণিত। কিন্তু ১৮৭৮ সালে তা ছিলনা। আজকের মাদ্রাজ রাষ্ট্রীয় চেতনায় ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত এক সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং একযোগে জন হিতকর সর্বভারতীয় প্রয়াসে অংশ গ্রহণ করছে। কিন্তু ১৮৭৮ সালে সারা ভারতের মধ্যে এই ছিল একটি মাত্র স্থান যেখানে দেশের জন-স্বার্থের সঙ্গে জড়িত এমন একটি অত্যাবশ্যক প্রশ্ন নিয়ে আমার পক্ষে কোন জনসভা করা সম্ভব হয়নি। অথচ সে প্রশ্ন নিয়ে সারা ভারতের অন্যত্র শক্তিশালী ঐক্য মত গড়ে উঠেছিল।

কলকাতায় আমার বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজের তাড়া ছিল। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি পরিভ্রমণ কার্য শেষে কলকাতায় ফিরে এলাম। এই ভাবে নানা স্থানে জনসভার ভিতর দিয়ে এক সর্বভারতীয় পূর্ণ ঐক্যমত গড়ে ওঠার পরে আমরা এক কার্যক্রম গ্রহণ করলাম। আমরা ঠিক করলাম আমাদের এই আন্দোলন ইংল্যাণ্ডে ছড়িয়ে দেব যাতে ভারতের গণ কণ্ঠের বাণী সেখানে শ্রুত হয়। সে বাণী সেখানে প্রচার করবেন আমাদের স্বজাতির ভিতর থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যারা আমাদেরই মনোভাব সেখানে ব্যক্ত করবেন। "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ রবর্টসনের এই নতুন কার্যক্রমের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখলেন "এটা নিশ্চয়ই একটি উজ্জীবিত ধারণা"। আমরা কিন্তু এটাকে একটা উজ্জ্বল কার্যক্রম বলে তুলে ধরার জন্য কোন বিশেষ দাবী করিনি। আমরা যা করেছি, দেশকে ভালবাসি বলেই করেছি। সে দেশপ্রেম মানুষের বুকের পবিত্র সম্ভেজ এবং অকৃত্রিম ভালবাসায় মণ্ডিত। পরবর্তীকালে যা ঘটেছে তাতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের এইচিন্তা অতি উপযোগী হয়েছিল এবং তা খুব মূল্যবান ফসল ফলিয়েছিল।

এখানে একটু কাল থেমে আমার ভারত পরিক্রমার কাল কি হয়েছে সে বিষয়ে একটু পর্যালোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বৃটিশ শাসনাধীনে নানা জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত ভারত ভূমিতে এই প্রথম একই উদ্দেশ্য, একই কর্ম সাধনার একই সুরে আমরা হয়েছে। এই ভাবে একই সুরে আমরা তুলে এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যের পূর্ণ সার্থক [illegible] হয়েছে যে আমাদের সম্প্রদায় ও ভাষা, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকনা কেন, ভারতীয়গন তাদের সাধারণ রাজনৈতিক অধিকার আদায় করার জন্য মিলিত ও ঐক্য বদ্ধ হতে পারে। এই ভাবে আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি পরবর্তী ঘটনাবলী দ্বারা আরও দূর ও গভীর হয়েছে এবং পরিশেষে তা চরম অভিব্যক্তি লাভ করেছে কংগ্রেস আন্দোলনে। সে প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি, কংগ্রেসের সেই মহান জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের ভিত্তিভূমি এইভাবেই প্রস্তুত হয়েছিল। সেদিনের জনগন এইভাবে যে শিক্ষা পেয়েছে তা কখনও ভুলতে পারেনি। ১৮৭৮ সালে পুণা সার্বজনিক সভার এক প্রতিনিধি দল কলকাতা পরিদর্শনে আসেন। তারা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে বলেন যে আমার এই ভারত পরিক্রমা জাগ্রত ভারতের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াসের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

তার দেশবন্ধু কটন "নিউ ইণ্ডিয়া" নামে একখানা বই লিখেছিলেন। সে যুগে বইখানি অসামান্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। আমার ভারত পরিক্রমা সম্পর্কে তিনি তার সেই পুস্তকে এরূপ উল্লেখ করেছেন—

"দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের বাণী ও বিচার বুদ্ধি বহন করে আসছে। বাঙালী বাবুরাই আজ পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সারা ভারতের জন-মত পরিচালনা করছেন এবং যদিও উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিবাসিগণ শিক্ষায় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা বোধে বাঙালীদের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছেন, তা হলেও তারা ক্রমশ দেশের অন্যান্য নিয়ামকদের তাদের মত বিচার বুদ্ধির নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনার ব্যাপারে যোগ্য হতে চলেছেন। পাঁচিশ বছর পূর্বে এরূপ কোন লক্ষণই প্রকাশ পায়নি। পাঞ্জাবীদের উপরে বাঙালীদের প্রভাব—এ রকমের একটা ধারনা লর্ডলরেন্স বা কোন মন্টগোমেরী বা কোন ম্যাকলিয়াডের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হত, তথাপি এটাই সত্য ঘটনা। একজন বাঙালী বক্তা গত এক বছর ধরে উত্তর, ভারতে ইংরাজীতে বক্তৃতা করে যে পরিভ্রমন করেছেন তা বিজয়ের গতিপথের প্রকৃত রূপ ধারন করেছে। সাম্প্রতিক কালে সুরেন্দ্র নাথ বাঁড়ুজ্যের নাম মুলতান ও ঢাকা—উভয়স্থলেই উৎসাহ [illegible] সমভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে।" (চলবে)

(contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Burdwan District		
Hazra Bibhuti Bhusan	Kalna Shyamganjpara, Kalna	100	1. 4. 76
Mondol Srihari	Vill. Kashigram' Katwa	200	1. 10. 76
Nandy Smt, Labanya Prova w/o Late Suresh Ch. Nandy	Bijoynagar Colony, Burdwan	200	26. 10. 77
Sinha Smt. Radha Rani w/o Late Meghnath Sinha	Vill. Mandaljora P.O. Bhabpur P. S. Memari	100	16. 6. 77
	Bankura Distt.		
Chowdhuri Smt. Rameswari	P. O. & Vill Damodarbati	150	1. 10. 76
Ghosh Amarendra Nath	P. O. & Vill. Kusaduip	200	
Gorai Smt. Rohini w/o Late Suchand Gorai	P. O. & Vill. Mosiara	100	3. 7. 77
Lakshman Smt. Rashmony w.o Late Sudhir Kr. Lakshman	Bishnupur, Krishnagarja	150	27. 9. 77
Sinha Smt. Sushila Dasi w-o Late Gopal Ch. Sinha	P. O. & Vil. Gobindadham	150	7. 11. 77
Singha Smt. Sudharani w-o Nabagopal Singha	P. O. & Vill. Patratorar	100	15. 8. 72
	24-Parganas		
Adhikari Smt. Nihar Bala w-o Late Gabindadas Adhikari	P. & Vill Bagdah	100	29. 5. 77
Bal Nikunja Behari	Vill. Mamapur (Ramkrishnanagar P O. Chandannagar (Vill. Batanagar)	200	1. 4. 76

যাবতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায় অব্যর্থ ফলপ্রদ

আমলা ঘৃত কুমারী

আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ ডাক মাশুল ফ্রী

প্রাপ্তিস্থান: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
নীলকণ্ঠ কুটির • কুন্তল পল্লী • বারাসত • ২৪ পরগণা

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

e/36

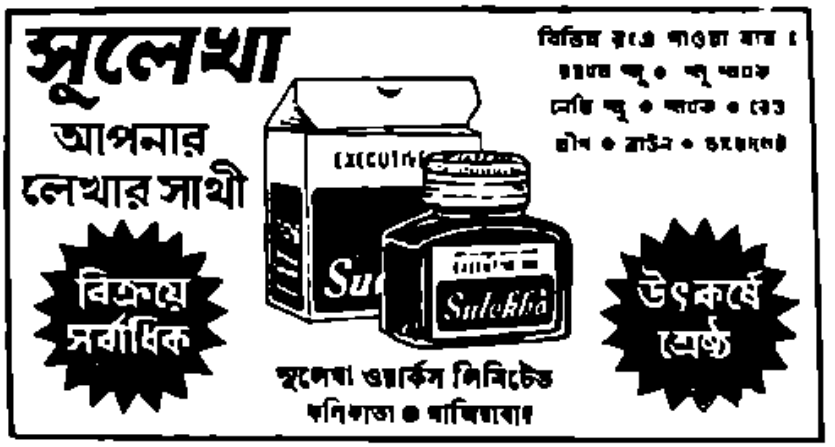

2 6 APR 1978

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি পদ রায়চৌধুরী
শিল্পীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতারে—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীঅনিত্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বজ্রদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ১২ই বৈশাখ, ১৩৮১ ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭৪	৩০ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়:

আগুন নিয়ে খেলা

দি লং মার্চ

শ্রীসত্যভূষণ সেন

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

শিক্ষাজগৎ

। মলয় ঘোষ

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

গান্ধী সংগ্রহালয়ের স্বেচ্ছাচার

। ব্রজেশ্বর বর্মন

রাজনৈতিক পেন্সান মঞ্জুরীর তালিকা

সত্যই হ'ল ভগবান। সত্যের সাধনাই তপস্যা। জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কাজ তার মূলে আছে সত্য। সত্যের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। —ব্যাসদেব

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt. –24-Parganas		
Banerjee Kalachand (alias Swami Dhirendra Giri	Bholagiri Road, Manirampur P. O. Barraipur	200	1. 10. 76
Bardhan Smt. Sefali w/o Late Jagadish Bardhan	Attpur. Rajpukur Path P. O. Shyamnagar	100	20. 11. 77
Bindu Smt. Latik Bala	Vill. Panchalokey P. O. Haltu	100	15. 8. 72
Bindu Smt Sudha Rani w/o Late Sudhin Ch. Bindu		100	
Chakraborty Smt. Biva w/o Late Jogesh Chandra		100	9. 1. 74
Chakraborty Kumari Kajal	d/o Late Jogesh Chandra	50	7. 12. 77
Manika	(Unmarried) (Eldest daughter Smt. Mukti married on 6. 12. 77 her pension now transferred to the younger daughter)	50	
Chakraborty Hemanta Kumar	O. P. Road, Nayabuster P. O. Burrackpur	200	1. 10. 76
Dutta Himangshu Mohan	39/2, Ashokenagar	200	
Manindra Chandra	72, Baker Mahal, Sadar Bazar P. O. Barrackpur	200	
Dutta Rati Kanta	P. O. New Barrackpur	200	
Debnath Rakhal Ch.	No. 3 Govt. Colony P. O. Basirhat	200	
Deb Sharma Smt. Devika Devi (Midya) w/o L. Lalitmohan Debsharma (Midya)	Vill. Nila P. O. Karaiberia	150	5. 10. 77
Dey Ranjan Mohan	South Garia Home for Political Sufferers Via Champahati	200	20. 12. 74

(contd. on 3rd cover)

সম্পাদকীয়

আগুন নিয়ে খেলা

কারণ যাই হোক না কেন, ভারতের শান্তি ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আজ বিপন্ন এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় কারও মনে নাই। দেশের সর্বত্র স্বৈরাচার মূলক এবং হিংসাত্মক যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। জরুরী অবস্থায় দেশে আইন ও শৃঙ্খলা ছিল না, যা কিছু ছিল তা গায়ের জোর। ফলে অশান্তি এবং অসন্তোষ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বৎসরাধিককাল পূর্বে জনতা পার্টি আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নাম জনতা দল এবং তারপরে ঐ প্রতিশ্রুতি। আমরা ভাবলাম আমরাই আমাদের শাসন করছি। হয়তো স্বর্গসুখের ব্যবস্থাই হচ্ছে। আমরা বরণ করে নিলাম এই বহুদলীয় দলকে, বসালাম তাদের দিল্লীর সিংহাসনে। কিন্তু তারপর সেই ১৯৭৭ সালের মার্চ মাস থেকে দেশের সমগ্র পরিবেশ যেন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। জাতির অন্তর আজ বিষবাষ্পে পূর্ণ অবস্থা আজ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি পর্যন্ত এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে প্রধানমন্ত্রীরও, জাতীয় নেতৃবৃন্দও এ অবস্থা উপেক্ষা করতে পারছেন না। তারা দেশের কেন্দ্রীয় আইন সভায় মিলিত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু এই আলোচনাই কি যথেষ্ট? উত্তরপ্রদেশে, পাঞ্জাব, বিহার, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হায়দরাবাদ সর্বত্র আজ আগুন জ্বলছে। শুধু আলোচনায় কি এ আগুন নিভবে? দেশের চল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয় আজ বন্ধ। ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে স্কুল কলেজগুলি বন্ধ করে দিয়ে এই অবস্থার দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন। এর প্রতি সরকারেরও অনুমোদন আছে। কিন্তু idle brain is the devil's workshop—এ তো কথায়ই বলে। সুতরাং অধ্যয়ন থেকে বিরত ছাত্র সমাজ যে কতখানি শান্ত হবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। আলোচনার দ্বারা এর কোন সুফল যে হবে তা আমরা মনে করতে পারছি না। এর জন্য প্রথম দরকার সকলের আত্মবিশ্লেষণ। আত্মবিশ্লেষণ দরকার জনতা সরকারের, আত্মবিশ্লেষণ দরকার সকল রাজনৈতিক দলের, আত্মবিশ্লেষণ দরকার দেশের নেতৃবৃন্দের। গৃহে আগুন লাগলে গৃহ পতির প্রথম চেষ্টা হয় জল ছিটিয়ে পরিবেশকে শান্ত করে তোলা। গত এক বছর ধরে নানা উপায়ে দেশের পরিচালক দল জাতির অন্তরকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছেন। জরুরী অবস্থার জন্য দায়ী ইন্দিরাজী এবং তাঁর সহকর্মীদের শাস্তি বিধানের জন্য তারা শাহ কমিশন বসিয়েছেন। তারা বলছেন এই পথে তারা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। তারা নাকি গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করছেন। কিন্তু প্রতিহিংসার আগুন নেভানো যায় না। লাঠির আঘাতেও আগুন নেভে না, এমন কি বাতাস দিলে আগুন আরও বেশী করে জ্বলে ওঠে

জাতির অন্তরে আজ আগুন জ্বলেছে সেদিকে জনতা সরকার একবারও তাকিয়ে দেখছেন না। ইন্দিরাজী কতখানি অন্যায় করেছিলেন সেটা আজ বিবেচ্য নয়। জনতা সরকারকে দেখতে হবে জাতির একাংশ আজও তাঁকেই চাইছে তাঁকে শাস্তি দিলে জাতির অন্তরে বিক্ষোভের আগুনই সৃষ্টি হবে। সে উত্তাপে জাতিই পুড়বে। সেটা জনতা সরকার ভেবে দেখছেন কি ?

গত ১৫ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত এক মাসে পুলিশের গুলিতে ৩০০ লোক প্রাণ হারিয়েছে। সুতরাং আজ আর আগুনের সৃষ্টি না করে দরকার শান্তির প্রলেপ। এই শান্তির প্রলেপ ব্যতীত গণতন্ত্রের শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব নয়। গণতন্ত্র তো দূরের কথা সহজ জীবনযাত্রাও এখনে আজ অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

আমাদের নিজেদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এদিক দিয়ে এতদিন অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এ অঞ্চলও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ইন্দিরা কংগ্রেস সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মহাকরণে অভিযান চালিয়েছিলেন দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সঙ্কট এবং উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের দাবীতে। সমাধান কতটুকু এগিয়েছে আমরা জানিনা কিন্তু সংঘর্ষের ফলে এখানেও আগুন জ্বলছে। পরিবেশ যেখানে অগ্নিগর্ভ সেখানে এ ছাড়া আর কিছু আশা করা যায়না। কিন্তু একটা মজার ব্যাপার এই যে শাসক শাসিত দুই দলই এ ব্যাপারে পুলিশকে দায়ী করেছেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি পুলিশ কি সরকারের অঙ্গ নয়। পুলিশী অক্ষমতা অথবা কর্তব্য কর্মে পুলিশের অবহেলা কি সরকারেরই অক্ষমতা নয়? এ অক্ষমতা স্বীকার করলে তিনি কি ক্ষমতাসনে আসীন থাকতে পারেন? পরাধীন ভারতে শাসক ইংরেজ সেই শাসক শক্তির প্রয়োজনেই Trigger happy করে তুলেছিলেন। আজ ত্রিশ বৎসর স্বাধীনতার পরেও সেই অবস্থাই বহাল আছে। পুলিশ আজও বন্দুকের মুখেই সমস্যার সমাধান দেখে। কংগ্রেস তার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের রাজত্বে পুলিশের এ দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন করেনি, বর্তমান জনতা সরকারও করছেন না। তাই সমস্যা যথা পূর্বম্ তথা পরং উপরন্তু মুখ্যমন্ত্রী তার কমরেডদের উত্তেজিত করে সমস্যার সমাধান চাইছেন। সে কথা উল্লেখ করতেও তিনি বিরত হন নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি একি সমস্যার সমাধানের পথ, এ পথে কি আগুন নিভবে, না আরও বেশী করে জ্বলে উঠবে? আমরা বলি দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-সঙ্কট, উদ্বাস্তু সমস্যা, ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা সবই দেশে আছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং জনতা সরকার এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের মধ্যেই প্রকৃত সমাধান খুঁজুন। আগুন জ্বললে তাতে সমস্যার সমাধান হবে না, আগুনও নিভবে না।

———

দি লং মার্চ

—সতীভূষণ সেন

এতদিনে আমরা দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে সজাগ হয়েছি। সজাগ হয়েছি তাদের অপরিসীম দুর্দশার জন্য নয়, তাদের অদ্ভুত অধ্যবসায়ের কাহিনী শুনেও নয়। সে তো বরাবরই জানতাম, আর মনে মনে আফশোষ করতাম। কুড়ি বছর পরে বাস্তুহারা মানুষগুলি আবার ফিরে এসে আমাদের পায়ের উপর পড়েছে বলেও আজ সজাগ হয়ে উঠিনি। দেখেছিতো সব পথই শেষে কলকাতায় এসে শেষ হয়। সব পথ, সকলের পথেরই শেষ হয় কলকাতায়। পূর্ব থেকে, পশ্চিম থেকে, উত্তর থেকে, দক্ষিণ থেকে, সবাই আসে কলকাতায়। পূর্ব থেকে আসে পূর্ববাংলার মানুষ একটু আশ্রয়ের সন্ধানে। উত্তরের পথ দিয়ে আসে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের মানুষ ভাল রুটির খোঁজে। দক্ষিণ থেকে উড়িয়া ও দক্ষিণীরা আসে ভাতের থালার আকর্ষণে। আর পশ্চিম দিক থেকে আসে ভাগ্যান্বেষী লোটা কম্বল ও বুদ্ধি সম্বল করে। সকলেই মোটামুটি আশ্রয় পায়। তাই দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদেরও ফিরে কলকাতা চলে আসার আমরা সজাগ হইনি।

আজ যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কুড়ি বছর আগে এঁরাই বাস্তুহারাদের দণ্ডকে পাঠানোর বিরোধীতা করেছিলেন। বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গেই এদের পুনর্বাসনের উপযুক্ত জমি আছে। জোর দিয়ে বলেছিলেন যে দণ্ডকারণ্যে পাঠালে এদের সর্বনাশ করা হবে। আজ দেখছি তাঁদের ভবিষ্যৎ বাণীই সত্য হয়েছে। দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হয়নি। লাঞ্ছিত, অপমানিত উদ্বাস্তুরা শেষ পর্যন্ত ফিরে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গে উপনিবেশের উপযুক্ত জমির খুদ্রুক সন্ধান নিয়ে এসেছেন। এখন যুক্তফ্রন্ট সরকার সাগ্রহে তাদের পুনর্বাসনের আয়োজন করবেন, এইটুকু আশা করাই স্বাভাবিক। তবে কিনা যখন এই সব আশার বাণী শুনিয়েছিলেন, তখন তাঁরা ছিলেন সরকার বিরোধী। এখন শাসনভার অধিকার করেছেন, সেই সব প্রতিশ্রুতির তামাদী হয়ে গেছে। তাই যুক্তফ্রন্ট সরকার আজ বিপুল সংখ্যাধিক্যে শাসন পরিচালন করছেন বলেও আমরা সজাগ বা আশান্বিত হইনি।

সজাগ হয়েছি অন্য কারণে। একদিন যাদের দেখেছি সব অপমান মাথা পেতে নিতে আর ঘুষঘুষে জ্বর করতে; প্রতিবাদ করার কথা মনেও আনেনি। ছিন্নমূল ছিটিয়ের জন্য যাদের কখনো সহরে আনা যায় নি। তদানীন্তন সরকার যাদের ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বনবাসে, পাঠিয়ে যাদের বোকা চাষকা করেছিলেন, তারাই আজ সংগঠনের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ফিরে এসেছে। লাঠি ঠুকে দাবি করছে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের অধিকার। তাই আমরা সজাগ হয়েছি, ভাবছি ওদের দুরবস্থার জন্য আমরা কে কতখানি দায়ী।

মস্তবড় একটা হাড়ের ফ্রেম, কিন্তু শুধু চামড়া দিয়ে আবৃত। মাথা ভর্তি বড় বড় চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের কোলে পিচুটি, অঙ্গে মলিন ছিন্ন বেশ। সর্বাঙ্গ থেকে ঘামের ভাপসা গন্ধ। এক এক দল মানুষ, তাদের ঘিরে এক এক দল পুলিশ। ওরা যদি উদ্বাস্তু, তবে কেন এত পুলিশের সমাবেশ? ওরা কি চোর ডাকাত? ওরা কি পলাতক ক্রীতদাস? আমেরিকার নিগ্রো দাসদের মত মালিকের বাগিচা থেকে পালিয়ে এসেছে? ধরে ফেরৎ পাঠাবার জন্য এমন পুলিশ তৎপরতা? দণ্ডকারণ্যের কর্তৃপক্ষ কি নগদ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন, কায়েমে আমল জিলা সাহেবের পুরের বন্দীশালার এই মানুষগুলিকে যে তাদের দণ্ডকে ফেরৎ পাঠাতে হবে?

কাজ তো তারা কম করেনি দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টে, কি ঘপলোষ হয়নি? বন কেটে সাফ করেছে, চাষের জমি তৈয়ার করেছে, রাজপথ নির্মান করেছে, বাঁধ বেঁধে সেচের জল সংগ্রহ করেছে। যে রাজপথ নির্মান করেছে, সে পথ তাদের কাজে লাগেনি; যে বাঁধ বেঁধেছে, তার জলের ভাগ পায় নি। ১০০ কোটি টাকা এসে ফিরেছে কেন্দ্রের কোষাগার থেকে, সে টাকায় লালিত হয়েছে কেন্দ্রের কতকগুলি অনাদু, অকর্মা, অবাঙ্গালী কর্মচারী, অন্য কোথাও যাদের যায়গা হয় নি।

১৯৭৫ সালে উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্য পরিত্যাগ করে আসতে আরম্ভ করেন, সিদ্ধার্থবাবু তাদের পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে আটক করেন এবং জোর করে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। কি তাদের অসুবিধা, কেন তারা সব পরিত্যাগ করে চলে আসছে, জানবারও চেষ্টা করেন নি। যেন তারা দণ্ডকারণ্যের প্রজা, পশ্চিমবঙ্গের কেউ নয় যেন ওদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসবার চেষ্টা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। আসামের ফ্রেমে, এমারজেন্সি প্রয়োগ করে সি আর পির সাহায্যে [illegible] ফিরিয়ে দিয়েছিলেন [illegible]

মানুষ ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারেনি। প্রতিবিধানও কিছু করা হয়নি, ওদের অভিযোগের। তারপর দিনে দিনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে, সরকার কিছুই করেন নি। কোন সরকারই হৃদয়ের ব্যথা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

তিন বছর পরে আজ দেশের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এমারজেন্সির বাঁধন খুলে গেছে, সিদ্ধার্থবাবু পদচ্যুত হয়েছেন। কেন্দ্রে ও রাজ্যে সহানুভূতি সম্পন্ন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবু বরতরণ্ডা ব্লকের অবস্থা হয়ে গেছে সেই আগের মতই। শাসকের অবহেলার সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রতিবেশীর বিদ্বেষ। এবার ওরা আসছে সংঘবদ্ধ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আসছে বন্যার স্রোতের মত। অগ্রসর হচ্ছে স্থির লক্ষ্যের দিকে। জ্যোতিবাবু সীমান্তে সি-আর-পির বাঁধ দিয়ে জনস্রোত বন্ধ করবার চেষ্টা করেন নি। এমারজেন্সির আঁধারে যা করা যায়, দিনের আলোয় তা করা সম্ভব নয়। তাই ওদের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে দিয়েছেন। এবং প্রথম ডিফেন্স লাইন অতিক্রম করেছেন উদ্বাস্তুরা, অর্ধেক যুদ্ধ জিতেছেন। উভয় পক্ষই জানেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দুর্বলের উপর সরকারী বল প্রয়োগ নীরবে সহ্য করবে না তাই জ্যোতিবাবুর মুখে শান্তির বাণী, বলছেন পশ্চিমবঙ্গে উদ্বৃত্ত জমি কোথায়, যে উপনিবেশ গড়তে চাও?

আমরা জমির ব্যাপারী নই, সুন্দর বনের ধারে কাছেও কখন যাইনি। কত উদ্বাস্তুর জন্য কত জমি প্রয়োজন, সে হিসাবও বুঝে উঠতে পারি না। তবে শুনেছি সুন্দরবনের মত একটা অংশ ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। সেখানে কি উদ্বাস্তুদের বসবাস করতে দেওয়া যায় না? দুচারটি বাঘ হয়ত নরমুণ্ডের 'টেস্টার' যারে মারা পড়বে। কিম্বা বাঘগুলোকে যদি বাঁচিয়ে রাখা একান্ত জরুরী হয়, ওদের তাড়িয়ে দিতে পারেন বাংলাদেশে। চরে বেড়াবার জন্য অনেক বড় অরণ্য পাবে সেখানে।

সুন্দর বন কালকে জেগে ওঠা দ্বীপের সমষ্টি নয়। হাজার বছর আগে সেখানে মানুষের বাস ছিল, তখনকার মন্দির দেউলের চিহ্ন, পীড়ার দুর্গার ভগ্নাবশেষ এখনো দেখা যায়। বহুবার মানুষ অরণ্যকে হটিয়ে উপনিবেশ গড়েছে, বহুবার অরণ্য মানবকে বিতাড়িত করে জনপদ গ্রাস করেছে। আদি যুগ থেকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের লড়াই চলেছে। সে যুগে মাটির বাঁধ বেঁধে জোয়ারের লোনা জল আটকানো হত, এ যুগে শক্ত করে বাঁধ সেঁধে স্লুইস গেট দিয়ে জোয়ারের জল নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ১০৮০ বছর আগে সার ডেনিয়েল হ্যামিলটন গোসাবায় একটি আধুনিক উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, প্রকৃতিকে পরাজিত করেছিলেন। বহু 'গোসাবা' সৃজন করতে পারেন জ্যোতিবাবু, শুধু ইচ্ছা করলেই হল। জনবলের অভাব নেই, অর্থও কোন 'প্রব্লেম' নয়। কথা হচ্ছে, তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি না।

হতকারণা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন, ওরা পরিশ্রমী, অলস নয়। প্রকৃতি বিরূপতাই কিছু করতে পারছে না। স্বীকার করেছেন, প্রতিবিধান করেন নি। যারা দেখেছেন তারাই জানেন কি কঠোর প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে উদ্বাস্তুরা টিকে থাকবার চেষ্টা করেছেন। জলের অভাবে ধান শুকিয়ে গেছে, সেই শুকনো মাঠে তুটা ফলিয়েছেন। অজন্মার জন্য যখন কোন ফসলই তোলা সম্ভব হয় নি, তখনও হাল ছাড়েন নি। নিজের চেষ্টায় কঠোর শ্রমের কাজ জুটিয়ে নিয়েছেন। মাটি কেটে রাস্তা বানিয়েছেন, পাথর ভেঙে রাজপথ নির্মাণ করেছেন। আজ অবশেষে অন্য উপায় আর নেই বেখে, হতকারণ্য পরিত্যাগ করে এসেছেন। একে যদি বিদ্রোহ বলেন, তবে ওঁরা বিদ্রোহী। কিন্তু এ বিদ্রোহে রক্তপাত নেই, যুদ্ধের উন্মাদনা নেই। শত্রুর বিনাশের জন্য বিদ্রোহ নয় এটা। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই নিয়ত বিদ্রোহ।

আমরা দূর থেকে এই পদযাত্রার গতি লক্ষ্য করছি। দৈনিক কাগজে তার বেদনার্ত বিবরণ পাঠ করছি। এক আশ্চর্য্য জনস্রোত চলেছে নতুন ভবিষ্যতের দিকে। তাদের আশা আছে, নেশা আছে, প্রতিজ্ঞা আছে। নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করার সব উপকরণই সংগৃহিত। প্রথম প্রথম কাঁটা ফুটবে রক্ত ঝরবে, বিষন্ন কণ্ঠের বেদনার্ত সুর ধ্বনিত হবে। কিন্তু থেমে ওরা যাবে না কখনোই।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান

সিভিল সার্ভিসের ব্যাপারটা নিয়ে রচিত সর্বভারতীয় স্মারক প্রতিবেদন হাউস অব কমন্সে পাঠান হয়েছিল। এই প্রতিবেদনে ভারত সচিবের আদেশকে সংশোধন করে প্রতিযোগিতা মূলক আই.সি. এস পরীক্ষার বয়সের সীমা বাড়িয়ে, বর্ত্তমানে যেমন চলছে, ২২ বছর করার দাবী জানান হয়। আরও দাবী করা হয়েছিল যে ইংল্যাণ্ডে এবং ভারতে একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হোক। প্রতিবেদনটি ডাকেই হাউস অব কমন্সে পাঠান হত। ইতিপূর্বে এই রকম ডাকে পাঠানোর ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এবারে জনমনে একটি নতুন খেয়াল চাপল। আমরা এমন একটি জন স্বার্থ সংরক্ষণ প্রশ্নে সমগ্র ভারত বর্ষকে একটি সূত্রে এনে স্থাপিত করেছি যা দেশের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নাড়া দিয়েছে। আমরা বুঝতে পারলাম এই সংঘবদ্ধ জনমতের অভিব্যক্তিকে আমাদের কোন জাতীয় প্রতিনিধির মারফৎ ইংল্যাণ্ডের শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। তিনি যথোপযুক্ত ভাষায় সে কথা ইংল্যাণ্ড বাসীদের কাছে ঘোষণা করে সে দাবী পেশ করবেন। আমাকেই এই প্রতিনিধিত্ব করতে বলা হল। কিন্তু আমি তাতে আপত্তি জানালাম। আমার আপত্তির কারণ সুস্পষ্ট এবং তা সকলেরই জানা ব্যাপার। ইতিপূর্বে ইংল্যাণ্ডে আমাকে নিয়ে যা ঘটেছে তাতে সেখানে যে সার্ভিস থেকে আমি নিজে বিতাড়িত হয়েছি সেই সার্ভিসে অধিক সংখ্যায় আমার দেশের লোককে নিয়োগ করার ব্যাপারে আমি কিছু বলতে গেলে তা ভুল বুঝবার সম্ভাবনা আছে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তখন নজর পড়ল মিঃ লাল মোহন ঘোষের উপর। তিনিই নির্বাচিত হলেন। মিঃ লালমোহন ঘোষ তাঁর মিশনে যেরূপ অপূর্ব সাফল্য করেছেন তাতেই প্রমাণিত হয়েছে যে তাকে নির্বাচন করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হয়েছিল। তাঁর যে এরূপ চমৎকার বক্তৃতা করার ক্ষমতা আছে তা আমাদের জানা ছিলনা। কারণ তিনি ইতি পূর্বে কোন সময়ে জন-জীবনের কোন ব্যাপারকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে তাতে যোগদান করেন নি। কিন্তু তাঁর সেই বাগ্মীতার শক্তি যখন এমন ভাবে প্রকাশ পেল যে তা শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করেছে এবং সেই শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী পুরুষ জন ব্রাইট, তখনই আমরা তা জানতে পারলাম। এই সংবাদ আমাদের যেমন উৎফুল্ল করল, তেমনি করল বিস্ময়াবিষ্ট। মেপালিয়ান যখন কেবলমাত্র একজন অপরিচিত তরুণ লাবঅলটান ছিলেন সেই সময়ই কারসট তাঁর মধ্যে ভবিষ্যৎ মেপালিয়ানকে আবিষ্কার করার সৌরব অর্জন করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের নেতারাও সেইরূপ এমন একজনকে আবিষ্কার করার সৌরব বোধ করলেন যিনি পার্লামেন্ট মহাসভায় সর্ব প্রথম ভারতীয় রূপে সম্মান অর্জন করেছেন এবং বিধাতার বিধান ক্রমে আমাদের জীবনে এক নেতৃত্বের স্থান অধিকার করলেন।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ডেপুটেশন পাঠান ছিল একটা ব্যয় সাধ্য ব্যাপার। তা ছাড়া ক্যালকাটার মত নিরাশাবাদী ভবিষ্যৎ বক্তারও অভাব ছিলনা যারা বলতে থাকেন যে টাকাগুলো সব নষ্ট হবে, ডেপুটেশনে কোন ফলই হবেনা। কিন্তু সারা ভারতে আমাদের সিভিল সার্ভিস আন্দোলনের সাফল্য আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। তাই আমরা ভীরুতার বা নিরাশা বাদের কোন উপদেশকে আমল দিলাম না। অর্থ সংগ্রহের জন্যে চাঁদার খাতা

নিজেই গ্রহণ করলাম এবং ছয় মাসের মধ্যে আমি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করলাম। টাকা দাতারা ছিলেন প্রধানতঃ মধ্য বিত্ত শ্রেণীর লোক।

মোটা টাকা পেয়েছি কেবল মাত্র মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট থেকে। বিখ্যাত বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জীর কাছ থেকে এক খানা পত্র সংগ্রহ করি। বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পত্রখানিকে আমার অক্লান্ত পরিশ্রমী বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে বহরমপুরে মহারাণী স্বর্ণময়ীর এষ্টেটের ম্যানেজার রায় রাজীব লোচন রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন কিন্তু আমরা যে পরিমাণ টাকা চেয়েছিলাম তিনি তার অর্ধেক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানালাম, তবে একথাও বললাম যে আমরা এর চেয়ে অধিক আশা করেছিলাম। আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাদের আবার ডাকালেন এবং বললেন "আমি আপনার সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করে দেখলাম এবং আপনারা যা চাচ্ছেন তার সবটাই দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।" আমরা তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে এবং মহারাণী স্বর্ণময়ীকে আশীর্বাদ করে চলে এলাম। রাজীবলোচন রায়ের সঙ্গে এই আমার প্রথম এবং শেষ দেখা। বর্তমান যুগের লোকেরা তাকে জানে না। শীঘ্রই তার স্মৃতিও লোকে ভুলে যাবে। মহারাণী স্বর্ণময়ী "দানশীলা মহিলা" বলে তার জীবনে যে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার পেছনে ছিল এই রাজীব লোচনের প্রেরনা—সিংহাসনের অন্তরালে শক্তির মত। এই রাজীব লোচনই কাশিম বাজার এষ্টেটকে সরকারের বাজেয়াপ্ত করণ থেকে রক্ষা করেছিলেন; এবং তারই সুপরামর্শ ক্রমে মহারাণী তাঁর এষ্টেটের বিশাল সম্পদ তিনি বিভিন্ন ভদ্র লোকের মধ্যে দান কার্যে এবং সর্বসাধারনের নানা হিতকর কাজে ব্যয় নির্বাহের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর এই দানশীলতার জন্য মহারাণী স্বর্ণ কুমারীর নাম তাঁর জীবদ্দশায়ই বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়।

তাঁর বদান্যতার এই নিষ্ঠা কিরূপ ছিল তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত না করে পারছিনা। তাঁর এই বদান্যতা কোন বিশেষ ধর্ম, শ্রেণী বা বর্ণ বিবাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। ১৮৭৮ সালে আফগান যুদ্ধের সময় উট সংগ্রহ করার জন্য গজনীর একজন আফগান বনিকের গভর্ণমেন্টের কাছে কিছু টাকা পাওনা ছিল। সেই টাকা কি ভাবে আদায় করা যায় সে সম্পর্কে তিনি আমার সাহায্য চান। একজন কাঙ্গালের মত সব হারিয়ে অসুখী হয়ে তিনি আমার কাছে আসেন। মামলায় তিনি হেরে গিয়ে এমন অবস্থার মধ্যে পড়েন তার নিজের দেশে চলে যাওয়ার খরচ পর্যন্ত তার ছিল না। আমি হিসাব করে দেখলাম যে গজনীতে ফিরে যেতে তার ১৫০ টাকা লাগবে। সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে আমি মহারাণীর নিকট লিখলাম। তিনি ১৫০ টাকা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বেচারা আফগান তখন হর্ষোৎফুল্লচিত্তে মহারাণীকে আশীর্বাদ জানিয়ে দেশে ফিরে গেলেন।

এইভাবে টাকা তোলা হলে মিঃ লালমোহন ঘোষকে পার্লামেন্টে সিভিল সার্ভিস সম্পর্কীয় মেমোরিয়ালটি পেশ করার ভার দেওয়া হল। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি রূপেই তাঁকে ইংল্যাণ্ডে ডেপুটেশনে পাঠান হল।

মিঃ লাল মোহন ঘোষের শ্রম ও কর্ম আমাদের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছে বলা যায়। ইংল্যাণ্ডে ডেপুটেশন পাঠিয়ে কত কি যে করা সম্ভব, তা এই ডেপুটেশনে জানা গেল। বুদ্ধি উদ্যম ও শক্তি নিয়ে তিনি তার কাজে লেগে গেলেন। তাঁর কাজে তিনি আদিবাসী সংরক্ষণ সমিতির সেক্রেটারী মিঃ চেমন এবং স্যার উইলিয়াম ওয়েডার্বার্ণের ভ্রাতা স্যার ডেভিড ওয়েডার্বার্ণের কাছ থেকে বেশ মূল্যবান সাহায্য পেয়েছেন। স্যার ডেভিড ওয়েডার্বার্ণ তাঁর খাঁটি ভ্রাতৃত্ব নিয়ে এ যুগের ভারতে [illegible] উপস্থিত

নেন। কিন্তু যারা ভারতে স্বপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সরকার প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন তার চেম্বিস ওয়েডার ধার্ন ছিলেন তাদেরই একজন। তার সঙ্গে এ বিষয়ে পত্রালাপ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে উইলিস রুমসে একটি মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। মিঃ জনব্রাইট সেই সভার সভাপতিত্ব করেন। মিঃ লালমোহন ঘোষ সেই সভায় এমন হৃদয় গ্রাহী ভাষায় বক্তৃতা করেন যে উপস্থিত সকলেরই তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। সভাপতি নিজেও তার ভাষণের প্রতি উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গেই সেই মিটিংয়ের ফল ফলল। চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই কমন্স সভায় বিধান উপস্থাপিত করা হল যা থেকে বিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস নামে আইনের সৃষ্টি হল। পরবর্তী কালে বিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস নামেই এই আইনটি পরিচিত হয়। ১৮৭০ সালের এই পার্লামেন্টের বিধান অনুযায়ী কয়েকটি নিয়ম প্রবর্তন সাপেক্ষে ভারত সরকারকে স্থানীয় অধিবাসীদের চরিত্র থেকে যোগ্যতা ও সামর্থের ভিত্তিতে বাছাই করা লোকদের পার্লামেন্টের সম্মতিতে সৃষ্ট সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তবে সাত বছরের উপর হয়ে গেল ভারত সরকার এ বিষয়ে কিছুই করেন নি। কিন্তু উইলিস রুমের সভায় সম্মিলিত ভারতের মনোভাব এমন ভাবে ব্যক্ত হয়েছিল যা উপস্থিত সকলের মনে দৃঢ় রেখা পাত করে যার ফলে ঐ সমস্ত বিধি বিধান গুলি যা সংখ্যায় ছিল মাত্র চারটি এবং যা দীর্ঘ সাত বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল—এই সভা অনুষ্ঠানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

এই ভাবে ভারতের অভিযোগের বার্ত্তা একজন ভারতীয় কর্তৃক ইংল্যাণ্ডে বহন করার ফলে এক অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করা গেল। ভবিষ্যতে এইরূপ পদ্ধতি কাজে লাগান হয়েছে, যাদের মনে প্রথমে এইরূপ প্রতিনিধি প্রেরণের ধারনা জাগ্রত হয় এবং কার্য্যতঃ তা প্রয়োগ করা হয়, তাদের বিজ্ঞতা ও দূর দর্শিতা সম্পর্কে আর কোন প্রশ্নই থাকেনা। বলতে কি, মিঃ লালমোহন ঘোষ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করার অত্যল্প কালের মধ্যেই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন আবার তাকে ইংল্যাণ্ডে ডেপুটেশনে পাঠান। এই কার্যোপলক্ষে তার ইংল্যাণ্ডে অবস্থান কালেই লিবারেল দলের পক্ষে তিনি পার্লামেন্টের নির্বাচনে দাঁড়ান। যদি শেষ মুহূর্ত্তে আইরিশ ভোটগুলি তার বিরুদ্ধে না যেত, তাহলে তিনি পার্লামেন্ট মহাসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার উচ্চ সম্মান অর্জন করতে পারতেন। এই সম্মান পরে ভারতের পক্ষে সেই মহান বৃদ্ধ ওয়লোক মিঃ দাদাভাই নৌরজি লাভ করেছিলেন। মিঃ দাদাভাই নৌরজিই ছিলেন পার্লামেন্টে প্রথম ভারতীয় সদস্য। তবে একথা ঠিক যে মিঃ লাল মোহন ঘোষই এরজন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন এবং তিনিই ছিলেন এর প্রথম পথ প্রদর্শক।

দীর্ঘদিন পরে ১৮৯০ সালে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম। সেখানে ভারতীয় সমস্যার উপরে এক জনসভায় বক্তৃতা করার জন্য ডিপট ফোরডে যাই। এই ডিপোট ফোর্ডই ছিল মিঃ লালমোহন ঘোষের নির্বাচন কেন্দ্র। সেখানে আমি দেখলাম যে তার পুরাতন বন্ধু ও সমর্থকগণ তাকে প্রীতির সহিত স্মরণে রেখেছেন। তার প্রতিভা এবং বাগ্মিতার শক্তি এমনই ছিল যে যারা তার বক্তৃতা শুনেছেন বা তার ব্যক্তিগত প্রভাবের সংস্পর্শে এসেছেন তাদেরই মনে তার সম্পর্কে একটা স্থায়ী অনুভূতির রেখাপাত ঘটেছে। ভারতের জনগণের কাছে এই রকমের একটি মানুষের অকাল মৃত্যু একটা প্রচণ্ড দুর্ঘৈব ঘটনা। আমি ১৮৮৯ সাল থেকে তাকে জানি। চল্লিশ বছর ধরে আমরা অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম। জীবনের শেষের দিকে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় এবং ক্রমশঃ অচল অবস্থা দেখা দেওয়ার জন্য সেবামূলক কাজ থেকে তাকে কিছুটা দূরে সরে যেতে হয়েছে। কিন্তু সেই সেবা মূলক কাজে তার আগ্রহের অভাব কখনও দেখা যায়নি, বরং সে কাজে যখনই যতটুকু অংশ তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে বরাবরের মতই তার বিচার-বুদ্ধি স্বচ্ছ ছিল এবং তার বাক্যালাপও ছিল দৃঢ়তা ব্যঞ্জক।

———

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীকীরোদ দত্ত

১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার সর্বত্র স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। এর কিছুদিন আগের কথা খুলনা জেলার আলকা গ্রামের সুধীর চন্দ্র দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে কলকাতায় এসে মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হন। ১৪৩নং মানিকতলা ষ্ট্রীটে একটি মেসে তিনি থাকতেন। সুধীর বাবুর কলেজে যাওয়ার পথে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর ছিল অনুশীলন সমিতির ব্যায়াম কেন্দ্র। কলেজে আসাযাওয়ার পথে সমিতির তরুণদের কণ্ঠে তিনি স্বদেশী গান শুনতেন এবং লাঠি হাতে বীরদর্পে চলতেও দেখতেন। সেখানে গিয়ে তিনি কয়েক দিন তাদের খেলাধূলা দেখলেন তারপরে সমিতির সেক্রেটারী সতীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি সমিতিতে ভর্তি হলেন। সমিতির মাসিক চাঁদা ছিল চার আনা। কলেজ থেকে ফেরার পথে রোজ খেলাধূলা করে সুধীরবাবু মেসে ফিরতেন। এটা ছিল ১৯০৪ সাল। মার্শ সিং নামে একজন পালোয়ান কুস্তি শেখাতেন, তুর্কী কায়েম খাঁ তরোয়াল শেখাতেন তরোয়ার খেলা। উলুবেড়িয়ার অতুল ঘোষ শেখাতেন বড়লাঠি তার ভাই প্রতুল ও সুরেনও লাঠি খেলা শেখাতেন। সুধীর বাবুও লাঠি এবং তরোয়ার খেলা শিখতে লাগলেন। প্রায় ছয়মাস পরে সুধীরবাবুর দীক্ষার সময় এল। সতীশবাবু তাকে ডেকে দীক্ষার দিন ধার্য্য করে দিলেন শুভদিনে সমস্ত দিন অভুক্ত থেকে স্নানাদির পর পবিত্র হয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে তিনি দীক্ষা নিলেন। নিজের বুক চিরে রক্ত দিয়ে দেশমাতৃকা মুক্তির পদতলে রক্তমাখা পত্রপুষ্প নিবেদন করলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হলে প্রাণ বিসর্জন দিবেন। কিছুদিন পরে সেক্রেটারী সতীশবাবু তাঁকে তাঁর নিজ অঞ্চল যশোহর এবং খুলনা জেলায় অনুশীলন সমিতির শাখা সমিতি গড়ে তুলবার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী সুধীরবাবু স্বগ্রাম আলকাতে অনুশীলন সমিতির প্রথম কেন্দ্র স্থাপন করলেন। কলকাতার সমিতি থেকে এক জন লাঠি খেলার শিক্ষক সেখানে রেখে এলেন প্রতি শনিবার বরিশাল এক্সপ্রেসে কলকাতা থেকে বাড়ী যেতেন এবং গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন। সোমবার সকালের ট্রেনে কলকাতা ফিরতেন। কিছুদিনের মধ্যে আশ পাশের গ্রামের মধ্যে অনুশীলন সমিতির শাখা গড়ে উঠতে লাগল। সতীশবাবু শুনে খুশী হলেন। তিনি তিন চারটি গ্রাম নিয়ে এক একটি সমিতি গঠন করতে বললেন। মাঝে মাঝে এক সপ্তাহের জন্য মূল কেন্দ্রের বিখ্যাত লাঠিয়াল অতুল ঘোষকে ঐ অঞ্চলে পাঠাতে লাগলেন। ফলে দূর দূর গ্রামেও অনুশীলন সমিতির বহু শাখা স্থাপিত হল। শ্রীশচীন মিত্র ছিলেন খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্মী। পাইকপাড়া সমিতির ভার-প্রাপ্ত কর্মী ছিলেন বিধুভূষণ দে। ধূলগ্রাম সমিতির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন অবনিভূষণ চক্রবর্তী এবং আলকা সমিতির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন শ্রীসুধীর চন্দ্রদে। সুধীর বাবুর মাধ্যমে এই অঞ্চলের বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে মূল কেন্দ্রের সংযোগ রক্ষিত হত।

ক্রমে এই অঞ্চলের বিপ্লবীদের নিয়ে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হল এবং তাদের কুচকাওয়াজ শিক্ষা চলতে লাগল। বেছে বেছে কর্মীদের নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র চালনাও শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল। ফলে কর্মীরা বিপ্লবাত্মক কার্যের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ল। অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা একটি ডাকাতিতে লিপ্ত হল। প্রথম ডাকাতি হল হালিশাখালির অধিবাসী গোপালবসুর গৃহে নগদ টাকা এবং অলঙ্কার পত্রে প্রায় আড়াইহাজার টাকা লুণ্ঠিত হল। এরপরে খুব অল্পদিনের মধ্যেই সোনাডি এবং দক্ষিণ ডিহি গ্রামেও দুটি ডাকাতি হল। ১৯০৯ সালের ১৩ই আগষ্ট ডাকাতি হল নাওনা গ্রামে মথুর গোদারের গৃহে। খুলনা সমিতির কিছুকর্মী পুলিশের উৎপীড়নে গৃহ ছেড়ে কলকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া করে

(পরের পাতায় দেখুন)

গান্ধী সংগ্রহালয়ের স্বেচ্ছাচার

—যজ্ঞেশ্বর বর্মন

ব্যারকপুর গান্ধী সংগ্রহালয়ের আবাসিক সম্পাদিকার অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে স্থানীয় জনসাধারণের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৯শে মার্চ, বুধবার ১৯, রিচার্ড সাইড রোড বিকাল ৫ টায়, উক্ত সংগ্রহালয়ের সামনের রাস্তায়। সভাপতি—স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দাশগুপ্ত। সভা শুরু হতে কিছু দেরি হলেও জনসভা ঐদিনে বিশাল আকার ধারণ করে। অতঃপর কর্মসূচী অনুযায়ী সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সর্বশ্রী গৌর কুণ্ডু, শৈলেন দাস, বিশ্বনাথ হালদার, তড়িৎ তোপদার প্রমুখ বিভিন্ন বক্তারা, গান্ধী সংগ্রহালয় দর্শনার্থী জনসাধারণের সঙ্গে বর্তমান আবাসিক সম্পাদিকার (শ্রীমতী সাধনা সোম) অবমন্ত আচরণের প্রতিবাদে সোচ্চার বক্তব্য রাখেন। ক্রমে বক্তারা সংগ্রহালয়ের প্রাক্তন সম্পাদকের (শ্রীযুক্ত মানসগোবিন্দ সেন) তুলনায় বর্তমান সম্পাদিকার কাজ পরিচালনগত ব্যর্থতা ও নিতান্ত স্বার্থসিদ্ধিমূলক কার্যকলাপের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(১১ পাতায় দ্রষ্টব্য)

(আট পাতার শেষাংশ)

বাস করছিলেন। তারাও এই ডাকাতিতে যোগ দিয়েছিলেন ডাকাতিতে মুখোস এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। সুতরাং পুলিশের বুঝতে অসুবিধা হলনা যে এটা বিপ্লবী ডাকাতি কিন্তু বিপ্লবীরা অনেক চেষ্টা করেও সিন্দুকের চাবী সংগ্রহ করতে পারেনি। চাবী ছিল অন্নবয়স্ক বধূদের কাছে। তাদের গায়ে হাত দেওয়া অথবা উৎপীড়ন করা বিপ্লবীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং সিন্দুক খোলা গেলনা বিপ্লবীদের অভিযান ব্যর্থ হল। কিন্তু এই ডাকাতি উপলক্ষ্য করেই ব্যাপক ধর পাকড়ও আরম্ভ হল। মামলা পরিচালনার ভার নিলেন সরকার পক্ষে মৌলবি সামসুল আলম। তার ওকালতির জন্য তিনি পরে হাইকোর্ট ভবনে বিপ্লবী বীরেন দত্তগুপ্ত কর্তৃক নিহত হন।

খুলতলা সমিতির যোগীরাম বলে জনৈক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে পুলিশের ফাঁদে পা দেয় এবং অনেক কথা তাদের বলে দেয়। এরফলে বিভিন্ন স্থান থেকে বহু কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এর মধ্যে ছিল যশোহর জেলার পাইকপাড়া গ্রামের বিধুভূষণ দে। খুল গ্রামের অবনি ভূষণ চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ চাই, বসুন্দিয়ার অশ্বিনীকুমার বসু, লোধাপুরের কালীদাস ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ সরকার এবং নগেন্দ্রনাথ চক্র, খুলনা জেলার আলকা গ্রামের সুধীর চক্রবর্তী, পাতিয়ারার কানাই চক্রবর্তী এবং ভূমীরা গ্রামের নগেন্দ্র নাথ মিত্র। ভূমীরা গ্রামের শচীন মিত্র প্রথমে ফেরার হন কিন্তু তার নামে ওয়ারেন্ট বার হলে তিনি ও নগেন্দ্রনাথ বক্সী নামক জনৈক যুবক উকিলের সহায়তায় আদালতে হাজির হয়। ১৯০৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর অবনী চক্রবর্তী এক স্বীকারোক্তি করে। এই স্বীকারোক্তিতে সে সকল আসামীকেই জড়ায়। অবনীকে সরকারপক্ষ রাজসাক্ষী বলে ঘোষণা করে। এই সমস্ত উপকরণে সজ্জিত হয়ে সরকার পক্ষ মামলা ডাকাতি মামলা রুজু করে। মকদ্দমা খুলনা থেকে হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে সোপর্দ করা হয়। বিচারক ছিলেন তিনজন জজ মিস্টার মুখার্জি এবং মিস্টার ব্যানার্জি এবং মিস্টার চ্যাটার্জী। কিন্তু স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বিচারের সময় অবনী বলে যে সে পুলিশের শেখানোমত সব কথা বলেছে যেসব কথা বলেছে তা কিছুই সত্য নয়। অবনীর স্বীকারোক্তিতে ছিল যে সিন্দুকের তালাটি খোলা যায় নাই। কিন্তু বাড়ীর মালিক মধুর পোদ্দার বলে যে লোহার সিন্দুক খোলা হয়েছিল এবং ঐ সিন্দুক থেকে একহাজারেরও টাকা অপহৃত হয়েছিল। একেতো অবনী তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করায় মামলা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল তার উপরে অবনীর কথার সঙ্গে মধুবাবুর কথার মিল না থাকায় ডাকাতি মামলা টেকেনি। ফলে বিচারে সকল আসামীই মুক্তি পেলেন। শুধু অবনী স্বীকারোক্তি করেছিল বলে সে সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ডাকাতি মামলা টিকলো না বটে কিন্তু আসামীদের ছেড়ে দেওয়া হল না। সবকটি ডাকাতি যুক্ত করে এবং সকল আসামীদেরই আসামী করে খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হল। হাইকোর্টে ডাকাতি মামলায় মুক্ত আসামীদেরও পুনরায় গ্রেপ্তার করা হল। তাদের খুলনায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শিক্ষাজগৎ ও সরকার

পশ্চিমবাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রাজ্যের নবগঠিত বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে সর্বপ্রকার অরাজকতা দূর করে পড়াশোনা ভালোভাবে চালানোর পক্ষে অনুকূল পরিবেশ ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা।

- পরীক্ষায় টোকাটুকি শুধু বর্তমান সমাজকেই নয়, ভবিষ্যৎ সমাজকেও পঙ্গু করবে—তাই, ছাত্রসমাজের কাছে সরকারের আবেদন, তাঁরা যেন নিজেরাই এই অন্যায় ও অসততার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।
- সর্বপ্রকার সমাজবিরোধী প্রবণতা থেকে ছাত্রসমাজ নিজেদেরকে দূরে রাখুন, স্কুলে—কলেজে শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলুন।
- দেশের সুস্থ ও রুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন,—পচাগলা সংস্কৃতির পাকিল আবর্তে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দেবেন না।

নিরক্ষরতা আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপ,—সেজন্য সরকার জনগণের সহযোগিতায় একটি বাস্তব ও ফলপ্রসূ কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তাছাড়া, প্রথমিক শিক্ষার বিষয়টিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রভৃতি বিশেষ অগ্রাধিকার পাবে।

শিক্ষাজগৎকে দুর্নীতিমুক্ত করে শিক্ষার সম্প্রসারণে জনগণের সহযোগিতাই সরকারের কাম্য

প: ব: (তথ্য ও জনসংযোগ) ৩১৪২/৭৮

৯ পাতার শেষাংশ

বক্তারা তথ্যসহ বিভিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া একে একে বলতে থাকেন, কাজে যোগদানের শুরু ২-৮-১৯৭৪ হইতেই বর্তমান সম্পাদিকা সংগ্রহালয়ের পূর্বপ্রচলিত কাজকর্ম প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়া প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পথ সর্বপ্রকারে বিঘ্নিত করিয়াছেন; যথা—সংগ্রহালয় দর্শনার্থীদের জন্য প্রচলিত জলদানের ব্যবস্থা বন্ধ করা হইয়াছে, সাজানো ফুলবাগান নষ্ট করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থেই কলা-কচু লাগানো হইয়াছে, ২'বছর গান্ধী জন্মোৎসব বন্ধ করিয়া ধর্মপিতা-সভাপতির (ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ) জন্মদিন পালন করা হইয়াছে, প্রদর্শনীয় চিঠিপত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচার না করিয়া গুদামজাত করা হইয়াছে, সংগ্রহালয় সংক্রান্ত সকল জনসাধারণের জন্য সুবিধাজনক হারের পরিবর্তে ভবলচার্জ করা হইয়াছে, গ্রন্থাগারের বইপত্র কেনা বন্ধ করিয়া নিজস্ব কোয়ার্টারে ও গ্যারেজঘরে অনাবশ্যক ও ব্যয়বহুল গ্রীল লাগানো হইয়াছে, বাগানের ফলমূলের অধিকাংশই অফিসে জমা না দিয়া বিনা পয়সায় সম্পাদিকার ভোগে লাগানো হইয়াছে, এবং গবেষকদের জন্য ও অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরগুলি বিনাভাড়ায় দখল করিয়াছেন যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদিকা স্বয়ং।

বক্তারা বলেন—এরকম দৃষ্টান্ত আরো বাড়ানো যায়, কিন্তু এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটিমাত্র উল্লেখ করা হইল। এখন সভাপতির মতে সম্পাদিকার লোভের মাত্রা এমনই বাড়িয়া গিয়াছে যে, তিনি খুশিমতো কর্মী ছাঁটাই, সাসপেনশান, বেতনকাটা ছুটিকাটা, আংশিক ভাতাবন্ধ ইত্যাদি সমানতালে চালাইতেছেন। জানা যায়, এ পর্যন্ত মাত্র ১৩ জন কর্মীর মধ্যে মোট ৪ জন কর্মীকেই অন্যায় ভাবে ছাঁটাই ও সাময়িক বরখাস্ত করা হইয়াছে। এবং অবশিষ্ট কর্মীরা আশঙ্কায় দিন কাটাইতেছেন। সম্পাদিকার এই জুলুমবাজ মনোভাব ও অবশিষ্ট ব্যবহারে নিতান্ত অতিষ্ঠ ও বিপন্ন হইয়াই কর্মীরা গত ১৭ই '৭৮ হইতে গান্ধী প্রদর্শিত অহিংস সত্যাগ্রহের পথে নামিয়াছেন। কর্মীরা কেবলমাত্র ভদ্র ব্যবহার ও এ যাবত প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাদি চালু রাখিবার দাবিতেই সত্যাগ্রহ চালাইয়া যাইতেছেন। অথচ সম্পাদিকা নিশ্চিন্ত নিরাপদে ঘরে বসিয়াই সত্যাগ্রহীদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করিতেছেন অকথ্য ভাষায়। অধিকন্তু সম্পাদিকার এই অন্যায় অত্যাচারমূলক কার্যকর্মে মদত যোগাইতেছেন তাঁহার ধর্মপিতা ও সংগ্রহালয়ের সভাপতি (ডঃ ঘোষ) তাঁর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীত্বের সুবাদে উপর মহলের পুলিশের সহায়তায়। যদিও বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতিমতো পুলিশ সত্যাগ্রহী কর্মীদের সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্র ও সভ্য আচরণ করিতেছে, তবুও কর্মকর্তার আহ্বানমাত্রে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পুলিশের উপস্থিতিই কর্মচারীদের মনে স্বভাবতই ভুলধারণার সৃষ্টি করতে পারে।

বক্তারা সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করেন, গান্ধীজির নামাঙ্কিত এই জনপ্রতিষ্ঠানকে এবং পূর্বভারতের (বিহার বাদে) একমাত্র গান্ধী সংগ্রহালয়কে তাঁরা কিছুতেই বর্তমান সম্পাদিকা ও তাঁহার ধর্মপিতা-সভাপতির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইতে দিবেন না; এমনকি কর্মীদেরও কোনোরকম ক্ষতি শেষ পর্যন্ত তাঁহারা বরদাস্ত করিবেন না। কারণ একথা আজ সুবিদিত যে, গান্ধীভাণ্ডের প্রায় ৬ লক্ষ টাকায় পরিচালিত মেদিনীপুর 'লোকভারতী'ও এই সম্পাদিকা ও সভাপতির হাতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া প্রায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। তাই, ব্যারাকপুর গান্ধী সংগ্রহালয়টিকে উক্ত দুষ্টচক্রের হাত হইতে বাঁচাইতে আজ সকলেই বদ্ধপরিকর। বিশেষতঃ স্থানীয় যুবসমাজ এখন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। স্থানীয় "ব্যারাকপুর বার্তা" পত্রিকার সম্পাদক (শ্রীপরেশ চক্রবর্তী) মহাশয়ও এই সংগ্রামে সামিল হন এবং জনস্বার্থে তাঁহার সর্বাধিক সমর্থনের কথা জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর স্থানীয় জনসাধারণের অভিপ্রায় অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে কর্মপরিচালনার উদ্দেশ্যে একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয়; সদস্যবৃন্দ যথা—সর্বশ্রী গৌর বসু, বিশ্বনাথ হালদার ও হৈমেন দাস এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দাশগুপ্ত ও আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বর্মন প্রমুখ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। কমিটির সুস্থির বক্তব্য—জনস্বার্থ ও কর্মীস্বার্থ উপেক্ষা করিয়া সংগ্রহালয়ের সম্পাদিকা ও কর্মপিতা-সভাপতি যদি স্বার্থসিদ্ধির আশায় ক্ষমতার দাপট দেখাইতে ক্ষতিকর অনমনীয় মনোভাব পোষণ করিতে থাকেন, তবে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে এ ব্যাপারে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, যেহেতু অহিংস সত্যাগ্রহী ও সংগ্রামী জনতার জয় অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনি ধ্বনিতে সভাভঙ্গ হয়।

শিক্ষা জগৎ

অনল ঘোষ

ছোটবেলায় মাষ্টারমশাই প্রায়ই একটা কথা বলতেন —'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ', অর্থাৎ কিনা, ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। যতো দিন যাচ্ছে, শব্দগুলো ততোই তাদের প্রকৃত অর্থ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এমন একটা সময় ছিল, যখন ছাত্ররা গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়ন করতো। দরিদ্র গুরু ও গুরুপত্নীর স্নেহ শাসনে থেকে, তাঁদের দৈনন্দিনের সুখ-দুঃখের অংশভাগী হয়ে গড়ে উঠতো ছাত্রদের প্রথম জীবন। বাস্তবের রুক্ষ উষ্ণতা তাদের স্পর্শ করতো না এমন নয়, সংঘাতের ক্লিন্নতা তাদের ক্লিন্ন করতো না তা-ও নয়—কিন্তু সবার ওপরে এক নান্দনিক আন্তরিকতা, পারস্পরিক বিশ্বাসের এক পরম মাধুর্য ঘিরে থাকতো তাদের। শুচিশুভ্র শিক্ষার পরিবেশে ভালোকে ভালো আর মন্দকে প্রকৃতই মন্দ জেনে তারা জীবনের পাঠ নিতো; তাই পরবর্তী জীবনের সংগ্রামমুখর মুহূর্তগুলিতেও আদর্শের বিচ্যুতি ঘটতো কদাচিৎ।

রাজনীতি সেযুগে ছিল রাজারই নীতি। রাজন্য, অমাত্যবর্গ ও উচ্চাভিলাষী কিছু মানুষই লিপ্ত থাকতো পারস্পরিক কলহে, সংঘাতে, ক্ষমতা-অধিকারের মরমস্তরায়। রাজপ্রাকার পেরিয়ে রাজনীতির ঢেউ কৈবাৎ ছুঁয়ে যেতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণকে—কিন্তু সে ঢেউ-এর ক্ষমতা ছিল না ভিতরে প্রবেশের। নালন্দার ধ্যানমগ্নতা কি ব্যাহত হয়েছিল কোন দিন অজ-বঙ্গ-কলিঙ্গের রাজনৈতিক উত্থান পতনে? নীলাম্বর কি আহ্বান করেছিলেন কখনো রাজকীয় বাহিনীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি রক্ষার্থে? হিউয়েন সাঙ কি নিগৃহীত হয়েছিলেন উত্তেজিত ছাত্রকুলের রোষে, প্রহৃত হয়েছিলেন কোন রাজপ্রহরীর মূষলাঘাতে?

সে রামও নেই—সে অযোধ্যাও নেই। তাই শিক্ষা, শিক্ষালয় আর শিক্ষাব্রতী—কথাগুলির অর্থ খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। শিক্ষা আজ শুধু পুঁথিগত বিদ্যালাভই নয়, শুধু জ্ঞানার্জনের সুশৃঙ্খলিত একটি পবিত্র প্রক্রিয়াই নয়, জীবনধারণের, জীবিকাসংগ্রহের হাতিয়ার সংগ্রহোপযোগী একটি দৈনন্দিন ক্রীড়াকাণ্ডও বটে! শিক্ষালয় আজ শুধু বিদ্যাদান ও গ্রহণের কেন্দ্রই নয়—তা পরবর্তী জীবনে, চাতুর্য, সংঘাত, মিথ্যাচার ও ক্ষমতাপ্রদর্শনমুখর নিরঙ্কুশ জীবনযাত্রার একটি সুবৃহদায়তন প্রদর্শনী। রাজনীতি বিশারদ শিক্ষাব্রতী ও ছাত্রের দল আজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্রাট। শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক পুরোপুরি ব্যবসায়ভিত্তিক—"পয়সা ফেলো ডিগ্রী নেবো, পয়সা দেবো নোট লেখাবো"। এমনিই চলছে, চলবে! রাজনীতির ঘুণপোকা ঘুরে ঘুরে খাচ্ছে সমাজ-জীবনকে, ঘুরে খাচ্ছে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশকে, ঘুরে খাচ্ছে মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, মনুষ্যত্বকে! এর থেকে রেহাই নেই!

সরকারী বিজ্ঞাপনে আড়ম্বরে ঘোষিত হচ্ছে—শিক্ষা-জগতকে দুর্নীতিমুক্ত করে শিক্ষার সম্প্রসারণ করতে হবে। ছাত্রসমাজ সমাজবিরোধী প্রবণতা থেকে দূরে থাকুন, দেশের সুস্থ ও রুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন' —ইত্যাদি ইত্যাদি! কিন্তু তাঁরা একবারও বলছেন না —এগুলো কিভাবে হবে!

দুর্নীতির যে অচলায়তন শিক্ষাজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে বসে আছে, উপরতলার কর্তা থেকে নিম্নতম কর্মী পর্যন্ত যার শরীক, তাকে ঠেলে সরাবে কে? আজকের ক্ষুণ্ণ সমাজে যে ছাত্ররা ভালো থাকতে পারেনা, তাদের ঘর-বাহির পরিবেশ-পারিপার্শ্বিক পাতায় ঘাপা আর বেপাড়ার 'গুরু' যে তাদের সমাজ বিরোধের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত—এই অবিসংবাদিত সত্যটাকে অস্বীকার করে লাভ কি?

(চলবে)

(contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
Ghose Smt. Nihar Bala	Madhu Pandit Road, P.O, Tolpukur P. S. Titagarh	100	12. 12. 77
Gupta Bhiresh Chandra	Chatterjee para P. O. Baranagar	200	1, 4. 73
Haldar Dibakar	Gobindapur, P.O. Mathurapur	200	1. 10. 78
Majumdar Sitanath	6/33, Netajinagar, Calcutta-42	200	
Mukherjee Smt. Parul Bala w/o Late Jitendra Mohan	Nalikul Road, Nimta (Cal-49)	100	20. 3. 74
Pal Hira Lal	Arabinda Palli, P. O, Dutta Pukur	200	1. 6. 77
Pal Kshitish Chandra	Rajbandi Palli, Rahuta Road P. O. Shyamnagar	200	1. 10. 76
Roy Sushil Kumar	462/8, Ashokenagar	200	1 4- 77
Roy Chowdhury Smt. Sandharani w/o Late Sitangshu Roychoudhury	1/6. Naskarpare Lane, Bapuji Colony P. O. Dhakuria Calcutta-31	200	24. 12. 77
Sen Kshetra Mohan	328/4, Ashok nagar	200	1. 10. 76
Sircar Hiren	342, Rishi Bankim Chandra Road P. O. Garia. P. S. Naihati (Permitted to draw arrears due)		

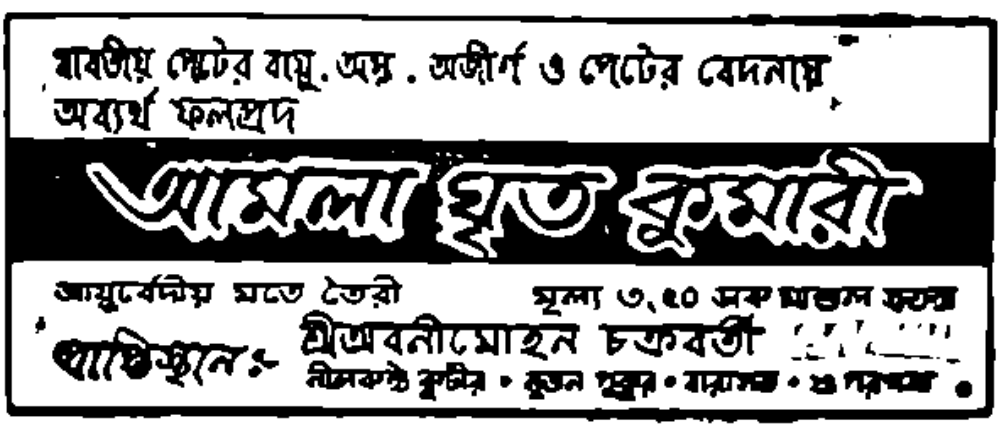

Regd No. R. N. 24511/71 Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫৫০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

436 3 MAY 1978

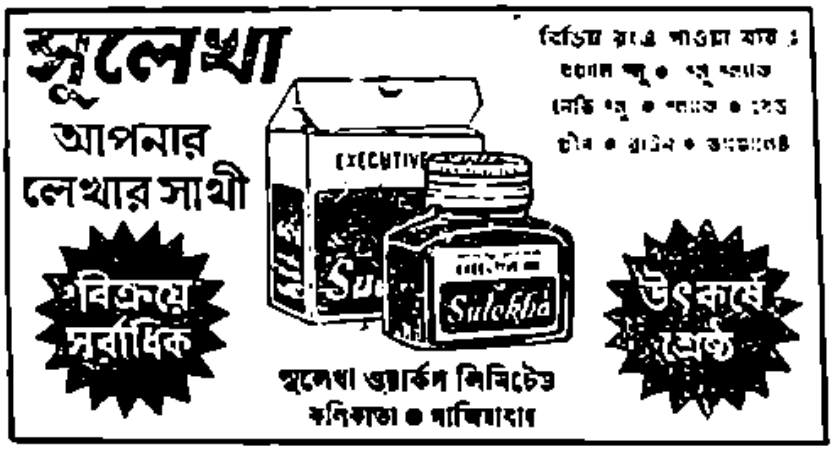

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅনীল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতি পরন রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতার—শ্রীব্রজগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীঅশোক গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্য্যালয় :—৪৯ বলরাম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—৭০০০১০

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৮৫ / ১৩ই মে, ১৯৭৮	৩১-৩২ সংখ্যা

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥'

কবিগুরুর ১১৮তম জন্মদিবসে বিপ্লবী পরিষদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

রবীন্দ্র জয়ন্তী

যেদিন ধরণীর ধূলিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেদিন থেকে মহাকালের পরিক্রমা পথে একশত আঠার বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। আরো কত যুগ, কত বছর কেটে যাবে। কত ঘটনা, কত নাম বিস্মৃতির অতলতলে লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেশ ও কাল অতিক্রম করে দাঁড়া বিশ্বের ও নিরবধি কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।

এক একজন মানুষ আসে যারা বহু কষ্ট, বড় যাপটার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। আর একজাতের মানুষ আসে যারা আঁতুড় ঘরে জন্মাবার সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। তাঁদের আবির্ভাব লগ্নে যে শাঁখ বাজে, সে সাধারণ আনন্দের শঙ্খধ্বনি নয়, বিস্ময়ের তূর্যধ্বনি, যে ঘোষণা করে "এলো, এলো জগজয়ী এলো, বরণ করে ঘরে তোল"। এই গতিশীল জগতেও এক একজন অগ্রগণ্য, কীর্তিমান আসেন, যাঁদের নিয়ে ধুম-ধাম না করে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। উৎসবের কৌস্তুভ হয়েই আসেন তাঁরা। রবীন্দ্র নাথ এই জাতিরই অন্যতম মহামানব। তাই যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালিত হবেই। সেই শুভক্ষণ আমাদের সামনে এসেছে, তাই আমরা এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি করি ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই তাঁর উদ্দেশে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এমন সর্বতোমুখী ছিল যে তার সঠিক মূল্যায়ন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ একটী ছোট নিবন্ধের মাধ্যমে। তিনি সমসাময়িক কালের এত অগ্রবর্তী ছিলেন যে তাঁর ধ্যান ধারণার, তাঁর বিরাট কর্মকাণ্ডের মূল্য উপলব্ধি করতে এবং সর্বোপরি, তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর অবদানের যথাযথ পরিমাপ করতে বহুদিন লাগবে।

সাধারণের মধ্যে ধারণা প্রচলিত ছিল যে তিনি নিছক একজন উচুদরের কবি ছিলেন এবং তিনি বাস করতেন গজদন্ত নির্মিত দুর্গে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে। কিন্তু মহাকবি তিনি ছিলেন নিশ্চিতই। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল নিবিড়। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, আদর্শনিষ্ঠ, মানবপ্রেমিক, দার্শনিক, শিক্ষাগুরু এবং একজন মহান কর্মী। মানুষের ভেতরকার motor nerve এবং sensory nerve এর এমন অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে, যার তুলনা মেলে না পৃথিবীর ইতিহাসে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন এই বিস্ময়কর সমন্বয়ের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে আছে ও থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য ও জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন বিভিন্নরূপে। স্বদেশপ্রেম ছিল তাঁর অকৃত্রিম। তবে তাঁর দেশপ্রেম সংকীর্ণ ছিল না, ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিলনা। নিপীড়িত মানবতার দুঃখকষ্ট নিজের মধ্যে তিনি অনুভব করতেন সম্যকরূপে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের ঘটনাবলী তাঁর হৃদয়বীণায় অনুরণিত হত। তাই তিনি হতে পেরেছিলেন পৃথিবীর কবি, তাই তাঁর বিশ্বপ্রেম ছিল সহজাত ও সীমাহীন। তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি,
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী ও সাধক। যেখানেই অসত্য সত্যকে গ্রাস করতে চেয়েছে, তখনই গর্জে উঠেছে তাঁর কণ্ঠ ও লেখনী। মানব জাতির পক্ষে যা কিছু কল্যাণকর, বজ্রনির্ঘোষে ও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি কোন দিন। প্রায় সমগ্র পৃথিবী তিনি পরিক্রমা করেছিলেন। যেখানে যা কিছু সুন্দর দেখেছেন, দ্বিধাহীন চিত্তে তুলে ধরেছেন বিশ্ব-বাসীর সম্মুখে নির্ভীক অগ্রপথিক রূপে। নিপীড়িত মানুষের মুক্তিযজ্ঞে প্রেরণা জুগিয়েছেন নিজের বিপদকে তুচ্ছ করে। সুভাষ চন্দ্রবসুকে গ্রাহ্য করেন নি তাঁর ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর লেখা ও ভাষণের মাধ্যমে প্রেরণা যুগিয়েছেন বিপ্লবী ও অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন চরম আত্মত্যাগের সংকল্পে। অন্ধকারের

ঘোর ঘনঘটা যখন মানুষের জীবনকে পঙ্কিল করে তুলেছে আবৃত করতে চেয়েছে মানুষের ভবিষ্যৎকে, তিনি আলোর ভিখারী হয়ে তখন অনির্বাণ দীপশিখা তুলে ধরেছেন মানুষের সামনে সব বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করে নিজস্ব সত্তাকে ফিরে পেতে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল সার্বজনীন, তাই তিনি বন্দনা পেয়েছেন বিশ্বমানব দরদীরূপে। সমগ্র মানবজাতিকে উপলক্ষ্য করে তিনি বলে গিয়েছেন, "আমি তোমাদেরই লোক। আর কিছু নয়, এই হোক মোর শেষ পরিচয়।"

আজ সারা পৃথিবীতে পুনর্গঠনের মধ্যদিয়ে যখন আলো-ছায়ার খেলা চলছে, প্রবলপক্ষ দুর্বলপক্ষকে মাথা তুলতে দিতে চাচ্ছে না, ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষের জীবনহানি ঘটছে ভয়ংকরভাবে, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হচ্ছে পদে পদে, বর্ণ-বৈষম্য, দারিদ্র্য, অজ্ঞানের অন্ধকার ছেয়ে আছে বিশ্বের একটা বিরাট অংশে, তখন রবীন্দ্রনাথের মত সত্যদ্রষ্টা, আদর্শবাদী, মানবদরদী মহামানবের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে বিশেষভাবে। সংকীর্ণতা, সব হীনতা, সব সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠে, তাঁর মত মানুষই পারত পথ দেখাতে। আক্ষরিক অর্থে তিনি বেঁচে না থাকলেও মানবসমাজের সামনে রয়েছে তাঁর অমোঘ বাণী, নিরলস কর্মশক্তির দৃষ্টান্ত, জীবনব্যাপী সাধনার পরিচয়। তাঁর লেখায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মণিমাণিক্য, নিভুল নির্দেশনা অনুসরণীয় পথের ঠিকানা। সেই উত্তরণে যদি মানুষ আত্মনিবেদন করে তাঁরই প্রদর্শিত পথে, তবে অগ্রগতি নিশ্চিত।

তাঁর অমর বাণী স্মরণীয় মানবের মুক্ত অপব্যয়,
ইতিবৃত্তে গ্রন্থিতে পারেনা কভু শাশ্বত অধ্যায়।

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক্
আমি তোমাদেরই লোক—
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।'

—রবীন্দ্রনাথ

★

Space Donated by :

MAJUMDAR BROTHERS
9, CLIVE ROW, CALCUTTA-1
Phone : 22-1438 & 22-2846

কবিগুরু

—মলয় ঘোষ

তুমি কি কেবলই ছবি ?
ফ্রেমে বাঁধা কাঁচের আড়াল !
শুধু বছর বছর ফিরে আসা, মরশোভা !
বিশ্লেষণে, বিশ্লেষণে, সুচারু বাক্যবিন্যাসে
ক্লান্তির মশাল জ্বেলে কেরা !
তুমি কি কেবলই সেই পঁচিশে
আর বাইশের অনুবর্তন,
বৈশাখের ঝড় আর শ্রাবণের অঝোর বর্ষণ !

তবে কেন সাড়া পাই প্রতিটি দুর্দিনে ?
শুধু নিঃশ্বাসনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি
যখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে
আমার অদিষ্ট ক্ষণ,
যখন নিরাশ্বাসে ফিরে আসি ক্লান্ত অবেলায়
নিজেকেই প্রশ্ন ক'রি গূঢ় অভিমানে
"বেঁচে থাকা এতো কি দরকার-ই !"
তোমার অমর দৃষ্টি জ্বেলে দেয় আশ্বাসের আলো,
রক্তের কল্লোলে বাজে আনন্দভৈরবী
'এখনো কোথাও আছে বিশ্বাসের নদী !

হে বৃদ্ধ পিতামহ,
ভেঙে দাও অলীক পবন,
খুলে যাক্ বন্ধ দুয়ার,
শতবর্ষ পার হ'য়ে তোমার অমৃত কর
আশীর্বাদে জন্ম দিক্
নতুন বাংলার ।

ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্বন্ধে আমি আজ মাত্র একটি কথা বলিব। "সাধনা" বলিতে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন এবং সাধনার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যায়। আমার ধারণা এই যে সাধনার উদ্দেশ্য মনুষ্যজীবনের রূপান্তর করা। রূপান্তরসাধন করিতে হইলে বাহির হইতে চেষ্টা করিলে চলিবে না—মানুষের জীবন নূতন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারিলে—মানুষের চেষ্টা, কথা ও কার্য—এক সূত্রে বাঁধা হইবে; তাহার ভিতর বাহির এক হইয়া যাইবে; তাহার সমস্ত জীবন এক আদর্শ-সূত্রে গ্রথিত হইবে; সে তখন তাহার জীবনে নূতন রস, নূতন আনন্দ, নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে। সমগ্র বিশ্বজগৎ তাহার নিকট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

—সুভাষচন্দ্র

Space Donated by :

Calcutta Fan Works Ltd.

30, CHOWRINGHEE ROAD,
CALCUTTA-16

রবীন্দ্রনাথের দেশানুরাগ

—ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস

রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি ও সাহিত্যিকই ছিলেন না। দেশপ্রীতির একটী জলন্ত প্রতীক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনী পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় শৈশব হতেই রবীন্দ্রনাথ দেশ বন্দনায় ব্রতী ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভা বহুমুখী ও অফুরন্ত হওয়ায় তাঁর জীবনের এই দিকটা অনেকটা নিষ্প্রভ। দেশের যুবকদের এই কাহিনী ভুলে না ধরলে রবীন্দ্র প্রতিভার উৎস খুঁজে পাবে না, নিজের শিক্ষা, দীক্ষা ও চরিত্র গঠনের মূল উপাদান সংগ্রহ বঞ্চিত হবে। রবীন্দ্র জন্মতিথিতে রবীন্দ্রনাথ স্মরণে এই বিষয়েই পাঠকবর্গের নিকট সামান্য নিবেদন করার প্রয়াস করব।

রবীন্দ্রনাথ এমন পরিবারে জন্মেছিলেন যে পরিবার ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যসৃষ্টি, সঙ্গীত, শিল্প, স্বদেশপ্রেম ও রুচি বৈশিষ্ট্যের জন্য সারা বাংলার আদর্শ স্থানীয় ছিল। কাজেই শিশু রবীন্দ্রনাথ গড়ে উঠেছিল, ভাবী নবযুগের পরিপূর্ণ সম্ভাবতার মধ্য দিয়ে।

শৈশবে জননীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুব বেশী সম্পর্ক না থাকলেও মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে মাতৃহারা হয়ে মর্মাহত হয়েছিলেন এবং বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবেন না স্থির করলেন। পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন উপদেশ ও তিরস্কার নানাভাবেই রবীন্দ্রনাথকে স্কুলে পাঠাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সবই বৃথা হল। অবশেষে বাড়ীতেই ভালভাবে পড়াশুনার ব্যবস্থা করলেন। মাতৃভক্তির এই অপূর্বনীয় আকর্ষণই রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেশমাতার সেবায় রূপান্তরিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে হিন্দুমেলার উপহার নামে একটী দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে উদ্বোধন সঙ্গীতের রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের রাজদ্রোহ আইনের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'কণ্ঠরোধ'। দেশ-পূজ্য নেতা বলে গঙ্গাধর তিলকের দে-মাইনী গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানায়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। ঢাকা নগরীতে প্রাদেশিক সম্মেলনে রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির ইংরেজী অভিভাষণ রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় বুঝায়ে দেন এবং সম্মেলনে আসাম ও উড়িষ্যা হতে বাংলা ভাষা উচ্ছেদের প্রচেষ্টার প্রতিবাদ জানান। ভারতের অন্যতম সুযোগ্য সন্তান রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভা-পতিত্বে ১৯০৪ সালে ২২শে শ্রাবণ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্র নাথ পাঠ করলেন 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ, এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কেবল আবেদন নিবেদনে কখন ও দেশ-বিদেশীর কবল হতে মুক্ত হতে পারে না। ভিক্ষুক জাতির সম্বল নাই। ইংরেজের কাছে ভিক্ষা করে আমরা আর সব পাইতে পারি, আত্মশক্তি পাইতে পারি না। পর-বর্ত্তী জীবনেও রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তাধারারই বাহক ছিলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ শাসকবর্গের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা বলে বলতেন। কোন দেশ বা কোন লোকই কখনও ভিক্ষা করে স্বাধীনতা পেতে পারে না রবীন্দ্রনাথ বলতেন। মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহও রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করেন নাই। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস হতে বিতাড়িত করা হলে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রকে জানায়েছিলেন তোমার নেতৃত্বে আমি আস্থাবান"—এত পার্থক্য ও অনৈক্য থাকা সত্বেও তাহাদের উভয়ের মধ্যে খুবই সৌহার্দ্য বর্ত্তমান ছিল। মহাত্মাজী রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব

সম্বোধন করতেন, রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা সম্বন্ধে বলেছেন 'গান্ধীজী কেবল ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নহেন, বর্তমান সময়ে সমগ্র জগতের মধ্যেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ'।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগ করলে সমগ্র বাংলায় ইহার প্রতিবাদে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল, কবি রবীন্দ্র নাথ সেই আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়লেন। বঙ্গচ্ছেদের প্রায় অব্যবহিত পরেই কলিকাতা টাউন হলে বিরাট প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করলেন। তাহারই ফলে বিদেশী পণ্যবর্জন ও বয়কট আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। সরকারের সহিত অসহযোগ ও বিদেশী পণ্য বর্জন সম্বন্ধে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তি সেই সময় বাংলায় অভ্যুদয় হইয়াছিলেন তন্মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিন চন্দ্র পালের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, কিন্তু সমগ্র আন্দোলনের মূল আত্মাই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বদেশী আন্দোলনকে সার্থক করার জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে মৈত্রী বন্ধন ও একতা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রাখীবন্ধন উৎসবে 'রাখী সঙ্গীত' বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক পুণ্য হউক, হে ভগবান" রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন। ঐ দিন আহূত সভায় আনন্দমোহন বসুর বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ। সভার শেষে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এক বিরাট শোভাযাত্রা বের হয় এবং বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীর সামনের বাগানে এক সভা হয়। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে এক জাতীয় ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। সভায় ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়।

ইংরেজ সরকারের কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে ছাত্রদের সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। কার্লাইল সার্কুলার ছিল বন্দেমাতরম ধ্বনি দিলে এবং স্বদেশী সভায় যোগ দিলে ছাত্রদের স্কুল হতে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। বাংলার সেই স্মরণীয় যুগে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে, সাধনায়, গানে নিথর নিস্তব্ধ বাংলার বুকে মহান আলোড়ন তুলেছিলেন। বাংলা দেশের অন্যতম কৃতী সন্তান আশুতোষ চৌধুরী যখন 'সবুজপত্র' বার করেন সেখানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি কর্মীর আদর্শ এবং বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষকে ভাবের আদর্শ বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নব্য ভারতের জাতীয়তা বোধের আদর্শ। বিপ্লবী আন্দোলনের জন্মদাতা অনুশীলন সমিতির কার্যকলাপের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ সংযুক্ত ছিলেন। এই জনপ্রিয় নেতা রবীন্দ্রনাথ প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে ১৯০৭ সালে রাজনীতির প্রকাশ্য ক্ষেত্র হতে সরে দাঁড়ালেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন স্বদেশী আন্দোলন অবশেষে রক্তপাত ও ঘোমার আন্দোলনে পর্যবসিত হবে। এই পথের অগ্রগামীদের স্বদেশ প্রেম ও শৌর্যের রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করলেন বটে কিন্তু নিজের মতের ইঙ্গিত "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে প্রকাশ করলেন। ১৯০৮ সালের ২৩শে মে চৈতন্য লাইব্রেরীতে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ কোন দেশ প্রেমিককেই যথোচিত মর্যাদা দিতে কৃপণতা করেন নাই। পথ ও মত বিভিন্ন হলেও নিজের অন্তরের দেশপ্রীতির প্রভাবে মতভেদকে ভুলিয়ে দিয়েছেন।

১৯১৯ সালের ৩০শে মে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে চিঠি লিখে পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট প্রদত্ত স্যার উপাধি রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেন। জগতে যে কয়েকটী চিঠির ভাষা ও ভাবের জন্য আজও স্মরণীয় হয়ে আছে কবি রবীন্দ্রনাথের সেই ইংরাজী লিখিত চিঠি তন্মধ্যে অন্যতম। পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী স্যার মাইকেল ও সেনাপতি ডায়ারকে বিলাতের লর্ড সভায় উচ্চ প্রশংসা করে এবং ইংরেজ মহিলারা প্রায় তিনলক্ষ টাকা পুরস্কার দেয়। ভারত সরকার ইম্পিরিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তাদের সুপারিশে Indemmicy Bill উপস্থিত করে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে দীনবন্ধু Mr C. F. Andrews কে চিঠি লিখেছিলেন।

১৯০১ সালে হিজলী বন্দী-নিবাসে নিরস্ত্র অসহায় রাজবন্দীদের উপর জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্ঠুর গুলি

চালনার প্রতিবাদে কলিকাতার গড়ের মাঠে জমায়েত বিপুল জনমণ্ডলীর সম্মুখে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে রবীন্দ্র নাথ ভাষণ দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র নাথ কখনও ভৌগলিক সমীক্ষার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় মানুষের লাঞ্ছনার প্রতিবাদে রবীন্দ্র নাথ মুখর হয়েছেন। আবিসিনিয়ায় শান্তিপ্রিয় অসামরিক নাগরিকদের উপর ইটালির ডিক্টেটর মুসোলিনির নির্দেশে বিমান হতে বোমা নিক্ষেপকে তীব্রভাবে নিন্দা করেছিলেন। জাপান সাম্রাজ্যবাদের দুর্ভর নেশায় বিজয় গর্বে প্রতিবেশী চীনকে আক্রমণ করায় রবীন্দ্র নাথের হৃদয় চীনের জন্য সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাপানী কবি নোগুচির সঙ্গে রবীন্দ্র নাথের পত্রালাপ ইহার সাক্ষ্য রেখে গেছে।

১৯০৭ সালের পর প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হলেও রবীন্দ্র নাথ সাম্রাজ্যবাদের কোন দম্ভ বা অত্যাচারই নিরবে সহ্য করেন নাই। ভীতিবর্জন ও জাতীয় মর্যাদা রক্ষাই ছিল রবীন্দ্র নাথের শিক্ষার মূলমন্ত্র।

ভারতীয় সংস্কার ও শিক্ষাদীক্ষার কার্যে ইঙ্গিত ও কারারুদ্ধ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কলুষিত করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা মিস র‍্যাথবোনের খোলা চিঠি রবীন্দ্র নাথকে রোগশয্যাও ব্যথিত করে তুলে। রবীন্দ্র-নাথ মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও ১৯৪১ সনের ৪ঠা জুন এই উদ্ধত প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন। এই চিঠি আজও জগতে একটি ঐতিহাসিক দলিল।

রবীন্দ্র নাথের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জাতীয় সঙ্কটকালে বা বিপন্ন মানুষের চরম মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ নিরব থাকতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রীতি, মানবতা ও জাতীয় মর্যাদা বোধ জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যই আমাদের সম্মুখে রেখে এগুতে হবে, তবেই কবির সৃষ্টি স্বরূপ সার্থক হবে এবং রবীন্দ্র কৃষ্টির যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন হবে

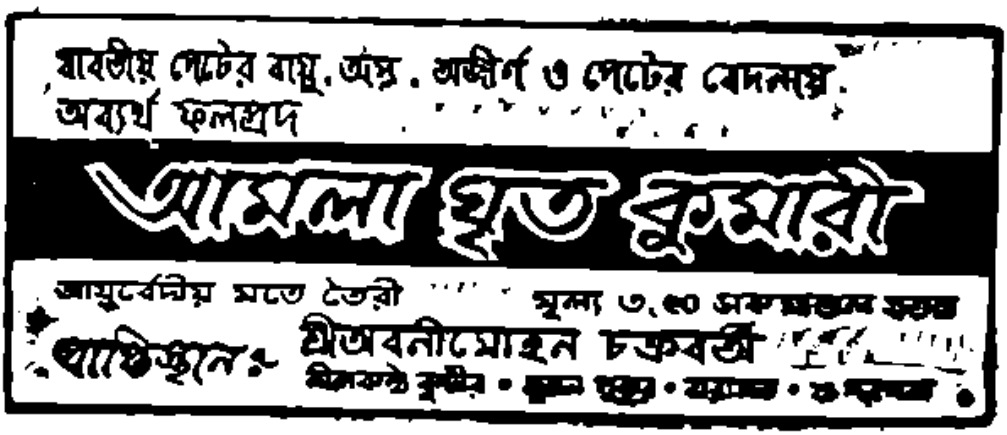

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও তার পরিণাম ফল]

আমার এই স্মৃতি কথায় আমার জীবনের ঘটনাগুলির বিবরণ বিন্যাসে আমি ঘটনার পৌর্বাপর্য অনুসরণ করে চলিনি। কোন অধ্যায় আরম্ভ করে সময় সময় আমি সুবিধা মত থেমে গিয়ে অন্য একটি অধ্যায় আরম্ভ করেছি। তার মধ্যে এমন ঘটনার কথাও টেনে এনেছি যা আগেকার দিনের ঘটনা। রক্ষণশীল দলের ভারত সচিব লর্ড সেলিস বারীর শাসন কালে যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতির অনুসরণ করা হয়, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার বয়ঃসীমা কমিয়ে দেওয়া তারই একটা অংশ মাত্র। ভারতকে ইংল্যাণ্ডের দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্র সীমার বাইরে ধরা হয়ে থাকে। শিক্ষিত ভারতীয়দের মত হল, ভারতকে ইংল্যাণ্ডের দলীয় রাজ নীতির বাইরে রাখাটা একটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। কারণ, আমরা ভুলতে পারিনা যে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে যে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাতে বিলেতের দলীয় রাজনীতিই কাজ করেছিল, আর সেই দলীয় রাজনীতির গতি নির্ধারণে ভারতের ছিল একটা শক্তিশালী ভূমিকা। তাছাড়া, লর্ড মর্লি তার রচিত বার্কের জীবন চরিতে যা লিখেছিলেন, তা হল, তারই ভাষায়-"ইহা সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে বৃটিশ শাসনাধীনে এশিয়দেরও নিজেদের অধিকার আছে এবং ইয়োরোপীয়দেরও দায় দায়িত্ব রয়েছে।"

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সেই বিচারের নীতিগত ফল ভারতের পক্ষে বিশেষ লাভ জনক হয়েছিল। কিন্তু তার পরের ঘটনা অন্য রকম হয়ে গেল। এখন উদার নৈতিক ও রক্ষণশীল—উভয় দলেরই সাধনের সারির নেতাদের মুখে একই সাম্রাজ্যিক বুলি আওড়ান হচ্ছে যে ভারতের ব্যাপার বিলেতের দলীয় রাজনীতির বিচারের বাইরে। স্যার হেনরি ক্যাম্বেল ব্যানার্ম যখন ভারত সচিব ছিলেন, তখন পার্লামেন্টে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে পার্লামেন্টের প্রত্যেকটি সদস্যই একজন ভারতের পক্ষের সমর্থক। এই মনোভাবকে তখন সোৎসাহে স্বাগত জানান হয়। স্পষ্টই এটি একটি মহান ঘোষণা বাণী, এবং এই উক্তির মধ্যে প্রতিনিধিত্ব রক্ষিত একটি রক্ষণশীল দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতার ইঙ্গিত রয়েছে। ভারতে কিন্তু এই বাণী অবিশ্বাসের হাসির উদ্রেক করে। কারণ আমরা জানি যে যে কাজটি সরকারের সে কাজটি প্রকৃত পক্ষে কারোই নয়। এই সত্যটি আমরা প্রতি বছরই হাউস অব কমন্সে ভারত সম্পর্কীয় বাজেটের উপর আলোচনার বিবরণ পাঠ কালে উপলব্ধি করছি, এবং সেই বিবরণে এ কথাও জানতে পারি যে সে সময় বক্তাগণ পার্লামেন্টে শূন্য বেঞ্চের কাছেই তাদের বাগ্মিতা প্রকাশ করে থাকেন।

অবশ্য ভারত সম্পর্কে অনেক কিছুই নির্ভর করে ভারত সচিবের ব্যক্তিত্বের উপর। ভারত সম্পর্কে যে নীতির অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা ভারত সচিবের ব্যক্তিগত চরিত্র ও ভারতের প্রতি তার সহানুভূতি কতখানি ও কিরূপ তার উপর নির্ভর করে। তার কিছুটা নীতি গঠিত হয় তিনি যে দলের লোক সেই দলের নীতির সাধারণ অভিপ্রায় অনুযায়ী। মন্ত্রীরা প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমানে নিজ নিজ দপ্তরে সর্বে সর্বা। তবে তাদের বিচার বিবেচনা করে দেখতে হয় যে দেশের জনমত পার্লামেন্টের মত সভার মধ্য দিয়ে তৎকালে কতখানি প্রতিধ্বনিত

হচ্ছে, এটাই আমাদের ধারণা। লর্ড ডার্বি ছিলেন একজন রক্ষণশীল দক্ষীয় ভারত সচিব। তিনিই ১৮৫৮ সালের মহাঘোষণা বাণী জানিয়েছিলেন। সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট (যিনি পরে আর্ল ইডেসলেই হয়েছিলেন) ভারতীয় ছাত্রদের ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পড়াশুনা করার উৎসাহ দেওয়ার, উদ্দেশ্যে একটি ষ্টেট স্কলার সিপের প্রবর্তন করেছিলেন। আবার দেখা গেল উদার পন্থী ভারত সচিব ভিউক আরগিল সে স্কলারসিপ বন্ধ করে দিলেন। ১৮৯২ সালের পার্লমেন্টারী ষ্ট্যাটিউট অনুযায়ী এক রক্ষণশীল মন্ত্রিসভাই আমাদের সম্প্রসারিত লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গুলি গঠন সংস্কার দিয়ে প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত করেছিলেন। পরবর্তী কালে আবার দেখা গেল উদার নৈতিক দল ভারত শাসন সম্পর্কে তাদের নীতিকে ধরে রাখার জন্য অল্পাধিক পরিমানে বাস্তবিকই প্রয়াস পেতে থাকেন। এই মনোভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে লর্ড মর্লির ১৯০৯ সালের মিন্টো-মর্লি, বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত সংশোধন এবং ১৯১১ সালের ২২ আগষ্টের ডেস্প্যাচে সন্নিবেশিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দানের প্রতিশ্রুতি।

ভারত সচিব রূপে লর্ড মেলিসবারীর শাসন ছিল সুস্পষ্ট রূপেই প্রতিক্রিয়া শীল। লর্ড লিটনকে ভারতে ভাইসরয় রূপে পাঠানোর জন্য তিনিই দায়ী। এই লর্ড লিটন সম্পর্কে ম্যাকুইস অব হ্যারিংটন পরবর্তী কালে পার্লমেন্টের সদস্য হিসাবে বলেছিলেন যে তিনি হচ্ছেন ভারতের ভাইসরয়কে যে রকমটি হওয়া উচিত, তার বিপরীত তবে তার পুত্র, বর্ত্তমানে বাংলার সম্রাট লর্ড লিটন একজন ভিন্ন প্রকৃতির শাসক। রক্ষণশীল মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও তিনি প্রকৃত পক্ষে একজন অগ্রণী ডেমোক্র্যাট। ভারতের আশা আকাঙ্খার প্রতি তিনি বাস্তবিকই সহানুভূতিশীল। এর অনেক বছর পরে, গত শতকের বিশ্বাসের দশকে প্রধান মন্ত্রীরূপে লর্ড মেলিসবারী লর্ড কার্জনকে ভাইসরয় করে ভারতে পাঠালেন। ভাইসরয় রূপে তিনি যে কীর্ত্তি রেখে গেছেন তা দি টাইমস্ পত্রিকার মিঃ মোরাট ফ্রেজার তার সমস্ত কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে প্রয়োগ করেও চূণকাম করতে পারেন নি।

যাক্‌গে। কথা বলতে বলতে আমি হয়ত ভাবি ঘটনা গুলির পূর্বাভাস দিয়ে ফেলছি। এর আগেই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বয়স সীমা কমিয়ে দেওয়ার কথা এবং সে বিষয় উপলক্ষ করে গড়ে ওঠা আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছি। লর্ড লেলিসবারীর ভাইসরয় লর্ড লিটন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সব পত্রিকা গুলির কণ্ঠ রোধ করে দিলেন এবং ব্রিটিশভারতের নাগরিক গণকে নিরস্ত্র করলেন। এই দুটি ব্যবস্থা —আর্মস্ এ্যাক্ট এবং ভার্ণাকুলার প্রেসএ্যাক্ট দেশের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি করল, এই আন্দোলনে আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে অংশ গ্রহণ করি।

সিপাহী বিদ্রোহের সেই ভয়াবহ দিন গুলিতে যখন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাস্তবিকই সাংঘাতিক বিপদের মুখে পড়েছিল, তখনও লর্ড ক্যানিং এবং তাঁর উপদেষ্টারা ভারত বাসীদের নিরস্ত্র করার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি। লর্ড লিটনের আমলে আফগান যুদ্ধ হয়েছিল। একটা ভ্রান্ত নীতির বশবর্ত্তী হয়ে এই যুদ্ধ বাধান হয়েছিল। এই আফগান যুদ্ধও ভারতে কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে নি। হিন্দুদের মধ্যে তো নয়ই। এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও সীমান্ত অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও সে রকম কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করেনি। দেশের অভ্যন্তরে এমন কোন বিদ্রোহের সম্ভাবনাও ছিলনা যাকে আয়ত্তে আনার জন্য নিরস্ত্রীকরণ আইন প্রনয়ণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এ একটা শয়তানী আইন। কারণ এই আইন ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে একটি বিরক্তিকর এবং ঘৃণা বিদ্বেষ উত্তেজক পার্থক্যের সৃষ্টি করে। অবশ্য অতি সাম্প্রতিক কালে এই পার্থক্য রহিত করা হয়েছে। এই আইন সন্দেহ ও অবিশ্বাসের নীতি প্রবর্ত্তিত করেছে—যা নৈতিক অবাঞ্ছনীয়। ফলে তা দেশের লোকের প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়। এই আইন আমাদের গায়ে বর্ণগতভাবে এক লজ্জার

ব্যাঙ্গ পরিয়ে দিয়েছে। এই আইন যখন পাশ হয়, তখনই আমরা প্রতিবাদ করি। আমরা মিঃ মাজটোনের নিকট আবেদন করলাম। তিনি আমাদের প্রতিবাদ সমর্থন করেন এবং তিনি তার মিডলোথিয়ানে নির্বাচনী প্রচারে আর্মস এ্যাক্ট ও ভার্নাকুলার প্রেস এক্টের নিন্দা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পরে আমাদের প্রতি মাত্র আংশিক সুবিচার করেছেন। তিনি ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট রদ করলেন, কিন্তু আর্মস এ্যাক্টকে স্পর্শও করলেন না।

১৮৭৮ সালের এপ্রিল মাসে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের একটি মাত্র সভায় ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট নিয়ে আলোচনা হয় সেই সভাতেই তা পাশ হয়ে যায়। এই আইন প্রনয়ণ এত জরুরী বলে বিবেচিত হয়েছিল যে দেশের লোককে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করারও কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। বিলটি পাশ করার জন্য এত বেশী তাড়া ছিল যে কাউন্সিলের কার্য পরিচালনার রীতি নীতিগুলি পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়নি। সে গুলিকে ছেপে রাখা হল; এবং যে দিন বিলটি উপস্থাপিত করা হল সে দিনই তা পাশ হয়ে গেল। অতি উৎসাহের ঝোকে আমলারা অনেক সময় কোন বিষয়ে আলোচনার মধ্যে যেতে চান না। কারণ তারা মনে করেন, আলোচনার মধ্যে গেলেই তাদের পূর্ব পরিকল্পিত চালবাজি সাধারণের প্রকাশ হয়ে যাবে। এবং ফলে তাদের মতলব ভেস্তে যাবে। তারা আরও মনে করেন যে একবার একটা ব্যবস্থা আইনের দ্বারা পাশ হয়ে গেলে এবং শাসন কার্যে তা প্রয়োগ করা আরম্ভ হলে, তার আর কোন পরিবর্তন করা যাবেনা তা স্থায়ী হয়েই থাকবে। তবে সম্প্রতিক কালের ঘটনাবলী তাদের সে মোহ ভেঙ্গে দিয়েছে। আমাদের আধুনিক কালের আমলা কর্মচারিরা তাদের নানা আচরনের দ্বারা এখন এটা প্রদর্শন করেছেন যে জন-মতের শক্তি সম্পর্কে তারা আগের উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট রদ হয়ে গিয়েছে; বঙ্গভঙ্গ যাকে সব চেয়ে বেশী অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা হত, তাও পরিবর্তিত হয়ে গেল। জন মনের কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়, এমন কোন বিধি-ব্যবস্থা প্রনয়ণ হলে জনগণ প্রথম ধাক্কায় তাকে ভাগ্যের অনিবার্য ফল বলে মেনে নেয়। তারা সময়ের অপেক্ষায় থাকে, শক্তিসংগ্রহ করে এবং পরে তারা নতুন উদ্যমে আন্দোলন চালায়, আমলা তন্ত্রের ভাব-বৃত্তিকে তাদের উপাসনা স্থল থেকে হেটিয়ে বিদায় করে; তার পরে তাদের যা থাকে তা হল তাদের প্রশাসনিক বোকামির এবং সম্পদ ও সামর্থ্য অপচয়ের কতকগুলি স্থায়ী স্মৃতি স্তম্ভ।

দেশের শিক্ষিত সমাজের উপর ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট আকাশ থেকে বাজ পড়ার মত মনে হল। তবে এরকম একটা কিছু যে ঘটতে চলেছে তা অনেক দিন আগে থেকেই আন্দাজ করা হচ্ছিল। ১৮৭৭ সালের দিল্লী সম্মেলনে সংবাদপত্রসেবীদের আমন্ত্রণ জানান হয়। আমি দিল্লী সম্মেলনে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সংবাদদাতা রূপে যোগদান করি। হিন্দু প্যাট্রিয়ট ছিল তখন বাংলার প্রধান সংবাদপত্র যার সম্পাদক ছিলেন ভারতীয় সংবাদপত্র সেবীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ও সম্মানিত হরিদাস পাল। সংবাদপত্র জগতে এই সময় আমি নিছিই কোন পদে থেকে কাজ করতাম না। তবে ১৮৭৪-৭৫ সালে যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার লণ্ডনের সংবাদদাতা ছিলাম। দিল্লী সম্মেলনে হিন্দু প্যাট্রিয়টের সংবাদদাতার কাজ আমার নিকট আনন্দদায়ক শ্রম বলে মনে হল। তাছাড়া, এর মধ্যে শৃঙ্খলা এবং শিক্ষার বিষয়ও আছে। সুরেন্দ্রনাথ যার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রগতি ও দেশসেবার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনেরও সুযোগ আমি এর ভিতর দিয়ে পেয়েছি। দিল্লীতে যে সমস্ত ভারতীয় প্রেস প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করতে এসেছিলেন তাঁদের নিয়ে এক প্রেস এ্যাসোসিয়েশন গঠন করলাম। আমরা ভাইসরয়কে এক মানপত্র দেওয়ার জন্য এক ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করি। ওই ডেপুটেশনে আমরা যারা ছিলাম, তাদের

মধ্যে আমি ছিলাম সকলের বয়োকনিষ্ঠ। তবে সেখানে আমি ছিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। ডেপুটেশনে আমাদের মধ্যে কে মুখপাত্র হবেন, তা নিয়ে যখন একটু মত পার্থক্য দেখা দিল তখন আমি সে অধিকার দাবী করলাম। আমার দাবী গৃহীত হল। আমিই ডেপুটেশনের মুখপাত্র হয়ে কাজ করার ভারপ্রাপ্ত হলাম। মানপত্র আমিই পাঠ করলাম। মান-পত্র রাখার জন্য কোন কাসকেট আমাদের ছিলনা। কারণ, এত অল্প সময়ের মধ্যে দিল্লিতে আমরা একটা কাসকেট তৈরী করে নিতে পারলাম না। মানপত্রের মধ্যে আমরা প্রেসের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে বলে যে খবর শোনা যাচ্ছে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করে এই আশা ঘোষণা করলাম যে এ যাবৎ কোন প্রেস যে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে তা যেন অব্যাহত থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে যেমন সাধারণতঃ হয়ে থাকে তেমনই হল। ভাইসরয় একেবারে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলেন। মান পত্রের এই অংশ সম্পর্কে ভাইসরয় তাঁর উত্তরদান কালে কিছুই বললেন না। আমরা ধরে নিলাম আমাদের আশা আকাঙ্খার কথা তাঁর কাছে তুলে ধরে আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি। সুতরাং সাময়িকভাবে ব্যাপারটার সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটল।

এর পরে পনেরো মাসের মধ্যেই কেবলমাত্র মাদ্রাজ ছাড়া ভারতের আর সব জায়গায়ই ভার্নাকুলার প্রেসের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল। কাউন্সিল চেম্বারে একটি বিরোধী মতও ধ্বনিত হয়নি। মহারাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর তখন ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। শোনা যায়, ভাইসরয় তাঁকে ডেকে নিয়ে কি বুঝিয়েছেন এবং তিনি গভর্ণমেন্টের পক্ষেই ভোট দিলেন। হিন্দু প্যাট্রিয়ট এই প্রেসের মুখ বন্ধ করার বিরুদ্ধে লিখলেন ঠিকই, কিন্তু দেশাত্মবোধক কোন মত প্রকাশে হিন্দু প্যাট্রিয়টের সাধারণতঃ যে ঝোঁক থাকে, এই বিষয়ে মন্তব্যে সে রকমের ঝোঁক ছিলনা। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিশিষ্টতম সদস্যদের মধ্যে একজন। সরকার পক্ষে তিনি ভোট দেওয়ায় সেই সমিতির স্বাধীন বিবেচনা ব্যাহত হল। যেহেতু তিনি সমিতির একজন বিশ্বস্ত সহযোগী সেই হেতু সমিতি তাঁকে অস্বীকার করতে পারল না। মহারাজার এই ভোটদান যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে সমর্থন করার কোন অভিপ্রায় আমার নেই। তবে একজন জননেতার কাজের বিচার করতে হলে কি রকম কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তিনি কাজ করেছেন এবং সে পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে আমরা কি করতাম তা ভেবে দেখতে হয়। তা হলেই তার অসুবিধা ও পরিবেশের চাপকে আমরা বুঝতে পারি। একটা কথা মনে রাখতে হবে। এখনকার মত জনমতসেদিন এত শক্তিশালী ছিলনা। তাছাড়া আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার—এই সে দিনের কথা—ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর আমলের কথা, মাত্র দুজন ছাড়া ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের আর সমস্ত ভারতীয় সদস্যই একটি প্রেস এ্যাক্টকে সমর্থন করেছিলেন। (বর্তমানে অবশ্য তা রদ করা হয়েছে)। একদিক থেকে এই প্রেস এ্যাক্ট মহারাজা যে এ্যাক্টকে সমর্থন করেছিলেন তার চেয়েও কড়া ছিল। একথা ভুললেও চলবে না যে মহারাজা নিজের পরমর্যাদার সীমার মধ্যেই পূর্ণরূপে স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন এবং যখনই পেয়েছেন সমস্ত গণআন্দোলনকেই তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। কাউন্সিলে তাঁর সরকারপক্ষে ভোট দান সমর্থন করা যায় না, কিন্তু এর মধ্যে অনিষ্টকারিতাকে কিছু লঘু করার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই স্বর্গত সম্মানিত ব্যক্তির বিচার করতে গিয়ে, আসুন, আমরা তাঁর ভাল কাজ ও মন্দ কাজ —দুইয়েরই পরিমাপ করি, দেখবেন, তাঁর ক্ষেত্রে সৎ কাজের দিকই পাল্লায় বেশী ভারী হবে। (চলবে)

কবি-প্রণাম

সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জী

ধরণীর তলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটু খানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে দুয়েকটী সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দুয়েকটি কাঁটা করি দিয়া দূর
তার পরে ছুটী নিব।

কবি সকলের জীবনকে রঙিন করিয়াই ছুটী নিয়াছেন—আজ থেকে ৩৭ বছর আগে ৭ই আগষ্ট ১৯৪১ সালে। (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮)।

১৮৬১ সালে ৭ই মে মঙ্গলবার (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮)—কবি কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্দ্দশ সন্তান। মাতা সারদা দেবী।

১৮৬৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ বোলপুর ভুবনডাঙ্গার কাছে ৩ একর জমি সংগ্রহ করেন—শান্তি নিকেতন এই জমিতেই প্রতিষ্ঠিত।

১৮৬৯-৭০—(বয়স ৮-৯) বালক রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও পরে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হন।

১৮৭১-৭২—(বয়স ৯-১০) বেঙ্গল একাডেমী (Anglo Indian School)-তে ভর্ত্তি হন কিন্তু স্কুলে যাওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না।

১৮৭৩—(বয়স ১২) পিতার সঙ্গে প্রথম শান্তিনিকেতন যান। ঐ বছরই পিতার সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন এবং অমৃতসর ও ডালহৌসীতে পিতার কাছে সংস্কৃত, ইংরাজি ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ নেন।

১৮৭৪—(বয়স ১৩) কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর St. Xaviers School-এ ভর্তি হন। এই সময় তিনি Macbeth এর বাংলা অনুবাদ করেন—পরে ইহা "ভারতী"তে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৫—(বয়স ১৩) কলকাতার বার্ষিক হিন্দু মেলাতে স্বরচিত দেশানুরাগের কবিতা পাঠ করেন। ৮ই মার্চ্চ রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়।

১৮৭৬—(বয়স ১৫) মাসিক পত্রিকা "জ্ঞানাঙ্কুর"এ তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'বনফুল' প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৮৭৭—(বয়স ১৬) দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে তদানিন্তন ভাইসরয় Lord Lytton এর দিল্লীর দরবারে আঁক জমকের ব্যঙ্গ করিয়া হিন্দু মেলায় কবিতা পাঠ করেন। জোঁড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ীতে "অলীকবাবু" নাটকে "অলীকবাবু"র ভূমিকায় প্রথম যোগ দেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ নাথ সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকাতে ভানু সিংহ ঠাকুর ছদ্মনামে গল্প 'ভিখারিণী', কবিতা 'কবি কাহিনী" ও অন্যান্য নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন।

১৮৭৮—(বয়স ১৭) অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাছে আমেদাবাদ যান। এবং তাঁরই সঙ্গে মার্চ্চ মাসে ইউরোপ যাত্রা করেন। Brighton এ School এ ভর্তি হন, পরে University College, Londonএ Prof. Henry Morlayর কাছে ইংরাজী সাহিত্যের পাঠ নেন।

১৮৮০—(বয়স ১৯) ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮৮১—(বয়স ২০) প্রথম গীতিনাট্য "বাল্মিকী প্রতিভা" রচনা করেন। "ভারতী"তে "চীনে মনুষ্যের ব্যবসা" নামে আফিং ব্যবসায়ীদের তীব্র আক্রমণ করেন। মেডিকেল কলেজের বক্তৃতা মঞ্চে প্রথম সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী ও আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য রওনা হ'ন কিন্তু মাদ্রাজ হতেই ফিরে আসতে হয়।

পিতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মুসৌরী যান। 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' এই সময় রচনা করেন। "ভারতী"তে 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮৮২—(বয়স ২১) গীতিনাট্য 'কাল মৃগয়া' রচনা করেন। এই সময় তিনি ১০, সদর ষ্ট্রীটে বাস করতেন। এই বাড়ীতেই তিনি তার বিখ্যাত কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' রচনা করেন। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষ সহায়তা করেন।

১৮৮৩—(বয়স ২২) বোম্বাই এর কারওয়ারে কিছুদিন বাস করেন। 'ভারতী'তে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রকাশিত হয়। মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ (৯ই ডিসেম্বর)।

১৮৮৪—(বয়স ২৩) আদি ব্রহ্মসমাজের সম্পাদকের পদে ব্রতী হন। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা করেন।

১৮৮৫—(বয়স ২৪) 'মুকুট' 'রাজর্ষি' এবং অন্যান্য বহু গান, প্রবন্ধ রচিত হয়। অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে শোলাপুর ও বান্দ্রায় কিছুকাল বাস করেন।

১৮৮৬—(বয়স ২৫) ডিসেম্বর মাসে দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতিয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে স্বরচিত উদ্বোধনী সঙ্গীত ("আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে/বরের হ'য়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে") করেন।

১৮৮৭—(বয়স ২৬) 'মানসী', 'চিঠিপত্র', 'আলস্য ও সাহিত্য' ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হয়।

১৮৮৮—(বয়স ২৭) জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম। 'মায়ার খেলা' প্রকাশিত হয়।

১৮৮৯—(বয়স ২৮) 'রাজা ও রাণী' রচিত হয়।

১৮৯০—(বয়স ২৯) 'বিসর্জন' নাটক রচিত হয়—রঘুপতির ভূমিকায় ঠাকুর বাড়ীতে অভিনয় করেন। Tagore Estate-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন শিলাইদহ বাস করেন। অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ও লোকেন পালিতের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণে যান—ইটালী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড। দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার জন্ম।

১৮৯১—(বয়স ৩০) ইয়োরোপ যাত্রীর ডায়েরী প্রকাশিত হয়—'সাধনা' মাসিক পত্র প্রকাশ করেন।

১৮৯২—(বয়স ৩১) 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'সোনার তরী' রচিত হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষার যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ "শিক্ষার হের ফের" সাধনায় প্রকাশিত হয়। তৃতীয় ও কনিষ্ঠা কন্যা মীরার জন্ম।

১৮৯৩—(বয়স ৩২) বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে টৈতন্য লাইব্রেরীতে 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ পাঠ করেন

১৮৯৫—(বয়স ৩৪) 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

১৮৯৬—(বয়স ৩৫) চিত্রা, নদী, জীবন দেবতা, মানসী।

১৮৯৭—(বয়স ৩৬) নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেন। ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় সম্মেলনের কাজ চালানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হন।

'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরক বাস' রচিত হয়।

১৮৯৮—(বয়স ৩৭) কারমাটারে (সাঁওতাল পরগণা) বায়ু পরিবর্তনে যান। 'ভারতী' সম্পাদনার ভার নেন। New sedition Act 1898 এর বিরুদ্ধে কলকাতা টাউন হলে প্রতিবাদ সভায় 'কণ্ঠরোধ' রচনার মাধ্যমে তীব্র আক্রমণ করেন।

বাল গঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন ও তিলকের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' রচনা করেন।

১৮৯৯—(বয়স ৩৮) কলকাতায় প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দেয়—ভগিনী নিবেদিতার সহযোগিতা করেন। ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেন এবং ৺ কালীচরণ বানার্জীর ইংরাজী ভাষণের বাংলা অনুবাদ করেন।

১৯০০—(বয়স ৩৯) কথিকা, কথা, চিরকুমার সভা রচিত হয়।

১৯০১—(বয়স ৪০) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ দর্শন' পুনঃপ্রকাশ করেন। 'ছোখের বালী' প্রকাশিত হতে থাকে। 'নৈবেদ্য' এই সময়ই লিখিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ নৈবেদ্যর কবিতায় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ছাপাইবার ব্যয় বহন করেন।

সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করবার জন্য আসেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্কুল উদ্বোধন করেন এবং নিজে শিক্ষকতা সুরু করেন এবং ছাত্রদের সকল কার্য্যে সাহচর্য্য দেন। এই স্কুলের প্রথম শিক্ষকগণের মধ্যে জগদানন্দ রায়, William Lawrence, রেওয়া চাঁদ, পণ্ডিত নিবারণ বিদ্যার্ণব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পরে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হরিচরণ ব্যানার্জি ও কবি সতীশ চন্দ্র রায় যোগ দেন।

১৯০২—(বয়স ৪১) অত্যন্ত আর্থিক অনটনে পুরীর বাড়ী বিক্রয় করে দেন এবং স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও তাঁর স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় করে স্কুল ও অন্যান্য দেনা শোধ করেন।

কলকাতা ইউনিভার্সিটির কনভোকেশনে Lord Curgon কর্তৃক প্রাচ্য দেশীয়দের সম্বন্ধে কটূক্তির প্রতিবাদ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করেন।

২৩শে নভেম্বর শ্রীমৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়

১৯০৩—(বয়স ৪২) 'বঙ্গদর্শনে' 'নৌকাডুবি' প্রকাশ হইতে থাকে।

১৯০৪—(বয়স ৪৩) গঠনমূলক জাতীয়তাবাদ, গ্রাম সংগঠন এবং নানা রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

কলকাতা টাউন হলে 'শিবাজি উৎসব' বিষয়ক কবিতা পাঠ করেন।

১৯০৫—(বয়স ৪৪) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহত্যাগ (19 January 1905 / ৬ই মাঘ, ১৩১১)। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাস করতে আসেন। মাসিক পত্রিকা 'ভাণ্ডার' প্রকাশ করেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে। ত্রিপুরা রাজের আমন্ত্রণে আগরতলা যান—New Bengal School of Act এর সংগঠনে Count Okakura ও ভগিনী নিবেদিতাকে সক্রিয় সাহায্য দেন।

১৯০৫—(বয়স ৪৪) Lord Curgon এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। 'রাখী বন্ধন' উৎসব পালনে বিরাট শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করেন। কলকাতা টাউন হলে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি একাধিক গান রচনা করেন—

বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান
তোমাদের এমনি অভিমান।
চিরদিন টানবে পিছে—চিরদিন রাখবে নীচে
এত বল নাইক তোমার সবে না সেই টান।
শাসনে যতই বড় আছে বল দুর্ব্বলেরও
হওনা যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেয়ে তোরাও বাঁচবি নারে
বোকা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান॥

রাখী বন্ধনের আর একটি বিখ্যাত গান—

বাংলার মাটী বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান॥
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান॥

ইংরেজ সরকার ছাত্রদের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেন। বহু জনসভায় রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করেন।

১৯০৭—(বয়স ৪৬) প্রবাসীতে 'গোরা' উপন্যাস প্রকাশিত হতে শুরু হয়। বোমার মামলায় অভিযুক্ত অরবিন্দের উদ্দেশে লেখেন—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার
বাণী মূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ, কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা, ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলী। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন।

●

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র ঋতে, বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার।

●

দুঃখ কিছু নয়
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব্বভয়।
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোল তোল শির
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।
জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশিষ মাগে
গাহে তব জয় গাথা।

১৯০৮—(বয়স ৪৭) পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে তিনি মানিকতলার বোমার কারখানা, মুজাফ্‌ফরপুরের বোমা বিস্ফোরণ, বারীণ ঘোষ ও অন্যান্য-দের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইংরাজের অমানুষিক অত্যাচারেই আদর্শবাদী বাঙালী যুবক হিংসার পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

১৯০৯—(বয়স ৪৮) প্রায়শ্চিত্ত, শব্দতত্ত্ব, 'ধর্ম' : 'তপোবন' শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা। গোরা, রাজা, শান্তিনিকেতন, গীতাঞ্জলী ও প্রবাসীতে জীবনস্মৃতি প্রকাশিত হয়।

১৯১১—(বয়স ৫০) জাতীয় কংগ্রেসে "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে" গানটী গীত হয়। এই প্রসিদ্ধ গানটী রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজে মাঘোৎসবে গান।

জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য বিধায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা—যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চির সারথি, তব রথ চক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখ ত্রাতা।
জনগণ পথ পরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।
ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে-আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণ দুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।
রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নব জীবন রস ঢালে।
তব করুণারুণ রাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় হে, জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

১৯১২—(বয়স ৫১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিরাট সম্বর্দ্ধনা জানায়। ২৭ মে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয়বার বিদেশ যাত্রা করেন। তাঁর কিছু কবিতা ইংরাজীতে তর্জমা করে Rothensteinকে দেখান। পরে W. B. Yeats বিদগ্ধজন সমক্ষে পাঠ করেন। C. F. Andrews এর সঙ্গে এই সভাতেই পরিচয় হয়। এই কবিতাগুচ্ছই 'গীতাঞ্জলী' নামে প্রকাশিত হয় এবং বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়।

১৯১৩—(বয়স ৫২) ১৩ই নভেম্বর সাহিত্যে Noble prize এর কথা ঘোষিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত D, Litt উপাধি প্রদান করেন।

১৯১৪—(বয়স ৫৩) ২৯শে জানুয়ারী বাংলার গভর্ণর Lord Carmichael বিশেষ সম্বর্দ্ধনা সভায় Noble prize ও পদক প্রদান করেন। W. W. Pearson শান্তিনিকেতনে আসেন। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্রে' অজস্র গান, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করেন। এলাহাবাদ অবস্থান কালে বিখ্যাত 'শা-জাহান' কবিতা লেখেন।

১৯১৫—(বয়স ৫৪) গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত Transval-এর Phoenix School-এর ছাত্র শিক্ষকগণ শান্তিনিকেতনে আসেন। গান্ধীজী ও শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ শান্তিনিকেতনে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বিশেষ সভায় সম্বর্দ্ধিত করেন। তরা জুন ভারত সম্রাট তাঁকে Knighthood প্রদান করেন।

'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' 'ফাল্গুনী' 'বলাকা' রচনা করেন। বাংলা ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত এই মর্ম্মে তিনি রামমোহন লাইব্রেরী হ'লে "শিক্ষার বাহন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯১৬—(বয়স ৫৫) C. F. Andrews, Pearson ও মুকুল দে-কে সঙ্গে লইয়া জাপান ভ্রমনে যান। জাপানে Tokyo ও Keio Gijiku বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ প্রসঙ্গে জাপানের চীনের উপর আগ্রাসী নীতির নিন্দা করেন। পরে আমেরিকায় ভ্রমণে Yale University ও অন্যান্য শহরে অনেক বক্তৃতা দেন। পুনরায় তিনি জাপান হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৯১৭—(বয়স ৫৬) সাধারণ ব্রহ্মসমাজ আচার্য্য ব্রজেন শীলের সভাপতিত্বে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা জানান। অ্যানি বেসান্টের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধটি জনসভায় পাঠ করেন। সেই সভাতেই তিনি স্বরচিত গানটি করেন—

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীর বৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই ?
সেকি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে ?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার মিলি সবাকার সাথে
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে
জাগ্রত ভগবান হে॥

বিঘ্ন বিপদ দুঃখ দহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যু গহন পার হইলো, টুটিল-মোহ কারা।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই ?
নিশ্চল নির্ব্বীর্য বাহু কর্ম্মকীর্ত্তি হীনে
সার্থ শক্তি নিরানন্দ জীবনধন দীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে
জাগ্রত ভগবান হে।

নূতন যুগ সূর্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি
তব মন্দির অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রি।
নিম আগত ওই, ভারত তবু কই ?
গত গৌরব ধ্যান আসন, নত মস্তক লাজে—
গ্লানি তার ধোয়ন করো নয়নপাতে মাঝে।
স্নান দাও, স্নান দাও, দাও দাও স্নান হে
আগ্রত ভগবান হে॥

১৯১৯—(বয়স ৫৮) দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যান।

১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে কবি বিচলিত হইয়া অসুস্থ শরীরে কলকাতায় আসেন এবং বিক্ষোভ সভার আয়োজন করেন। এই হত্যার প্রতিবাদে তিনি Knighthood ত্যাগ করেন ৩০শে মে তাঁইসরয়কে লেখেন

"The very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in the incongnous context of humilation, and I for my hart wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who for then so called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings."

১৯২০—(বয়স ৫৯) উত্তর ভারত ভ্রমণে যান। গান্ধীজীর সবরমতি আশ্রমে একদিন বাস করেন। পঞ্চমবার বিদেশ যাত্রা করেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন—পরে আমেরিকায় যান। Rome in Rolland, Bergson, Sylvian Levy প্রমুখ মনীষীদের সহচর্যে আসেন। আমেরিকার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন।

১৯২১—(বয়স ৬০) গান্ধীজী জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিভৃতে অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

২২শে ডিসেম্বর আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল আনুষ্ঠানিক ভাবে বিশ্বভারতী উদ্বোধন করেন। শান্তিনিকেতনের সকল সম্পত্তি 'বিশ্বভারতী'র নামে দান (trust deed) করিয়া দেন।

১৯২২—(বয়স ৬১) দক্ষিণ ভারত ও সিংহল পরিভ্রমণ, 'শিশু ভোলানাথ' সুধাধারণ, লিপিকা প্রকাশ।

১৯২৩—(বয়স ৬২) 'রক্ত করবী' প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীতে এগুরুজ দান। পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ।

১৯২৪—(বয়স ৬৩) চীন ভ্রমণে যান এবং পথে জাপান হ'য়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। চীনের সর্বত্র তিনি বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

১৯২৫—(বয়স ৬৪) দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ ভ্রমণে যান। গান্ধীজীর শান্তিনিকেতনে আগমন। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে কবি মর্মাহত হয়ে লেখেন

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

১৯২৬—(বয়স ৬৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ঢাকায় যান। পরে কুমিল্লায় অভয় আশ্রমের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন। ত্রিপুরা রাজের আমন্ত্রণে আগরতলা হয়ে কলকাতায় ফেরেন। ইতালির আমন্ত্রণে অষ্টমবার বিদেশ যাত্রা। মুসোলিনী কর্তৃক রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা।

১৯২৬—(বয়স ৬৫) রোমাঁ রোঁলার আমন্ত্রণে সুইজারল্যাণ্ড গমন। আপিস্ট সরকারের পরিচয় লাভ এবং প্রতিবাদে ম্যাকেঁটা গার্ডিয়ানে পত্র প্রেরণ। অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড হইয়া নরওয়ে ও সুইডেন যাত্রা। নরওয়ে রাজার অভ্যর্থনা। ডেনমার্ক হইয়া জার্মানী আগমন এবং ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লোভিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ও মিশর হয়ে ৭ মাস পরে দেশে প্রত্যাবর্তন।

'লেখন', 'বৈকালী', 'নারীর পূজা', 'চিরকুমার সভা', 'শোধ বোধ'

১৯২৭—(বয়স ৬৬) ভরতপুর, আগ্রা, জয়পুর ও আমেদাবাদ ভ্রমণ। শিলংএ 'যোগাযোগ' উপন্যাসের সূচনা। 'নটরাজ', 'মৃত্যুঞ্জয়'। নবমবার বিদেশযাত্রা। মালয়, বালী, জাভা, শ্যামদেশ হয়ে প্রত্যাবর্তন। বসুমতিতে শেষ রক্ষা।

১৯২৮ (বয়স ৬৭) পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সিংহল ও বাঙ্গালোর ভ্রমণ। 'শেষের কবিতা' রচনা।

১৯২৯—(বয়স ৬৮) কানাডার আমন্ত্রণে দশমবার বিদেশ যাত্রা। জাপান হয়ে ভ্যাঙ্কুভারে বক্তৃতা। যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরে বক্তৃতা। জাপান ও ইন্দোচীন হয়ে প্রত্যাবর্তন তপতী, মহুয়া।

১৯৩০—(বয়স ৬৯) পুনরায় বিদেশ ভ্রমণ। ফ্রান্স হয়ে ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড হিবার্ট লেকচার—পরে জার্মানীতে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ডেনমার্ক হয়ে রাশিয়ায় গমন। রাশিয়ায় বিপুল সম্বর্দ্ধনা।

১৯৩১—(বয়স ৭০) রিয়লীর বন্দী শিবিরে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ১লা অক্টোবর জনসভায় বক্তৃতা। প্রশ্ন কবিতা রচনা।

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল "ক্ষমা করো সবে, বলে গেল 'ভালবাসো'—
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।"
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দ্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥
আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে,
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হ'য়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে বিক্ষত মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশী সংগীত হারা,
অমাবস্যার কারা
মুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

রাশিয়ার চিঠি, বঙ্গবাণী, সহজ পাঠ।

১৯৩২—(বয়স ৭১) গান্ধীজির' কারাদণ্ড ' বৃটিশ মন্ত্রীকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। আমন্ত্রিত হয়ে পারস্যে গমন। রেজা শা পহ্‌লবী ও পারশ্য বাসীর বিপুল সম্বর্দ্ধনা। ইরাক হয়ে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন। মদন মোহন মালবোর শান্তিনিকেতন আগমন।

১৯৩৩—(বয়স ৭২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন উপলক্ষে বক্তৃতা। রামমোহন মৃত্যু শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব।
দুই বোন বিচিত্রিতা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বাঁশরী।

১৯৩৪—(বয়স ৭৩) জহরলাল নেহেরুর শান্তিনিকেতন আগমন। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সিংহল ও দক্ষিণভারত পরিক্রমা।

১৯৩৫—(বয়স ৭৪) কালীহিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্ত্তনে ভাষণ এবং ডি,লিট উপাধী লাভ। জাপানী কবি নোগুচির শান্তিনিকেতন আগমন।

১৯৩৬—(বয়স ৭৫) অর্থ সংগ্রহে উত্তর ভারত যাত্রা। গান্ধীজির সাহায্যে ৬০,০০০ টাকা সংগ্রহ। সাম্প্রদায়ীক বাটোয়ারার প্রতিবাদে বক্তৃতা।

পত্রপুট, শ্যামলী সাহিত্যের পথে, জাপানে-পারস্যে পাশ্চাত্য ভ্রমণ।

১৯৩৭—(বয়স ৭৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সর্বপ্রথম বাংলায় অভিভাষণ। শান্তি-নিকেতনে চীনা ভবনের উদ্বোধন।

১৯৩৮—(বয়স ৭৭) এন্ড্রুজ কর্তৃক হিন্দি ভবনের ভিত্তি স্থাপন। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাত।

১৯৩৯—বয়স ৭৮) ২৯ জানুয়ারী জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের শান্তিনিকেতনে আগমন। ১৯ এ আগষ্ট মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

১৯৪০—(বয়স ৭৯) ২৭ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী ও কস্তুরবাই আশ্রমে আগমন।

১৯৪১—(বয়স ৮০) ১লা বৈশাখ তারিখে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আশীতম বর্ষ পূর্তী উৎসব জন্মদিনের ভাষণে 'সভ্যতার সঙ্কট' লেডি রাথবোনের খোলা চিঠির উত্তরে রোগ শয্যা হতে বিবৃতি ৩০শে জুলাই অনুপ্রচারের পূর্বে মুখে মুখে সর্বশেষ রচনা "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ন করি"।

৭ই আগষ্ট ১৯৪১ (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) রাখী পূর্ণিমার দিন বেলা বারোটার কিছুপরে ৮০ বৎসর ৩ মাস বয়সে জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়ীতে দেহত্যাগ।

পরলোকে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাণকুমার দাস

গত ২রা এপ্রিল রাত ১২.৩০ এ প্রবীন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী কলকাতায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর তিনি অকৃতদার ছিলেন। বাড়ী ছিল ফরিদপুর জেলার বাঐসার গ্রামে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বন্ধীয় সঙ্কট ত্রান সমিতির সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে তাঁহার স্বদেশী জীবনের সূত্রপাত। পরে অনুশীলন সমিতির আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন এবং বহুবার কারা-বরণ করেন।

আমরা তার বিদেহীআত্মার শান্তি কামনা করি।

হাটের নাম জনতা

শ্রীসতীভূষণ সেন

যে বিশ্বাস, যে নির্ভরতা নিয়ে, চোখ বুঁজে পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিলাম, কটা দিনই বা গেছে এর মধ্যেই সেটা হারাতে বসেছি। চরণ সিং আবার পদত্যাগ করেছেন। কি কারণে পদত্যাগ, কোথা থেকে পদত্যাগ, সেগুলো অবান্তর। মোরারজীকে আর সইতে পারছেন না সেটাই আসল কথা।

গত বছর মে দিবসে, জনতা দল অনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেদিন ইন্দিরার অভাবনীয় পরাজয়ে উদ্বেলিত দেশ বরণ করে নিয়েছিল জনতাকে। আশা করেছিল, নতুন মানুষরা এসেছে এবার নতুন ইতিহাস রচিত হবে। দ্বিধা ছিল মনে, একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে একটি পাঁচ মিশালী দল পারবে কি এ গুরুভার বহন করতে? আবার অন্যদিক থেকে দেখলে, জনতা দলের নেতৃত্বের তিন চতুর্থাংশই আমাদের পরিচিত, কংগ্রেসের রাজনৈতিক বাতাবরণে মানুষ হয়েছেন। 'ব্যাক বেঞ্চবেঞ্চ' ছিলেন না সকলে, অনেকেই মন্ত্রীত্বের ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছিলেন। যে দলগুলির সমষ্টির নাম জনতা, তারাও কংগ্রেসেরই সন্তান, বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের উপদল ছিলেন। তারা যখন স্বেচ্ছায় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে জনতা দলে যোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন আশ্বস্ত হয়েছিলাম, ভয় কেটে গেছিল।

অন্তত আশা আমরা করিনি। মন্ত্রীপরিষদের অনেকেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। নিজেদের মধ্যে তাত্ত্বিক মতভেদ ছিল, কিন্তু সেজন্য কাজের ক্ষতি হয়নি। বিদেশ মন্ত্রী বাজপেয়ী, তথ্যমন্ত্রী আদবানি, শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডিজ, শ্রমমন্ত্রী দুর্গাভূষণ, রেলমন্ত্রী মধুদণ্ডবতে দপ্তর পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন: মন্ত্রীপরিষদে এরা নবাগত, পূর্বঅভিজ্ঞতা কারোই নেই, তবুও দেখা গেল আমাদের ছেলে 'ট্যালেন্টের অভাব নেই। অভাব যে বস্তুটির সে কথায় পরে আসছি। দু একজন আমাদের হতাশ করেছেন, যেমন রাজনারায়ণ ও ত্রিলোচন শর্মা। কয়েকজন এখনো নিজ নিজ বৈশিষ্ট দেখাতে পারেন নি; দুর্ভাগ্য ক্রমে অর্থমন্ত্রী প্যাটেলও এই দলে পড়েন। বৈশিষ্ট্যহীন ব্যক্তি তিনি নন, পড়ে গেছেন জনতার হাটে, তাই এই দুরবস্থা। একটা প্ল্যানই রচনা করতে পারলেন না জনতাদল এই বেড় বছরে। একদল ডানদিকে যেতে চান তো অন্য দল গোত্তা মারেন বাঁ দিকে একটা পথ তো বাংলে দেবেন সবাই মিলে, তবে না অর্থমন্ত্রী বাজেট করবেন, ভূমিকা নেবেন তো।

তবে প্রধানমন্ত্রী মোটামুটি পেরে যেতেছেন। চোখ রাঙিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে এমনি লাফ দেখে, এমন কোন লক্ষণ নেই। দেশের অর্থনীতির কোন কৃতিত্ব নেই। কয়েকবছর দুই হয়েছে, ভাল ফসল পাওয়া গেছে; আমরা ছুটো জিনিস পরের মুখে দেখছি, নাগালের মধ্যে পাচ্ছি। এই মাত্র বইলে Rural Bias বলে ওঁরা যে সব বড় বড় বাণী শুনিয়েছিলেন, তার কোন হদিস নেই। ধনী কৃষক আগের মতই শক্তিমান, বরং 'জনতার' বর্মচর্ম পরিধান করে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। ভূমিহীন কৃষক আরও বেশী উৎপীড়িত ও বঞ্চিত হয়ে, জনতা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। শিল্পের জগতে স্ট্রাইক ও লকআউট বাড়ছে। জনতা সরকার দুর্বলের রক্ষায় এগিয়ে আসছেন না। পরিষ্কার বোঝা যায়, তাঁদের সহানুভূতি শ্রমিকের উপরে নয়, মালিকের দিকেই প্রাণের টান। যত Concession সব পকেটে মালিকরা। সেই যে বোনাস আইন সংশোধন করে বাহবা কুড়িয়েছিলেন জনতারাজের শুরুতে, শ্রমিকের উপর অবিচারের শেষ নেই হয়েছে ইতি।

এটুকু করতে গিয়েই চড় চড় করে উঠেছিল জনতা দলের জোড়াতালো। মন্ত্রীত্ব রক্ষার জরুরী প্রয়োজন না থাকলে সে দিনই ভেঙে পড়ত। যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জনত ফ্রন্টের স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগুলি, সেই যে বলেছিলেন নিজ নিজ সত্তা লুপ্ত করে দিয়ে শক্তিশালী জনতা দল গঠন করবেন, সে কাজ এক পাও অগ্রসর হয়নি। বরং স্বাতন্ত্র্য আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। নেতৃবর্গ পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, প্রকাশ্যে তর্কাতর্কি করছেন। জল ঘেঁষে নোংড়া কাপড় নিয়ে সরকারী ঘাটে কাচতে আসছেন। যেন বলতে চাচ্ছেন, দেখুন সবাই জনতার অন্তপুর কত নোংড়া।—এর মধ্যে আবার হাসির খোরাক যোগাচ্ছেন পাগলোয়ান রাজনারায়ণ। কখনো কাশী ছুটছেন বহুগুনার দিকে [যদিও দুজনে একই যূথচ্যুত মানুষ একই ক্যাবিনেটের অংশীদার] কখনো "গোর লাগি মহারাজ" বলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন চরণ সিংএর পায়ে। একবার তাল ঠুকে যাচ্ছেন সভাপতি চন্দ্রশেখরের দিকে পরমুহূর্তেই মোরারজীর শিবায় ভিক্ষা করেছেন নতজানু হয়ে. হাটুরে কিল ছুড়ছেন, যার গায়ে লাগে লাগুক।

যা বলছিলাম। ওঁদের আত্মঘাতী কোন্দলের ফলে সংগঠনিক দুর্বলতা দিন দিন বাড়ছে। গত একবছরে দু দুটো বড় নির্বাচন হল, প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হল প্রত্যেকবার। মহারাষ্ট্রে সমাজবাদী দলকে তাদের শক্ত ঘাঁটিতে শেষটায় জনসংঘের কাছে মাথা নোয়াতে

হল। Peasants & Workers Party-র সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার কথা দিয়েও তা ফিরিয়ে নিতে হল। তা না করতে হলে জনতাদল মহারাষ্ট্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারত। তাতে লাভ হত জনতা দলের ; বড় তরফ জনসংঘের ঘাটুনে রাজনীতির জন্য সেটা হতে পারল না।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিরোধ সমাজবাদী ও জনসংঘের, বিচার ও উক্তি প্রয়োগে বিরোধ সমাজবাদী ও লোকদলের। আবার পশ্চিমবঙ্গে আদি কংগ্রেস ও সমাজবাদীদের ঠোকাঠুকি। তাই জনতা দলের সাংগঠনিক নির্বাচন সম্ভব হচ্ছে না। 'অ্যাড হকে'র ভাঙা গাড়ী টক্ টক্ করতে সভাপতি চন্দ্রশেখর প্রথমটায় চেষ্টা করেছিলেন সকলকে এক সুতোয় বাঁধতে। R.S.S তার স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত করতে রাজী হল না। নিজের শক্তি বাড়াতে চলল। আগামী দিনের কয়েদের ঘণ্টে, জনসংঘের দেশী ও সাধু হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

ক্যাবিনেটের তিন প্রধান, মোরারজী বাবুজী ও চৌধুরী এরা তিন জন যদি মিলে মিশে কাজ করতে পারতেন তবু আশা ছিল। আটল বিহারী বাজপেয়ীর আকাশে যে সব রঙীন পাখী ভেসে বেড়ায়, তারা বলে এই তিন জনের তিনটি নির্দিষ্ট গ্রুপ আছে। একজনের সেখানে প্রভুত্ব অপরেরা সেখানে অবাঞ্ছিত। নানাজি দেশমুখের আবার স্বতন্ত্র একটি গ্রুপ, যদিও তিনি মন্ত্রী সভার কেউ নন। তাঁর আদর্শ নির্ভেজাল একনায়ক তন্ত্র। গণতন্ত্রের কৌশলে জনতার ক্ষেত্রে পৌঁছে গেছেন এই মাত্র। তাই বলে কি গণতন্ত্রী হয়ে গেছেন বুড়ো বয়সে ? R.S.S. কে দেখেছেন তো তারা দেশের জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার করবে, কিন্তু কাঁধ থেকে নামবে না। রূপ বদলাবে, পথ পরিবর্তন করবে, ভালো করে কাঁধে চেপে বসার কোন সুযোগই ছাড়বে না। তাদেরই পালের গোদা নানাজি।

মন্ত্রী পরিষদের যে দুজন প্রধান, মোরারজী ও চৌধুরিজী, তাঁদের মধ্যে কে যে প্রকৃত কর্ণধার বলা শক্ত। তবে কিনা দুজনের কেউই নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। সে মসলাই নেই তাঁদের ধাতে। মোরারজী ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আহ্বায়কই রয়ে গেলেন নেতৃত্ব দিতে পারলেন না। তাঁর কতকগুলি খ্যাপামি ([illegible]) নিয়ে রয়ে গেলেন আর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করছেন। সেটা যে তাঁর সরকারের সুচিন্তিত মত নয়, সেটি স্বীকার করতেও দ্বিধা নেই। আর বরাবর মন্ত্রীত্বে প্রথম থেকেই ভুল চালের পরে ভুল চাল দিয়ে, নিজেও বেইজ্জত হলেন, সরকারেরও ইজ্জত ডুবিয়ে চলেছেন। আর্যসমাজী আঠ বিশ্বাসের আপোষহীন আদর্শ ও সঙ্কুচিত দিগবলয়, ভারতের বিশাল ও বিচিত্র সমস্যাবলী সমাধানের সহায়ক নয়।

এঁরা সব Elderly Statesman. আমরা কিছু বলতে গেলে ছোট মুখে বড় কথার মত শোনাবে। পঞ্চাশ ষাট বছর এক একজন রাজনীতি করেছেন, শিখেছেন শুধুই দলাদলি। এঁরা দেখেছেন, বয়সই প্রায় ৭০। ৮০ হল, আর কিছুই হল না। এতদিন যা পাবেন নি, এবার সেটা পুষিয়ে নিতে চান। তাই চক্ষে ঝিলিক খেলেছে, আবোল তাবোল কথা যে রাশ পড়েছে মুখে দিয়ে। যদি ত্যাগ ও সন্ন্যাসের পাঠ নিয়ে কিছুদিনের মত অবসরচারী করতে পারতেন এঁদের, তবে জনতাদল বেঁচে যেতো।

সেদিন রামলীলা ময়দানে, জনতার প্রথম জন্মদিনের সভায়, মোরারজী জোর দিয়ে বলেছেন যে জনতা ভাঙবে না আগামী এক বছরে এমন ঐক্য গড়ে উঠবে যে সকলের তাক লেগে যাবে। আর তা যদি না হয়, যদি ভেঙেই পড়ে জনতা, তাহে ফল হবে মারাত্মক। দেশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমরা তো দেখছি গদীতে অধিষ্ঠিত থেকেই জনতাদল দেশকে ধ্বংস করে ছাড়বেন। রাজ্যে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি হচ্ছে। শান্তিরক্ষার বাহিনীর চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আগুন জ্বলে উঠছে, আজ এখানে কাল ওখানে। বোমা ফাটছে, গুলি ছুটছে, চাপছে কারফিউ। পন্টনের বুটের আওয়াজ কম্পিত করছে দিনান্তের জনহীন রাজপথ। তিরিশ বছর পিছিয়ে গেছে কি দেশ ? পার্টিশনের রক্তাক্ত দিনগুলির দুঃস্বপ্ন কি ফিরে এলো পুনরায় ? ধর্মের চেয়ে প্রচণ্ডতর উন্মাদনা কি সুপ্তি থাকে জাতের রক্তে, আরও হিংস্র আরো ক্ষমাহীন ?

আজ কোথায় তুমি শান্তিধর ভাই দেশনায়ক, কোথায় তোমার বিকল্প রাজনৈতিক দল। ওঠো, জাগো ত্রাণ করো।

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীকীরোদ দত্ত

বারীন্দ্রকুমার বাংলা দেশে এসে বিপ্লব কেন্দ্র ১০৮ নং সারকুলার রোডেই উঠলেন। তখন সেখানে মন্ত্রীক যতীন্দ্রনাথ বাস করছেন এবং দিনের বেলা ব্যায়াম ও লাঠি খেলা প্রভৃতি চলছে। ভবানীপুর এবং বালীগঞ্জের অভিজাত মহল থেকে প্রতি মাসে মাসে প্রায় আড়াইশ টাকা চাঁদা আদায় হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট পি. মিত্র দিচ্ছেন মাসিক ৩০ টাকা, চিত্তরঞ্জন দাসও সমিতিকে সাহায্য করতেন। অন্যান্য বহুলোক উকিল ব্যারিষ্টার দিতেন ১০ টাকা করে। সুরেন হালদার, হরিতরাজ প্রভৃতি জুনিয়র ব্যারিষ্টাররা দিতেন মাসিক ৫ টাকা করে। তরুণদের মধ্যে অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য, দেবব্রত বসু, জ্যোতিষ সমাজপতি, নলিন মিত্র, ভূপেন দত্ত প্রভৃতি আগেই এসে জুটে ছিলেন। আস্ফালোতি সমিতির ইন্দ্রনাথ নন্দীও যাওয়া আসা করতেন। সখারাম গণেশ বারীন্দ্রকুমারই পি. মিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মেদিনীপুরের বিপ্লব কেন্দ্রও আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আড়াইশ টাকা দিয়ে এক ঘোড়া কেনা হয়েছিল অশ্বারোহণ শেখবার জন্য সমিতির সেক্রেটারী সতীশ বসু ছিলেন পাকা ঘোড় সওয়ার, তিনিই অন্যান্যদের ঘোড়ায় চড়া শেখাতেন। এই ঘোড়ায় চড়েই যতীন্দ্রনাথ গড়ের মাঠের পথে বেরোতেন তার সমিতির পোষাক পরে ভাবি বিপ্লবের সংবাদ দিতে বালিগঞ্জ পাড়ার অভিজাত বংশে শিকার ধরবার জন্য প্রতিদিন সকালে। তাঁর সাহস ছিল অদম্য, উৎসাহ ছিল অপরাজেয় এবং মনের বল ছিল অসীম। জন্ম থেকেই তিনি ছিলেন অসীম গুণের আধার নেতৃত্ব ছিল তাঁর সহজাত। তাই পরবর্তী সন্ন্যাস জীবনে তিনি ছিলেন সহস্র সহস্র সাঁওতালদের নেতা।

সমিতির কেন্দ্র ৪৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে যাবার পরেই নিবেদিতা তাঁর সংগৃহীত দুইশত পুস্তক দিয়ে সমিতি পাঠাগারের পত্তন করেন। পরে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৪০০০০ হয়েছিল। সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে ক্লাশ হত। প্রতি রবিবার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ক্লাশ নিতেন সত্যচরণ লা এবং স্বামী সারদানন্দ, স্বদেশ বন্দনা এবং ধর্মসঙ্গীত গীত হত। কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথও এতে উৎসাহ দিতেন। অনুশীলন সমিতিতে এসে কবি—ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তোর আপনমনে ছাড়তে তোরে, আপনি স্বদেশ হলে তবে বল দিবি তুই কারে, নিশিদিন ভরসা রাখিস প্রভৃতি গান গেয়েছেন। রাজনৈতিক ও দেশোপ্রেমোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করে এবং এই সমস্ত ক্লাশের মধ্য দিয়ে কর্মীদল গড়ে উঠে ভারতের নব জাগরণের এই চারণ দল গ্রামে গ্রামে এবং নগরে নগরে ছড়িয়ে পড়ে ভাবী বিপ্লবের বীজ বপন করবে এবং এইভাবে দেশে অসংখ্য বিপ্লবকেন্দ্র গড়ে উঠে দেশকে সশস্ত্র বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করবে এই ছিল পরিকল্পনা। জাতির মনকে সর্বপ্রথমে গড়ে তোলাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। এ জন্য সে যুগে বিপ্লব আন্দোলনে শত্রু হত্যার চেয়ে আত্মবলিদানের প্রেরনাই ছিল বেশী। মৃত্যু বরণের মধ্যেই আছে দেশ জননীর বন্ধন মোচনের পথ এই কথাই কর্মীদল জানতেন। হিংসা মূল লক্ষ্য ছিল না এবং একটা মানবিকতা বোধ একটা বিশ্বমৈত্রীতা সমিতির মূল মন্ত্র ছিল। মুক্ত ভারতই জগৎ কল্যাণে ব্রতী হতে সক্ষম এই ধারণা ছিল কর্মীদের মনে। এভাবেই সশস্ত্র বিপ্লব পথেই দেশের মুক্তি সম্ভব। এ জন্যই বিপ্লবীরা এই পথ বেছে নিয়েছিলেন, তা বলে অপর জাতির প্রতি কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষভাব বিপ্লব আন্দোলনে ছিলনা।

কর্মীদল এই ভাবে তৈরী হচ্ছিল। এসম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার বলেন, "১০৮ নং সারকুলার রোডের কেন্দ্রে

পলিটিক্যাল মিশনারী ওটেনের ক্লাসে বা পাইকপাড়া পুকুরধারে চলতে লাগল। বালীগঞ্জের বাড়িটার পি. মিত্র সেখানে পড়াতেন, ইতিহাস, বিশেষ করে সিপাহী যুদ্ধের, সিখ অভ্যুত্থানের এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস। তিনি সারকুলার রোডের চক্রে বড় একটা আসতেন না। আমরা তাঁর লোয়ার সারকুলার রোডের বাড়ীতে গিয়ে আলোচনা শুনতাম এবং মাঠে লাঠি খেলা শিখতাম। সখারাম গণেশ দেউস্কর মশাই নিতেন ব্রিটিশ ভারতের আর্থিক শোষণের ইতিহাসের পড়া। তাঁর এই লেকচার গুলি পরিবর্তীত আকারে "দেশের কথা" নামে পরে পুস্তক আকারে ছাপা হয়েছিল। যতীনদা পড়াতেন রণনীতি আর ফ্রান্সের ছাত্রদের কাছে উচ্চাশ ভরা অগ্নিগর্ভ ভাষণ দিতেন ভাবি বিপ্লবের কথা। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে নানাজাতির উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত ইটালীর মাৎসেনি কাহিনী মার্কীনের স্বাধীনতা সমরের কথা, আইরিশ মুক্তি আন্দোলন, তাছ বিপ্লবিক নায়ক চতুষ্টয়ের রোমান্টিক জয়কথা প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক বই আমাদের পড়াতেন। এই সব রক্ত গরম করা কাহিনী পড়ে মত্ত ও রুদ্ধ রণ অশ্বের মত আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম।

(অগ্নিযুগ পৃষ্ঠা ৭১-৭২)

এই ভাবে বাংলাদেশে বিপ্লব প্রচার ও প্রসারের কাজ পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ হল, কিন্তু অচিরেই এর অগ্রগতি ব্যাহত হল। বারীন্দ্রকুমারের চরিত্রে ছিল অনেক গুণ কিন্তু তিনি অপরের নেতৃত্বের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন তাঁর ধারণা ছিল যে সর্বোপরি নেতৃত্ব একমাত্র তাঁরই স্বতঃসিদ্ধ এবং নেতৃত্ব করবার জন্যই তাঁর জন্ম। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন এবং তরুণ দলের মধ্যে বিরোধী ভাব প্রচার করতে লাগলেন। এর ফলে অবিনাশ, দেবব্রত প্রভৃতিও এইই মনোভাবাপন্ন হলেন। তরুণ সভ্যদের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট মিত্তির সাহেবের নিকট অভিযোগ গেল যতীন্দ্রনাথের পরিচালনা অথবা ব্যয়-বহুল। প্রবীণ সদস্য যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের উপর সত্যাসত্য নির্ণয় করবার ভার পড়ল। তিনি জানালেন এ অভিযোগ অসত্য। বারীন্দ্রকুমার কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মেনে নিতে কিছুতেই সম্মত নন। বিপ্লবকেন্দ্রে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এক তরীও বাস করতেন। তাঁর চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করে দ্বিতীয়বার অভিযোগ আনা হল। এবারে যতীন্দ্রনাথ বরোদার অরবিন্দের নিকট লিখে পাঠালেন। তিনি এসে বিরোধ আপাতিক ভাবে মিটিয়ে দিলেন। কিন্তু এই ছোড়া তালি টিকলনা। যতীন্দ্রনাথকে সমিতি ত্যাগ করতে হল। তিনি সমিতি ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করলেন। সন্ন্যাস জীবনে তাঁর নাম হল নিরালম্বস্বামী। ১৯০৮ সালে বোমার মামলায় তিনি যখন গ্রেপ্তার হন তখন তিনি সন্ন্যাসী। প্রাথমিক শুনানীর পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মথুর সোদ্দার পুলিশে মিথ্যা এজাহার দিয়েছিল। তার লোহার সিন্দুক থেকে এক হাজার সত্তর টাকা অপহৃত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই অপহৃত হয়নি। এদিকে অবনী তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করায় মামলা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার উপর অবনীর সঙ্গে মথুর সোদ্দারের কথার মিল না থাকায় হাইকোর্টের বিচারে সকল আসামীই মুক্তি পায়। শুধু অবনীর স্বীকারোক্তির জন্য বিচারে সে সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অবনী তার স্বীকারোক্তিতে বলেছিল যে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রবোধ দাস বন্দুক কিনবার জন্য তাকে তিনশ টাকা দিয়েছিল।

ডাকাতি মামলা টিকলো না বটে কিন্তু আসামীদের ছেড়ে দেওয়া হলনা। সব কটি ডাকাতি মামলা যুক্ত করে এবং ডাকাতি মামলার আসামীদেরই আসামী করে খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হল। হাইকোর্টে ডাকাতি মামলায় মুক্ত আসামীদের পুনরায় গ্রেপ্তার করা হল। এদের পুনরায় খুলনা জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। গোপনে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা হল। এ ভার দেওয়া হল ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাকফারসনের উপর। তিনি খুলনার ডাক বাংলোতে বিভিন্ন সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করলেন। আসামীদের বিচারের জন্য পুনরায় কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

প্রথমেই পুলিশ উনিশ জন আসামীকে চালান দিয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট তিনজনকে ছেড়ে দেন। তিনজন আসামী কেরার ছিল। মামলা শেষ হওয়া অবধি তাদের ধরতে পারা যায় নি। বাকি তের জনকে ট্রাইবুন্যালে সোপর্দ করা হয়। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন আলিপুরের সরকারী উকিল নীনিরোদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্ত করেন মৌলবী শামসুল আলম। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বড়যন্ত্র মামলার বিচারক ছিলেন বিচারপতি হ্যারিংটন, বিচারপতি বোসউড এবং বিচারক দাস। ১৯০৯ সালের ১৮ই জুলাই হাইকোর্টে মামলা আরম্ভ হয়। আসামীদের পক্ষ সমর্থন করছিলেন মিষ্টার জে. এন. রায়, মিঃ নিশিথ সেন এবং মি. নৈলেন সেন। ১৯১০ সালের ৩০ শে আগষ্ট বিচারকগণ রায় দেন। অবনী চক্রবর্তী, সচীন মিত্র, অশ্বিনী বাবু, বিধু সে, নগেন্দ্রচন্দ্র ও কালিদাস ঘোষকে দশ বৎসর করে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রিয়নাথ পাট, নগেন সরকার এবং সুধীর সে পাঁচ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। সতীশ চ্যাটার্জী এবং ঢাকা অনুশীলন সমিতির ব্রজেন দত্ত তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, যশোহর জেলার ঝুমিলহাট থানার সতীশ ভট্টাচার্য্য এবং খুলনা জেলার নাওসা গ্রামের সর্বেশ্বর চক্রবর্তী তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অবনীর প্রতি নির্দেশ হল যে বড়যন্ত্র মামলায় তার দণ্ড ও ডাকাতি মামলার দণ্ডের সঙ্গে এক সঙ্গেই চলবে। মোহিনী মিত্র এবং মন্মথ মিত্র বিচারে মুক্তি পান।

অবনী চক্রবর্তী ছিল 'খুলনা' পত্রিকার ম্যানেজার। অশ্বিনী বসু ই. বি রেলওয়ের ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। মোহিনী মিত্র ছিলেন তাঁদার কোম্পানীর ম্যানেজার।

প্রায় একবছর ধরে মামলার বিচার চলেছিল আলকার আমিনুল্লা সর্দার, হারানচন্দ্র দে সরকার, হামিদুল্লার পিতা কোরবানালি সর্দার, খুলনার কেশব পাটনিকে পাইকপাড়ার রানী দত্ত এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রামের সত্তানিষ্ঠ সজ্জন ব্যক্তিগণ হলফ করে ভগবানকে সাক্ষী মেনে আসামীদের বিরুদ্ধে নির্জলা মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে গেলেন। এদের মধ্যে কেশবপাটনিকে সমিতি থেকে পয়সা এবং চাল দিয়ে সাহায্য না করলে তার একবেলাও আহার জুটিত না। সাক্ষীরা সকলেই আসামীদের সঙ্গে এবং বিভিন্ন গ্রামের সমিতির সঙ্গে পারস্পরিক আনাগোনা মেলামেশা এবং যোগাযোগ প্রমাণ করে গেলেন।

আসামীদের মধ্যে অবনী চক্রবর্তীর বাড়ী ছিল খুলনা জেলার ধূলগ্রামে। নগেন্দ্র চন্দ্র, নগেন সরকার কালিদাস ঘোষ, মহিনী মিত্র এদের বাড়ী ছিল খুলনা জেলার শোলপুরে। মতিলাল দাস, বিনু পাই এদের বাড়ীও ছিল খুলগ্রামে। ব্রজেন দত্তের বাড়ী ছিল ঢাকা। তিনি ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্য। সতীশ চ্যাটার্জীর বাড়ী ছিল অন্তরন্দর। আসামীদের মধ্যে বিধু ঢাকা সমিতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন। বিধুভূষণ বসু ছিলেন খুলনা জেলার বাগেরহাটের মাসিক পত্রিকা পল্লীচিত্রের সম্পাদক। অবনী ভট্টাচার্য্য ছিলেন ঐ পত্রিকারই প্রকাশক বিধুভূষণ বসুর বাড়ী ছিল যশোর জেলায় পাইকপাড়া। কলকাতা অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে খুলনা এবং যশোহর জেলায় বহু শাখা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এরা ঢাকা অনুশীলন সমিতির সঙ্গেও সংযোগ রক্ষা করতেন মফঃস্বল অঞ্চলে এই সমিতিগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই এত শক্তিশালী হয়ে উঠে যে সরকার পক্ষ এদের দমন করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে সত্য মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে খুলনা বড়যন্ত্র মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ক ধারা অনুযায়ী রুজু করেন ১৯০৯ সালে। বিপ্লবী বাংলার ইতিহাসে এটা দ্বিতীয় বড়যন্ত্র মামলা। আলিপুর বড়যন্ত্র মামলার পরেই খুলনা বড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। এই মামলার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে বিপ্লবী পরিবেশ গড়ে উঠেছিল পল্লী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে।

(ক্রমশঃ)

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী
আশিষ সরকার

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী আশিষ সরকার গত ৫ই এপ্রিল কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ নেতা সতীশ সরকার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র আশিষ বাল্যকালেই বিপ্লবী নেতা আশিষ রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিপ্লবী জীবনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আট বৎসর রাজবন্দী ছিলেন. মুক্তির পর তিনি স্বাধীন বাংলায় রাজনীতির স্বাক্ষর রেখেছেন।

পরলোকে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী
গোষ্ঠ বিহারী শেঠ

সুপ্রসিদ্ধ সমাজসেবী স্বাধীনতা সংগ্রামী গোষ্ঠবিহারী শেঠ মঙ্গলবার ২রা মে সকাল ৭ ঘটিকায় নারায়ণি হোমে পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর, জোড়াসাঁকোর এলাকার সবজন প্রিয়-সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি কয়েকবার কলিকাতা পৌর-সভার কাউন্সিলার হয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রীয় অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আশুতোষ জন্ম ধরণী এই কর্মবীরের বিদেহীআত্মার শান্তি কামনা করি—তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

RegdNo. R. N .245.1 71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৫০ পয়সা

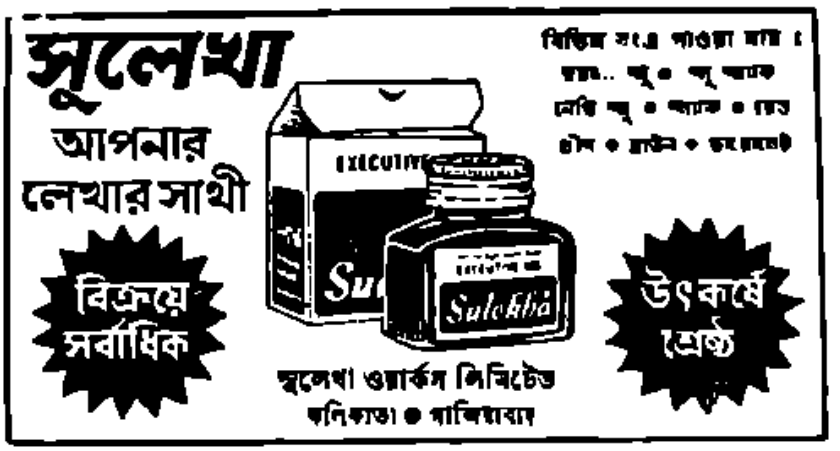

17 MAY 1978

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী, শ্রীবাদল রায়চৌ
সম্পাদক—শ্রীশান্তি সরল রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বোম্বাই—শ্রীমনুগোপাল গাঙ্গু
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅমিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমতীন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৮৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১৫ বং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

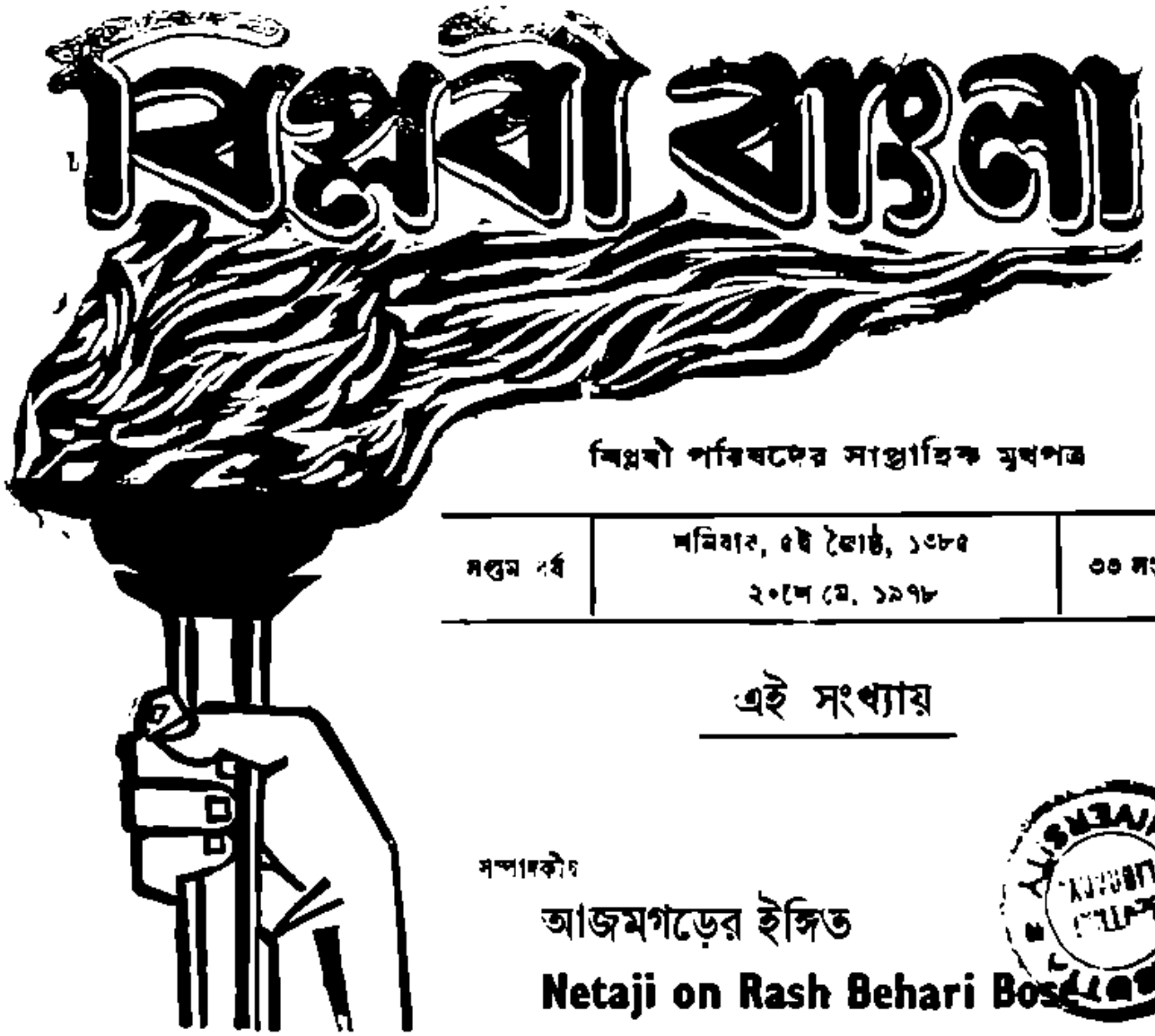

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ ২০শে মে, ১৯৭৮	৩৩ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

আজমগড়ের ইঙ্গিত

Netaji on Rash Behari Bose

তবু মৃত্যু নাই

। শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাসগুপ্ত ।

নেতৃত্ব

। কৌটিল্য ।

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর বিপ্লব প্রচেষ্টা

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। শ্রীকীরোদ দত্ত

UNIVERSITY LIBRARY CALCUTTA

"বল ভাই—ভারতের মাটী সেই আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

—গান্ধীজী

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

আগামী ২৫শে মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মহাজাতি সদনে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর ৯৩-তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হইবে।

সম্পাদকীয়

আজমগড়ের ইঙ্গিত

আজ থেকে প্রায় দেড় বছর আগে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন ইন্দিরা গান্ধী। দোর্দণ্ড প্রতাপে তিনি রাজত্ব করে চলছেন। লোকসভা এবং রাজ্যসভা দুইটি আইন সভায়ই তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা। প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতেও কোথাও তাঁর বিরোধীতা নাই। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি জরুরী ক্ষমতা প্রয়োজন বোধ করলেন। দুইটি আইন সভায়ই জাতির প্রতিনিধিরা তাঁকে অনুমোদন করলেন। আপত্তি জানালো না জাতি। প্রতিবাদের একটি কণ্ঠও ধ্বনীত হলো না দেশের কোনও আনাচে কানাচে। ইন্দিরাজী দেশ শাসন করতে লাগলেন জরুরী ক্ষমতার সাহায্যে। একি তাঁর গণতন্ত্র বিরোধীতা? একে কি গণতন্ত্র বিরোধীতা বলা চলে? এ যদি গণতন্ত্র বিরোধীতা হয় গণতান্ত্রিকতা কাকে বলব?

তারপরে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাস এল। ইন্দিরাজী ঘোষণা করলেন ভারতীয় লোকসভার নির্বাচন হবে। তিনি স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়েই তাঁর শাসন ব্যবস্থার জাতির অনুমোদন লাভের চেষ্টা করেছিলেন। বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধ বাতাস কোথাও ছিল না, সর্বত্রই বাতাস ছিল ইন্দিরাজীর অনুকূলে। বাইরের কোন শক্তি তাঁকে নির্বাচনে বিন্দুমাত্র বাধ্য করে নাই। সেদিনের প্রচলিত আইনের বলে যতদিন ইচ্ছা তিনি শাসনকার্য্য চালিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর খেয়াল খুশিমত যতদিন ইচ্ছা তিনি সিংহাসনে আসীন থাকতে পারতেন। কিন্তু তবুও তিনি জাতিকে নির্বাচনের অধিকার প্রয়োগের সুবিধা দিয়েছিলেন। একি তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক কার্য্য। এর চেয়ে বেশী গণতন্ত্রের সার্থক পূজা আর কেউ কোথাও করেছেন কি?

আমরা আরও দেখি কোন প্রকার Coup বা সামরিক অভিযানের সাহায্যে তিনি শাসন ক্ষমতায় আরোহন করেন নাই। জাতি এবং দেশই তাঁকে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছিল। জাতির সেবার জন্যই তিনি জরুরী ক্ষমতার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং জাতিই সে অধিকার তাঁকে দিয়েছিল। বলপূর্বক শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কোন আগ্রহই এর পশ্চাতে ছিল না। তবে ইন্দিরাজীর দীর্ঘ এগার বছরের রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্র বিরোধীতা কোথায়?

তবুও আজ কেউ কেউ বলছেন ইন্দিরাজী গণতন্ত্র ধ্বংস করেছিলেন এবং পরবর্তী জনতা সরকার সেই গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। আমরা ইন্দিরাজীকে দেখলাম এবং জনতা পার্টি এবং জনতা সরকারকেও দেখছি। ইন্দিরাজী নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছিলেন এবং সেই সুযোগ নিয়েই জনতা দল জাতির সম্মুখে এসেছিলেন তাদের নানা রকম সুখরোচক প্রতিশ্রুতি নিয়ে। স্বর্গসুখের ছবি তাঁরা এঁকে দিয়েছিলেন জাতির সম্মুখে। কিন্তু জনতা সরকারের গত দেড় বছরের জীবনে কি এ প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই? জনতা সরকার জাতিকে নিরাশ করেছেন। তাই জাতিও আজ তাদের দিক থেকে ক্রমে মুখ ফেরাচ্ছে। বাতাস আজ আর জনতামুখী নয়। বাতাস আবার ইন্দিরামুখী হয়েছে। এটা দেখা গেছে প্রথম অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্র নির্বাচনে। পরবর্তী কয়েকটি অন্তবর্তী নির্বাচনেও একই হাওয়া বইছে আমরা দেখছি। আজমগড়েও তারই ইঙ্গিত। জাতির ইচ্ছাই গণতন্ত্র। জাতির ইচ্ছা অনুসারে চলাই গণতান্ত্রিকতা। স্বৈরাচারী, একনায়কতন্ত্রী এবং গণতন্ত্র বিরোধী বলে বর্ণিত ইন্দিরাজী জাতির ইচ্ছা নির্ণয়ের জন্য সেদিন যেটুকু করেছিলেন আজ গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী জনতা সরকার কি সেটুকু করতে পারেন না? বর্তমানে জাতি কি চাচ্ছে, তারা জনতাকে চাচ্ছে কি না এটা নির্ণয় করা কি এখন তাঁদের কর্তব্য নয়? একমাত্র এই পথেই হবে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

আমরা জানি জনতা সরকার আরও কিছুকাল নিরাপদে ক্ষমতাসনে বসে থাকতে পারবেন। এরফলে অন্তর্বিরোধ হয়তো বাড়বে কিন্তু আইনগত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু সেটা গণতন্ত্রের পথ নয়। আমরা এই কথাই জনতা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

———

Netaji on Rash Behari Bose

The old and new leaders of the movement inspected the Indian National army on the ground in front of the Singapore City Hall on July 4, 1943, before the historic session commenced its deliverations.

The two stalwarts of the Indian Freedom Movement stood side by side before a huge gathering of Indians from all the countries of East Asia of ages, men and women, using different languages and belonging to diverse religious faiths.

Rash Behari in words that bubbled forth from the depth of the heart, introduced Subhas Chandra to the vast concourse of men saying :

"Friends and Comrades-in-Arms You might now ask me what did I do in Tokyo for your cause ! what present I have brought for you. Well I have brought for you this present (turning to Subhas). Srijut Subhas Chandra Bose needs no introduction toy ou, India or to the world. He symbolises all that is best, noblest, the most daring and the most dynamic in the youth of India."

"Indians' best is represented in him He is our "Netaji".

"Friends and Comrades-in-Arms :

In your presence today I resign my office and appoint Subhas Chandra Bose as President of the Indian Independence League in East Asia."

In publicly accepting the heavy responsibility Subhas Chandra Bose in a suitable speech expressed his deep reverence for Rash Behari and recounted his services to the Motherland. He concluded by saying :

"His marvellous achievements at the risk of his life during the last War for liberation of India are not only fresh in our memories but are also in records of the British Imperialism."

Rash Behari was not allowed to retire but was selected by the new President as the Chief Adviser to the Provisional Government of Azad Hind.

Continuous hard labour in the most difficult and uncertain conditions, suffering as had been from diabetes and bereavement from the death of his dear wife, the Great Hero of hundred fights who never faltered or take rest for decades at stretch, fell ill in January, 1945, and had to be removed to hospital for treatment.

During his illness His Majesty the Emperor of Japan decorated Him with the Second Order of Merit of the Rising Sun with double Rays. To the last moment of his life his predominant thought was the emancipation of his Motherland. Quietly, slipped into the other world on January 21, 1945, with a heart yearning for visiting the soil of his birth, the

playground of his younger days and the battle field of his manhood.

He expressed the essence of the philosophy of his struggle on April 25, 1942, when he said :

"I was a fighter,
One Fight more ;
The last and
The Best."

"Netaji Subhas Chandra Bose Head of the State, Provincial Government of Azad Hind, paid glowing tribute to Rash Behari Bose, the Supreme adviser to the Provisional Government of Azad Hind, which ran :

"The sad demise of Sri Rash Behari Bose is a personal loss to me and to my co-workers, besides being a serious loss to the cause of India's Independence. The late Rash Behari was not only a born revolutionary but also a great man. When I was in my teens I used to thrill at hearing about the daring exploits of Rash Behari in his anti-British revolutionary activities in India. Now thirty years later when I came into close personal ardour and unbounded optimism. Neither his advancing age nor his failing health blunted the edge of fighting spirit.

"India cannot be sufficiently grateful to the late Sri Rash Behari for the yeoman service he rendered to the cause of India's Freedom during his sojourn far Nippon a generation ago. It will be remembered that when Dr. Rabindranath Tagore returned to India after a visit to Nippon, he paid a glowing tribute to the selfless services that Rash Behari Bose was rendering to the cause of India's Liberation. The goodwill, sympathy and friendship for India that he built up in Nippon bore fruit when the Greater East Asia War broke out, and the Government and the people of Nippon pledged all out aid India's fight for freedom.

"The late Rash Behari has been rightly described as the Father of Indian independence Movement in East Asia, since the outbreak of the Greater East Asia War, and it may be truly said of him that he lived and died for India's Freedom. Among his most outstanding services ta the cause of his motherland will be counted the leading part of played at the Bangkok Conference and the establishment of Indian Independence Leagues throughout East Asia with Headquarters at Bangkok.

"But for his illness in recent months he would have taken a much more active part in provisional Government of Azad Hind. I vividly recall the moving scene at his sick-bed when I visited him more than once when I was recently in Tokyo. Optimism was writ large on his face, and he was not in the least depressed over our failure to take Imphal in first assault. He thought only of India and India's Freedom till the last moments of his life."

Rash Behari Bose is dead, but his indomitable spirit will live in our hearts for ever and will inspire us to carry on our fight until the last Britisher is driven out of India, and until India achieves complete Independence—the dream of his life.

On January 26, 1945, Netaji Subhas Bose issued instruction to the Indian Independence League branches throughout East Asia to hold mass meeting of Indians on January 29, 1945 the day of the funeral Ceremony of Rash Behari Bose to be held in Tokyo.

A special meeting of the Council of Ministers and advisers of the provisional Government was held at the office of the Provisioonal Goverenment headquarters on January 29, 1945, the day of funeral Ceremony of Rash Behari Bose to be held in Tokyo.

A special meeting of the Council of Ministers and advisers of the Provisional Government was held at the office of the Provisional Government headquarters on January 25, at 6-30 p. m. His Eucellency Netaji Subhas Chandra Bose presided.

The Council unanimously passed the following resolution on the death of Sri Bose, the entire Council standing and observing one minute silence :

"The meeting of the Council of Ministers and advisers of the Provisional Government of Azad Hind records its profound grief at the untimely demise of Sri Rash Behari Bese and further places on record its sense of appreciation of the manifold outstanding services rendered by him to the cause of independence throughout his life. As the only fitting tribute to the beloved memory of the late Sri Bose this council reiterates once again his resolve to carry to the fight for India's Independence with unrelenting vigour until complete Independence is achieved, and the life mission of Sri Rash Behari Bose is hereby fulfilled."

The Council then resolved unanimously to create a new order to be known as the "Order to Tamgha-E-Azad Hind" and to award the first decoration of the first Class of that Order post humously to the late Sri Bose in a grateful recognition of his service and sacrifices in the cause of India's Independence.

The Council also decided to awarded a Medal, to be known as the Rash Behari Bose Medal, to successful Cadet in the Indian Military Academy in Tokyo.

This is what a handful of Indians beset with danger all around did with limitations patent to their very existence for the Great Fighter for India's freedom : but what about his countrymen of the mainland and the Sovereign State of India built of the ashes of Rash Behari Bose and the patriots who had immolated themselves at the Alter of the Mother land ?

তবু মৃত্যু নাই

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু দেখেছি কি তোমরা কেউ ?
ক্রূর গোপন হিংসা নিশীথে দিবসে বলসিছে তরুণ অন্তরে,
চারিদিকে করি ত্রাসের সঞ্চার।
বিতংস জিঘাংসা, কারণে অকারণে ব্যস্ত হয় সৃষ্টিলোপ তরে।
বিষাক্ত পঙ্কিল মন হচ্ছে হয়ে ফেরে হেথা হিংসা চরিতার্থতায়,
রুধির আঁখির সম ছড়ায় ছিটায় যত্র তত্র নিরুদ্বেগ চিত্তে।

আদিম হিংস্র পশু প্রকাশে নির্ভয়ে অহর্নিশি কেন ?
স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা নীরবে শুকায়—সত্য-সুন্দরের বিলুপ্তি ঘটায়ে ;
ভ্রাতৃ-হত্যা অন্যায় পাপ বলে কেন নাহি মনে হয় ?
শ্বাপদ-সঙ্কুল আদিম অরণ্য-বাস, এর চেয়ে বোধ করি সত্যি সুখকর।

গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, শহরে দিক্ বিদিকে,
হিংসা করে হানাহানি ভীষণ হুংকারে, সুতীব্র আবেগে বিকট উল্লাসে।
ভীরুতা, ক্লীবতা, হীনমন্যতা ছেয়ে ফেলে আকাশ বাতাস দীনতায়
মানুষ দাসত্ব মাগে পশুত্ব সকাশে কেন,
অসহায় ভাবে ধৈর্যহীন চাটুকার সম ?

কে দিবে উত্তর তায়—কে দেখাবে দিব্য পথ ?
মৃত মনুষ্যত্ব কি উঠিবে না জাগি আরবার,
দমিতে এই হীন পশু-শক্তি এ সুন্দর ভুবনে ?
জানি কলিকের এ বুদ্ধি ভ্রংশ হবে দূরীভূত সুনিশ্চিৎ ;
মনুষ্যত্বের তবু মৃত্যু নাই, সে যে মহান আদর্শে উদ্ভূত।
চিরন্তন, অম্লান ভাস্বর, সূর্য্য সম—ঈশ্বর প্রেরিত।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও তার পরিণাম ফল]

যাক সে কথা। বাংলার শিক্ষিত সমাজ ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট সম্পর্কে এবং যে ভাবে তা বিধি বদ্ধ করা হয়েছে, তাতে উৎকণ্ঠিত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে জেগে উঠলো। এই আতঙ্কের অনুভূতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং আমাদের কয়েকজন নেতার নিষ্ক্রিয়তার ফলে আরও গভীর হল। সৌভাগ্যের কথা, পাঁচ বছর আগেই মধ্যবিত্ত সমাজের মনের কথা ব্যক্ত করার জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গড়ে উঠেছিল। প্রেস এ্যাক্টকে রদ করার জন্য সর্বশক্তি কাজে করে যাওয়ার জন্য আমরা সঙ্কল্প বদ্ধ হলাম। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে আমাদের পক্ষে টানার জন্য আমি তাদের কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, আমার বেশ স্মরণে আছে, আমি একাধিক ব্যক্তির নিকট থেকে কোন উৎসাহ পাইনি। একজন ব্রাহ্ম নেতা—তার নাম বলতে চাইনে—আমাকে বললেন : প্রেস কমিশনার মিঃ লেথব্রিজ এই বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। আমাদের মধ্যে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। আমি একটি দায়িত্বশীল পদে আছি; তার মর্য্যাদা আমাকে রক্ষা করতে হবে। আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিনা" আর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন : " আমি তোমাদের সাফল্য কামনা করি। কিন্তু আমি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারিনা।" যাদের কাছ থেকে আমরা সাহায্য ও সহযোগিতা পাব বলে ধারনা করার অধিকার আছে বলে মনে করতাম তাদের মধ্যে অনেকের কাছ থেকে আমরা এই রকম নিরুত্তাপ সম্বর্দ্ধনাই পেয়েছি।

আমাদের খৃষ্টান বন্ধুদের মনোভাব ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এই বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ কে, এস, ব্যানার্জি এবং ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের রেভাঃ ডাঃ কে, এস, ম্যাকডোনাল্ড। আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই তারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি (যিনি কে, এম, ব্যানার্জি নামে আরও ভাল-ভাবে পরিচিত) ছিলেন ভারতীয়দের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাদের একজন। তিনি একজন বিদ্বান ও সৎ লোক ছিলেন। জীবনের শেষ দিকেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে যোগদান করেন এবং ইহার প্রেসিডেন্ট হন। একবার ঋণ-জীবন বোধের আবর্তের মধ্যে যখন পড়ে গেলেন, তখন তা থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় আর তাঁর রইল না, এবং ক্রমেই তার গভীর-তর প্রবাহ তাকে টেনে নিয়ে গেল। তিনি কর্পোরেশনে যোগদান করলেন এবং তার একজন সক্রিয় সদস্য হলেন। তখন তার বয়স ষাট পেরিয়ে গিয়েছে। বয়সের ভারে তিনি যৌবনের কর্ম চাঞ্চল্য দেখাতে পারেন নি তথাপি একথা বলা যায় যে উৎসাহে, স্পষ্টবাদিতায় তিনি আমাদের দলে নব দীক্ষিত কনিষ্ঠতম কর্মীর মতই প্রবীণ ভাব প্রদর্শন করেছেন। সহজ বলে যা বুঝতেন তার সঙ্গে কোন আপোস না করার এরূপ কঠিন মনোভাব যুক্ত মানুষ আর একটি দেখা যায় না। দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে অমায়িকতার এরূপ মিশ্রনও কদাচিৎ দেখা যায়।

আমার দুঃখ হয়, এই রকম চরিত্রের লোক আমাদের মধ্য থেকে দ্রুত লোপ পাচ্ছে, আমাদের দেশের লোকের আচরণের মধ্যে এখন আর সরলতা ও আগেকার দিনের রীতি-নীতির বেশভূষা খুঁজে একটা দেখা যায় না। তার জায়গা এখন দখল করে বসেছে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ

আগ্রাসী ভাব। ডাঃ খানজি এই আন্দোলনে তার মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। তিনি এবং রেভাঃ ডাক্তার ম্যাকডোনাল্ড এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এই আন্দোলন যে কোন সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠিগত ব্যাপার নয়, তা প্রমাণিত হল এবং আন্দোলনটি একটি সার্বজনীন রূপ লাভ করল। ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন মাত্রকেই রাজদ্রোহ বলে সোরগোল পাকানোর আর কোন সুবিধা হয়ে উঠলো না। রাজার প্রথম বিরাট রাজনৈতিক বিক্ষোভের মধ্যে আমরা কলকাতার খৃষ্টান সম্প্রদায়ের এই দুইজন মহামান্য প্রতিনিধিকে পাওয়ায় আমরা শক্তি ও উৎসাহ যোগান দেওয়ার একটি সুস্পষ্ট উৎস লাভ করলাম।

টাউন হলটি ভাড়া করা হল। জনসভার দিন-তারিখও ঠিক হল। এ সময়ে একটা ঘটনা ঘটল যা লিপিবদ্ধ করা দরকার। যেদিন জনসভা হওয়ার কথা, সেদিন কলকাতায় একটা খবর পাওয়া গেল যে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলী ছ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে মাল্টায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোন যুদ্ধ বাধেনি। এটা ছিল একটা রাজনৈতিক আতঙ্ক রটানো, আধা-প্রাচ্যভাবের ধারক প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলীর কল্পনা প্রসূত মনে এই রকম রাজনৈতিক রটি ফুটিয়ে আনন্দ পাওয়ার একটা ঝোঁক ছিল। খবরটা কলকাতায় বেশ হানা বেঁধে উঠলো। সারা নগরীতে এবং কলকাতা বার লাইব্রেরীতে এটা একটা আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ল। মিঃ আনন্দ মোহন বোসকে তার বার লাইব্রেরীর আইনজীবী বন্ধুরা বেশ জোর দিয়েই পরামর্শ দিলেন যে টাউন হলের সভা মুলতবি রাখা হোক। এমনকি আভাসও তাঁকে দেওয়া হল যে তা না হলে পরিস্থিতি খুব খারাপ হবে, এবং এ কথাও বলা চলে যে ইণ্ডিয়ানদের এই আশঙ্কা-জনক অনিশ্চিত অবস্থা চলতে থাকা অবস্থায় যদি আমরা সভা করতে জেদ করি, তা হলে একটা ফৌজদারী মামলাও দায়ের করা হতে পারে। মিঃ আনন্দ মোহন বোস ছুটে এলেন আমার বাড়ীতে তখন সময় বিকেল তিনটা। পাঁচটায় সময় মিটিং আরম্ভ হওয়ার কথা। আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি বললাম, বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এটা হচ্ছে প্রথম এবং অন্যতম বৃহৎ বিক্ষোভ সভা। যদি এ সভা স্থগিত রাখা হয়, তা হলে এ সভা আর কখনই হবে না; আমাদের উপর লোকের বিশ্বাস আর থাকবে না, এবং তাহলে এখানেই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমি আরও বললাম, আমাদের কাজ জনসাধারণকে নিয়ে; তাদের স্বার্থেই আমরা দাঁড়িয়েছি। এখন সভা করলে তার পরিণতি কি হতে পারে সে সম্পর্কে আমার আইনজীবী বন্ধু ও আমি একমত হলাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনুগ্র থাকব এবং বৈধতার সীমা লঙ্ঘন না করে চলবো, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সাংঘাতিক কিছু ঘটার আশঙ্কা করার প্রয়োজন নেই। আমরা স্থির করলাম সভা হবে এবং তার ফলে যা-ই ঘটুক না কেন, আমরা সম্মুখীন হব।

এতবড় সফল জনসভা ইতিপূর্বে কলকাতায় আর বড় একটা হয়নি। এই সভা ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্টের মৃত্যু-ঘণ্টা ধ্বনিত করল এবং তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে এই সভা মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রম বর্দ্ধমান শক্তির প্রকাশ ঘটাল। আর তাদের মধ্যে এ বিশ্বাসও সৃষ্টি করল যে ধনী শ্রেণীর উদাসীন মনোভাব এবং সরকারী কর্মচারীদের প্রকাশ্য বিরোধী প্রভাব বিস্তার সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী কার্যকরভাবে তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। এই সাফল্য তাদের কাছে এমন একটা শিক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো যা তারা কোন দিনই ভোলেনি এবং যা তারা সেই দিন থেকে অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছে। জাতির ক্রম বিকাশের প্রতি পথে এই জনসভা বাস্তবিকই একটা সুস্পষ্ট অগ্রগতির ধাপ রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে, আর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের [illegible] হলেন এর সৃষ্টিকর্তা।

ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত গতিতে চলতেই থাকে। মিঃ গ্লাডস্টোন ভারতে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছিলেন। সেজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

একখানি পত্র দিলেন। সে পত্রের মুসাবিদা আমিই করেছিলাম, তিনি তা দেখে কিছু কিছু সংশোধন করেছিলেন। সেই মাননীয় ভদ্রলোক গ্লাডস্টোন সাহেব নিজের হাতে লিখে সেই পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন। পত্রখানা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের দপ্তরে খানায় রক্ষিত আছে। ১৯০১ সালে আমি যখন ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে অক্সফোর্ড ইউনিয়নে যাই তখন আমাকে মিঃ গ্লাডস্টোনের নিজের হাতে লেখা উক্ত ইউনিয়নের কার্য্য বিবরণী দেখান হয়েছিল। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, তিনি তখন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন না সেক্রেটারী ছিলেন, সুন্দর হস্তাক্ষর; ঝকঝকে এবং স্পষ্ট মোটা অক্ষরে লেখা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে তার লেখা যে পত্রখানা আছে তার লেখা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। বয়সের সঙ্গে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তারই সাক্ষ্য বহন করছে হস্তাক্ষরের এই পার্থক্য।

লর্ড রিপণের শাসনকালে প্রথমে যে কাজগুলি করা হয়, তার মধ্যে একটি ছিল এই ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট রদ করা। এই সময় একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্টকে সমর্থন করতে যারা খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তারাই আবার এই এ্যাক্টকে রদ করার সময় সেই রকমই উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। সিভিল সার্ভিসের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল নমনীয়তা, সঙ্গতি অসঙ্গতির প্রশ্ন সিভিল সার্ভিসের নীতির মধ্যে নেই। বিশ্বস্ততার সহিত উপর ওয়ালার হুকুম তামিল করাই হচ্ছে সিভিল সার্ভিসের কাজ। সাম্প্রতিক কালে বঙ্গ-ভঙ্গ সিদ্ধান্তের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে, সেই পরিবর্ত্তন সম্পর্কে সিভিল সার্ভিসের মনোভাবের আসলরূপ একটা সুন্দর দৃষ্টান্তে আমরা পাই। বঙ্গ-ভঙ্গ আইন সংশোধনের প্রবল বিরোধিতা করেছিল বাংলার সিভিলিয়ানরা। এরা কম বেশী পরিমাণে অনুভব করল যে এই সংশোধন এদের প্রেস্টিজের উপর একটা আঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। বঙ্গ-ভঙ্গ আইনরদ করার সুপারিশ ১৯১১ সালের ২৫ শে আগষ্ট তারিখে এক ডেসপ্যাচে পেশ হয়। সেই ডেসপ্যাচে যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের মধ্যে এমন একজন নাম করা বেঙ্গল সিভিলিয়ান আছেন যিনি বঙ্গভঙ্গকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে জড়িত ছিলেন, তা ছাড়া তিনি একটি সার্কুলার লেটারের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন সে সার্কুলার লেটারের মর্ম সকলেই জানেন। দেশ বিভাগের পরে যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতির জন্ম হয়েছিল তার আদি ইঙ্গিত বহন করছে এই সার্কুলার লেটার। দেশের নেতাদের এই কার্যকলাপের সঙ্গে কোন ঝগড়া নেই, কিন্তু তারা ভারতের সিভিলিয়ানদের আচরণের মধ্যে এটা লক্ষ্য করেছেন যে বিবেক প্রসূত কোন দৃঢ় বিচার বুদ্ধি হয়ত বা তাদের চাকরীর ক্ষেত্রে উন্নতির পথে বাধা বলে মনে হয় এবং এটাও লক্ষ্য করেছেন যে যারা তাদের উপরওয়ালা কর্ত্তা ব্যক্তিদের মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও মনের পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারেন, তাদেরই চাকরীতে উন্নতির সম্ভাবনা থাকে।

লর্ড রিপন ভাইসরয়ের কাজ গ্রহণ করায় ভারতবাসী স্বস্তিবোধ করল। লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়া শাসন ব্যবস্থা ভারতবাসীকে সচকিত করে তুলেছিল। এবং গণ-জীবনের মধ্যে একটা সাড়াও জাগিয়েছিল। রাজনৈতিক ক্রমাগ্রগতির ক্ষেত্রে দুই শাসন কর্ত্তারা অনেক সময় ছদ্মবেশে আশীর্বাদ বহন করে আনে। তারা গোটা সমাজকে নাড়া দিয়ে এমনভাবে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে যে বছরের পর বছর ধরে আন্দোলন করেও যে জাগরণ মেলেনা। তারা জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ প্রয়াস জাগ্রত করে যে যা শাসনের সুব্যবস্থাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন গণ-জীবনের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। গণ-জীবনের এই উদ্দীপনা সর্বকালীন হয়ে ভবিষ্যতের স্থায়ী উন্নতির প্রতিশ্রুতি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। লর্ড লিটন এই ভাবে নিজের অগোচরে এবং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাদের হিত সাধন করেছেন এবং তার পরে আরও নিকটবর্ত্তী কালে, সেই একই অর্থে; আর একজন হিতকারী রূপে দেখা দিলেন লর্ড কার্জন। তবে লর্ড কার্জন হয়ত আরও ব্যাপক অর্থে একজন হিতকারী রূপে গণ্য হতে পারেন।

(চলবে)

নেতৃত্ব

—কৌটিল্য

যে গণতন্ত্র বুর্জ্জোয়াদের তার সামান্যতম সুযোগটুকু কম্যুনিষ্টরা কিভাবে নিয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পর্য্যালোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। বুর্জ্জোয়াদের সব কিছু অবক্ষয়ের দ্বারা লয় প্রাপ্ত হচ্ছে। এবং সমাজকে বাকি বুর্জ্জোয়ারা অবিরাম সর্ব্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এই সর্ব্বনাশকে ঠেকাবার একমাত্র চাবিকাঠি প্রোলেতারিয় নেতৃত্বের কাছে আছে। এখানে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করে দেখবার, ভারতের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের তেজস্বী উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। পরদেশী শাসন মুক্ত হবার সেই তেজ ও ঔজ্জ্বল্য স্বতঃই নিস্তেজ হওয়ার সম্ভাবনা। বহু যুগের সঞ্চিত দারিদ্র্য চক্ষুর নিমেষে বীভৎস রূপ নিয়ে দেখা দিল। অগ্রসর ও অনগ্রসর দুই প্রান্ত সমাজ সহসা ঘুম থেকে উঠে খিদে এবং অতি-খিদের রোগে ভুগতে লাগল। এরই ফাঁকে প্রোলেতারিয় নেতৃত্বের স্বপক্ষে, শ্রেণীযুদ্ধের সমর্থনে একটি কূট যুক্তিজাল রচনা করে জাতীয় ঐতিহ্যের সবই নিন্দনীয় বলে প্রচার শুরু হলো। বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র নামক যে গণতন্ত্র সে কিন্তু এই ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন অন্য মতবাদকে গলা টিপে মারে নি। অন্য দেশের কথা এখানে আসে না। জাতীয়তাবাদী ভারত মতবাদ প্রচারের স্বাধীনতা হরণ করে নি। এদিকে জাতীয়তাবাদ বিমিয়ে পড়েছে। শাসন ও গঠনের দায়িত্ব মাথার উপর। "Produce or Perish" এই মন্ত্র নিয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে এগোবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে জাতীয়তাবাদ। এমন সময় ওঁরা লেগে গেলেন মগজ ধোলাইয়ের কাজে। গঠনের কাজ চির দিনই অপ্রিয়। কেননা এতে যে শ্রম বিনিয়োগ ও অর্থ বিনিয়োগ হয় তার পুরোটাই জাতিকে হিসেব করে দিতে হয় না। এদিক থেকে জাতীয়তাবাদ ধীরে অপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করল।

প্রোলেতারিয় নেতৃত্ব এক নয়া মানসিকতা সৃষ্টি যজ্ঞ শুরু করলো। পতঙ্গ যেমন আগুন দেখলে তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, এও অনেকটা তাই। আমাদের স্কুল কলেজের ছাত্র সমাজ কলেজের অধ্যাপক সমাজ, বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমাজ অংশবিশেষে ভাগ হয়ে, অনেকটা সেই রকমেই ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বিশ্বের সব সমাধান ওই এক আদর্শের মধ্যে নিহিত আছে এমন জায়গায়, সে আদর্শ কে না গ্রহণ করে? এরকম বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনে ইউ, জি, সি,-র টাকা, সাত'শ ষোল'শ গ্রেড, আর ছাত্রদের দাবীরত অন্ত নেই। ছাত্ররা গুরু মারা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে তাঁরা হলেন নোতুন কুলীন যাঁদের কিছুই বলবার জো নেই। বিশ্ব বিদ্যালয়ে, উৎপাৎ ঠেকাতে পুলিশ প্রবেশ করলে, পবিত্র গণতান্ত্রিক অধিকারের মাজা ভেঙ্গে যাবে। এই রূপ ভঙ্গুর উচ্ছৃঙ্খল গণতন্ত্র বুর্জ্জোয়াদের, আর এর সুযোগ নিচ্ছেন প্রোলেতারিয় নেতৃত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ে,ও বিদ্যালয়ের রঙ্গমঞ্চের ধারে কাছে প্রোলেতারিয়েতরা কোথাও-ও নেই। ভালহৌসী স্কোয়ার দুর্গের কক্ষে কক্ষে সাদা কলারের শ্রমিকরা সর্ব্বহারা লেজে গণ্ডা তেদী চীৎকার করছেন। এদের ভয়ে রাজ নৈতিক দলের নেতৃবৃন্দরা বেসামাল। এদের চাই বাসস্থান, ছেলের জন্য উচ্চশিক্ষা, ভাল মাইনে, ছেলের ভাল চাকুরী।

এদিকে ভারতের ষাট বছরের জাতীয়তাবাদ সাতচল্লিশ সালের (১৯৪৭) পর কেমন ঝিমুতে লাগল। এই ক্লান্তি ও বিভ্রান্তির যথাযোগ্য কারণ আছে। সে কারণ বিশ্লেষণ করে লাভ নেই। ঘটনা সত্য, তা নির্মম হলেও সত্য। নেহেরুজীর আমলে ভারত মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করে। ফলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনীতির সৃষ্টি হলো। জাতীয়তাবাদ এতেও খানিকটা চোট খেয়ে গেলো। দালিকানা অর্থনীতি, আর রাষ্ট্রীয়কৃত অর্থনীতি— দুই শুমীদ্বিত ব্যবধান পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে বাড়তে লাগল। আসলে সম্বন্ধ কিন্তু অহি-নকুলের মত, তাহলেও কেউ কাউকে ঘাটায় না এর ফল হলো, দুই ফ্রন্টের সৃষ্টি। নব্য হিন্দুবাদ (জনসঙ্ঘ) ও স্বতন্ত্র মিলে। স্বাধীন প্রতিযোগিতা-মূলক অর্থনীতির দাবী, অপর পক্ষে, সামাজিকী-করণ ও রাষ্ট্রীয়করণ অর্থনীতির দাবীদার অবিরাম নাম বদলের পার্টি সোস্যালিষ্ট পার্টি, আর খোদ আন্তর্জ্জাতিকতাবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি। এই দুয়ের টানে-পোড়েনে, ভারতের জাতীয়তাবাদ ঝিমন্ত, দ্বিধাগ্রস্ত।

ইয়োরোপের জাতীয়তাবাদে কিন্তু এই ঘটনা ঘটেনি। এর ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। জাতী-য়তাবাদের উগ্র অবস্থায় ইয়োরোপে যে ঐশ্বর্যবাদের মহিমা প্রচারিত হয়েছিল, তার মূল জমিন ছিল এশিয়া-আফ্রিকার উপনিবেশ। প্রথমে এটা শুরু হয় জলপথে দেশ আবিষ্কারের নেশা থেকে। এই নেশায় স্পেন, ইংরেজ, পর্তুগাল, ফরাসী, জার্ম্মানী কেউ যোগ দিতে বাদ যায় নি। অতএব প্রতি-যোগিতা একটা মহৎ গুণ হিসেবে জাতির মধ্যে দেখা দিল। আর এই প্রতিযোগিতার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছার অংশ অনেকখানি। সাগর বেয়ে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে ওরা। আর রাশিরা, চীন ডাঙ্গায় সৈন্য পাঠিয়ে, ব্যবসায়ীরাও সঙ্গে আছে, উপনিবেশ গড়েছে। পাঠান-মোগলেরা সৈন্য পাঠিয়ে রাজ্য বিস্তার করেছে। এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে, উপনিবেশ গঠন ও বাণিজ্য বৃদ্ধির অন্তরালে, একটি সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সমষ্টিগত ক্রিয়া রয়েছে, এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এই সমষ্টি-গত ইচ্ছাশক্তির রাজনৈতিক নাম জাতীয়তাবাদ। ভারতের জাতীয়তাবাদের রাজনীতিতে এই জাতীয় সমষ্টিগত ইচ্ছাশক্তি প্রকাশের সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না। সেই ঐকান্তিক ইচ্ছাবিহীন জাতীয়তাবাদ গঠনের দায়িত্ব ভারে নুয়ে পড়ল। সমাজ গঠনে যে শক্তি, সাহস প্রয়োজন তা যেন থেকেও নেই। তাই নেহেরু নীতিকে অনেকে হাঁটুভাঙ্গা নীতি বলতেন। এ মন্তব্য সবটাই সঠিক নয়। যাক সে অন্য আলোচনা।

একই জাতীয় ইচ্ছাশক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে একই সময় জন্ম নিতে পারে এমন দৃষ্টান্ত বহু ইতিহাসেই খুঁজে পাওয়া যাবে। ইচ্ছাশক্তি রাষ্ট্র-শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহত্তর সমাজকে বহু দূর টেনে নিয়ে যেতে পারে। আমেরিকার উপনিবেশ বিপ্লবের পর, ঐশ্বর্য্যের রেখা দেখা দিতে শুরু করে। আমাদের দেশে গল্প আছে সদাগরেরা চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে ভিন্ন দেশে বাণিজ্যের আশায় যেতেন। উদ্দেশ্য মুনাফা করা এবং অন্য দেশ থেকে সম্পদ এনে নিজ দেশকে ঐশ্বর্য্যশালী করা। বিশ্ব সমাজ কোন কালেও বণিক বৃত্তি থেকে মুক্ত ছিল না। এক দেশের পণ্য অন্য দেশে গেছে, এক দেশের কারিগরী বৃত্তি অন্য দেশে গেছে। এর দৃষ্টান্ত তো ইতিহাসে ছড়ানো আছে আজকে আধুনিক যুগে যার নাম হয়েছে 'Know how'

এই বিনিময়ের সূত্র ধরেই সমাজে ঐশ্বর্যবাদের মহিমা, দারিদ্র্যের আর্তনাদ দুটি যুগপৎ সৃষ্টি হয়েছে। এর একটি আর একটিকে ছাড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই এবং এর কোনটিই চিরন্তন নয়। কবিতায় বলে, 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়, আজ যে রাজা কাল সে ভিক্ষা চায়।' এটা নিতান্তই কথার কথা নয়। এর অভ্যন্তরে ইতিহাসের কালচক্রযান জীবন্ত এবং সজাগ রয়েছে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একদিন সূর্য অস্ত যেতো না আজ সেখানে সূর্য অস্ত যাচ্ছে ইতিপূর্বে আমরা ঐশ্বর্যের মহিমা ও দারিদ্র্যের আর্তনাদের কথা উল্লেখ করেছি—এই দুটি শব্দ অর্থগর্ভ। তার কারণ এই দুটি শব্দ অর্থনৈতিক অবস্থিতির প্রতিভূ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আজকে আধুনিক যুগে 'শোষণ' ও 'শাসন' যেমন বিশেষ অর্থলাভ করেছে, তেমনি 'মহিমা' ও 'আর্তনাদ' দুটি শব্দ জন্ম নিয়ে পাশাপাশি চলছে। পূর্বোক্তের সঙ্গে শেষোক্তের অহিনকুল সম্বন্ধ।

অথচ দেখা যাচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। যেখানেই সম্পদের মহিমা সেখানেই দারিদ্র্যের আর্তনাদ। এই পরস্পর অর্থনৈতিক অবস্থিতিকে অস্ত্র হিংসাশ্রয়ী করে তোলা যায়। বর্তমানের বাস্তব (সামাজিক ও অর্থনৈতিক) অবস্থা থেকে এর উদ্ভব বলে ব্যাখ্যা করা যায়। এবং এর সাময়িক সমাধান হিংসাশ্রয়ী দ্বন্দ্বের মাধ্যমে (শ্রেণীযুদ্ধ) সম্ভব। অনন্ত কাল ধরে যারা নীচে পড়ে আছে তারা ওপরে উঠবে—তাদের রাজত্ব সৃষ্টি হবে। আর ভারতীয় দর্শন একে জন্ম-জন্মান্তরের কর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দারিদ্র্য ও সম্পদকে প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের বিচারে কোনটা মানব জীবনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কোনটা নিকৃষ্ট—এ বিচার নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মাঝে একটি মেনে নেবার এবং মেনে না নেবার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। যাঁরা মেনে নেন, তাঁদের চিত্তে বিক্ষোভের কোন স্থান নেই। এর কারণ, আমার কর্মে অর্জিত যেটুকু সম্পদ সেটুকুই আমার অধিকার, যে যার কর্ম অনুযায়ী জাগতিক সুখ দুঃখ ভোগ করে। এর কারণ কোন ব্যক্তির জীবনই কোন খণ্ড কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অতএব জীবনচক্রে কোন সময় সুখ, কোন সময় দুঃখ ভোগ করতেই হবে। বস্তুবাদকে যারা মানব জীবনের অন্তিম রূপে স্বীকার করেছেন তাদের পক্ষে বিপদ হলো খণ্ড কালটা খণ্ড কাল নয়—ঐটেই সব। আদি এবং অন্ত কাজেই জীবনের আদি এবং অন্ত যখন (ঐতিহাসিক কালের) মধ্যে আটকা পড়েছে তখন এই খণ্ডকালের মধ্যেই সমাজ ব্যবস্থাটাকে পাল্টে ফেলতে হবে। সঞ্চিত সম্পদকে বাঁটোয়ারা করে দারিদ্র্যকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। কাজেই অবকাশ নেই, লাঠি-সোটা, সড়কি-বল্লম যা দিয়ে পারে শ্রেণী শত্রু অর্থাৎ সম্পদকে ধ্বংস কর। সমাজের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক অসম বণ্টনের কারণে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তাকে ওই লাঠি-সোটার পথে – (এর রাজনৈতিক নাম সশস্ত্র বিপ্লব) সমাধান করতে হবে।

(চলবে)

বিপ্লবী মহানায়ক

রাসবিহারী বসুর বিপ্লব প্রচেষ্টা

১৯১৪ সালের শেষের দিকে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। এই যুদ্ধে ভারতের জাতীয় শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জার্মান সাম্রাজ্য বাদীদের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে জড়িত হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘদিন গোপনে গোপনে প্রস্তুত হয়ে প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানরা প্রচণ্ড বিক্রমে ফরাসী দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফরাসীরা ছিল এই যুদ্ধে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতম সাথী। ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যেরা জার্মানদের সেই আক্রমণ কিছুতেই প্রতিরোধ করে রাখতে পারছিল না। সমগ্র পৃথিবীর আশঙ্কা হয়েছিল জার্মানরা খুব শীঘ্রই সমগ্র ফরাসী দেশ গ্রাস করে নেবে।

এই সম্ভাবনা প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় ইংরেজরা ভারতবর্ষ থেকে অতি সংগোপনে প্রায় সব দখলদারী ইংরেজ সৈন্য সরিয়ে ফরাসী দেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে শোনা গিয়েছিল যে, সেই সময়ে যে অতি সামান্য সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য ভারতবর্ষে ছিল তাদের বেশীর ভাগই ছিল স্বেচ্ছামূলক দেশরক্ষা বাহিনীর নতুন ভর্তিকরা তরুণ শিক্ষার্থী" (new-recruits of the Territorial Force). এই খবরটি ভারতের ইংরেজ সরকার সেই সময়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে সকলের কাছে গোপন করে রেখেছিল।

ঠিক সেই সময়ে যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত দেরাদুনের সরকারী বন বিভাগের অফিসে কাজ করতেন চন্দননগরের অধিবাসী রাসবিহারী বসু নামে একজন বুদ্ধিদীপ্ত, বিচক্ষণ, অসম সাহসী বিপ্লবী যুবক।

ইংরেজ আমলে এই শৈল সহর দেরাদুন ছিল ভারতের সমর বিভাগেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। রাসবিহারী বসু গোপন সূত্রে জানতে পারেন যে ইউরোপে যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ থেকে প্রায় সকল ইংরেজ সৈন্যকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং দখলদার হিসাবে যে পরিমান ইংরেজ সৈন্য তখন ভারতবর্ষে রয়েছে তাদের সংখ্যা যথার্থই অকিঞ্চিতকর। ভারতীয় জনগণের পক্ষে মুক্তি প্রচেষ্টার এই স্বর্ণ সুযোগ হেলায় হারাতে রাসবিহারী বসু কিছুতেই সম্মত হলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন অতি বিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য এবং সক্ষম সহকর্মীর সহায়তায় প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের সকল ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে ও তাদের সংগঠিত করবার কাজে তৎপর হয়ে উঠলেন।

রাসবিহারী বসু পরিকল্পনা করেছিলেন ঐ পরিস্থিতিতে যদি ইংরেজদের অধীনস্থ দেশীয় সিপাহীরা ১৮৫৭ সালের ন্যায় আর একবার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বিদ্রোহ আরম্ভ করে তাহলে ঐ বিদ্রোহকে ইংরেজরা সেই অবস্থায় কিছুতেই রোধ করতে পারবে না। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে রাসবিহারী বসু এবং তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী ও অনুরাগীরা ও অনুগামীরা অবিলম্বে সমগ্র উত্তর ভারতের প্রায় প্রতিটি দুর্গ ও সৈন্য ছাউনীর (Cantonment) দেশীয় সিপাহীদের সঙ্গে অতি গোপনে ও নিপুনতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রের বহু সংখ্যক দেশীয় সিপাহীদের স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে নির্দিষ্ট একটি দিনে ভারতের মুক্তি অর্জন প্রচেষ্টায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং সংগ্রাম করতে তাদের অনুপ্রাণিত করেন।

এলাহাবাদ, বেনারস, রামনগর, জবলপুর, সেকরোল, লাহোর, আম্বালা, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, মীরাট ও আরও বহু ছাউনীর ভারতীয় সৈন্যেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে অথবা বিদ্রোহের সূত্রপাত হলে ঐ বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে সম্মতি দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, লালা হরদয়াল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ওবেদুল্লা, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, তারকনাথ

দাস প্রমুখ যে সকল ভারতীয় বিপ্লবী সেই সময়ে ইওরোপে ছিলেন, এবং যারা জার্মানিতে ছিলেন তারা জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ভারতীয় জনগণের সাধারণ গ্রেট ব্রিটেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য জার্মান সরকারের সাহায্যের আবেদন জানান। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইওরোপে খুব বিপদগ্রস্ত সেই সময়েই ব্রিটেনের অধীনস্থ ভারতীয় উপনিবেশের জনগণের মুক্তি প্রচেষ্টার সুবর্ণ সুযোগ। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মান সরকারের কাছে সাহায্য দানের, বিশেষ ভাবে অস্ত্র সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। ঐ যুদ্ধের সময়ে ইংরেজরা ভারতবর্ষ থেকে কল্পনাতীত পরিমাণে সম্পদ ও লোকবল নিয়ে গিয়ে ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছিল তার ফলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা যথার্থই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে স্থির করেন যে যদি গোলমাল এবং অরাজকতা সৃষ্টি করে দেওয়া সম্ভব হয়, তা হলে ভারত থেকে যে অবিশ্বাস্য পরিমাণ সমর সম্ভার ও "কামানের খোরাকের" (Cammon fodder) অফুরন্ত স্রোত অবিরাম ইওরোপে চলেছে তা রোধ করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। এই কথা মনে করে জার্মান শাসকেরা ভারতীয় বিপ্লবীগণের আবেদনে খুব আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দেয়।

জার্মানীর সহায়তায় ভারতীয় বিপ্লবীরা তুর্কী ও আফগান সরকারের সঙ্গেও সেই সময়ে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং পরিকল্পিত ভাবে ভারতের আসন্ন গণবিপ্লবের সমর্থনে ঐ দুই দেশের সরকারের কাছ থেকেও নানাবিধ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি অর্জন করে। মোটামুটি ভাবে স্থির হয়েছিল জার্মান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের যথাসম্ভব সত্বর প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র সাহায্য করবে এবং সেই অস্ত্র ভারতের উপকূলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। ভারতীয় জনগণের সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় তুর্কী সরকার প্রকাশ্য ভাবে সমর্থন জানাবে, যার ফলে ভারতের ব্যাপক সংখ্যক মুসলমান অধিবাসী ঐ বিদ্রোহে যোগ দিতে উৎসাহিত বোধ করবে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য অগ্রসর হয়ে আসবে। আফগান সরকার সম্মত হয়েছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করে ভারত আক্রমণের ভীতি সৃষ্টি করবে যার ফলে ইংরেজ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে সৈন্য ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে স্থানান্তরিত করে ঐ অঞ্চলকেই শক্তিশালী করে তুলবে এবং তার ফলে ভারতের অন্যান্য সকল অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের শক্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে এবং দেশীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা দমন করবার সামর্থ্য বহুলাংশে দুর্বল হয়ে পড়বে।

ঠিক ওই একই সময়ে আমেরিকা, কানাডা, চীন ও দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে পাঞ্জাবের যে বহু সহস্র অধিবাসী ছিলেন, তারাও গদর পার্টির অনুপ্রেরণায় আসন্ন বিদ্রোহ অংশ গ্রহণের জন্য দ্রুত ভারতে চলে আসতে আরম্ভ করেন। গদর পার্টি কতৃক অনুপ্রাণিত হয়ে বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং, প্রভৃতি স্থানের ইংরেজদের অধীনস্থ শিখ ও মুসলমান সৈন্যরাও ভারতবর্ষের সিপাহীদের সঙ্গে একই সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঐ সকল কেন্দ্রে ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে নেবার জন্য পরিকল্পনা করেন ও তদনুযায়ী বাস্তব অবস্থা গড়ে তুলবার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী দেশীয় সিপাহীদের যুগপৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করবার দিন রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে স্থির হয়েছিল ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। দুর্ভাগ্যবশত এই নির্দিষ্ট দিনের অল্প কিছুদিন পূর্বেই মীরাটি ছাউনীর একটি দুর্বলমনা সিপাহী এই কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়। রাসবিহারী বসু এই দুঃসংবাদের খবর পেয়েই নতুন করে বিদ্রোহের দিন স্থির করেন ১৯শে ফেব্রুয়ারী। কিন্তু সরকার এই নতুন সিদ্ধান্তের কথাও জানতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গেই যেমন ব্যাপকভাবে ধর পাকড় আরম্ভ করে বহুশত বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আবদ্ধ করে ফেলে, ঠিক তেমনি যে সকল দেশীয় সৈন্যবাহিনী এই পরিকল্পিত বিদ্রোহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা

১৬ পাতায় দ্রষ্টব্য

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীকীরোদ দত্ত

পুলিনবাবু যেদিন সুমিত্রা থেকে ঢাকায় ফিরে এলেন সেই দিন থেকেই পুলিশের কর্মতৎপরতা আরও বিশেষ ভাবে বেড়ে গেল। তারা দিনে একবার এবং রাত্রিতে দুবার এসে পুলিনবাবুর সন্ধান নিয়ে যেতেন এবং সমিতি নিবাসে কে কে আছে তারও সন্ধান নিতেন। এই সময় কলকাতা থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি চিঠি লিখে পুলিনবাবুকে জানালেন গভর্ণমেণ্ট অনুশীলন সমিতির কয়েকজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে কোন অজ্ঞাত স্থানে আটক করে রাখবেন। দলের বিশিষ্ট কর্মী নরেন সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশাঙ্ক সেনও পুলিনবাবুর নিকট অনুরূপ এক চিঠি লিখলেন এবং তাঁকে আত্মগোপন করতে বললেন। কিন্তু পুলিনবাবু এই সময় আত্মগোপন করা সমীচীন মনে করলেন না। তবুও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিশিষ্ট কর্মীদের তিনি গোপনে নানাস্থানে পাঠিয়ে দিলেন। শিশির গুহকে তিনি পাঠালেন ভূটান সীমান্তে সিসমি পাহাড় অঞ্চলে। তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থাদি দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হল ঐ অঞ্চলে স্বাধীন অথচ ভারতের মধ্যে গুপ্তকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিশিরবাবু সেদিন চলে গেলেন তার দু-তিন দিন পরেই একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ দুই তিন শত সৈন্য এসে সমিতি নিবাস ঘিরে ফেলল। তারা দরজা ভেঙেই ভিতরে প্রবেশ করল। পুলিনবাবু গ্রেপ্তার হলেন। সমিতির অন্যতম কর্মী এবং পুলিনবাবুর সহকারী নৃপেশ নাগও ঐ দিনই গ্রেপ্তার হন। পুলিনবাবুকে পাঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টেগুমারী জেলে আটক রাখা হয়। এক বছরের কিছু অধিককাল পুলিনবাবু বন্দী ছিলেন। মণ্টেগুমারী জেল থেকে মুক্তিলাভের পুলিনবাবু পি মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। পি মিত্র অপ্রত্যাশিত ভাবে পুলিনবাবুকে পেয়ে তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন এবং তাঁর পত্নী এসে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। মুক্তি পেয়ে পুলিনবাবু যখন কলকাতা আসেন তার কয়েক দিন আগেই অরবিন্দ ঘোষ আলিপুর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন। তিনি পুলিনবাবুকে ডেকে পাঠান এবং পুলিনবাবু তাঁর সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। তিনি পুলিনবাবুকে বলেন যে বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলি একসঙ্গে কাজ করলেই জাতির কল্যাণ হবে। পুলিনবাবুরও অরবিন্দের এই মত সমর্থন করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বলেন যে ঢাকায় গিয়ে শীঘ্রই যেন কলকাতায় একবার চলে আসেন। তখন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

পুলিনবাবুর কলকাতা অবস্থান কালেই একদিন সুবোধ মল্লিকের ভবনে সমিতির কর্মপরিচালনা সম্পর্কে এক বৈঠক হয়। ডাকাতির দ্বারা অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব কি-না ঐ বৈঠকে সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। কেহ কেহ এ প্রস্তাবে আপত্তি করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাকাতির সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং সকলের আপত্তি খণ্ডন করেন।

ঢাকায় ফিরে পুলিনবাবু উৎসাহের সঙ্গে বিপ্লবী সমিতির কাজ আরম্ভ করলেন ক্রমে কর্মী সংখ্যাবৃদ্ধি পেল এবং তাদের নানা জনহিতকর কাজে নিয়োগ করা হতে লাগল এর ফলে ঢাকার অধিবাসীগণ পুলিনবাবুর এবং তার সমিতির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠলেন। তাদের কাছ থেকে কিছু অর্থ সাহায্যও পাওয়া যেতে লাগল কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ নগণ্য। এদিকে সমিতির কার্যক্রমও ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল এবং ছোট ছোট দুই একটা ডাকাতি করে প্রয়োজন মিটানো হতে লাগল। এই সময় মুন্সিগঞ্জ মৈমনসিংহে একটি বৃহৎ আঙ্গিনাযুক্ত বড় টিনের-ছাড়ী সমিতি নিবাসের জন্য পাওয়া গেল। প্রায় সত্তর জন কর্মী সমিতির সর্বক্ষণের কর্মীহিসাবে এখানে বাস করতে লাগলেন। সমিতির দরজায় পালা করে কর্মীরা পাহারা দিতেন। বিনা অনুমতিতে সমিতি নিবাসে কেউ প্রবেশ করতে পারতনা। সমিতি নিবাসেই কর্মীরা লাঠি খেলা প্রভৃতি করতেন এবং দৈনন্দিন সমস্ত কাজ কর্মও করতেন। কর্মীদের মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক কর্ম নির্দিষ্ট ছিল। হাটবাজার গৃহসজ্জিনা প্রভৃতি পরিষ্কার, ধুপ দেবার ব্যবস্থা কর্মীরা নিজেরাই করতেন। ভোর পাঁচটায় ঘণ্টা ধ্বনি করে সকলকে তুলে দেবার ব্যবস্থা

ছিল। পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে সমবেত ভাবে সকলে দাঁড়িয়ে স্তোত্র পাঠ করতেন দশাবতার স্তোত্র, গুরুপাদুত, ভগবতী, সরস্বতী, শিব নারায়ণ এবং মাতৃভূমির স্তোত্র ও পাঠ করা হত। প্রত্যেক সন্ধ্যাই নির্দিষ্ট পরিমান ছোলা এবং কাঁচা হলুদ, আদা, লবন এবং গুড় সহযোগে আহার করতেন। পুলিনবাবু সকলের আহার না হলে সাধারণত আহার করতেন না। কর্মীদলকে কেউ বাইরে থাকলে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত পুলিনবাবু আহার করতেন না। কারও বাড়ী থেকে কিছু খাবার এলে তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত।

সমিতি নিবাসের নাম রাখা হয়েছিল বস্ত্রপুরী। কর্মীরাও নিজেদের বস্ত্রী বলে পরিচয় দিতেন। ঋষিটী মুনির অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরী হয়েছিল তাই বজ্র চূড়ান্ত ত্যাগের নিদর্শন। দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্য সংহারকালে বজ্র প্রয়োগ করেছিলেন তাই বজ্র শক্তিরও অনন্য নিদর্শন। সমিতির কর্মীগন পড়াশোনাও করতেন সমিতি সংলগ্ন পাঠাগারে গীতা, রামায়ন, মহাভারত এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, বঙ্কিম সাহিত্য, সামাজিক এবং রাজনীতির গ্রন্থাদি, জীবনী এবং ইতিহাস প্রভৃতি সতেরশত পুস্তক ছিল। দুপুরে পুলিনবাবু নিজেই কর্মীদের সঙ্গে লাঠি, ছুরি যুযুৎসু প্রভৃতি খেলতেন। রাত্রির আহারের পরে সন্ধ্যাগ্রহণ করা এবং দণ্ডঘটিকার মধ্যে নিদ্রা সমিতির কর্মীদের পক্ষে বিধান ছিল।

(চলবে)

(১৪ পাতার পর)

পরোক্ষভাবে জড়িত আছে বলে তারা সন্দেহ করেছিল, সেই সকল সৈনাবাহিনীকেও তৎক্ষণাৎ বহু দূরে বদলী করে দিয়ে তাদের সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে ফেলবার চেষ্টা করেছিল।

ভারতবর্ষে দেশীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা এই ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্তর্গত বহুসংখ্যক দেশপ্রেমিক, সাহসী, উদ্যোগী এবং অনুপ্রাণিত বীর সৈনিক এই সময়ে ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়ে যান ও সামরিক আদালতে সরাসরি বিচারের সম্মুখীন হন।

সিঙ্গাপুরে সেই সময়ে "পঞ্চলাইট্‌ইনফেন্ট্রি" নামে একটি মুসলমানপ্রধান ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল। ঐ বীর মুসলিম সৈন্যেরা ইংরেজদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিতে রাজী হলেন না এবং বিদেশী ইংরেজ শত্রুরা আঘাত করবার পূর্বেই নিজেরাই অকস্মাৎ প্রচণ্ড-ভাবে আঘাত করে সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশদের শাসনব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) তারিখে তারা বিদ্রোহ করে সিঙ্গাপুরের রাজীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে দখল করে নেয়। ভীত-সন্ত্রস্ত ইংরেজদের কিছু প্রাণভয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়, কিছু বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, কিছু সংখ্যক সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রাণ হারায়।

তিন দিন সিঙ্গাপুর বিদ্রোহীদের দখলে ছিল। তারপর একটি জাপানী ও একটি ফরাসী যুদ্ধজাহাজের সাহায্যে ইংরেজরা সিঙ্গাপুর পুনরায় দখল করে নেয়। তারপর আরম্ভ হয় ইংরেজদের প্রতিহিংসাপূরণ। বিদ্রোহীদের ত্রিশজন নেতাকে ফাঁসির মঞ্চে হত্যা করা হয়, ৩৮ জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং পঞ্চলাইট-ইনফেন্ট্রি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। বহু মানুষকে যাবজ্জীবন দীর্ঘ কারাদণ্ড দিয়ে আটক করে ফেলা হয়।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাঞ্জাবেও প্রচণ্ড ধর-পাকড় হয় এবং কয়েকশত মানুষকে কয়েকটি ষড়যন্ত্র মামলার অন্তর্ভুক্ত করে সরাসরি বিচার করা হয়। এই ভাবে বিচার প্রহসন করে রক্তপিপাসু ইংরেজরা একমাত্র পাঞ্জাবেই ২৮ জনকে ফাঁসির মঞ্চে হত্যা করেছিল এবং অভাবিত ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন অথবা দীর্ঘ কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

RegdNo. R. N .24511/71 Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

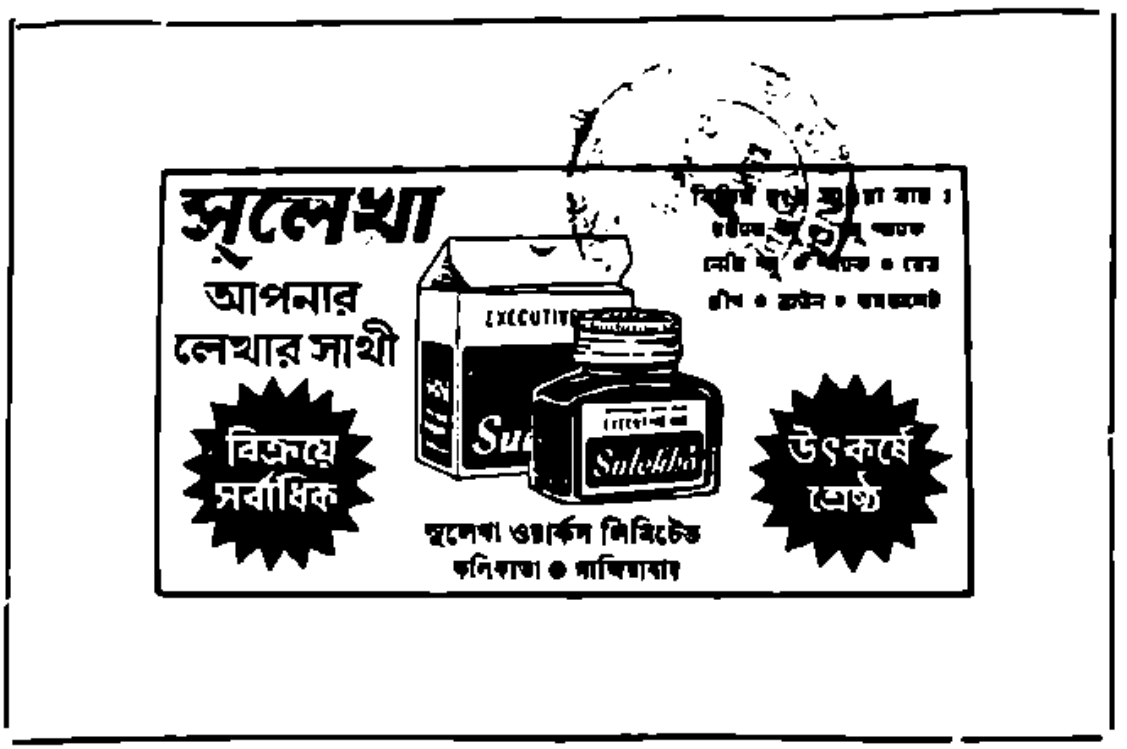

31 MAY 1978

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীসাধি পদ রায়চৌধুরী
বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতার—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীদীপ্তি গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩০০০১
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ ২৭শে মে, ১৯৭৮	৩৫ নয়া

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

এই সংখ্যায়

ভারতবর্ষের রাজনীতি কোন মোড় নিবে

। শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র দাস

নেতৃত্ব

। কৌটিল্য ।

দেও ফিরে রাম রামরাজ্য

। শ্রীনগেন্দ্রভূষণ সেন

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক নলিনী মোহন লাহিড়ী ।

শ্রমশিল্পে আগ্রহ সৃষ্টির উপায়

। মনয় ঘোষ

"আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের যুবকেরা যদি সংঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক অত্যাচার ও দেশের অনাচার নিবারণের জন্য বদ্ধ পরিকর হন তাহা হইলে অনতিবিলম্বে আমাদের সামনে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।"

—সুভাষচন্দ্র

ভারতবর্ষের রাজনীতি কোন মোড় নিবে?

শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস

রাজনীতি সাধারণতঃ সোজা সরল পথে চলে না। আঁকা বাঁকা পথেই এগিয়ে চলে। কিন্তু এই আঁকা বাঁকা পথেও নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে। বিংশ শতকের শেষ পাদে পৌঁছে রাজনীতি যে নিমুন মোড় নিতে শুরু করেছে। যেমন ইথোপিয়ার কমিউনিষ্ট বিপ্লবের রক্তাক্ত সংঘাত, আফগানিস্থানে মস্কোপন্থী পিপলস্ ডেমোক্রাটিক পার্টির সরকার গঠন, ভারতবর্ষের রাজনীতিতেও দেখা যায় দীর্ঘ ৩০ বৎসর একই ধারায় চলার পর হঠাৎ রাজনৈতিক তরাটে একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল। উদ্ভূত দল জনতা পার্টি। গত নির্বাচনে উত্তর ভারতে কংগ্রেস প্রায় লোপ পেয়ে গেল। কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজনারায়ণের নিকট বিপুল ভোট পার্থক্যে পরাজিত হল। এই জন উচ্ছাস ও আশীর্বাদ নিয়ে জনতা দলের শাসন আরম্ভ হল। জনতা দলের ১৪ মাস শাসনের পর দেখা যায় জনতাদলের উপর দেশের মানুষ যে গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছে জনতাদল সেই কর্তব্যপালনে উদাসীন। নেতৃবর্গ নিজেদের গোষ্টি ও গদি সংরক্ষণে সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে আসতে পারছে না। গ্রুপ রাজনীতি প্রত্যেককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। প্রথমেই শুরু করা হল বর্তমান শাসক পার্টি জনতাদলের ঘরোয়া ব্যাপার ও দেশের পরিস্থিতির আলোচনা।

গণতন্ত্র ও গান্ধীবাদের মহৎ আদর্শের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনতাদল ১৯৭৭ সালের মার্চ্চ মাসে কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষমতা দখল করেছেন। গত চৌদ্দ মাসের শাসনেই দেখা যায় সেই আদর্শ ও প্রতিশ্রুতি ম্লান হয়ে গেছে। কোন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। সেই দিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিজেদের বিভেদ ও বিরোধ নিয়েই নেতারা ব্যস্ত। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রি দেশাই মহারাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিং, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম, স্বাস্থ্য মন্ত্রী রাজ নারায়ণ, দলের সভাপতি চন্দ্রশেখর, বিদেশ মন্ত্রী অটল বিহারী বাজপাই, পার্টি সেক্রেটারী নানাজী দেশমুখ এবং পশ্চিমবঙ্গের পার্টি প্রধান প্রফুল্ল চন্দ্র সেন প্রমুখকে কেন্দ্র করে এত বিরোধ চলছে যে সর্বভারতীয় পার্টির পক্ষে এর চেয়ে আত্মঘাতী আর কি হতে পারে। পাঁচটি দল একত্র হয়ে কংগ্রেসের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিরোধ করার জন্য জনতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পাঁচটি দল, একটি দলে পরিণত হবে, কোন দলেরই কোন অস্তিত্ব থাকবে না। এই পাঁচটি দলের আদর্শ, চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি সবই পৃথক। জনসঙ্ঘ, লোকদল, আদিকংগ্রেস সোসিয়েলিষ্ট এবং সংযুক্ত বাঙালী দল ও সি, পি, আই (এম) একই পদ্ধতিতে চলা কি সম্ভব এমার্জেন্সির তাড়াতাড়ি দলগুলি আত্ম স্বার্থসিদ্ধির জন্য একত্র হয়েছিল নেতারাও ইহা জানেন এবং বুঝেন কেনেও এমার্জেন্সি বৈতা উৎখাতে জনতাদলকে সুসংহত করার জন্য পাঁচটি দল একটি দলে পরিণত হবে এই প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু বিগত চৌদ্দ মাসেই নেতাদের যার যার দল রক্ষার্থে নিজেদের আচরণ ও স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে, জনতার নিকট প্রতিশ্রুতি তলিয়ে গিয়েছে।

জনতা দলের শক্ত মানুষ চরণ সিং প্রধান মন্ত্রীর পুত্র কান্তি দেশাইর কাজকর্ম ও কাণ্ডকারখানা নিয়ে তদন্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, প্রধান মন্ত্রী এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। হরিজনদের উপর অত্যাচারের ব্যাপারে চরণ সিং এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দোষারোপ হওয়ায় চরণ সিং পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। সম্প্রতি বন্দীর পর থেকে ইস্তাফা দিয়ে চরণ সিং [illegible] সরকারকে সহকর্মীদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চরণ সিং এর অভিযোগে হরিয়ানার মুখ্য মন্ত্রী দেবীলালকে সরাবার প্রচেষ্টার পিছনে দিল্লীর বড় বড় মাথাওয়ালারা রয়েছে। বিগত কারনাল নির্বাচনে জনতা দলের পক্ষে প্রার্থী ছিলেন চরণ সিং এর লোক, তাঁকে হারাবার জন্য এই সব নেতারা উদ্যোগী হয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবাহুগুণ যাদবকে সরাবার জন্যও দিল্লী থেকে কলকাঠি নাড়া হচ্ছে। বিহারে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য চাকরীর আসন সংরক্ষণে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে মত্ত হয়েছে জনতা দলের একাংশ। চরণ সিং এই সব অভিযোগ প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন। চরণ সিং, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রামকে জনতা দলের লোকই মনে করেন না এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের জনতা দলের সভাপতি কতবার যে পরিবর্তন করলেন ইয়ত্তা নাই। বিভিন্ন রাজ্যেই জনতা দলের মধ্যে কম বেশী ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগে আছে। ইহা উপলব্ধি করেই জনতা দলের অন্যতম সম্পাদক শ্রীনানাজী দেশমুখ বৃদ্ধ নেতাদের সংকীর্ণ পথ ছেড়ে দলের সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগের প্রস্তাব তুলেছেন। এতে মনে হয় জনতার ভিতরে শক্তির পুনর্বিন্যাস দ্বারা ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য একটা চাল সৃষ্টি করাই চরণ সিং এর বর্তমান দলীয় পদ হতে পদ ত্যাগের উদ্দেশ্য, কারণ চরণ সিং জানেন তাঁকে অসন্তুষ্ট করে দল রাখা সম্ভব হবে না।

জনতা পার্টির বিভিন্ন গ্রুপ জনসঙ্ঘ, বি, এল, ডি, আর্য, কংগ্রেস, লোসিয়েলিষ্ট, গণতন্ত্রী কংগ্রেস প্রভৃতি নেতাদের মধ্যে অনেকে বিবাদ হতে বাইরে থেকটা আরও ভয়াবহ এবং কংগ্রেসী আমল হতে অধিকতর শোচনীয়। গত এক মাসে সারা ভারতে মোট ৩০০ জন ব্যক্তি মারা গেছেন পুলিশের গুলিতে। ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত এই হিসাব দিয়েছেন কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। গত, ত্রিশ বৎসরের স্বাধীনতার আমলের ইহা উচ্চতম। উত্তর প্রদেশের গত জুন মাস থেকে ৩৮ বার গুলি চলেছে। গত ৫ই এপ্রিল মধ্য প্রদেশের খাইলাডিলার শ্রমিক বস্তির উপর যে বর্বরতা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন ভারতে তার নজির নাই। ট্রেড ইউনিয়ান ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বিক্ষুব্ধ অঞ্চল ঘুরে এসে বলেছেন পুলিশবাহিনী সমস্ত বস্তি অঞ্চল ঘিরে রেখে প্রথমে শ্রমিক স্ত্রীলোকদের উপর বলাৎকার করে এবং পরে বস্তি এলাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়। কত শ্রমিক এইভাবে অগ্নিদগ্ধে প্রাণ হারিয়েছে বলা কঠিন। বেসরকারী মতে মৃতের সংখ্যা ২০০ থেকে ৫০০ মধ্যে। কেহ কেহ এই হত্যাকাণ্ডকে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। পুলিশের অনুহাত খনির কর্তৃপক্ষ শ্রমিকরা মারমুখী হয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে, একজন ষ্টেন্ড কনষ্টেবল মারা যায় এবং দুইজন পুলিশের একটি করে চোখ নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য পুলিশ আত্মরক্ষার গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল। বস্তির মধ্যে অগ্নিদগ্ধে আবদ্ধ হতভাগ্যরা জঙ্গলে পালাতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাতেও তারা ত্রাণ পায় নাই। উত্তর প্রদেশে পদমনগরে ও শ্রমিকদের উপর অনুরূপ পৈশাচিক আক্রমণ হয়েছে। নিহত ও আহত শ্রমিকদের একসঙ্গে ট্রাকে বোঝাই করে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে অথবা সাক্ষ্য লোপ করার জন্য কোন অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে লাশ গুম করা হয়েছে। অনুরূপ বর্বরতা হরিজনদের উপরও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৭৭ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এই তিন মাসে উত্তর পূর্ব ভারতের ৯টি রাজ্যে ১৭১৬টি হরিজন নির্যাতন ঘটনা ঘটেছে এবং একমাত্র উত্তর প্রদেশেই ১৩৮২টি ঘটনা ঘটেছে। অনুরূপভাবে ১৯৭৭ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বরের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের ১০৫টি হরিজন খুন হয়েছে। গত বৎসর বিহারে বেলগাছিতে একজন শিশুসহ ১২ জন হরিজনকে জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তাছাড়া কানপুরে শ্রমিক নিধন এবং বারানসীতে মদনপুরায় বস্তিতে সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা হয়েছে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে হায়দারাবাদেও বিভৎস কাণ্ড ঘটে গেছে। একজন সাধারণ সম্পত্তি রাতে নিমেষা দেখে বাড়ী ফিরছিলেন। পথিমধ্যে তাদের বাড়ে, অনুহাতে গ্রেপ্তার করে। পরের দিন থানা হাজতে স্বামীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং স্ত্রীলোকটি ধর্ষিতা হয়। এই অত্যাচারের খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা

নানাস্থানে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের আক্রমণে ১২ জন নিহত হয়। উপরে শ্রমিক, চাষীরা, ছাত্রসমাজ, সাধারণ মানুষ ও সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ ও নিপীড়নের যে সমস্ত উল্লেখ করা হয়েছে, কোন কোন সংবাদপত্রে সেই সমস্ত সংবাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এ গুলি যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয় তার প্রমাণ স্বয়ং রাষ্ট্রপতি শ্রী সঞ্জীব রেড্ডি এই সমস্ত নৃশংস সংবাদে বিচলিত হয়েছেন এবং সরকারের সমালোচনা না করার প্রচলিত পদ্ধতি ব্যতিক্রম করে প্রকাশ্য বক্তৃতায় প্রশ্ন তুলেছেন 'আমরা কোথায় আছি, আমি রাষ্ট্রপতি হয়েও জানি না'। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই রাষ্ট্রপতির সরাসরি এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে প্রকাশ কিন্তু অবস্থা প্রধান মন্ত্রীর আয়ত্তে নাই। প্রধানমন্ত্রী অসহায়ভাবে নিরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে মন্ত্রীর গদি রক্ষা করে চলেন মাত্র। কিন্তু এইভাবে গদি রক্ষা করা কি সম্ভব হবে? চরণ সিং চুপ করে যাওয়ার লোক নয়। চরণ সিং নিজের ক্ষমতার লড়াইয়ে এগিয়ে চলবেই।

জনতা পার্টির মতভেদ যে কত। আশা করা হয়েছিল জনতার অকুণ্ঠ সমর্থনে নিজেদের মতভেদ ভুলে গিয়ে দেশকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে জনতা দল চলবে কিন্তু চৌদ্দ মাসের শাসনের মধ্যেই পার্টির নেতৃত্বের অবস্থানগুলে নানা বিষয়ে মতভেদ পুঞ্জীভূত হয়ে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে মনোনিবেশ করার সময় কোথায়। নিজেদের স্বার্থ ও পার্থক্য ভুলে ৭ই নেতাদের বর্তমান রাজনীতি। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ইন্দিরা পার্থক্য, কংগ্রেস ছেড়ে যাঁরা জনতা পার্টিতে আসতে ইচ্ছুক তাদের গ্রহণ করা প্রশ্নে মতভেদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে পার্থক্য, সংসদীয় নির্বাচন প্রণালী নিয়ে মতভেদ, মত পার্থক্য চরমে সংরক্ষণের প্রশ্নেও সব চাইতে ধ্বংসাত্মক দল নেতারা নিজের নিজের ক্ষমতার ঘাঁটি শক্ত করার জন্য গোপনে গোপনে চেষ্টা করছেন ও পরস্পরের প্রতি সন্দেহ। এই সব প্রশ্ন, মতান্তর ও সংশয়, কেবল মাত্র সংসদের দ্বারা মীমাংসা হতে পারে না। তাই মীমাংসা হবে না, আপাতত জোড়া তালি চলতে পারে। কারণ যে দলগুলি নিয়ে জনতা দল গঠিত সেই সমস্ত দলের ডিগবাজীরা ও গোষ্ঠিতন্ত্র নেতারা বিসর্জন দেয় নাই যার যার দলের শক্তি বৃদ্ধি করার কৌশল হিসাবে জনতা সাজিল হয়েছে, কাজেই মতভেদ থাকবে, ভিন্ন মত দেখা দিতে পারে, শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরণ ঘটবে চুপসে যাবে জনতাদল যেমন। অগ্নিগর্ভ আবহ, নিঃসঙ্গ, বিরোধ, ক্লান্ত, হোঁচট ছাড়া কোন পথ খুঁজে পাবে না। কিন্তু রাজনীতিতে কিছু বলা যায় না। জনতা কাকে নেতা-রূপে বরণ করে নিবে অপেক্ষা করুন। রাজনীতি কোন মোড় নিবে?

[চলবে]

যাবতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র
প্রস্তুতকারক শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
শ্রীকণ্ঠ কুটীর • কুলন পুকুর • আগরতলা • ত্রিপুরা

নেতৃত্ব

—কৌটিল্য

ভারতীয় রাজনীতিতে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা আজ থেকে বহু পূর্ব্বেই আছে। ভারতীয় রাজনীতি সে পন্থা গ্রহণ পরাঙ্মুখ, এমন কথা ইতিহাস বলে না। ইতালির গ্যারিবল্ডি, কাভুর। ফরাসী বিপ্লব এসব ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রেরণা জুগিয়েছে। ইতি পূর্ব্বকার বিপ্লবী সমাজ ও তাদের নেতৃত্ব বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করবার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। এদের জীবন দর্শন, দেশ ও দেশ মাতৃকার সেবা। পাঠক লক্ষ্য করবেন, এখানে 'সেবা' কথাটার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আর এক 'স্থিতিবান রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিদ্রোহ করা আর এক। কিন্তু একবার যদি রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশের সব মানুষকে জাগিয়ে তোলা যায়। তবে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিদ্রোহ আপনা থেকেই শুরু হয়। রাষ্ট্রচেতনা সবাইকেই গড়ে পিটে একরকম মানুষ করে। সেই মানুষ গড়ার কাজটা ভারতীয় বিপ্লবীদের কাঁধে চেপেছিল। মানুষকে ভালবাসা এবং দেশের সবকিছুকে ভালবাসাই ছিল এদের মহামন্ত্র। এই মহামন্ত্র জপ করতে গেলে আত্ম বৈরাগ্য চাইত তার সঙ্গে ত্যাগ তিতিক্ষা রয়েছে-ই। ভারতে জাতীয়তাবোধের আমদানী বিদেশ থেকে, বিপ্লবের আদর্শ সফল করার চেষ্টা সে-ও বিদেশ থেকে আমদানী। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবীদের এর মধ্যে দান হলো আত্মবৈরাগ্য। গীতার নিষ্কাম কর্ম। সবাই জানে ভারতীয় বিপ্লবীরা গীতার আদর্শ সামনে রেখে সব কাজ করে। আর গীতা মৃত্যু বলে কিছুকে স্বীকার করে না, জীর্ণ বাস পরিত্যাগ মাত্র। কাজেই জীবন মৃত্যু, পাপের ভয়া চিত্ত ভাবনা হীন।' এই বিপ্লবী সাধনার মধ্যে লেশ মাত্র বিদ্বেষ ভাব নেই। কাল নিরবধি, জীবন অনন্ত, কাজেই আমরা মরিনা। আমরা মরিনা বলেই মৃত্যুর অন্তরে অমৃতের স্বাদ পাই।

ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে রাজা রামমোহন বিশ্বের মানব মুক্তির একটা নোতুন জাগ্রত প্রহরী দেখতে পেয়েছিলেন। ক্ষমতার শীর্ষে উঠে ফরাসী নেপোলিয়ানকে রাজা ভবে ভবে ছাড়ল। অথবা নেপোলিয়ান নিজেই চক্রান্ত করে রাজা হলেন। কথায় বলে এক রাজা যায়, আর এক রাজা আসে, সিংহাসন কখনও খালি থাকেনা কেউ-না কেউ ক্ষমতার দণ্ড, ধারণ করবে। আবার কেউ না কেউ ক্ষমতার শূন্যস্থান পূরন করবে। ফরাসী রাজা লুইকে ছেড়ে রাজা নেপোলিয়ানকে নোনাপার্টিকে গ্রহন করল। সে হল ঐতিহাসিক পরিণতি। কিন্তু বিপ্লবের মধ্যে যে মানব মুক্তির সফলতা পূর্ণ হয়ে ওঠে একথা সত্য, এবং এই সত্যকে রামমোহন মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। রুশ বিপ্লবের পর আর একজন বাঙ্গালী বিপ্লবী রুশ বিপ্লবের মধ্যে জন মনের মুক্তি—এখানে মুক্তি অর্থে শুধু অর্থনৈতিক মুক্তি বুঝতে হবে—দেখতে পেয়েছিলেন। মানবেন্দ্র নাথ রুশ বিপ্লবের আদর্শে ভারতে যাতে অনুরূপ বিপ্লব ঘটে তার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনিই প্রথমে ভারতে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবী দলগঠন করেন অথবা বিদেশ থেকে দল গঠনের সহায়তা করেন এখানে কোন সূত্র থেকে ভারতে

কম্যুনিষ্ট বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে তার শুধু উল্লেখ করে যাওয়াই উদ্দেশ্য। লেনিন গড়ে-পিটে তৃতীয় আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল গঠন করেন। মানবেন্দ্র নাথ সেই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্ব কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের কর্ম্মী। ১৯২১ সে ভারতের কম্যুনিষ্ট দল তাসখণ্ডে জন্মলাভ করে। তার পর কানপুর ষড়যন্ত্র, মীরাটষড়যন্ত্র, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভারতের কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাগাল পায়।

বিপন্ন স্টালিন বিশ্বের শোষিত জনগণের মুক্তি পকেটে পুরে হিটলারি তাসালিতে অভিষ্ট হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দোসরে পরিণত হয়। আত্মরক্ষা ধর্ম্ম তবে প্রতি বর্ষ; এই বহু পরীক্ষিত প্রবাদ বাক্যকে আশ্রয় করে স্টালিন নোতুন মন্ত্র রচনা করলেন—তার নাম হলো "জন যুদ্ধ"। দেশ নেই, দেশের জাতীয়তা বাদের কোন মূল্য নেই, দেশের ঐতিহ্যের মূল্য নেই। এমন কি দেশে ধর্ম্মীয় সংস্কারের কোন মূল্য নেই। শুধু মুক্তি জনগণের মুক্তি, শুধু জনগণ বললেই চলবে না শোষিত জনগণ হওয়া চাই। এই সব মহৎ আপ্ত বাক্য উচ্চারণের একমাত্র কারণ রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে। রাশিয়াই বিশ্বের জনগণের (অর্থাৎ প্রোলেতারিয়েৎদের রাষ্ট্র, এবং এই রাষ্ট্র বেঁচে থাকলে বিশ্ব প্রোলেতারিয়েৎ মুক্তির সন্ধান পাবে। এ একেবারে মোক্ষম বাণী এমনটি আর হয় না। শুনেছি জ্যোতিশাস্ত্রে 'বজ্রশনি' বলে, কথাটার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিনা। কিন্তু ইতিহাসের বজ্র-গতির সঙ্গে পরিহাসটা যে কী পরিমান নির্ম্মম, ও ভীতপ্রদ তা আমরা জানি। সাম্য মৈত্র, স্বাধীনতার ফরাসী একদিন বিশ্বের সেরা সাম্রাজ্য-বাদীতে পরিণত হয়েছিল; যার ফলে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ সম্ভব হয়েছিল। বিশ্বের শোষিত জনগণের প্রোলেতারিয়েতদের একমাত্র রাষ্ট্র পুণ্যভূমি মস্কো আজ 'সুপার পাওয়ার' বলে ইতিহাসে কথিত হয়েছে। নেপোলিয়ান তাঁর জয়ের নিশান উড়ো-রোপের বিভিন্নদেশে বসিয়েছিলেন। ষ্টালিন রাশিয়ার মহাজার এবার আর মধ্য এশিয়ার দিকে না ঝুঁকে, কেননা সে কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে জারই সমাধা করে গেছেন) পূর্ব ইয়োরোপের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ফলে পোলাণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব্ব-জার্মানি সব করতলগত হয়, বুড়ো আঙ্গুলের তলায় থাকল। স্টালিনের অঙ্গুলিহেলনে সব কাজ হচ্ছে।

চীনারা বিপদ বুঝে আগে থেকে গেয়ে রেখে-ছেন, Social Imperialism বিস্তৃত অধিকারের বেলায় এই Social Imperialism ছিলনা ব্রেজ নেতৃত্বের আমলে এই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ চেকো-শ্লোভাকিয়ায় পূর্ণতা লাভ করে। এক মোক্ষম তথ্য সৃষ্টি হয় সমাজতন্ত্রী সার্ব্বভৌমত্ব অর্থাৎ সমস্ত সমাজ তন্ত্রীদেশের রাষ্ট্র সার্ব্বভৌমত্ব একই ধাঁচের Socialist Sovereignty সাম্রাজ্য বাদের পুরোনো মদ নোতুন বোতলে বিশ্বের বাজারে বিক্রি। শামুচ্চা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেন চলছে ভাল। শেয়ানে শেয়ানে কোলা-কুলি। তবে দুটো চাল মুখোমুখি রাখাই ভাল, ন্যাটো চুক্তি, ওয়ারশ চুক্তি লড়কি বল্লম যার যা আছে তৈরী থাক, তবু SALT আলোচনা হোক! এদিকে নিউট্রন বোমা যেমন যেমন তৈরী হবে, তেমন তেমন বাহাই করে গুদাম বোঝাই হবে। সাবধানের মার নেই। সজাগ ঘরে চুরি হয় না, এ ঠিকই। কিন্তু সজাগ ঘরে ঘুমও হয় না। অতি শক্তিমান রাষ্ট্র উভয়েরই

ঘুম নেই। সে যাই হোক, এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতের জাতীয় বিপ্লবী ও কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীদের মধ্যে যে-মূলগত পার্থক্য রয়েছে তার বিশ্লেষণ করা। ভারতের জাতীয় বিপ্লবীরা যা কিছু আন্দোলন প্রয়োজনে করেছে তাকে ওঁরা নাম দিয়েছেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। লেনিনের কাছ থেকে ধার করা নাম নিয়ে জাতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে মসীলিপ্ত করার চেষ্টা করেছে। জাতীয়বিপ্লবীদের কর্মধারার বিকৃত ব্যাখ্যা করে, পরদেশীর কাছ থেকে ধার করা বুলি নিয়ে যুবকদের মগজ ধোলাই করেছে। বিদেশী শাসনের যুগে, কম্যুনিষ্টদের আন্দোলন মুখ্যত শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ধর্মঘট আন্দোলনের সুবিধা এই যে, এর ফলটা হাতে হাতে পাওয়া যায়। শ্রমিক শ্রেণী কিছু সুবিধা দেবার অর্থ হলো, দেশবাসী ক্রেতাকে সেই টাকা দিতে হবে। শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্য সমাজ রাজী থাকবে বটেই কিন্তু এই জাতীয় ধর্মঘট আন্দোলন অব্যবহিত, ফলের দিকে লক্ষ্য রেখে, স্থানিক, ও সুদূর প্রসারী নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই স্বল্প স্থায়ী।

জাতীয় আন্দোলনে যে বিদেশী পণ্য বর্জন নীতি সক্রিয় ভাবে কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে শুরু করে তা সুদূর প্রসারী ছিল। বিদেশী পণ্য বর্জন নীতি ব্রিটিশ অর্থনীতির নাড়িতে টান মারে। গান্ধীজী যখন দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে লণ্ডন যান তখন ম্যাঞ্চেস্টার বাসীরা তাঁকে তাদের সুতো কল ও কাপড় কলের দুরবস্থা দেখাতে নিয়ে যান। কেননা, বিদেশী পণ্য বর্জনের ফলে ম্যাঞ্চে তাঁদের বহু কল বন্ধ হয়েছে, বহু মানুষ বেকার হয়েছে, ও গরীব হয়েছে। তারা তাদের দারিদ্র্যের কথাটাই বলেছিলেন। গান্ধীজী মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষ এর চেয়ে গরীব। এই হলো বর্জন আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া। ভারতে বিদেশী বর্জন আন্দোলনের বেলায় ওঁরা কম্যুনিষ্ট ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। যে-হেতু হ্যারি-পোলিট ইংল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টির বড় কর্তা সেই-হেতুই ভারতীয়কম্যুনিষ্ট পার্টিরও বড়কর্তা। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি তখন ইংল্যাণ্ডের অকলের মিথি। যতদিন ব্রিটিশ ভারতে ছিল ততদিন নেতৃত্বের নামে, ২-জনমে দস্তুরমত চলেছিল। ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর ওঁরা সাবালক হয়ে ওঠেন। রাশিয়া থেকে প্রচুর প্রচার পুস্তিকা আসছে মার্কসীয় দর্শনের বই আসছে। এ দেশের শিক্ষিত সমাজের একটা অংশ ক্ষোভে দুঃখে মার্কসীয় সাহিত্য পড়তে শুরু করে। প্রথম প্রথম পড়ে মনে হয় পৃথিবীর সব দুঃখমোচনের এই একটি স্বর্ণসিঁড়ি রচিত হয়েছে। শ্রেণীযুদ্ধ, সশস্ত্র সংগ্রাম করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা বুর্জোয়া গণতন্ত্র দুর্নীতিগ্রস্ত একমাত্র সাচ্চা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র। নির্ভেজাল নীরেট, অকাট্য যুক্তি এর কোন ফেল নেই কাটল নেই। এর নাম হলো দেশাত্ম-বিরোধী মগজ ধোলাইয়ের আন্দোলন। এই আন্দোলনে কারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন তা পূর্বেই বলেছি।

দেও ফির রাম রাজ্য

শ্রীসতীভূষণ সেন

পথে কুড়িয়ে পাওয়া চিঠির টুকরোটা দিয়েই আরম্ভ করা যাক্। "শ্যামলীর দিদির বিয়ের সিলভার জুবিলিতে কলকাতা গিয়েছিলাম, এই মাত্র ফিরে তোমাদের চিঠি পেলাম। এমন বাজারেতেই তোমরা থাকো যে ছেলে যাওয়া যায় না। ইচ্ছে থলেও যে দেখা দিয়ে আসব সে উপায় নেই। মা আরও টাকা পাঠাতে লিখেছেন। তোমরা ছোট যায়গায় থাকো, রাজধানীতে যে কি রকম costly বুঝতে পার না। শ্যামলী যে কি করে ম্যানেজ করছে, ভেবে পাই না। 'রুবা' এর জন্য Private Tutor রাখতে হয়েছে, তাকে তিনশো টাকা দিতে হয়, সপ্তাহে তিনদিন পড়ায়। একটা ভালো ইংলিশ স্কুলে ভর্তি করাবার জন্য এখন থেকেই তৈরাবী হতে হচ্ছে।

"ইতিমধ্যে বড়দির একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠি দেখে শ্যামলীতো ক্ষেপে গেছে। বাস্তবিক পক্ষে বড়দি যে আমাদের ব্যাপারে কেন নাক গলাতে আসেন বুঝিনা। তিনি লিখেছেন আমরা নাকি তোমাদের উপর কর্তব্য পালন করছি না। নিশ্চাই তোমরা অনেক করে লাগিয়েছ। দূরত আত্মীয় স্বজন সকলের কাছেই বলে বেড়াচ্ছ যে আমরা কত স্বার্থপর। তোমাদের জন্য কিছুই করছি না।

"তোমাদের জন্য এতদিন যা করেছি, তা শ্যামলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করে এসেছি। কোন ছেলেই আজ কাল-কার দিনে এত বেশী করে না। এতদিন যা করেছি, তাতে তোমরা আমাকে মানুষ করার জন্য যা খরচ করেছ, তা শোধ হয়ে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস। আমার পক্ষে আর টাকা পাঠানো সম্ভব হবে না। আমাকেও সোসাইটিতে বাস করতে হয়, ছেলেপিলে মানুষ করতে হয়। তোমরা যেভাবে আমাদের মানুষ করেছ সে রকম ওয়োরের পালের মত ছেলেপিলে মানুষ করার কথা, আমরা ভাবতেও পারি না।"

[illegible] থেকেই বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে ভাটন ধরেছিল। ছেলে মেয়েরা কর্মস্থলে বাসা বাঁধতেন, দেশে থাকতেন বাপ মা। আসা যাওয়া ছিল প্রতিবছর, টাকা পয়সা আসত প্রতিমাসে। দেশ বিভাগের সঙ্গে সেই বাঁধন কেটে গেল। পুরানো সমাজ ভেঙে গড়ে উঠল ফ্ল্যাট বাড়ীর সমাজ। ইচ্ছে থাকলেও সেখানে বাপ মার স্থান নেই; খান দুয়েক ঘর নিয়ে কোয়ার্টার কিম্বা বাসা, বোজগেরে বাপ মা ও দুতিনটি নাবালক সন্তান নিয়ে থাকবার উপযুক্ত। দিনের আট ঘণ্টা কাটে তাদের আয় বাড়াবার চেষ্টায়, পরের আট ঘণ্টায়, তার বেড় গুণ খরচ করতে হয়, এবং শেষের আট ঘণ্টা ঘুমের বড়ি গিলেও ঘুম আসে না। ভাবেন, কি স্বাধীনতা যে পেলাম এর চেয়ে ব্রিটিস আমল অনেক ভাল ছিল।

এত টেনশন ছিল না সাহেবদের আমলে, সেটা ঠিক নইলে ইংরেজ রাজত্বটাও এমন কিছু ভালো বস্তু ছিল না। নইলে আর দেশশুদ্ধ লোক স্বাধীনতার জন্য ক্ষেপে উঠবে কেন? কেন চাইবে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে? রামরাজ্যটাকে তখন আমাদের চোখে আদর্শ শাসন মনে হত। আজকাল হাত' মাথায় ভেবে দেখলে ওটাকেও তেমন কিছু ভালো বস্তু বলে মনে হয় না। চারদিকে ফুল ফলের গাছ, তপোবনের কুটিরে বসে বাল্মিকী বীণা বাজিয়ে গান করছেন আর রামায়ণ রচনা করছেন, ভাবতে ভালোই লাগে। আবার ওদিকে শম্বুক ব্যাটা বসে ভগবানের নাম করছেন, সেই অপরাধে তার শিরশ্ছেদ করা হল। তাহলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। তখন রামরাজ্যে অর্থে ছিল ব্রাহ্মণ ও রাজন্যগুলোকে খুব করবার অধিকার, আর বাদরগুলোর উপরে ছড়ি ঘোরাবার স্বাধীনতা ব্রাহ্মণ ও বানর হয়ে বেঁচে থাকার কথা কেউ ভাবি নি।

বাল্মিকীর কাল থেকে রবীন্দ্রনাথের কাল পর্যন্ত, অল্প কয়েকজনের ঐশ্বর্য উৎপন্ন হয়েছে বহুর দাসত্বের বিনিময়ে। মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য সেটাই ছিল প্রয়োজন। জাদুঘরের পাতালে আটক না রাখলে, কে খুঁজে তুলতো সোনাদানা চাঁদে মুক্তা? বিজ্ঞানের ও টেকনলজির অগ্রগতির ফলে মানব আজ বহুমানবকে বল

করেছে, কঠোর পরিশ্রমের কাজগুলো তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। মুক্ত করেছে মানব সন্তানকে পশুর মত কঠোর পরিশ্রম ও দাস জীবন থেকে। খরচও কম পড়ছে।

সমাজ সদাই পরিবর্তনশীল। কখনো ধীরগতি কখনো, অতি বেগবান। ধীর পরিবর্তনে কোন টেনশন সৃষ্টি করে না, এ যুগের সমাজ ছুটছে এক্সপ্রেসের গতিতে, তাই টেনশনের পর টেনশন আসে, সমস্যার পরে সমস্যা জমতে থাকে। হিমশিম খেয়ে যাই আমরা। আধি মরণ হলে বাঁচতাম।

মানব আগুনের ব্যবহার শিখেছিল প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে। প্রাতিহাসিকের গবেষণার বাঘ-ভালুক ও সাপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। দ্বিতীয় লাভ হল, খাদ্য বস্তুকে রন্ধনে সুস্বাদু করে নেওয়া। আরো অনেক পরে, আগুন সহজ করে শীতের দেশে বসবাস করতে, গেল এক দল explorer। একটু হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে বসে থাকতে পারল, শীতের দেশের খাদ্যও পাওয়া গেল প্রচুর। মানবের ভাগ্য বিকশিত হল। কিন্তু এর ফলে কি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয় নি? শুধার আগুন হঠাৎ নিভে গেলে শীতে জমে যাওয়ার ভয় ছিল, খোয়ার দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। তাই বলে কি সবাই ফিরে গিয়েছিল গহ্বরের দেশে? তা কি আর পারে? তত্ত্বদিনে গহ্বরের দেশে জনসংখ্যা বেড়ে গেছে। না পারে বাসস্থান না পারে খাদ্য। আগুনের ব্যবহার শিখবার পরে তা বর্জন করার কথাই আসে না। হয় অসুবিধাগুলো মুখ বুজে সহ্য করতে হবে, নয়তো নতুন আবিষ্কার করে যাবতীয় অসুবিধা দূর করতে হবে। এই আগুন যাতে হঠাৎ নিভে না যায়, আর ধোঁয়া যাতে সহজে বেরিয়ে যায় তারই টেকনোলজি আবিষ্কার করতে হল।

কৃষি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তাও প্রায় ৮ হাজার বছর আগে। খাদ্য সংগ্রহের সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনে হাত লাগালো মানব। কোন এক সেই ভোরে আবার শিকারী জীবনে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সেই ভোরে কিন্তু স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াবার আনন্দ বিসর্জন দিতে হল। পরিশ্রম বেড়ে গেল, বাস করতে হল দলবদ্ধ হয়ে, নইলে যাযাবর মানবগোষ্ঠী লুটপাট করে কেড়ে নিয়ে যাবে শস্য সম্পদ। খরা ও বন্যার সম্ভাবনা মেনে নিতে হল, প্রতিবিধানের চেষ্টা করতে হল। জলসেচের টেকনিক আবিষ্কার করল, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধলো 'ড্যাম'। বহু পরিবারের একত্র বসবাস করা প্রয়োজন হল। তার ফলে এল 'লজ অ্যাণ্ড অর্ডারের' সমস্যা। দুষ্টের দমনের জন্য একজন শক্তিমানকে রাজপদে নির্বাচিত করল। রাজার শাসন স্বীকার করে নিল সহ্য করতে হল রাজার পীড়ন ও এল ক্রমে রাজা বা অভিজাতদের উৎপীড়ন, এল ঠাকুর মশায়দের বাধা নিষেধ। ———দেশ যত বড় হল সমৃদ্ধিশালী হল, লোকবল যত বাড়তে লাগলো এলো সংক্রামক ব্যাধি। হয়তো দাবানলের মত ধ্বংস করে ফেলল সমৃদ্ধ জনপদ। উপায় নেই নিশ্চিন্তে বাস করবার।

দরকার কি ছিল এত সব হাঙ্গামার? স্বাধীন শিকারী জীবনে আবার ফিরে গেলেই তো লাঠা চুকে যেত। বনে বনে হরিণ মেরে কিরব আর নদীর পারে মৎস্য মারিব খাইব সুখে! পরিশ্রম কম, চিন্তা ভাবনা নেই, খাও আর ঘুমাও। কৃষি বর্জন করলে তোর ভাকাত, যুদ্ধ বিগ্রহের ভয় থাকেনা, ব্যাধি মারীও আক্রমণ করবে না। কিন্তু কৃষি বর্জন করলে প্রতি ১০ হাজার মানব সন্তানের একশো জন মাত্র বাঁচবে, বাকি সব উপোষে মারা যাবে। সেইটি যেন না ভুলি। না, কৃষিকে বর্জন করার উপায় নেই যে সব সমস্যা সৃষ্টি করেছে কৃষি, সেগুলিই সমাধানের চেষ্টা করতে হবে টেকনোলজির আরও উন্নতি করে। মানুষের বদলে গরু বা ঘোড়া দিয়ে চাষ করে, বদলের বদলে ট্রাক্টার ব্যবহার করে, সার প্রয়োগ বাড়িয়ে, Rotation of crops প্রচলন করে। পিছিয়ে এসে নয়, এগিয়ে গিয়েই মানুষ তার সমস্যার সমাধান করবে।

১৯০০ সালে মানবের প্রয়োজনীয় সব বস্তুই উৎপন্ন হত শিল্প ও টেকনোলজির সাহায্য ব্যতিরেকে। পৃথিবীর জন সংখ্যা তখন ১০০ কোটি। এই ছশো বছরে সেটা বেড়ে হয়েছে ৪০০ কোটি। টেকনোলজি'কে বর্জন করলে বাকি ৩০০ কোটির আহার আসবে কোথা থেকে? তুমি চাষ বলুন, ইচ্ছে বলুন বলুন। আপাতঃ নির্মূল বলুন,

ফসল কাটা চলুন. সব কাজই করছে রাতি দহপাতি। [করছে পশ্চিমী দেশে, আমাদের দেশেও আরম্ভ হয়েছে যে সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার হয় ক্ষেতে তাও উৎপন্ন হয় বিশাল বিশাল রাসায়নিক কারখানায়। আর এই সব যন্ত্রপাতি চালায় ভূগর্ভে সঞ্চিত এনার্জি।

শিল্প ও টেকনোলজি বর্জন করতে পারি না, ওর উপরেই আমাদের জীবন কাঠি লুকানো। রাম রাজ্যে ফিরে যাওয়ার কোন পথই খোলা নেই। টেকনোলজি আমাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে, কেড়ে নিয়েছে মনের সুখ। শুভ ও অশুভ দুটি বস্তুকেই এক সঙ্গে আমন্ত্রন করেছে। একটি ছেড়ে অন্যটি পাওয়ার উপায় নেই। ছুরি ও বর্শা আবিষ্কৃত হল পশু শিকার সহজ হল, খাদ্য সহজ লভ্য হল। কিন্তু ঐ ছুরি ও বর্শায় নরহত্যাও সহজ হয়ে গেল। আণবিক শক্তি আবিষ্কৃত হল, সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসের সম্ভাবনায় কেঁপে উঠলো। কিন্তু প্রকৃতির শক্তির চাবি এসে গেল মানুষের হাতে। Fusion Power সৃষ্টি করতে পারলে শক্তি তখন আর সমস্যাই থাকবে না। বিনে পয়সায় পাওয়া যাবে। যত চাই ততই পাওয়া যাবে।

সামন্ত তান্ত্রিক সমাজের সীমানা ছাড়িয়ে পা দিয়েছি শিল্প তান্ত্রিক সমাজে। কাঁটা ফুটছে, উঠছে বেদনার্ত কণ্ঠের আর্তনাদ। আকাশে ধুলো বাতাসে ধোঁয়া, পথে জঞ্জাল। চোখের সামনে ইটের দেওয়াল। ট্রামের ঘর্ঘর, বাসের গমগম, রেডিওর চীৎকার। ভোর হতে না হতে দৈনিক পত্রিকার কলা নাড়া শুরু হয় লোড শেডিং, জলহীন হাওয়া হীন নরকপুরীর জীবন। যতই অসহ্য হোক এই সব টেন্‌শন নিয়েই বাস করবো। এটাই মানবের নিয়তি। এবং প্রকৃতি ও।

ক্ষীরোদ কুমার দত্ত প্রণীত

বিপ্লবী পুস্তকমালা

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০

২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০

৩। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির—২·০০

৪। সৌদাগী সংগ্রাম কাহিনী—১·০০

৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১·২৫

৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—·৪০

৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—·৬০

৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—·৪০

৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৬০

১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০

১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—·৪০

১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—·৭৫

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও তার পরিণাম ফল]

ভারতে লর্ড রিপন সম্পর্কে যা তার আগেকার জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানি, হয়ত বা কিছুই জানিনা রিপনের অনুকূলে দুইটি ঘটনা ছিল। একটি হল, তিনি ছিলেন গ্লাডস্টোন মনোনীত ব্যক্তি। গ্লাডস্টোন ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাকটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ রূপে ভারতীয় জনমতের সামিল হয়েছিলেন। আর একটি হল, রিপন রোমান ক্যাথলিক মতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই বিশ্বাসের জন্য তাকে কিছু দুর্ভোগ ও ভুগতে হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে উচ্চ সামাজিক মর্যাদার পরিত্যাগ করে এবং জন জীবনের পথ থেকে সরে এসে রোমান ক্যাথলিক মত গ্রহণ করে রিপন স্বেচ্ছায় নিজের সর্বনাশের সম্মুখীন হয়েছিলেন। দি টাইমস্ পত্রিকায় তার সম্পর্কে প্রকাশিত এই সমস্ত বিবরণ আমাদের মনে পড়ে। আমি সে সময় ইংল্যাণ্ডে ছিলাম এবং এই ঘটনা সেখানে তখন যে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, তা আমার বেশ মনে আছে। আমার মনে হয়, মত ও বিশ্বাসের সংঘর্ষ নিয়ে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়ত, বর্তমানে সেরূপ দেখা যায় না। দি টাইমস্ একটি মুখ্য নিবন্ধ লেখেন যাতে এরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করা হল যে রিপন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় কয়েকজনের অনুশাসন সূত্রে বিশ্বাস করতেন। তারা দি টাইমস যা অনুমোদন করেন নি, তা-ই অনুমোদন করলেন। আমরা লর্ড রিপনকে ভারতের শাসনকর্তা রূপে স্বাগত জানালাম; কারণ তিনি তার নিজ বিশ্বাসের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। ঘটনা পরম্পরা প্রমান করেছে যে রিপনের প্রতি আমাদের এই আস্থা যুক্তি যুক্তই হয়েছিল, দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে তিনি প্রথমে যা যা বললেন তার মধ্যে একটি কথা হল এই যে মহা মহিমময়ী ভারত সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে তিনি পৌর প্রতিষ্ঠান গুলির দিকে নজর দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন, কারণ জন সাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে সেখান থেকেই শুরু হয়।

যারা দেশের উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তাদের কাছে লর্ড রিপনের এই উদার নীতির ঘোষণাবাণী তাদের স্বদেশ সেবা ব্রতকে সফল করে তোলার জন্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার এক উন্মুক্ত আহ্বান বলেই পরিগণিত হল। আমরা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেলাম। আমরা এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলাম, এবং মফঃস্বলের সহর গুলিতে আমাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে করদাতাদের প্রতি এই মর্মে আহ্বান জানালাম যে তারা যেন নিজ এলাকায় মিউনিসিপ্যালটি গুলিকে নির্বাচনের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। আমি নিজে বাংলার নানা স্থানে ভ্রমণ করি। ভাগলপুর, মুঙ্গের (এই দুটি জেলা এখন বিহারের অন্তর্ভুক্ত) রাজ শাহী, বগুড়া এবং পাবনা প্রভৃতি স্থানেও যাই। এইসব জায়গায় জনসভা করে বক্তৃতা করি। আমাদের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অন্যান্য কেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করেন। সেই দিনে সরকারের কোন গোয়েন্দা বিভাগ (সি. আই. ডি) ছিলনা। আর পুলিশের লোকেরাও রাজনৈতিক কর্মীদের পেছনে লেগে তাদের গতি বিধি লক্ষ্য করাকে নিজেদের কর্তব্য কাজের মধ্যে গণ্য করত না। সুতরাং আমাদের কাজ করতে কোন অসুবিধা হয়নি। আমাদের স্বদেশ বাসিগণ সর্বত্রই আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

মফঃস্বল অঞ্চলে রাজনৈতিক কাজ কর্মের ব্যাপারটা ছিল একটা নতুন জিনিষ। প্রদেশের দূর দূর প্রান্তে রাজ-

নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য আমরা যে নব প্রেরণার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলাম, আমার জীবনে তা অতি মধুর ও স্থায়ী স্মৃতি রূপে বিরাজ করছে। সর্বত্রই টাউন-সভা আমাদের দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছেন। জমিদার গণও আমাদের বড় একটা বিমুখ করেন নি। সত্যি-কথা বলতে কি, সেই আদিকালে রাজনৈতিক কাজকে সরকারী কর্মচারিরা কোন রূপ সন্দেহের চোখে দেখেন নি। কোন প্রকার অসহযোগিতার মনোভাবের দ্বারা বাধ্য না হয়ে নিজ নিজ সহজ মনের আবেগে জনগণ তাদের কর্তব্য করে-গেছেন। অবশ্য দেশের প্রত্যেকটি শহরেই পরিভ্রমণ করা বা প্রত্যেকটি প্রধান অঞ্চলে প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি, তবে যে সব জায়গায় আমরা যেতে পারিনি সে সব জায়গা থেকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে লিখিত অভিমত সংগ্রহ করেছি। এই ভাবে ভাইসরয়ের প্রস্তাবের উপরে দেশের লোকের অভিমত কি, তা নির্ধারণ করে আমরা এক স্মারক পত্রের খসড়া প্রস্তুত করলাম এবং টাউন হলে এক জনসভা আহ্বান করলাম।

এই সভা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা ভাইসরয়কে ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট রদ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার এবং আর্মস্ এ্যাক্ট তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করলাম। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কীয় প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করেছিলাম, সে প্রস্তাবটি ছিল এই রকম :—

"সম্প্রতি মহানুভব ভাইসরয় মহোদয় এদেশের লোকের প্রতি অপরিসীম আশীর্বাদ স্বরূপ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন দান করায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সে জন্য এই সভা তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে এবং ঐকান্তিক আশা ও বিশ্বাস পোষণ করার বল পেয়ে এই পরিকল্পনাকে একটি সুষ্ঠু ও সন্তোষ জনক রূপ দান করবে। এই কথা মনে করে এই সভা সসম্ভ্রমে নিম্নলিখিত সুপারিশ গুলি উপস্থাপনের প্রার্থনা জানাচ্ছে। (১) লোকাল বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালটির গঠন নির্বাচন ভিত্তিক করা হোক (২) ঐ সমস্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান গন নির্বাচিত সদস্যদিগের দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং কোনক্রমেই যেন ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টরদের ঐ পদে নিয়োগ করা না হয় (৩) বর্তমান কমিটি গুলির যে কাজ ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, তা বাড়িয়ে দেওয়া হোক। এটা প্রয়োজন এই জন্য যে ওই কমিটিগুলি লোকাল বোর্ডগুলির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।"

এই প্রস্তাবের মধ্যে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তাই লর্ড রিপন কর্তৃক প্রকাশিত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কীয় প্রস্তাবগুলির প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। লর্ড রিপনের প্রস্তাবগুলির মধ্যে আছে (১) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামো গড়া হবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচনের ভিত্তিতে (২) তার মধ্যে ক্ষমতার সম্প্রসারণ থাকবে (৩) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিই তাদের নিজেদের চেয়ারম্যান করবে। এইগুলিই ছিল ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের মূলনীতি। আমাদের এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮১ সালের ১৮ ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, আর ভারত-সরকারের এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয় ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসে এবং ১৮৮২ সালের মে মাসে। সরকারী মতের সঙ্গে জনমতের একটা পরিপূর্ণ ঐক্যের দৃষ্টান্তই এখানে সুপরিস্ফুট হয়ে দেখা দিচ্ছে। তা ছাড়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে এর অল্প দিন পরেই কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আচার্য রূপে এই লর্ড রিপনই ঘোষণা করেছিলেন যে সময় আসছে অতি দ্রুত গতিতেই আসছে যখন এমন কি এই ভারতেও জনমতই হবে শাসনকার্যের অপ্রতিরোধ্য এবং অপ্রতিহত প্রভুত্বে অধাসীন। এরূপ আশাব্যঞ্জক চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আর কোন ভাইসরয়ই এত-করেন নি। ভারতের শাসন কার্যের উপর তার নীতি এমন ছাপ রেখে গেছে যা একটি চিরকালীন চিহ্ন হয়ে রয়েছে, এবং একাধিক ভাইসরয় তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছেন।

তবে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ব্যাপারটা এমন একটা কোন বড় নয়। এটা একটা বৃহত্তর আন্দোলনের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সেই বৃহত্তর আন্দোলন ছিল জনমতকে শক্তিশালী করে তাকে জনগণের প্রিয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে আসার

পূর্বেই বাংলার নেতাদের ভারতের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই সমস্যাই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন একটি কমিটি গঠন করল। আমি ইতিপূর্বেই বোম্বের বৃদ্ধ পূর্ব সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী মিঃ শ এবং স্যার ভেচিজি ওয়েডার বার্নের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে পত্রালাপ করেছিলাম।

এই প্রসঙ্গে আমাদের জাতীয় উচ্চাভিলাষ কি ভাবে স্থির অগ্রগতির পথে চলেছে সে দিকে লক্ষ করা বোধ হয় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শতকের ষাটের দশকে এমন কি তারও আগে থেকে, আমাদের জাতীয় নেতাদের ভারতীয় জনগণের জন্য কি ভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন অবস্থা ও দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজে অংশ গ্রহণের দাবী আদায় করা যায় সে দিকে কর্ম প্রয়াস নিয়োজিত ছিল। ১৮৫৮ সালে মহারাণীর যে মহা ঘোষণা বাণী প্রচারিত হয়, তাতে এদিকে তাদের উচ্চাভিলাষ জেগে ওঠে এবং মহারাণীর সেই ঘোষণা বাণীর মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা আদায় করার জন্য সব সময়ই তারা চাপ সৃষ্টি করতেন। পাশ্চাত্য ভারতে এই আন্দোলন পরিচালনা করেন মিঃ নওরোজি ফার্দুনজি এবং দাদাভাই নওরোজি। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন। তাছাড়া কৃষ্ণদাস পালের মত বিত্ত, রমানাথ ঠাকুর এবং শিবচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি শক্তিমান পুরুষেরা ছিলেন এই আন্দোলনের দৃঢ় সমর্থক।

কিন্তু আন্দোলনের ভিত্তি ভূমির পরিবর্তন ঘটল। এক বৃহত্তর লক্ষ দৃষ্টিপথে এসে পড়ল। শিক্ষিত ভারতের চোখের সামনে এক উজ্জ্বল স্বপ্নচ্ছবি জেগে উঠলো। সব জিনিষেরই ক্রমবিকাশ আছে—এমন কি মন-জীবনের আন্দোলনের মধ্যেও ক্রমাভিব্যক্তির ধারা নিহিত আছে। গত কয়েক বছরের প্রয়াস জন-গণের মধ্যে এক বিস্ময়কর অপূর্ব জাগরণ এনে দিল এবং তাদের মধ্যে নতুন আশা, নতুন আকাঙ্খার সৃষ্টি করল। এখন আর উচ্চ সরকারী চাকরীর মধ্যে আমাদের পরিপূর্ণ ভাগ আদায় করে নেওয়ার দাবীর মধ্যেই আশা-আকাঙ্খা সীমাবদ্ধ রইল না। এখন আমরা চাচ্ছি যে জাতির শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য গঠিত পরামর্শ সমিতিগুলির মধ্যে আমাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে কিন্তু দেশে রয়েছে আমলতন্ত্র। ভালোর জন্যই হোক, আর মন্দের জন্যই হোক, আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দেশে চলছে। এখন যে আমরা কেবল মাত্র আমলাতান্ত্রের অংশীদার হয়ে তাকে ভারতীয়ভাবে উজ্জীবিত করে তুলতে চাচ্ছি, তাই নয়; আমরা চাচ্ছি একে আয়ত্তে আনতে, একে রূপ দিতে, এর কার্যাবলী পরিচালনা করতে এবং এই ভাবে ঘটনাক্রমে সমস্ত শাসন ব্যবস্থাকে জনগণের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে টেনে নিতে। এটা একটা নতুন পথ পরিক্রমা যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নি। আর এই পথ পরিক্রমা ছিল অশেষ সম্ভাবনা পূর্ণ। দেশের লোকের জন্য চাকরীর পদ ও ক্ষমতা আদায়ের জন্য এই সংগ্রামের বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে ধীরে ধীরে, কিন্তু অবিচ্ছিন্নভাবে, এই ভাবনা জেগে উঠলো যে, না, যা পেয়েছি তা যথেষ্ট নয়, তা অংশ মাত্র; এবং অংশও আবার আমাদের জনগণের রাজনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্য্যক্রমের সবচেয়ে প্রধান অংশ নয়। উচ্চ আদর্শের অনুসরণ জন মানসকে উন্নীত করে। বড় রকমের সাফল্য লাভ হলে তা পরোক্ষভাবে জনপ্রকৃতি স্বরূপ ভবিষ্যতের জন্য আরও অনেক বড় ধরণের অদৃষ্টপূর্ব অপরিকল্পিত সম্ভাবনা উপস্থিত করে। এই সম্ভাবনাগুলি পরিলক্ষিত হয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতার মধ্যে, আমাদের নৈতিক জীবনের শক্তিশালী করে গড়ার মধ্যে, জাতীয় কর্ম তৎপরতা বাড়িয়ে তোলার এক সার্বিক প্রেরণা যোগানোর মধ্যে। তাই এখন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের দাবী সুস্পষ্টরূপে দানা বেঁধে উঠলো, এবং এ দাবী গণ-আন্দোলনেরই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত পরিণতি।

শ্রমশিল্পে আগ্রহ সৃষ্টির উপায়

—মলয় ঘোষ

বিখ্যাত চিন্তাবিদ ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, তাঁর কনডিশন অব্ দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড গ্রন্থের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলেন—'বর্তমান কালের সমস্ত সামাজিক আন্দোলনের প্রকৃত ভিত্তি এবং তার গতি পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার মধ্যেই নিহিত, কারণ এরাই হচ্ছে আমাদের যুগের সামাজিক দুর্গতির প্রকটতম এবং সর্বোচ্চ রূপ।

এঙ্গেলসের এই বিশ্লেষণ তাঁর সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষীতে যেমন অধিক ছিল, আজকের পরিবর্তিত যুগ ও কালেও তার কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটেনি। কারণ সময় বদলালেও মানুষ বদলায় নি। মানুষের অন্তর্গত পঙ্কিলতা বদলানো যায় নি। ফলতঃ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন শিল্পক্ষেত্রে, অন্যায়, অবিচার ও অসাম্যের চিরন্তনতা পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পেলেও একেবারে লুপ্ত হয়নি—বরং আকার ও প্রকরণে পরিবর্তিত হয়েছে বলা চলে। এগুলির বিশদ আলোচনার মাধ্যমে প্রতিকারের উপায় সন্ধান এবং শিল্পক্ষেত্রে একটি সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনিয়তার চিন্তা আজকের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হবে।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শ্রম ও শ্রমিককে চিরদিনই অবহেলার চোখে দেখা হয়েছে। মর্যাদা পেয়েছে, সেই সব বুদ্ধিমান মানুষ, যারা শ্রমিকের শ্রমলব্ধ সমৃদ্ধি আত্মসাৎ করতে পেরেছে মালিকানার অধিকারে, যারা সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে কখনও ক্রীতদাস আবার কখনোও ভূমিদাস রূপে শ্রমজীবি মানুষকে শোষণ করেছে। শ্রম ও কর্মের প্রতি ভারতীয় সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে প্রাথমিকভাবে ছিল, বহির্জগত সম্পর্কে উদাসীনতা এবং বেদান্ত দর্শনের বিকৃত ব্যাখ্যা। জগতকে তথা ইহলোককে নিতান্ত মায়া এবং পরলৌকিক মোক্ষ লাভকেই একান্ত অভিষ্ট বলে গ্রহণ করায় এদেশের মানুষ কর্মের প্রয়োজনীয়তাকে জীবনের ক্ষেত্রে গৌণ বলে মনে করতো। এই মায়াবাদের প্রভাবেই, একদিন এদেশের উঁচুজাতের মানুষেরা, যারা সমাজকে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত ছিল ঈশ্বর ও তত্ত্বতত্ত্ব আলোচনায় আত্মনিয়োগ করলো। পক্ষান্তরে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গিয়ে পড়লো নীচুতলার মানুষদের কাঁধে। এইভাবেই দেশে সৃষ্টি হয়েছিল—শ্রমজীবি ও বুদ্ধিজীবি—এই দুইটি শ্রেণীর।

গান্ধীজী বলেছিলেন—সমাজ কখনই একটি অনড় হয়ে থাকতে পারে না। জীবনের মত সমাজেরও একটি চলিষ্ণু রূপ আছে। মানুষের প্রয়োজনে সে রূপ বারবার বদলায়।' তাই যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের সমাজ জীবনেও পরিবর্তিত হতে থাকলো। মায়াবাদের

যে নিষ্কাম ধর্মচিন্তা অচলায়তনের মতোই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল, মানুষ তার ওপর দেশীদিন আস্থা রাখতে পারলো না। বাঁচবার প্রয়োজনেই অসার তত্ত্বসর্বস্ব বর্ণশ্রেষ্ঠদেরও একদিন কায়িক শ্রমে দীক্ষা নিতে হলো। বিশেষতঃ ইংরেজরা এদেশে আসার পর বিশ্বের কর্মমুখর জীবনের পটভূমিকায় এদেশের মেতীবাদী মন্থরতা অধিকতর সচেষ্ট হয়ে উঠলো।

ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস—এবং মহান কালবিবর্তনের ইতিহাস। এক দিকে সনাতন ধ্যানধারনাকে আঁকড়ে থাকার অন্ধ প্রচেষ্টা। আর একদিকে, নবীন মূল্যবোধ ও সংস্কারহীনতার পিঠে সওয়ার হয়ে আধুনিকতার জয় যাত্রা। ইংরেজ বনিক শ্রেণী ও এদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একত্রিত প্রয়াসে এই সময় সমস্ত দেশে শিল্পায়নের বিশেষ প্রসার হয়। এই উদ্যমের পেছনে অবশ্যই ছিল বনিক ইংরেজের অধিকতর সম্পদলাভের আকাংখা। কিন্তু এর ফলশ্রুতি হিসাবে, ভারতীয় জনগণের শ্রমবিমুখ জীবন যাত্রার মরাগাঙে জোয়ার আসে আজীবনের সংসার। ধর্মীয় গোঁড়ামী ও গতানুগতিকতার বন্ধন ছেদ করে সাধারণ মানুষ ছুটে যায় সদ্য-প্রতিষ্ঠিত কলকারখানাগুলিতে কাজের খোঁজে; আর্থিক অনগ্রসরতাও এর পেছনে কাজ করেছিল। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের এই অধ্যায়েই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অভ্যুদয়। এই নতুন ব্যবস্থায়, শ্রমজীবি মানুষ, যারা উৎপাদন করে এবং পুঁজিবাদী শ্রেণী, যারা সেই উৎপাদনের ফলভোগ করে—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়।

শুধু শিল্প ক্ষেত্রেই নয়, কৃষি ক্ষেত্রেও শ্রেণী বিভক্ত সমাজের এই দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আজও পর্যন্ত ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে জনসংখ্যার যে প্রচণ্ড চাপ সাধারণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেছে—তার সূত্রপাত হয়েছিল বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতেই। যে গ্রামীণ কৃষক একদিন শাসক ও মহাজনের একত্রিত অত্যাচারে নিঃস্ব হয়ে শহরের কারখানায় কাজ করতে এসেছিল। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, সেই শিল্প ক্ষেত্রেও তার জন্য অপেক্ষা করেছিল বঞ্চনা ও শোষণ বৃটীশ আমলেই, সাধারণ মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে। অধিকাংশ দল কারখানার শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীতে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হতো। বহুক্ষেত্রে সেই মজুরীতে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হতো। বহুক্ষেত্রে সেই মজুরীও তারা পুরোপুরি পেতনা—নানা অজুহাতে তার অধিকাংশ কেটে নেওয়া হতো। যতো দিন যেতে লাগলো, মানুষের দারিদ্র্য যতো বাড়লো, কর্মক্ষেত্রে ভিড় হতে লাগলো ততো বেশী, শোষণের মাত্রাও বেড়েই চললো। ফলতঃ শ্রমজীবি মানুষের কর্মোদ্যম হ্রাস পেতে লাগলো, কাজকে তারা শুধুমাত্র জীবন ধারণের তাগিদে উপার্জনের উপলক্ষ্য বলে মনে করতে লাগলো।

(চলবে)

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date.
	Distt.—Calcutta		
Acharya Bijon Kishore	No. 2 Russa Road East Calcutta-33	200	12. 1. 74
Bhattacharji Satyendra Nath	112/21/3 Goalpara Road Calcutta-60	200	5. 4. 74
Biswas Bhupendra Nath	Siddheswari Colony Calcutta-28	200	1. 9. 73
Bose Smt. Santi w/o Late Bhupesh Ch.	1P Kailash Bose Street Calcutta-6	150	19, 2. 77
Dutta Smt. Nilima w/o Late Adhir Ranjan Dutta	15/1 Hindusthan Road, Cal.-29	150	18. 11. 77
Ganguly Gour	39 Baburam Ghosh Road (3rd Floor) Calcutta-40	200	1. 4. 77
Kanjilal Gopal Chandra	112 Mahatma Gandhi Road Calcutta-01	200	6. 2. 76
Kundu Chakladat Smt. Nilima w/o Late Ananta Kumar	128/Q Narkeldanga Main Road Calcutta-54	100	30, 8. 77
Present Address :—			
C/o I. P. Kar	P. O. Aswininagar, Cal-59		
Mazumdar Smt. Nani Bala w/o Late Radha Raman	128B B. U. Road, Calcutta-10	150	9. 4. 74
Mitra Smt. Anshurani	5/2 Sachin Mitra Lane	100	12. 9, 77
Mukherjee Santosh Kumar	Midyapur, Dulal Chandra Lane Nimta, Calcutta	200	1. 10. 76
Roy Smt. Fulla Bale w/o Late Jogendra Lal Roy	13/A Brindaban Mallick 1st Lane, Calcutta-9	100	11. 2. 76
Roy Niren	8/1 Panchanantola Road Calcutta-4	200	25. 3. 74
Roy Chowdhury Sm. Siddheswari w/o Late Ramanath	84 B. T. Road, Calcutta-2	100	1. 10. 76

Name	Address	Amount Rs.	Date
Sen Smt. Arati w/o Late Sudhir Ch. Sen	20A Rammohan Saha Lane Calcutta-6	150	19. 10. 77
Talapatra Smt. Bina w/o Late Narayan Chandra	7/1 K. P. Goosal Street Calcutta-56	150	1. 10. 76
Biswas Smt. Anila w/o Late Jogesh Chandra Biswas	Vill. Chandmari P.O. Sonarpur	200	20. 7. 77
Chatterjee Smt. Sabitri w/o Late Parimal Chatterji	255 Nagendru Nath Road, Calcutta-28	100	14. 9. 77
Present Address :— Vill. Vatinda, P. O. Rajarhat, 24-Pgs.			
De Prafulla Kumar	P.,O. & Vill· Hizalpukuri	200	1. 10. 76
Mukherji Indu Bhusan	Vill Salus Ulutanga P. O. Maslandapur	200	
Roy Smt. Binapani w/o Late Manindra Roy	Vill Kodalia (East) Rly. Gate No. 7 P. O. New Barrackpore	150	
	Hooghly District		
Bharati Nagendra Kumar	P. O. & Vill. Mandir Road Tarakeswar	200	1. 10. 76
Biswas Ardhendu Sekhar	Chandanpukur, Barrackpore 24-Parganas	200	
Present Address :— Somra Baxar Colony, P. O. Somra			
Ghosh Narendra Kumar	P. O. & Vill Nangulparo P. S. Khanakul	200	1. 10. 76
Ghosh Smt. Bimala Bala w/o Late Nirmal Ch. Ghosh	Basudebpur P. O. Tribeni	100	1. 10. 76
Ghosh Ramesh Chandr	Haradurgadham, Abdul Kuddar Road, P. O. Titagarh 24-Pargs	1200	1. 10. 76
Present Add :— Risra Seva Sadan, C/o M. T. C. Ward P. O. Rishra, Hooghly Dist.			

৭/১১/71 Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১২ টাকা ষাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

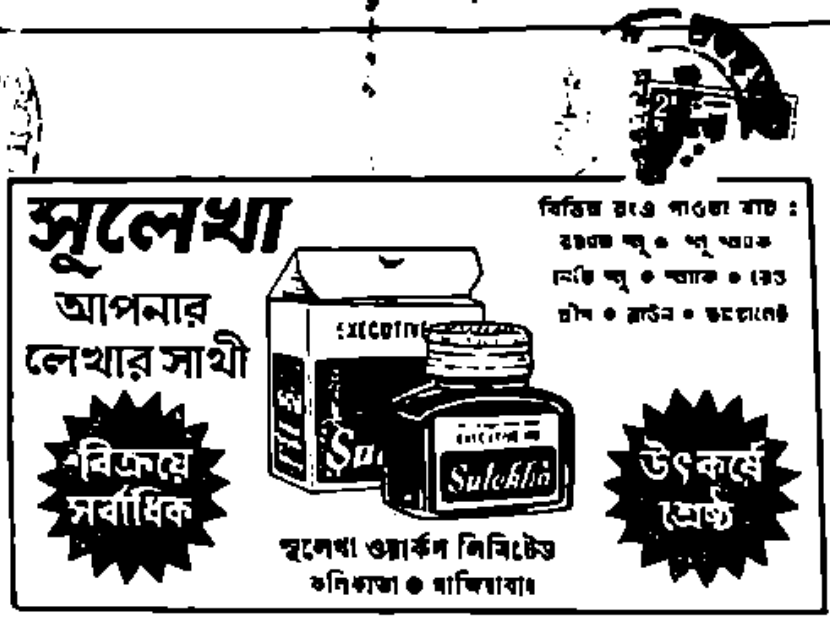

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীসাজি পরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বোম্বাই—শ্রীমধুগোপাল পালি।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবীরু গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্য অফিস :—৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

UNIVERSITY OF CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ ৩রা জুন, ১৯৭৮	৩৫ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

জালি বোটের লড়াই

সম্পাদকীয়

কেন এমন হল ?

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মলিনী মোহন দাশগুপ্ত

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। শ্রীকীরোদ দত্ত ॥

নেতৃত্ব

। কৌটিল্য ।

রবীন্দ্র স্মরণে

। শ্রীসংকীর্তন বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে—সারা জীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে—নিজেকে বিলিয়ে কাঙাল হয়ে যেতে হবে—প্রতিদানে কিছু না চেয়ে।

—নেতাজী

সম্পাদকীয়

জালি ভোটের লড়াই

ভারতবর্ষের গণতন্ত্র জনতা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাম ঝোঁকে ঝুঁকিতেছে। বাম অতি বাম, তস্য বাম—অর্থাৎ পেঁয়াজের মত যতই ছাড়াইবে ততই খোসা পাওয়া যাইবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কি থাকিবে তাহা না-বলাই ভাল। আর. এস. এস. এবং নব্য হিন্দু-বাদের দাপটে এই বামেরা কে যে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িবেন, তাহা বলা দুষ্কর। ইতি-পূর্বে বামীয় জাতগোষ্ঠিরা যখন একজোট ছিল তখন ন্যাংমারামারির খবরটা বাইরে তেমন প্রকাশ পায় নাই। ভাবটা এই আমরা পার্টি সভ্যরা সব ঠিক আছি। বেশ ভাল কথা বেঠিক কিছু আছে এমন কথা কে বলিতেছে। তবু মাঝে মাঝে উষ্ণ বাষ্প এদিক ও দিক বহিয়া থাকে। তাই রাজনৈতিক হাওয়াবীদেরা আবহাওয়া দেখিয়া মনে মনে আশঙ্কা করিতেন, বাতাস আউল বাউল বহিতেছে। চীন ভারত আক্রমণ করিয়া এত দিনে মনের গলদটা বাহির করিয়া দিয়াছে, তরফ দুইটা হইল। বড় তরফ আর ছোট তরফ। সি. পি. আই, সি. আই. আই. এম.। এই চক্রের কারসাজিতে 'স্বাধীনতা' ডুবিল। যাইহোক, তরফা লড়াই আজও চলিতেছে। সংবাদ পত্রে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতির পালাগান চলিতেছে। এক ধুয়া আমরা সাচ্ছা ওরা ঝুটা কে সাচ্ছা কে ঝুটা তাহা ঘটনাচক্রে ক্রমশই আবর্তিত হইয়া উঠিতেছে।

ভারতীয় গনতন্ত্রকে মধ্যস্থলে রাখিয়া দুমুখো সাপের দুই মত দিক হইতে ও বলে তুই গ্রাস কর এ বলে তুই গ্রাস কর। গ্রাস-কার্য সমাধা না হইলেও দুই মুখের বিষাক্ত নিশ্বাসে, যেটুকু স্বাভাবিক গণতন্ত্র ছিল তাহাও যায় যায়, তাহার নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। সি. পি. আই. এম নেতা ভারতের গণতন্ত্রকে শুধু গণতন্ত্র বলিতেছেন না। ইহার সঙ্গে আর একটা উপসর্গ জুড়িয়া দিয়াছেন। ভিরিশ বছরের গণতন্ত্রী খোকার নাম হইল 'জনগণতন্ত্র'। ইহা বলতে গণতন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে গতিপ্রবণ প্রগতিশীল হইল। আর বুর্জোয়াদের স্পর্শদোষ এড়াইয়া গনতন্ত্র অতি বাম হইল। রক্তের দোসর সি. পি. আই বসিয়া আই। তাদের নেতারা হাত গুটাইয়া বলিলেন, আরে ছো, জনতা সরকারের সঙ্গে দোস্তী করিয়া কখনও গণতন্ত্র রক্ষা করা যায়? যারা বাইলাডিলা, পন্থনগর ও আগ্রাতে রক্তের হোলী খেলিয়া গণতন্ত্রের ফাটা কপালে রক্ত তিলক পরাইল তাদের সঙ্গে আবার সমঝোতা।

ভারতবর্ষের বাম জনতা (ওরা বলেন, Revolutionary mass) একদিনে প্রকৃত পথের সন্ধান পাইয়াছে। এই পথে তাদের গলায় দড়ি টানিতে হইলে, একা দড়ি টানিয়া গুছাইয়া ওঠা যাইবে না তাই বাম জনতাকে, দড়িটানা করিবার জন্য একটি আঁতাত চাই। আর সে আঁতাত রক্তের দোসর সি. পি. আই. এম-এর সঙ্গে। একবার

সমঝোতায় রাজী নয় আবার পরক্ষণেই আঁতাত চাই। তবে সে আঁতাত গণ-আন্দোলনের জন্য। অবশ্যই সেটা জনতা সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু সি. পি. আই. এম. এর টিকি বাঁধা জনতা সরকারের সঙ্গে তাহার কি হইল? ই. এম. এস. নম্বুদ্রিপাদ, আসলে নম্বুদ্রিপাদ ব্রাহ্মণ, ছুতিস্পর্শ রোগ তার আছে, কিন্তু মার্কসীয় মতে দীক্ষিত হইবার পর তার পূর্ব্ব রোগ মুক্ত হইয়াছেন। তাই বলিয়া সি. পি. আই-এর সঙ্গে গাঁট ছড়া বাঁধার আপত্তি নাই, এমন কথা হইতে পারে না। কারণ সি. পি. আই. এখনও ইন্দিরা কংগ্রেসকে সমর্থন করে। অন্ত যার সঙ্গে মোলাকাৎ হয় হোক, কংগ্রেসের সঙ্গে নয়। আজন্মশত্রু কংগ্রেস, তার সঙ্গে নয়। তারচেয়ে বরং নব্য হিন্দুবাদী জনসঙ্ঘ—শিশুকালের নাম, বর্ত্তমানে জনসাধারণের আদালতে এফিডেভিট করিয়া নাম মিলেছে 'জনতা'।) ঢের ভাল। অনন্ত আশুশ্রাদ্ধে—অর্থাৎ ইন্দিরা রাজনৈতিক আশুশ্রাদ্ধে, শিওখানে ওখানে নিশ্চয়ই চাল কলা পাওয়া যাইবে। অতি উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বাদী আর অতি উগ্রমার্কসবাদী,—এই দুই উগ্রে মিলিয়া দুই দিকে ভারতের সমাজকে টানিতেছে। মাঝ হইতে সি. পি. আই মেডা রাবেশ্বর রাও তৃতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষ বলিয়া হুঙ্কার দিতেছেন। আসলী গণতন্ত্র তৃতীয়পক্ষের পক্ষপুটে আটকা পড়িয়াছে। পক্ষপটগ্রস্ত গণতন্ত্রকে লইয়া আগাইয়া যাইতে পারিলে জনতা এবং কংগ্রেসই-র বিকল্প হিসেবে তৃতীয় শক্তি ভারতে হাঁটুভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। মৌতাত ভাল জমিয়াছে, স্বপ্নও রঙীন বটে, তবে ফিকে লালের অংশ কিঞ্চিৎ বেশী। এদেশে ত আর কেহ নাই, ওরাই জাগিয়া আছেন—এই ভাব। সে যাহাই হোক, সবাই যদি ঘুমায় আর ওরা জাগিয়া অমন স্বপ্ন দেখেন তাহার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ই. এম. এস. নম্বুদ্রিপাদের কথায় ঘর ভঙ্গ হইবার লক্ষণ যা দেখা দিয়াছে। ওরা নাকি মৎলবটা (সি. পি. আই-এর মৎলবটা) ঠিক ধরিয়াছেন। সি. পাই. আই. এবং সেন্ডিয়েৎ উভয় মিলিয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক পুনর্বাসনের নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি সোভিয়েৎ বা সি. আই যতটা ব্যস্ত তার চেয়ে বেশী ব্যস্ত সি. পি. আই. এম নিজে। জনসঙ্ঘ মৃগচর্ম্মের আড়ালে টানা চামড়া গায় জড়াইয়া, জনতার কাঁধে চাপিয়া, নিজেদের রাজনৈতিক পুনর্বাসন পাইবার মানসে ভারতের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। আর নম্বুদ্রিপাদ বলিতেছেন। জনতার সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ সি. পি. আই. এম এর—মতভেদ আছে। তবে হাঁ, জনতা সরকার গণতন্ত্রের ডোবা জাহাজটাকে টানিয়া তুলিয়াছেন, তাই ধড়িবড়া টানিবার জন্য সঙ্গে আছি। বরাবরই ডালি বোট ছিলাম, তখন সোভিয়েতের ছিলাম, এখন জনতা সরকারের হইলাম। পট পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু ভূমিকা পূর্ব্ববৎ।

———

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

অল্পবয়স্ক বিপ্লব কর্মীদের কর্মপ্রবণ এবং দুঃসাহসিক করে তোলাই ছিল সমিতির উদ্দেশ্য। এজন্য কোন কোন কর্মীকে মাঝে মাঝে এমন সমস্ত কর্মে নিয়োগ করা হতো যাতে সে কোন আনন্দ বা তৃপ্তি অনুভব করতে পারত না। কোন কোন কর্মীকে কয়েকদিনের জন্য নির্জন স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেখানে কী জন্য তাকে পাঠানো হচ্ছে তাও বলে দেওয়া হতো না। সমিতিতে ৭।৮ খানা সাইকেল ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তার আন্তরিকতা পরীক্ষা করবার জন্য তাকে দূরের রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে বলা হতো। সে সম্পর্কে কোন প্রকার প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল না। অনেক সময় নির্দেশ পালন করা কর্মীর সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু তা জেনেও সে ওই নির্দেশ পালনে অগ্রসর হতো এবং পরে তাকে ওই কার্য থেকে নিবৃত্ত করা হতো। কর্মীর সাহস এবং দায়িত্ববোধ পরীক্ষা করবার জন্যই এরূপ করা হতো। তরুণ কর্মীদের মনে এমন কর্ম চাঞ্চল্য জেগে উঠেছিল যে তাদের মধ্যে কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেত না। তারা চাইত আরও কাজ। কিন্তু বালসুলভ চপলতা বশতঃ মাঝে মাঝে কোন কর্মী কোন রূপ লঘু অপরাধ করে ফেলত। এজন্য সমিতি ভবনে কয়েক প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। প্রথম শাস্তি—কর্মীকে নুন ছাড়া ভাত খেতে হবে। অপরাধ অনুসারে একদিন থেকে সাতদিন পর্যন্ত এর মেয়াদ ছিল। দ্বিতীয় শাস্তি—বালিশ ব্যতীত শয়ন। তৃতীয় শাস্তি—কয়েকদিনের জন্য প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ। চতুর্থ শাস্তি সমিতি নিবাসের সহকর্মীদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। পঞ্চম শাস্তি—কাজকর্ম বন্ধ। নির্জন স্থানে বন্দী অবস্থায় থাকতে হবে। আহারাদি সেখানেই পাবে।

সমিতি নিবাসের দ্বিতলের যে কক্ষে পুলিনবাবু থাকতেন, সেই ঘরেই চুপুরে সাইকেল রিওলবার প্রভৃতির সংস্কার হতো। অস্ত্র ব্যবহারের কৌশলও নূতন সভ্যদের সেখানে শেখানো হতো। শিসা গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে বুলেট তৈরী করা হতো। শূন্য খোলের মধ্যে বারুদ ক্যাপ এবং বুলেট ভরে মেসিনের চাপে কার্তুজ প্রস্তুত করা হতো এমন গোপনে এ সব করা হতো যে সমিতির নিবাসের সাধারণ কর্মীরা এর বিন্দু বিসর্গ জানতে না পারে। কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র সমিতি থাকতে কিন্তু বেশীর ভাগ অস্ত্র-শস্ত্রই রাখা হতো শঙ্খনিধি, জাহাজ-মোহন সাহা উয়ারিশন্থ বাগান বাটির ভূগর্ভে এক গোপন কক্ষে। দেশ ও জাতির কল্যানের জন্য বিভিন্ন রূপ সমিতি অগ্রসর হতো। এজন্য সাধারণ শ্রেণীর নরনারীর মধ্যেও অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে একটা গভীর আস্থা জন্মেছিল। স্থানীয় লোকদের মধ্যে কলহ বিবাদ অথবা অন্যকোন প্রকার অশোভনীয় অবস্থার উদ্ভব হলে তারা পুলিনবাবুকে মীমাংসার জন্য ডাকতেন, পুলিনবাবু নিজে না যেতে পারলে কোন প্রতিনিধিকে সেখানে পাঠাতেন।

বিখ্যাত কাপড়ের কারবারী ঢাকেশ্বরী কটন মিলের মালিক মানিকগঞ্জের মোক্তার রজনী বসাক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওই মহকুমার সকল সমিতির ভারবহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। একবার তিনি মহকুমার সকল শাখা সমিতিকে নিজগৃহে আমন্ত্রন করেন। এই উপলক্ষে লাঠি-খেলা এবং অন্যান্য ক্রীড়া কৌশলের আয়োজন হয় তিনি বিজয়ীদের পুরস্কারও দেন। কিন্তু উৎসবের শেষদিনে পুলিনবাবু, রজনীবাবু এবং অন্যান্য কয়েকজন তরুণ কর্মীদের গ্রেপ্তার করার জন্য পরোয়ানা জারি করা হলে সরকার পক্ষ থেকে। অভিযোগ—অনুষ্ঠানে রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় দারোগা এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ রজনীবাবুর পক্ষে থাকায় ব্যাপার বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নাই।

এই সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে দেশের মধ্যে সর্বত্রই স্বাধীনতার এক অদম্য স্পৃহা জাগ্রত হয়। এছাড়া জামালপুর, কুষিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে সরকারী উস্কানির প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের প্রতি বিরোধিতার লক্ষণ দেখা দেয়। এরফলে হিন্দুদের মধ্যে এক শ্রেণী অনুশীলন সমিতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমিতি এবং মহকুমার

৪ পাতায় দেখুন

কেন এমন হল?

অসংখ্য ভারতবাসীর আত্মত্যাগের এবং কর্মপ্রচেষ্টায় আমাদের ২০০ বছরের পরাধীনতার শিকল কেটে গেছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। মুখাগ্নিতে সেদিন ছিল বাঙ্গদের শক্তি গণচিত্তে সেদিন ছিল স্বাধীনতার আহুতি। আমা অজানা কত ভারতবাসী তাদের জীবনের কর্মসাধনা উজাড় করে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতার সংগ্রামে। আমাদের পরাধীনতা ছিল ২০০ বছরের এবং সংগ্রাম চলেছিল ২০০ বছর ধরেই। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও এই দুশো বছরেরই ইতিহাস। পলাশীর ক্ষেত্রে সেদিন ইংরেজের বীরত্ব জয়ী হয় নাই, জয়ী হয়েছিল ইংরেজের শঠতা। তাই ভারতের স্বাধীনতা সূর্য যখন অস্ত গেল পলাশীর সন্ধ্যার ওপারে তারপর দিন থেকেই আমাদের সংগ্রাম শুরু হল। বিপ্লবের রক্ত রাঙ্গা পথে আত্মভোলা একদল ভারতীয় নরনারী অগ্রসর হল সমরাঙ্গনে আত্মাহুতিকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করে। কিন্তু তাদের এই আত্মবলিদান কি সফল হয়েছে? তাদের এই স্বপ্ন সাধনা কি সার্থক হয়েছে। কবি প্রশ্ন করেছেন—

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান
আজি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা নিয়ে কোন বলিদান।

স্বাধীনতার ত্রিশটি বৎসর পরে আজি এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে? আজ সর্বত্র শুনছি যে স্বাধীনতা আমরা চেয়েছিলাম এ স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা নয়। ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছে বটে কিন্তু মুক্তি আমাদের আসেনি। অন্যায় অত্যাচার শোষণ এবং নিপীড়ন সেইরূপই রয়ে গেছে। বরং আগের থেকে ভারতের স্বাধীনতা আইনে অগণিত ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশা বহুগুণ বেড়েছে। একদল ভারতবাসী আজ ঐশ্বর্যিক রাষ্ট্রে আত্মগ্লানিময় জীবন যাপন করছে জীবনের সার্থকতা কোথায় তারা খুঁজে পায় না। কেহ বা গৃহহীন, অন্নহীন বন থেকে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, শুধু কুকুর বেড়ালের মত জীবন ধারণের তাড়নায় তারা গুরুত্ব বন থেকে ছুঁচর বন এবং সুন্দর বন থেকে হুতুম বন করছে। এদের পুর্ণবাসনের প্রতি আজ জাতি উদাসীন কেন শুধু অন্ন সংস্থান হলেই গৃহহীনের পুর্ণবাসন হয় না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য দেহ এবং মনের পরিপূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন। পুর্ণবাসনের জন্য বনে জঙ্গলে কোথাও একটু মাথা গুজবার ঠাঁই পেলেই কি পুর্ণবাসন হল? শুধু স্বাধীনতার এই ভিটে ছাড়া কলই আজ গৃহহীন নয়। এরাই শুধু অন্নহীন নয় এছাড়াও আছে সর্বহারার দল। যারা নূতন ভাবে ভিটেছাড়া হয়ে আজ গ্রাম থেকে শহরে এসে ভীড় করেছে। যারা প্রতিদিনই ঘুরে ঘুরে মরছে। দুটি অন্নের জন্য পিতৃ পিতামহের ভিটে ছেড়ে এরা শহরের ঘাটে পথে এসে গৃহস্থালী পেতেছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, কুটপাথেই জন্ম, কুটপাথেই মৃত্যু, সন্তান সন্ততি নিয়ে কুটপাথেই বাস। এই এদের নিয়তি। আজ এই আমাদের স্বাধীনতা চিত্র। এই জন্যই কি লক্ষ লক্ষ তরুণ দল সেদিন আত্মবলিদান দিয়েছিল। এই স্বাধীনতার স্বপনই কি সেদিন তারা দেখেছিল কিন্তু কেন এমন হল। এর জন্য দায়ী কে? আজ কে এর উত্তর দেবে?

(৩ পাতার পর)

পরলোকে স্থানান্তরে চলিয়ে পড়ে। এই সকল কর্মীদের মধ্যে সাটিরপাড়া হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র হৈমন্তী চক্রবর্তী, বারোদি হাইস্কুলের দেড় পণ্ডিত ধরোদা সুধার ভট্টাচার্য্য এবং ঢাকা কলেজের ছাত্র প্রকাশ পাকড়াশীর নাম উল্লেখযোগ্য। পুলিনবাবু কর্মী, বালক ও যুবকদের নিয়ে মাঝে মাঝে নানা স্থান ভ্রমণ করতেন। অনুশীলন সমিতির কর্মীরা কোন গ্রামে উপস্থিত হলেই রমণীগণ উলুধ্বনী দিতেন এবং বয়স্কারা ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করতেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে অনুশীলন সমিতির কলকাতা বৈঠকেই ডাকাতি-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। পুলিনবাবু ঢাকায় এসে এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি যুবক সংগ্রহ করেন। এই সময় স্বাধীবাগের পিছন দিকে এক নির্জন স্থানে রাত্রিতে কাগজের উপর টর্চলাইট ফেলে এই সকল কর্মীকে রিভলবারের গুলি ছোড়ার শিক্ষা দেওয়া হত। শশী সরকার নামে এক কর্মী এই সময় সমিতির সদস্যভুক্ত হন। ইনি সুদক্ষ লক্ষ্যভেদী ছিলেন। বিভিন্ন সময় কর্মীদের শশী সরকারের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হত। তিনি শিকার উপলক্ষ্যে তাদের জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে রাইফেল ছোড়া অভ্যাস করাতেন। ক্রমে সমিতির জন্য একটি বড় এবং একটি ছোট নৌকা কেনা হল এবং এই সকল নৌকা চালাবার জন্য নমশূদ্র মাঝি নিযুক্ত করা হয়। বিপ্লবী কর্মীদল বিভিন্ন নদীতে গিয়ে ঐ সকল মাঝির সাহায্যে নৌ চালনা শিক্ষা করতেন। এর ফলে ডাকাতির শিক্ষা নবীনী আরম্ভ হল এবং কৃত্রিম ডাকাতির মহড়া চলতে লাগল। কর্মীগণ রাত্রিতে নিদ্রা না গিয়ে কৃত্রিম ডাকাতির অভিনয় করে কোন নিরাপদ স্থানে সরে পড়তেন। এইরূপ ছয়মাস যাবৎ অভ্যাসের ফলে বোকা গেল কর্মীগণ ডাকাতির জন্য যোগ্য হয়েছে। তাদের এবারে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের নানাস্থানে ছোট ছোট রাহাজানিতে নিয়োগ করা হতে লাগল। সন্ধ্যার পরে ব্যবসায়ীগণ অর্থ নিয়ে যখন বাড়ী ফিরতেন তাদের আক্রমণ করা হত। নরহত্যা বিশেষ ভাবেই নিষিদ্ধ ছিল।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[সাংবাদিকতা]

এখন কিছুক্ষনের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বন্ধ রেখে আমার নিজের একটা ব্যক্তিগত কাজের কথা বলা প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে তো আমি আমার ভূমিকা ও অংশ করে দিই। আমার এই ব্যক্তিগত কাজও আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনকে খুব সাহায্য করেছে বলেই আমি মনে করি।

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ভারতে যে সংবাদপত্র ছিল, তা এখনকার মত এত সরব ও শক্তিশালী ছিল না। সে সময়ও সংবাদ পত্র প্রচার কার্য্যের একটা বড় রকমের হাতিয়ার ছিল। আমার মনে হল যে আমাদের রাজনৈতিক কাজে সহায়তার জন্য আমাদের একটি নিজস্ব মুখপত্র থাকা প্রয়োজন। কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদনায় একান্তিক হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার দৃষ্টান্ত আমার সামনে ছিল। হিন্দু-প্যাট্রিয়ট পত্রিকা বাংলার তো বটেই, সারা ভারতেই সর্বপ্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র ছিল। এই পত্রিকা জন-মানসে ও সংকারের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভাবলাম, আমি নিজে স্বাধীনভাবে একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে পারি, অথবা পূর্ব থেকে প্রকাশিত অন্য কোন পত্রিকার যোগদান করতে পারি। দ্বিতীয় পন্থাটিই গ্রহণ করা স্থির করলাম। আমি সব সময়ই পুরাতন জিনিষ উপরই কোন কিছু গড়তে পছন্দ করি। সারা জীবন ধরে একেবারে নতুন কোন কাজে হাত লাগানোকে এড়িয়ে চলেছি। আমার বিশ্বাস এবং হয়ত পূর্বপুরুষের প্রাপ্ত সহজাত ব্রাহ্মণ সংস্কারই আমাকে অতীতের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছে। আমি সব সময়ই পুরাতন ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়েছি পুরাতনে যে কিছু ত্রুটি যে সর্বোত্তম, তা আমি কখন মনে করিনি। তবে নতুন সংগঠনের গোড়াতে পুরাতনকেই নতুন ছাঁচে ঢালতে আমার ভাল লাগে।

কয়েকটি আকস্মিক ঘটনার সমাবেশ আমাকে আমার নিজের একটি মুখ-পত্র প্রকাশে সাহায্য করল। সেই সময় বাবু যোগেন্দ্র চাটার্জি বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। তিনি নিজেই ছিলেন তার স্বত্বাধিকারী। পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা কমে যায়। গ্রাহকের সংখ্যা দুই শতের বেশী ছিলনা। এ ব্যাপারে তাঁর ও আমার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হল। আমাদের উদ্যোগেই বন্ধু স্বর্গত বাবু রমানাথ রায়ের মাধ্যমে এই যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বাবু রমানাথ রায়ের নাম এখন লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছে। কিন্তু গত শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে তিনি হাইকোর্টের একজন সুপরিচিত সলিসিটর ছিলেন। বর্তমানে হাইকোর্টে যত ভারতীয় সলিসিটর আছেন। কিন্তু সেই দিনে গিবিনচন্দ্র বানার্জি (মিঃ ডব্লু. সি. বানার্জির পিতা) এবং রমানাথ রায়ই আইন ব্যবসায়ে আমাদের দেশের শক্তি সামর্থ্য করায়ত্ত, তা দেখিয়েছেন। তিনি যেমন ছিলেন একজন সুযোগ্য আইনজীবি তেমনি ছিলেন একজন অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর মাধ্যমে এই যোগসূত্র স্থাপন সম্পূর্ণ সার্থক হল। ১৮৭৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে আমি বেঙ্গলী পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক হলাম। পত্রিকার ক্রয়ের জন্য আমি যোগেশ বাবুকে প্রস্তাবের জন্য একটা লৌকিকতার নিদর্শন স্বরূপ কিছু টাকা দিলাম। তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এখন আমাকে বলতে হচ্ছে যে তিনি এর বেশী দাম করতে বা নিতেও চাননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিনা মূল্যেই পত্রিকাটি দান করতে

চেয়েছিলেন। কিন্তু বাবু রমানাথ লাহা বললেন যে ব্যাপারটাকে আইনসিদ্ধ করার জন্য কিছু টাকা দেওয়া দরকার। তাই তিনি এই সামান্য টাকা গ্রহণ করলেন। প্রেসের জন্য ১৮০০ টাকা দেই। সেজন্য এক বন্ধুর কাছ থেকে আমাকে ৭০০ টাকা ধার করতে হয়েছিল। দু বছর পরে সে ধার আমি শোধ করি। সেজন্য আমাকে কোন সুদ দিতে হয়নি। কারণ, আমার বন্ধু কোন সুদ নেবেন না। এই সমস্তই অতি সামান্য ঘটনা। তথাপি এই সামান্য ঘটনারও উল্লেখ করলাম এই জন্য যে অনেকের কাছ থেকে সহিচ্ছা ও মৌন আশীর্বাদ লাভ করেছি। সেই সহিচ্ছা ও আশীর্বাদের মধ্যে বেঙ্গলী পত্রিকা আমার তত্ত্বাবধানে এসে পড়ল।

সংবাদপত্র পরিচালনার মধ্যদিয়ে কোন প্রকার ব্যবসা করার ছায়ামাত্র অভিপ্রায়ও আমার ছিলনা। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র প্রেরণা ছিল জন-সেবা-যে কাজের সঙ্গে আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে দিয়েছি। প্রতিদানে কিছু গ্রহণ না করে, পত্রিকার সম্পাদনার ভার হিন্দের হাতে রেখে পত্রিকাটি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনকে দিয়ে দিতে চাইলাম। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অন্য সমস্ত খরচ বহন করবে। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকাটি ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পত্তি। আমি ভাবলাম, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনও সেই রকম একটা সম্পত্তি বেঙ্গলী পত্রিকার ঘাড়ে চড়ে তুলুক। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা অসুবিধা ছিল, পত্রিকাটি চলছিল লোকসানে। অপরপক্ষে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হল একটি নতুন সংগঠন। তার অর্থসঙ্গতিও ছিল সীমাবদ্ধ। সুতরাং এসোসিয়েসন মনে করল যে বেঙ্গলী পত্রিকার পরিচালনার আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা সুবিবেচনার কাজ হবে না। পরবর্তীকালে যা ঘটেছে তা বিচার বিবেচনা করে দেখলে এ কথাই বলতে হয় যে এসোসিয়েসনের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞজনোচিতই হয়েছিল। কোন রাজনৈতিক সংগঠন, যার বিশেষ কার্যক্রম আছে, যার নিজের বহুবিধ কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তারপক্ষে সমান দক্ষতার সঙ্গে বেঙ্গলী পত্রিকার মত ব্যাপক ও ক্রম-বিস্তারিত প্রচার বিশিষ্ট পত্রিকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। যাকগে, আমি ভাবী ঘটনার পূর্বোল্লেখ করে ফেলেছি।

১৮৭৯ সালে জানুয়ারী মাসে আমি যখন বেঙ্গলী পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক হলাম, তখন এটি ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ঐ সময়ে কেবলমাত্র "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকা ছাড়া বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী পত্রিকা সমেত আর সব পত্রিকাগুলিই ছিল সাপ্তাহিক। টাটকা খবর পাওয়ার জন্য তখন সাধারণভাবে লোকে খুব উৎসুক ছিলনা, এবং ভারতীয় পাঠকগণ সপ্তাহে একবার সংবাদ ও তার উপরে মন্তব্য পাঠ করতে পারলেই খুশী থাকতেন। আমার বেশ মনে আছে ঐ সময় একবার গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলের হেড-মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন, তিনি সাত দিন ধরে বেঙ্গলী পত্রিকা পড়েন (বেঙ্গলী তখন সাপ্তাহিক ছিল); কিন্তু বেঙ্গলী যদি দৈনিক পত্রিকা হয়, তাহলে তা নিয়ে তিনি কি করবেন, ভেবে পাবেন না। ত্রিশ বছর আগে বাঙ্গালী পাঠকদের মনের অবস্থা এই রকমই ছিল। দৈনিক পত্রিকার প্রচলন অতি সাম্প্রতিককালের ঘটনা। বর্তমানে দৈনিক পত্রিকা আবার এসে সাপ্তাহিক পত্রিকাকে এমন-ভাবে বাতিল করে দিয়েছে যে কোন সাপ্তাহিক পত্রিকারই কোন দৈনিক পত্রিকার সহযোগী পত্রিকা হিসাবে ছাড়া বহল প্রচারের সম্ভাবনা নেই।

আমার সাংবাদিক কর্ম প্রয়াসের প্রথম দিকে আমাকে স্বর্গত আশুতোষ বিশ্বাস নিঃস্বার্থভাবে বহু ও শ্রম স্বীকার করে সাহায্য করেছেন। তার জন্য আমি শোক প্রকাশ না করে পারি না। একটি জন-সভায় আমি তাকে প্রথমে আবিষ্কার করলাম। ওয়েলিংটন স্কোয়ার মিশনারী বোসাইটিস্ ইন্‌স্টিটিউসনে ঐ সভা হচ্ছিল। সেখানে আমি চৈতন্য দেবের উপরে এক বক্তৃতা করেছিলাম। তিনিও সেই সভায় বক্তৃতা করলেন। তার বক্তৃতায় আমি অতিশয় মুগ্ধ হই। তার বক্তৃতায় কথা বেশী ছিলনা; কিন্তু যা বলেছিলেন তাঁর মধ্যে যেমন ছিল বাগ্মিতা, তেমনি ছিল তা প্রাণস্পর্শী এবং আন্তরিকতাপূর্ণ। এই বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে তার স্বকীয়তা প্রকাশ

পেল। আমি তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আহ্বান জানালাম। এই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ছিল। তিনি আমাকে তাঁর "গুরু" বলে ডাকতেন। এই "গুরু" সম্বোধন কেবলমাত্র মুখের কথাই ছিলনা। তিনি বাস্তবিকই আমার একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি আমাকে এমন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন যা আজকালকার দিনে দেখা যায় না।

পত্রিকাটি প্রতি শনিবার সকালে প্রকাশিত হত। এজন্য শুক্রবার রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কাজ করতে হত। প্রুফ সংশোধন করা, প্রয়োজন হলে নতুন কপি প্রস্তুত করা এবং প্রিন্টারকে নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি কাজ রাত্রে আমাদের করতে হত। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত বেশ কিছুটা একঘেয়ে এই নীরস কাজে আমার সঙ্গীত ও সহকর্মী ছিলেন। ১৮৮৪ সালে তবানীপুর থেকে "গাড়িয়ান" নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে, এই সময় থেকেই আশুতোষ সেই পত্রিকাটিকে সাহায্য করতে আরম্ভ করেন। আজ তিনি মৃত, তিনি চলে গেছেন। একটি শোচনীয় অপরাধমূলক কাজের তিনি শিকার হয়েছেন। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে তার প্রতি আমার ঋণ স্বীকার করছি এবং তাকে স্মরণ করছি।

আইন ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধুর সাংবাদিকতার প্রতি আকর্ষণ আগের মত আর থাকল না। তা ঢিলা হতে ও কমে যেতে শুরু করল। অবশেষে এ কাজের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই রইল না। কিন্তু আমাদের আন্তরিক বন্ধুতার সম্পর্ক শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল, এবং যখনই কোন আইন ঘটিত ব্যাপারে পরামর্শের জন্য তার কাছে গিয়েছি তিনি আনন্দে সে পরামর্শ দিয়েছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি আমাদেরই দলভুক্ত ছিলেন, এবং বেঙ্গলী পত্রিকার সঙ্গে যখন যুক্ত ছিলেন তখন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কাজে সাহায্যের জন্য একবার উত্তর ভারত পরিক্রমায় গিয়েছিলেন। এটা একটা অদৃষ্টের পরিহাস যে এই রকম একজন লোককে এনার্কিষ্ট উপদ্রবের বলি হতে হয়েছে তার অপরাধের মধ্যে মাত্র এই ছিল যে তিনি আলিপুর বোমা মামলা নামে কথিত মামলায় সরকার পক্ষের উকিল রূপে মামলাটি পরিচালনা করছিলেন। সেদিনে ফৌজদারী মামলায় তিনি একজন বিচক্ষণ উকিল ছিলেন এবং আসামীদের তার আইন ঘটিত নৈপুণ্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে ভয় করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাকে হত্যা করার পেছনে এই মূলত কারণ ছিল আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টের পরিবেষ্টনীর মধ্যেই একজন এনার্কিষ্ট, যে তার একখানা হাত একরকম ব্যবহার করতেই পারত না) তাকে গুলি করে হত্যা করে, এর আগে তাকে ভয় দেখিয়ে পত্র দেওয়া হয়েছিল এবং সরকার পক্ষ থেকে পুলিশ দিয়ে তার নিরাপত্তা রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন অদৃষ্টবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন অদৃষ্টের বিধান থেকে কোন মানুষী শক্তি তাকে রক্ষা করতে পারবে না। তাই তিনি পুলিশী রক্ষা ব্যবস্থায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

(চলবে)

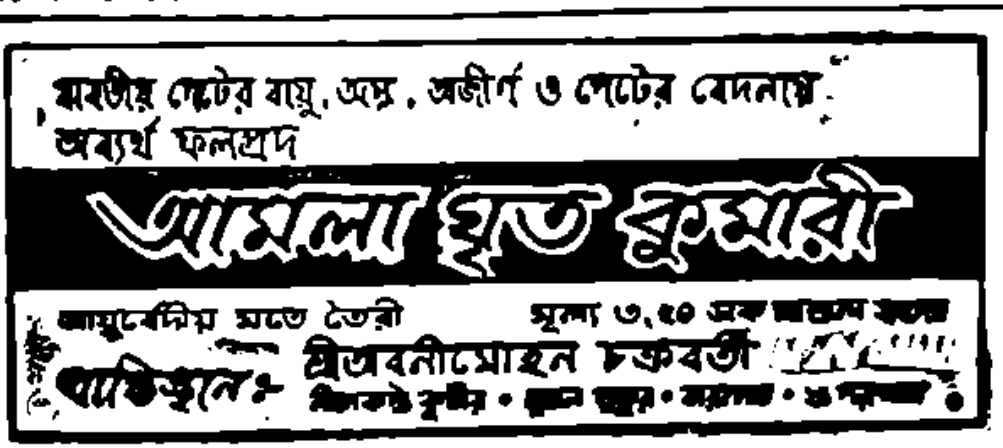

নেতৃত্ব

—কৌটিল্য

বিয়াল্লিশের (১৯৪২) ব্রিটিশ বন্ধু কম্যুনিষ্টপার্টি সাতচল্লিশে ১৯৪৭) উগ্র কংগ্রেস বিরোধী, উৎকট বৈরী কলকাতার পাকে পাকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে আতপ্রাদ্ধ অনেক হয়েছে, কিন্তু এই শ্রাদ্ধের পিণ্ডদান গ্রহণ করতে রবাহূত কাক কোকিলেরা আসেনি। এসেছে পার্টি সমর্থক, সভ্য, সহযাত্রীরা। গান্ধিজীর ব্যঙ্গ কৌতুকাভিনয় হয়েছে। 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম'—এরও parody হয়েছে। তথাকথিত গণসঙ্গীত গেয়ে,—'মাউন্টব্যাটেন তোমার ব্যাটন দিয়া গেলা কারে।' জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। এই সব ঘৃণ্য প্রহসন সঙ্গীত, ব্যঙ্গ কটূকাটব্য কংগ্রেস কর্মীরা কিন্তু দুই চোখ ভরে দেখেছে ও শুনেছে। একটা প্রশ্ন, বার বার উঠেছে, দেশ গঠনের সঙ্গে এই জাতীয় রাজনৈতিক কর্মের সঙ্গতি কোথায়। কিন্তু ওরা মৌলিক চিন্তায় একটা নীতি স্থির করে নিয়েছে যে, আমরা অর্থাৎ ওদের পার্টি যাদে আর সব চিন্তা ভুল, ভুয়া এবং ঝুটা। বিক্ষুব্ধ নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের যুবকদের সামনে এসব উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তেলেভাজা যেমন আপাত ক্ষিদে ভাব সৃষ্টি করে, পরে পাকস্থলীতে বিক্রিয়া করে। তার পরে শুরু হয় উদ্গার রোগ। পেট ফাঁপা ও লম্বা চোয়া ঢেকুর। এও ঠিক তাই মার্কসবাদের গোটা কয়েক চিরপরিচিত মুখরোচক বুলি তরুণ যুবকদের গিলিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক পাকস্থলীতে উদ্গারযোগের সৃষ্টি করা, দায় নেই দেশ গঠনের দায়িত্ব নেই, কিন্তু তাসচুরের গুরুঠাকুর। এই মতবাদ রাজনীতির ও নেতৃত্বেও সুবিধা এই যে কৌজদারী বাসনার মত হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। আশুফলের কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব রণভঙ্গ বাজিয়ে দিলে।। রণভিতের রণভঙ্গ ঘেনীতুর পৌঁছালো না। ভারতের বিশাল জনতা এই সব বাদস্থলভ সশস্ত্র বিপ্লব নিদারুণ ঔদাসীন্যে পরিত্যাগ করল।

দেশ স্বাধীন হবার পর যাঁরা মার্কসীয় পন্থায়—শ্রেণী যুদ্ধ ও সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা দখলে বিশ্বাস করেন, তাঁরা অনেক চেষ্টা করেছেন। জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হতাশা সৃষ্টি করার চেষ্টা কম হয়নি। মহম্মদ আলীপার্ক থেকে একদিন সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেয়া হয়েছিল। সেই ডাকে তেলেভাজা, কাকদ্বীপ সশস্ত্র বিপ্লবের লক্ষ্যস্থল হিসেবে পরিণত হয়েছিল। আর কলকাতার চলিষ্ণু ট্রামগুলো ওদের বিপ্লবের হোলি খেলার কিছু আগুনে রঙে দেখা দিয়েছিল। হতাশাক্লিষ্ট নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের যুবকেরা বিপ্লবের স্বপ্নে এমন বিভোর হয়েছিলেন যে, একবার ভেবে দেখবার অবকাশ পেলেন না, যে জনগণকে নিয়ে এত টানাহেঁচড়া তারা কোথায়, ট্রামপোড়া বিপ্লবে, আর সুদূর গ্রামদেশে নিরাপত্তা বিহীন গোটাকয়েক জোতদার খুনেই বিপ্লবের শেষ পরিণত গিয়ে দাঁড়াল। পণ্ডিত জওহরলালের সভায়, বিরাট জনতার মাঝে বোমা ফেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পূর্ণ বিপরীত বাজ হলো এই যে, এরাই ব্রিটিশ যুগের জাতীয় বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী বলে প্রচার করতেন। এবং তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষার ওপরে জোলুষী ব্যাখ্যা চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা বোমা তৈরী ও ছাইকেল বোমাদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন পন্থাটা গুপ্ত হলেই তার সঙ্গে রোমাঞ্চ ও হঠকারিতা মিশে এক নোতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করে। এই উন্মাদনা আমাদের যুবকদের মধ্যে সেদিন এসেছিল। আর একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ব্রিটিশ যুগের চেয়ে স্বাধীনোত্তর যুগে গুপ্ত পন্থায় কাজ করা অনেকটা সহজ। কেননা দেশেই শাসন ব্যবস্থায় অনেক লোকই অখুশী ও বিক্ষুব্ধ। এই অখুশী ও বিক্ষুব্ধ ভাঙ্গকে মার্কসীয় রসায়নে ঘেঁটে অর্থাৎ শ্রেণী বিদ্বেষ ঘেঁটে এক নোতুন রসের উত্তেজনা সৃষ্টি করা যায়। এই উত্তেজনার মধ্যের নাম হলো প্রোলেতারীয় বিপ্লবী আন্দোলন চোখের সামনে সব সময়ই রক্তাক্ত বিপ্লবের স্বপ্ন ভাসবে। যুবকদের মগজ ধোলাইয়ের এমন অপূর্ব সুনিশ্চিত ধারাটাই ইতিপূর্বে সৃষ্টি হয়েছিল কিনা বলা মুস্কিল।

যাই হোক বিপ্লবের hit and run নীতি যখন সক্রিয় বেগে দেখা দিল, তখন অন্য পক্ষও সজাগ হয়ে উঠল। যুবের আর যুবকের অভিযান যখন চরমে উঠেছে তখন কেন্দ্রীয় সরকার নড়েচড়ে উঠলেন। কৃষক বিদ্রোহের নামে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের বাছাই বাছাই cadre (death

squad) পাঠিয়ে action করার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই হলো বুটা? আজাদীর যুদ্ধের প্রাক্কালীন বিপ্লব। জনগণ কথাটা অবিশ্যি এটা একটা abstract term)-এ পরিণত হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কল্যাণকামী কিছু ছাত্র, কিছু বেকার যুবক, কিছু ব্যর্থ কেরানী—এদের অন্তত সমন্বয়। concrete terme-এ এরাই পার্টির বনিয়াদ। এই class composition-এর মধ্যে কারখানার শ্রমিক সমাজকে ধরা হয়নি। এখানকার জনপ্রিয় আন্দোলন হলো দাবী এবং আরো দাবীর মাত্রা বৃদ্ধি। তাৎক্ষণিকের শ্রমিক সমাজের কল্যাণের জন্য যা কিছু করা হয়েছে সবই ভুয়া। বর্তমান ভারতের শ্রমিক সমাজের একটা প্রধান অংশ যে-সুখ-সুবিধা ভোগ করে তার সামান্যতম কিছু গ্রামের চাষী শ্রমিক পায় না, বা ভারতেও পায়ে না। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে চাই আরো চাই আন্দোলন জোরদার করার সুবিধা এই যে, একটা উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে রাখা যায়। এসব আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য সরকারকে কাবু করার কাজে নিয়োগ করার ব্যবস্থা। এই রাজনৈতিক অসভ্য উদ্দেশ্য আজও সফল হয়নি। তার কারণ, দেশের স্বার্থ রক্ষার কাজে, বৃহত্তর কল্যাণের কাজে শ্রমিক সমাজের যে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা তারা অনুধাবন করতে পেরেছেন। ভারত-চীন যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের শ্রমিক সমাজ যে আত্মনিয়োগের মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন তা ভারতের ইতিহাসে লেখা থাকবে। অবিশ্যি ইতিহাসকে বিকৃত করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা আজকাল দেখা যাচ্ছে। তাহলেও সত্য একদিন প্রকাশিত হবেই ভারতবর্ষের শ্রমিক সমাজের দেশহিতৈষিনা কারু চেয়ে কম নয়।

তেলেঙ্গানা অস্ত্রাগারে কিছু লোকের মৃত্যুর পর দলীয় নেতৃত্বের শক্তি-সামর্থ্য পরীক্ষার পর, অবশিষ্ট নীতি ও নৈরাশ্যের রোগে ভুগতে ভুগতে একদিন ওরা স্বীকার করলেন, নীতিতে ভুল ছিল। টিটোবাদীরা আমাদের মহৎ বিপ্লবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছে। ও ভাবে বিপ্লব সম্ভব নয়। অতএব যারা মরেছে মরু, বাকিরা প্রাণ বাঁচাও। অজয় ঘোষ মশাই ছুটে এসে পার্টিকে বাঁচাবার সঙ্কল্প নিলেন নোতুন চিন্তাস্রোতের দরজা খুলে দিলেন। সর্বত্রই প্রগতিমূলক চিন্তার স্রোত আছে। প্রগতিবাদী চিন্তার স্রোতটা যে শুধুমাত্র ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে এসেই আটকে গেছে এমন নয়। কংগ্রেসের মধ্যেও প্রগতিবাদী চিন্তা আছে। আমাদের অবিশ্যি বিপ্লবের সঙ্গী হিসেবে কংগ্রেসের ভেতরকার প্রগতিমূলক চিন্তাশীল শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। সম্প্রতি সমস্ত বিপ্লবের বিষদাঁতটা ভেঙে দেবার সুযোগনা কলাটা ঠিকই বেকে গেল। আর এই প্রগতিমূলক চিন্তার সূত্র ধরে কম্যুনিষ্ট পার্টি ভুঁচ্ হয়ে কংগ্রেসে ঢুকল এবং কাল হয়ে ১৯৬৯ সালে বেরিয়ে গেল। কংগ্রেসের কালা কাঠ হয়ে থাকার কারণ, কংগ্রেসের জীর্ণ নেতৃত্ব তখন পাণ্ডুরোগে ভুগছিল। কংগ্রেসের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের মধ্যে নরা রাস্তার মোড় অনেকবার দেখা গিয়েছে। সুরাটের দক্ষযজ্ঞ, সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস পরিত্যাগ। এসব ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির সমগ্র দেশকে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু খণ্ড ব্যক্তিত্বের সংযোগে যৌথ নেতৃত্ব দেবার আংশিক ক্ষমতা আছে, যে ক্ষমতা Frontal সে ক্ষমতা কখনই ব্যাপক হতে পারেনা। ওরা দেশ বলে না শুধু কৃষক, শ্রমিক প্রথমে ছিল আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল। এখন চাপে পড়ে বলছেন, কেরানী, ছাত্র, এর মোটামুটি বিভাগ, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, আর শিল্পে নিযুক্ত কর্মী যাদের ওরা বলেন, খেটে খাওয়া মানুষ। দেশ বা ব্যাপক অর্থে জাতির কথা কখনও বলেনা। তার কারণ ওদের বিপ্লবের পয়লা অস্ত্র হলো শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণী। এখন এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সুদের কারবারীও আছে। 'দেশমে হুয়া অমির বারাবার' দলও আছে। আবার কিছুই নেই এমন মানুষও আছে। এরা কিন্তু এক-একে সময় এক-এক রূপ ধারণ করে। সাম্প্রদায়িক বিরোধের দিনে ধর্মগত বিভেদকে আঁকড়ে ধরে দুই বিবদমান পক্ষ হয়ে যায়। আবার ধর্মঘটের সময় ইউনিয়নের বাবুদের পরামর্শে ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের স্বার্থে লড়াই করে। নিম্ন মধ্যবিত্তের বেলায়-ও তাই। নিরীশ্বরবাদী মার্কসবাদী, সে-চিন্তাও ঠিক আছে। তাহলে সরস্বতী পূজা বা দুর্গা পূজার সামাজিক দিকটা

মানব না এমনও নয়। কিছুদিন আগেও পূজা-পার্বণ সম্বন্ধে কম্যুনিষ্টরা গোঁড়া ছিলেন। ইদানিং এ গোঁড়ামিটা কিছু কমেছে। নেতৃত্ব রাখতে গেলে নানাবিধ সামাজিক দৃষ্টিকোণ বিচার করতে হয়। সংযোগের ক্ষেত্রে সামাজিক বৃত্তি, দৃষ্টিকোণ অনেক প্রখরতা হারিয়ে ফেলে। এরা শ্রেণী-যুদ্ধের সহায়ক নয়, তবু প্রয়োজনের দিনে এই সংযোগ, এই সামাজিক সংযোগ, অনেক শক্তির আধার হয়ে দেখা দেয়। কম্যুনিস্ট নেতৃত্বই এই সামাজিক সংযোগকে বর্তমানে বড় করে দেখে, তাই সমগ্র দেশ এর কাছে তেমন গুরুত্ব লাভ করে না। তাই দেখা যায় গ্রাম দেশ থেকে জনতা এসেছে, মাথায় লাল টুপি, গলায় যখন চাঁদা করছে তখন আর লাল টুপি নেই, কালীঘাটে প্রণাম করছে তখনও। কিন্তু মিটিং-এ বসেই মাথার টুপি দিয়ে শোভাবর্ধন করল।

একটা দেশ যখন সচেতনভাবে আর একটি দেশকে পদানত করে রাখতে চায়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সে দেশের ঐতিহ্য লুপ্ত ইতিহাস, গৌরবগাথা পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করে। ইংরেজের শাসনের কালে ভারতবর্ষ সেই নবজীবনের ধারা প্রবর্তিত হয়। কংগ্রেসই সেই ধারার নেতৃত্ব করে। এর মধ্যে সমগ্র দেশ, জাতি ও সুপ্ত ইতিহাস সুরক্ষিত ছিল। মুসলমান শাসনকালে সমগ্র হিন্দু সমাজই প্রজা ছিল। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য কোথাও রুদ্ধ করে নিজেকে রক্ষা করেছে কোথাও বা আত্ম-সমর্পণ করেছে। ইংরেজ যখন এদেশের শাসনভার গ্রহণ করে তখন হিন্দুদের পরাধীন আত্মসমর্পণ ত আছেই, উপরন্তু শাসক মুসলমান সমাজের পরাজয় তার সঙ্গে যোগ হলো, এই হল ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষের আসল চেহারা। কাজেই কংগ্রেসকে উভয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ সমানজনক মর্যাদা দিয়ে আন্দোলন করতে হয়েছে। তাই বন্দেমাতরম্‌ও বলতে হয়েছে, আল্লাহো আকবরও বলতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে ইংরেজ আমলে দুই বিজীত ইতিহাসেরই সন্ধান মেলে। উভয়ের সুপ্ত ইতিহাসকে ফিরে পাবার আগ্রহে উভয় উভয়ের নিকটবর্তী হয়েছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মাঝে ভারত ধর্মগত নির্বিশেষে একটা জাতি এ কথা বহুবার প্রচারিত হয়েছে। তাই ভাষা, ধর্ম, সামাজিক অনুশাসন—এর প্রতিটি স্তরে কিছু-না-কিছু বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বে ভারত এক জাতি। একথা আজ বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিপদ দেখা দিল সেদিন, যে-দিন ইংরেজ দেশ থেকে চলে গেল। অর্থাৎ তৃতীয় শক্তি যেদিন অপসারিত হলো। তখন বিভিন্ন ঐতিহ্য-আশ্রয়ী ইতিহাসের মধ্যে একটা বিরোধের ভাব দেখা দিল। এরই ফোকর গলে শোষক শোষিতের শাসক শাসিতের জন্ম দর্শন প্রবেশ করল। এর পেছনে রয়েছে রুশ বিপ্লবের উজ্জ্বল মহিমা কংগ্রেসের নেতৃত্বে চিন্তা দর্শন এই প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তাধারাকে স্ববশে আনতে পারলনা। ফলে জাতীয় সামাজিক সংস্কার মধ্যে এক নোতুন অধিনায়ক সমস্যা সৃষ্টি হলো। শত শত বছরের দারিদ্র্য নোতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনিক ভিত্তি পেয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। এবং তার রূপটা কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে মোটেই মিষ্টিমধুর ছিল না। কংগ্রেসের চিন্তাজগতে একটা ফাটল দেখা দিল। সংরক্ষণ বৃত্তি, আর গতি প্রবণ বৃত্তি একটা বিরোধের মুখে এসে কংগ্রেস ট্যাওন বনাম নেহেরু বিরোধীতার কথা স্মরণ করুন। দ্বিতীয় পর্যায়, ইন্দিরা বনাম দেশাই বিরোধের কথা স্মরণ করুন। আজ ইন্দিরা সরকারী ক্ষেত্রে পরাজিত কিন্তু ভারতীয় জনগণের মনে বেশী প্রতিষ্ঠিত। কম্যুনিষ্ট পার্টির সুযোগ বিরোধ ও চিন্তার ক্ষেত্রে কিছু কংগ্রেসের দীনতা। নেহেরু পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ করে জাতির মধ্যে যে সম্পদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন তাকে ধ্বংস করল তথাকথিত গণতান্ত্রিক অধিকার। আর সে অধিকার হাটে-মাঠে-ঘাটে এমনিই বিক্রি হতে লাগল যে তাকে গণতন্ত্রের হরিলুট বলা যায়। যখন-তখন ধর্মঘট করার অধিকার শ্রমিক শ্রেণীর হাতে, আর দেশবাসীকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা দেবার ভার থাকল সরকারের হাতে। সরকার কংগ্রেস পার্টির, কিন্তু সে পার্টি শ্রেণী যুদ্ধেও বিশ্বাস করে না। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের দ্বারা জাতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করার পন্থাও অবলম্বন করে না। কোন এক আর্থান সংবাদপত্রের কাছে নাকি

সোস্যালিস্ট নেতা স্বীকার করেছেন যে তিনি কয়েকশ (পাঁচশ' বলে প্রচারিত) হেল-সন্তর্ষাত্মক কাজ করেছেন বা করার সঙ্গে যুক্ত আছেন। এর তুলনায় কংগ্রেস সংগঠন নিতান্তই নিরামিষি বলা যেতে পারে। কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যদি, শুধু পয়সা বিনাশ করে, হিংসাত্মক কাজকে রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রাথমিক ভিত্তি বলে মনে করে, তাকে ঠেকাতে কংগ্রেসের নিরিমিষি ভাব কোন যোগ্য সমাধান নয়।

আর দ্বিতীয় ফ্রন্ট কাক দ্বীপ। ইতিমধ্যে কেউ যদি কম্যুনিষ্টপার্টির কর্মী এবং নেতাদের সামাজিক সংস্থিতি বিশ্লেষণ করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এখানে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, কায়েত, বৈশ্য, চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মাধুরপাদ ব্রাহ্মণ। শিখ সম্প্রদায়। আরও অনেকে যাদের আমরা ঠিক চিনিনা। এই সামাজিক-সংস্থিতি থাকার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে এক সময় হিন্দু কম্যুনিষ্ট। মুসলমান কম্যুনিষ্ট দেখা গিয়েছিল। অবিশ্যি কম্যুনিষ্ট হিসেবে এদের কারুরই তা কাম্য ছিলনা। তবু এটা নির্মম বাস্তব সত্য। পশ্চিম দেশে, বিশেষ করে মার্কিণ দেশে, ব্লাক কম্যুনিষ্ট, (রিচার্ড রাইট লেখক) হোয়াইট কম্যুনিষ্ট দেখা গিয়ে। যা ঘটনা তা মেনে নেয়াই বাঞ্ছিত। এই বিচার শুধু এখানেই নয়। পূর্ব ইয়োরোপেও আছে। একটা জাতীয় চিহ্ন ধারণ করে পরে কম্যুনিষ্ট নাম নিতে হয়। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, খুব সূক্ষ্মভাবে একটি জাতীয়তাবাদের চিহ্ন অঙ্গে বহন করে সবাই আন্তর্জাতিক হয়েছেন। আমাদের এই বক্তব্য যে সর্বৈব সঠিক তা আমরা দাবী করি না। শুধু আমরা বৈশিষ্ট্যের এবং বিভিন্নতার ইঙ্গিত করলাম। যে যে-ধারা খুব সূক্ষ্মভাবে, গুপ্ত ভাবে বয়ে চলেছে তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ফ্রন্টের দ্বীপটিও নিভে গেল। দেশকে যখন নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নেই তখন ব্যক্তিত্বের সমাবেশে যৌথ নেতৃত্বের কথাই চিন্তা করাই বিফল। বস্তুতপক্ষে তাই শুরু হলো। নেতৃত্ব বিহীন খণ্ড ব্যক্তিত্বের খেলা শুরু হলো। চোপরন, শিরবাজ। স্থানীয় ট্রাটেজি এ কারখানা, সে কারখানা। আর যেখানে সেখানে কৃষক কেনিয়ে উৎপাদন বাহত করা যেতে যখন, কলে-কারখানায় উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন।

'Produce or Parish' যখন শ্লোগান তখন, তারা উৎপাদন বাহত করে নিজেদের যৌথ নেতৃত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। এ এক ভাবের ঘরে চুরি। রাজনৈতিক শিক্ষার দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীর এক নায়কত্ব, বাস্তব ক্ষেত্রে স্তালিনের মৃত্যুর পর ধাক্কায় পড়ে যৌথ নেতৃত্ব। এর কোন দিক সামলাই বলুন। আর cadre দের বোঝাতে হবে, 'dictatorship of the proletariate এর সঙ্গে অবিশ্যি for the Transition period কথাটাও আছে। তবে বাস্তবক্ষেত্রে এই Transitionটি যে কবে ফুরোবে তা কেউ জানেনা, রাশিয়ার আজও ফুরোয় নি। সে যাই হোক, শত ব্যক্তিত্ব নিয়ে যৌথ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে punch করে যে নেতৃত্ব সম্ভব তাই দেশকে উপহার দেওয়া গেল। কিন্তু দেশবাসী এই জাতীয় যৌথ নেতৃত্বের মধ্যে তেমন জোর খুঁজে পেল না। তাই কল-কারখানার ধর্মঘট কমিয়ে যা সম্ভব তাই করা হলো। আপাতত সশস্ত্র বিপ্লব শ্রেণী সংগ্রাম শিকেয় তুলে Economicismকে সামনে রেখে এগিয়ে চলাই তথা কথিত যৌথ নেতৃত্বের কাজ হলো। বেতন বৃদ্ধি, আরো বেতন বৃদ্ধি। এই জাতীয় একতরফা বেতন বৃদ্ধি, শুধু শ্রমিক শ্রেণীর ও সাদা কলারের বাবুদের বেতন বৃদ্ধির ফলে যে সাধারণ ক্রেতার সর্বনাশ হলো—এ কথা কিন্তু কেউ বললেন না। ক্রেতার সর্বনাশ আর ওদের পৌষ মাস এই হলো ভারতীয় ছাপের যৌথ নেতৃত্ব, আর পয়সা-পেটাওবাদ'। আমরা Economicism 'পয়সা-পেটাওবাদ' নাম দিলাম। এতে যদি অর্থ পুরোপুরি প্রকাশ না হয়ে থাকে, তবে আর একটা নাম পাঠকদের কাছ থেকে পেলে বাধিত হবো। এই সম্ভবত যৌথ নেতৃত্বের কার্যকারিতা সম্বন্ধে দেশবাসীর কিছু অভিজ্ঞতা আছে। ইতিহাস ফরাসী জাতির সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞতা আছে। কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে।

রবীন্দ্র স্মরণে

—শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃত সন্ধানী, হে অমর কবি,
এঁকেছিলে বরষার যে শ্যামল ছবি,
সুমধুর কাব্যে গানে তব
মিত্য অভিনব ;
তারে ফেলে,
কোন শূন্যে, কোথা মিলে গেলে ?

সেথা কি রচিছ আবার নব ছন্দ গানে,
চাহি ধরণীর পানে,
অপরূপ গীতি-কাব্য-খানি ;
ছায়াময় আবরণ-টানি ?

নব বরষার শ্যাম মেঘ পানে চাহি,
উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে উঠিছ কি গাহি,
মৃত্যুঞ্জয় সৌন্দর্য্যে তোমার ;
ধরণীর সঙ্গীত অপার ?

সেথা কি পেয়েছ তব চিরারাধ্য জীবন দেবতায়,
বিধা দ্বন্দ্ব হীন পূর্ণ সফলতায় ?
গীতাঞ্জলি লভেছে কি স্থান,
তোমার সমান ;
সেই অমর অমৃত পুরে,
তোমার কণ্ঠের সুরে ?
সেথা কি নিরুদ্দেশ যাত্রা তব সিরাছে গো থামি,
সীমাশূন্য অসীমের রাজপথে নামি ?

হে বৈষ্ণব কবি,
চিরন্তন বিশ্বের হে অম্লান রবি,
রেখে গেলে যে নিষ্কাম প্রেম-গাথা ধরা পরে
সকলের তরে ;
পেয়েছ কি তাহার আস্বাদ তুমি,
তোমার সুন্দরে চুমি ?
লভেছে কি আলিঙ্গন তার বক্ষ মাঝে,
অপরূপ মনোহর সাজে ?
প্রকৃতি কি তব মিশেছে পুরুষ সাথে,
সেথা সবার অজ্ঞাতে ?

বিশ্বের হে বরেণ্য কবি,
তুমি নাই, আছে তব ধেয়ানের ছবি
মৃত্যুহীন চিরঞ্জীব অরূপের সাজে
মানব সমাজে।
সেই তব সফলতা চরম বিকাশে
সেই তব জয়মালা ভেসে আসা নখিনা বাতাসে।

ওগো বলাকার কবি,
অন্তরের সত্য ছবি,
গতির আবেগে হলে কি বিবাগী ;
নবীন বীজের লাগি,
নবাঙ্কুরে মেলিবারে ভাষা,
নাহি জানা
কার আহ্বানে,
কোথা, কতদূরে, কোনখানে ?

তুমি চলে গেছ হায় !
কাব্য তব আমারে ভুলায়,
নিঃশব্দে মহাশূন্য মাঝে আপনারে ঢাকি,
বিরাজ নিঃসীম নির্ভয়ে ;
তোমার শাশ্বত আলয়ে।

———

এ কি ম্যাজিক? সে কি তান্ত্রিক?

শ্রীমতী ভূষণ সেন

"সাইবাবা একজন প্রতারক। আসলে তিনি একজন ম্যাজিশিয়ান, কিন্তু স্বীকার করবেন না। তাবে দেখাবেন যেন মস্ত বড় সাধক। তাঁর মত যে কোন মানবরূপী ভগবান (God man) কে আমি আহ্বান করছি, আসুন সকলের সামনে নিজের ঐশ্বরিক ক্ষমতার পরীক্ষা দিন। একটি পরীক্ষাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে তিনি ভণ্ড। এটা বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তির যুগ। জনতার মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে টাকা কামিয়ে খাবেন, সে দিন আর নেই।"

এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন ম্যাজিশিয়ান সরকার। ১৯. ৪. ৭৮ তারিখের Sunday ম্যাগাজিনে সেটা প্রচারিত হয়েছে। মাস ছয়েক হতে চলল এখনো সাইবাবার টনক নড়েনি। মানহানির মামলা এক নম্বর ঠুকে দেবেন আশা করেছিলাম। আমাদের হতাশ করেছেন। বছর আগে, বাঙ্গালোরের অধ্যাপক নরসিংহম্ একটা কমিটি গঠন করে সাইবাবাকে তাঁর অলৌকিক শক্তির পরীক্ষা দিতে আহ্বান করেছিলেন, বৈজ্ঞানিক রিসার্চের জন্য, সে আহ্বানেও সাড়া দেন নি। বলেছিলেন, "আমি বৈজ্ঞানিক নই, আপনাদের রিসার্চে কোন কৌতূহলও নেই। ইস্কুল কলেজ করছি, সমাজ সেবা করছি। অন্যায় কিছু করছি বলে মনে হয় না। আমি কেন পরীক্ষা দিতে যাব? আমার পরীক্ষা নেওয়ার যোগ্যতা আপনার কমিটির আছে বলে মনে করি না।" চতুর পাকানো হাতের মত কৌশলে বেড়িয়ে গেছিলেন, ধরা দেন নি।

Strictly Controlled Laboratory Conditions এ পরীক্ষার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন বৈজ্ঞানিক নরসিংহম্। বাক্যটি শুনতে যত ভয়াবহ, আসলে ততটা নয়। সাইবাবার ভক্তদের মধ্যেও বহু প্রতিষ্ঠিতবশা বৈজ্ঞানিক আছেন। তাদের সবাই তিনি Hypnolise করে রেখেছেন, তাও সম্ভব নয়। তাদের চোখে বাবার কীর্তিকলাপ ধরা পড়ে না কেন? নরসিংহম্ এর চোখেই যে পড়বে তার নিশ্চয়তা কি? ঐ রকম বৈজ্ঞানিক ভক্তাভক্তির মধ্যে একটা পরীক্ষা হয়েছিল বছর চারেক আগে, তার বর্ণনা দিচ্ছি অবহিত হোন।

স্থান লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, বার্বেক কলেজ, ফিসিক্স ল্যাবরেটারি।

কাল—২১ শে জুন ১৯৭৩।

পাত্র—উপস্থিত কয়েকজন; ঘিরে রয়েছেন এক তরুণ ইসরায়েলী প্যারাটিপাথকে; নাম উরি জেলার। তিনি একটি Geiger counter হাতে ধরে আছেন। তাঁর ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে ঘড়ির 'টিক টিক' এর গতি বেড়ে যাবে, তারই পরীক্ষা এই যন্ত্রের সাহায্যে। সাধারণতঃ তেজস্ক্রিয় খনিজের সন্ধান করা হয়।

হঠাৎ গতি বেড়ে উঠল, মাত্র মুহূর্তের মধ্যেই গতিবেগ ২০০ গুণ বেড়ে গেল। চারিদিকে পরীক্ষক বৈজ্ঞানিক, বাইরের কোন শক্তির নেই Geiger counter এর সঙ্গে সংযোগ নেই। শুধু মাত্র 'জেলার এর ইচ্ছাশক্তি বা Mental concentration ছাড়া। ঐ টিকটিক যদি বাস্তবিক নিউক্লিয়ার রেডিয়েশনের ফলে হত, তবে উপস্থিত পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী সকলেরই জীবন বিপন্ন হত। কিন্তু এর উৎপত্তি জেলারের মনে। উপস্থিত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকেরা এই পরীক্ষায় কোন ছলনার সম্ভাবনা খুঁজে পান নি। তাঁদের সুচিন্তিত মত হল এই।

আরও কয়েকটি পরীক্ষা নেওয়া হল, সবগুলিই 'Strictly controlled laboratory conditions এ। একটি মেটাল রড [ধাতু নির্মিত দণ্ড] থেকে গেল জেলারের আঙুলের সামান্য উঁচুতে শূন্যে। প্লাস্টিকের কৌটোয় প্যাক করা একটি কুয়াল ভেঙে চুরমার করে গেল জেলারের হাত সেই কৌটোর উপরে থাকতেই। দূর থেকে শুধু মাত্র মনঃ-সংযোগ করে জেলার একগাছের কাঁটা ৪০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিলেন' ম্যাগনেটোমিটার যন্ত্রের কাঁটা সরিয়ে দিলেন। বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন কোন

সূত্রই খুঁজে পাওয়া যেত না। একমাত্র জেলারের ইচ্ছা-শক্তি ছাড়া।

লণ্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক জন টেইলার বলেন, যেটাল রডটি যে বেঁকানো হয়েছে, তাতে জুয়াচুরি করবার কোন সুযোগ ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞানের আইন কানুনকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন 'জেলার।

'পরীক্ষায়' সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মানব মন শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে বস্তু বা 'ম্যাটারের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তনে সক্ষম।' Experimental Physics এর অধ্যাপক জন হ্যাসটেড এবং Theoretical Physicsএর অধ্যাপক ডেভিড বম যুক্তভাবে বিবৃতি দিয়ে বললেন, "এই জাতীয় আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রয়োজন। তার ফলে হয়ত একদিন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে যে জড় বিজ্ঞানের যে সব আইন কানুনের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার বাইরেও অনেক বস্তু আছে, যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।' অন্য একদল বৈজ্ঞানিক আমার এ সব বুজরুকীতে ভুলবার পাত্র নন। জড়বিজ্ঞানের আইন কানুনের বাইরের কোন শক্তিকে স্বীকার করেন না।

গুরুণ জেলার বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বেশ কয়েক বছর আগে। ব্রিটেনের বিখ্যাত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ম্যাগাজিন Nature-এ ১৯৭৪ সালের অক্টোবর সংখ্যায় জেলার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার Stanford Research Instituteএ জেলার যে অতি প্রকৃত (Supernatural) শক্তির পরীক্ষা দিয়ে ছিলেন তারই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। পরীক্ষা ছিল মনজানাজানি বা Telepathy-র। একটি ইস্পাতের ঘরের মধ্যে আর একটি ইস্পাতের ঘর, তার ভিতরে জেলার। ঘর দুটি এমনভাবে insulated যে বাইরে থেকে আলো, শব্দ বা বিদ্যুৎ তরঙ্গ আসবার উপায় নেই। বাইরে পরীক্ষকগণ একশত ছবির মধ্যে থেকে কয়েকখানা ছবি বেছে নিলেন। পরীক্ষকের অবস্থিত জেলার সেই ছবি গুলো আঁকলেন। দেখা গেল সম্পূর্ণ মিলে গেছে। একটা ছিল একগুচ্ছ আঙ্গুরের ছবি। পরীক্ষকের ছবির সঙ্গে জেলারের আঁকা ছবিতেও ঠিক চব্বিশটি আঙ্গুরই, একটিও বেশী বা কম নয়।

Nature পত্রিকায় নিযুক্ত উপদেষ্টাগণ কিন্তু এই পরীক্ষা নির্ভুল বলে স্বীকার করেন নি। বলেছিল এর পরিকল্পনা [design] এবং উপস্থাপনা [Presentation] উভয়েই অতীব দুর্বল। প্রতারনার বিরুদ্ধে যে সব সতর্কতা নেওয়া উচিত তার কি কি নেওয়া হয়েছিল, তারও কোন বিস্তারিত বর্ণনা নেই। কিংবা যে আর একবার পরীক্ষা করবেন বিশেষজ্ঞদল সেটাও তাঁদের সাধ্যাতীত। এমনই মোটা কি [fee] হাঁকেন জেলার প্রতিবার পরীক্ষার জন্য। শেষটায় তাঁরা রায় দিয়েছিলেন যে জেলার একজন চতুর যাদুকর, টাকা কামাবার জন্যই ধনী দেশগুলোতে চক্কর দিচ্ছেন।

Nature পত্রিকার এই বিরূপ মন্তব্যে জেলারের অনুরাগীর সংখ্যা যে হঠাৎ কমে গেল, কিংবা তাঁর ব্যবসা লাটে উঠল তা নয়। বরং এই তর্কাতর্কির ফলে তিনি কৌতূহলের বস্তু হয়ে উঠলেন এবং ব্যবসা ফেঁপে উঠল। এর পর যখন 'Geller effect'-এর খেলা দেখালেন B. B. C-র টেলিভিশনে তখন তাঁর খ্যাতি সূর্য্য-তুঙ্গে উঠল। খেলাটা ছিল যৌগিক শক্তির সাহায্যে চাবি বেঁকিয়ে দেওয়া এবং ঘড়ি চালু করার খেলা। যে কোন যাদুকরই এই খেলা দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু এর মেপথ্যের খেলা যেটা সেই after effect ই ছিল সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর।

টিভির খেলা মাত্র শেষ হয়েছে, চারদিক থেকে ফোন এসে B. B. C. র ফোন জ্যাম হয়ে গেল। "আমার ছুরি বেঁকে ডুবড়ে গেছে।" "কাটা চামচ পটাপট ভেঙে খাচ্ছে" "চল্লিশ বছরের বন্ধ ঘেড়ির ঘড়ি নতুনের মত টিক টিক করে চলছে।" টিভিতে জেলারের 'শো' দেখে কি উন্মাদ হয়ে উঠল জড় পদার্থগুলি? পরদিন কাগজে শুধু এই সব খবর। ছাপা হল ছবি, কোন পাচিকার হাত জড়িয়ে গেছে লোহার খুন্তিতে, সোনার ব্রেসলেট বেঁকে গিয়ে ফাঁসি লেগেছে কোন রূপসীর মনিবন্ধে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন টেইলার,

জড় বিজ্ঞানের আইন কানুনের উপর এই মেঘনাদি আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘাঠে নামলেন। জেলারের টিচি বেধে যারা এপাখিব শক্তি লাভ করেছেন, সেইরকম ১৫টি বালক বালিকা নিয়ে পরীক্ষা সুরু করলেন। দেখা গেল সেই রাত্র থেকে এরা প্রত্যেকেই এক একটি সুদে জেলার হয়ে গেছে। ছুঁয়েই লোহা বেঁকিয়ে দিতে পারে ইত্যাদি। সামান্য একটু বেঁকানো নয়, একেবারে দুমড়ে দুর্ভাঁজ করে দিতে সক্ষম।

সুদে জেলারদের হাতে জড়বিজ্ঞান যখন নাস্তানাবুদ, তখন খুব সতর্কতার সঙ্গেই পরীক্ষা আরম্ভ হল। ইতিমধ্যে আসল জেলারেরই গলদ ধরা পড়তে লাগল। দেখা গেল বহুবার পরীক্ষার সন্ধিক্ষণেই [critical moments] তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এবং বিব্রতও হয়েছেন। কিন্তু জানেনই তো God Man হতে গেলে কথার জলোয়ার খেলায় ওস্তাদ হতে হয়। অভিনেতাও হতে হয় প্রথম শ্রেণীর। ব্যর্থতা বেদমাধারকে, সেটা টাকা দিতে পারেন না। বলেন, মানুষের মন সহজে কি পোষ মানতে চায়। ইতই কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করুক, পিছলে যাচ্ছে। কি আর করা যাবে আরও মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া? চেষ্টা তিনি করেন যদি তাতে সময় থাকে। তবে কিনা ব্যস্ত মানুষ তো। সময় বড় কম

তারপর একদিন বেরিয়ে পড়েন বিশ্বভ্রমণে। বলেন, "এই যে প্রচার অভিযান, প্রধর্মনীয় আয়োজন এরও একটা প্রয়োজন আছে। জীবন ধারণের জন্য টাকা চাই, সে তো বটেই, কিন্তু শুধুমাত্র সেটুকুই নয়। তার চেয়েও অনেক বেশী জরুরী, জনগণ বৈজ্ঞানিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন। স্বীকার করিয়ে ছাড়বেন বৈজ্ঞানিকদের, যে Geller effect আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে।"

• • •

এই রকম একটা মহা 'হাঙ্গাম', তাকে সহ্য করে কি করে পশ্চিম দেশের সুসভ্য মানুষ? যে দেশে শতকরা একশোজন শিক্ষিত, যেখানে জীবন ও জীবিকার সঙ্গে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, সেই দেশের জনতা? আগন্তুক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে ছুটতে ছুটতে কি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? আত্মা কি এতই ক্লান্ত যে অন্তরের জীর্ণতার ভার আর বইতে পারছে না? একটা আশ্রয় চাই, ডুবন্ত মানুষ যেমন হাতের কাছে যা পায় তাই জড়িয়ে ধরে, তেমনি জড়িয়ে ধরেছে জেলারকে?

কিন্তু ভারত তো সাধু সন্তের দেশ, সেখানেও কেন এই সব নকল সাধুর ছড়াছড়ি? কি কৌশলে এই অর্থলোভী ভণ্ডের দল জনমানসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে? শুনেছি হাজার টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে নাম রেজিষ্টারী করলে তবে বাবার দর্শন ও আশীর্বাদ পাওয়া যায় এমন costly সাধুও একাধিক বিদ্যমান। আমাদের সবই যেন কেমন ব্লাইণ্ড নেমে এসে পড়েছে। ব্যবসায়ী বলুন আর রাজনীতিই বলুন, কেউই কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। পার্টিশনের আগে আমরা যেমন অন্ধ ও দুর্বার ছিলাম, মধ্যযুগের আবর্জে আচ্ছন্ন ছিলাম; যে পাপ থেকে মুক্তির আশায় বিপ্লবী বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন—আজকের আধিক স্বচ্ছন্দতার স্পর্শে সেই পাপ কি ধরার জন্য পাওয়া পুই-সত্তার মত কুলকুল্ করে বেড়ে উঠল?

ক্ষীরোদ কুমার দত্ত প্রণীত

বিপ্লবী পুস্তকমালা

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০
২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০
৪। সৈনিক সংগ্রাম কাহিনী—১·৫০
৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১·২৫
৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—·৯০
৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—·৯০
৮। স্বাধীনতার সপ্তম অঙ্ক ও মেয়ে—·৯০
৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবিপ্লব—·৯১
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০
১১। মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—·৯০
১২। [illegible]

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—HOOGHLY		
Pal Smt. Saraswati w/o Late Mohan Ch. Pal	Vill Ramnarayanpur P. O. Champadanga	200	6. 11. 74
	Dist.—HOWRAH		
Bhattacharji Siddeswar	6/1 Panchanantola Road P. O, Balley	200	1 10. 76
	Dist—BURDWAN		
Dey Smt. Manorama w/o Late Harimohan Dey	P. O. & Vill. Satgachia P, S. Memari	150	10. 9. 77
	Dist.—MURSHIDABAD		
Basu Harendra Nath	Sainpala Jadu Nath Bose Road Basbirhat (24-Parganas)	200	
Present Address :— Ghatbandar, P. O. Khogra			
	Dist—MALDA		
Ghosh Kritananda (alias Kutter)	P. O. Bhaluka bazar	200	15. 8. 72
	Dist—JALPAIGURI		
Sarma Roy Jnanesh Chandra	P. O. & Vill Pandapara Kaliban	200	1. 10. 77
	Dist—MIDNAPORE		
Das Bhujanga Bhusan	P. O. & Vill Kumar, Arah	200	15. 8. 72
Das Kanungo Smt. Nalini Bala w/o Late Sachindra Nath	P. O. & Vill Naipur P. S. Patsapur	100	21. 11. 77
Giri Smt. Sindhu Bala w/o Late Rakhal Chandra	Vill Nar, P. O. Narghat	100	16. 10. 77
Guria Smt, Kiran Bala w/o Late Gajendra Nath	Vill Khogda, P. O. Narghat P. S. Nandogram	150	1. 1. 78
Jana Bhupendra Nath	P. O. & Vill Ashutibarh	200	1, 10. 76
Maity Smt. Kiran Bal w/o Late Laxi Narayan	P. O. & Vill Amritaberia P. S, Mahisadal	100	22. 12. 77
Maity Smt. Saila Bala w/o Late Bhutnath	P. O. & Vill Brindabanpur P. S. Nandigram	100	23. 12. 77
Misr Smt. Lakshmi Rani w/o Late Atul Krishna	Vill Bagmari P, O. Nandakumar P. S. Mahisadal	100	27. 1. 78
Roy Dhananjoy	Vill Bakshispur, P.O. Nayaput	200	1. 10. 76
	Dist—JAMSHEDPUR		
Sen Gupta Sunil Kumar	10 Babuline Foundry Area Jamshedpur-7	200	23. 12. 77

RgedNo. R. N .24511/71 Biplabi Bangla Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

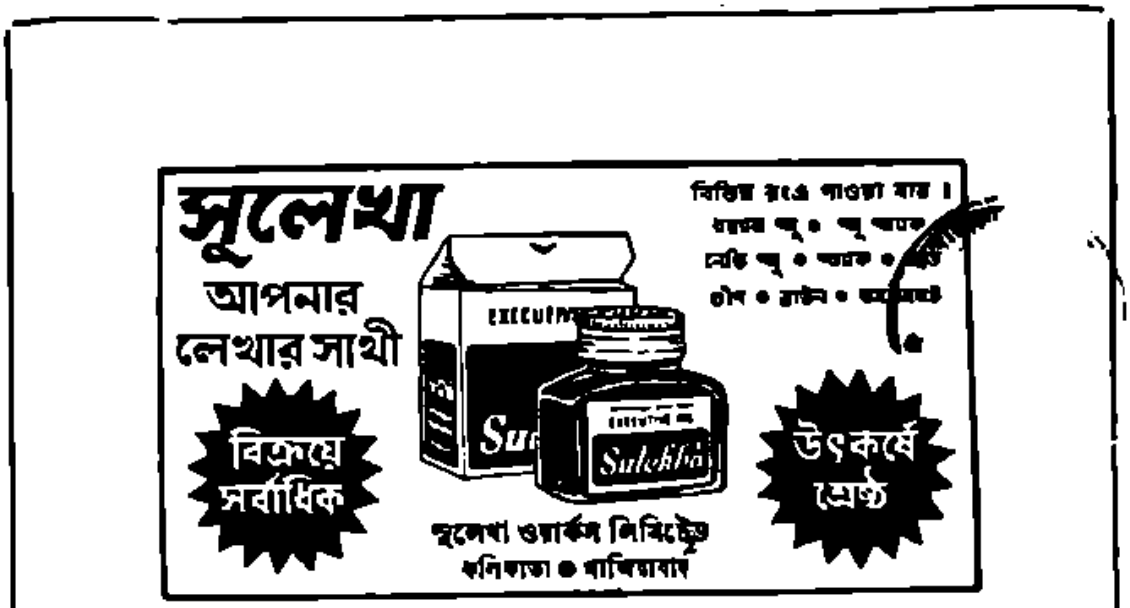

9 JUN 1978
UNIVERSITY OF CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীসাধি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেঙ্গালা—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবীরেন্দ্র বসু।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ ১০ই জুন, ১৯৭৮	৩১ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

CALCUTTA

গোড়ায় গলদ

। শ্রীসতী ভূষণ সেন ।

গান্ধী সংগ্রহালয়ে অচলাবস্থা

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। শ্রীকেদার দত্ত ।

'ভারতের কোটী কোটী মানুষ কেবল অন্ন চাহিতেছে। তোমরা কেবল গুরু কথা শুনাইতেছ। নিরন্ন, ক্ষুধার্ত মানুষের ধর্মকথা লইয়া শোনান ঘোরতর অন্যায়।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

গোড়ায় গলদ

শ্রীসন্তোষকুমার সেন

এরা কারা? মহীন মিনারের নীচে একদল শীর্ণ মৃতপ্রায় জীব দ্বারা যাদের, এরাই কি এককালের পূর্ববাংলার নবযুবক লাঠিয়াল, যাদের শক্তির উপর নির্ভর করে বারো ভূঁইয়া এক হাতে ধরতেন মসনদ্‌-এ আর অন্য হাতে যোগল বাহিনী? এরাই কি দণ্ডকারণ্য পরিত্যাগী উদ্বাস্তু?

দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের একশো বছর আগে, আরম্ভ হয়েছিল আন্দামানের জনহীন অরণ্যে কয়েদী পুনর্বাসনের কাজ। তখনো দুনিয়ায় দাস প্রথা বিলোপ হয় নি। বন্দী এবং অপরাধীদের দিয়ে শ্রমসাধ্য কাজ করিয়ে নেওয়াটাই ছিল প্রথা। সেই সময়ে আন্দামানের 'পেনাল সেটেলমেন্ট' পরিদর্শন করতে এলেন সার রবার্ট নেপিয়ার। চমকে উঠলেন কয়েদীদের দুর্গতি দেখে,—শীর্ণ মৃতপ্রায় একদল নেটিভরা মানুষ। এরাই কি সেই গর্বিত বিদ্রোহী সিপাহী, যারা কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছে? "এরা কারা" আর্তনাদ করে উঠলেন নেপিয়ার। "ওদের দুবেলা দুটো খেতে দেও, যা হোক একটু কিছু পরতে দেও। মানুষের মত বাঁচতে দেও।"—সেটা ছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব। নেপিয়ারও বড়লাট ছিলেন না, ছিলেন তাঁর প্রেরিত একজন পরিদর্শক। দণ্ডকারণ্যে কিন্তু কোন পরিদর্শক পাঠান নি স্বাধীন ভারতের Welfare State এর শাসক গোষ্ঠি।

পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসিত করবেন, এটা ছিল কল্পনাপ্রবণ নেহেরুর একটা Brain wave, কে যেন বলল, এত বড় একটা অরণ্যাঞ্চল আছে মধ্য ভারতে, একেবারে জনহীন। তার আগেই দেখে এসেছেন শরণার্থী ছিন্নমূল মানুষের মিছিল। ঘুরে ঘুরে যোগ করে চার হয়ে গেল, আর কিছু দেখবার দরকার হল না। পশ্চিম বাংলার ক্যাম্পগুলির দুর্দিন আবহাওয়ায় উদ্বাস্তুদের মাঝে বোধ হয়ে আসছিল। দণ্ডকারণ্য নামটিও তাদের সুপরিচিত। সেখানে নতুন বাংলাদেশ গড়বার স্বপ্ন তাদের উদ্বুদ্ধ করল। শাঁখ বাজিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে প্রথম উদ্বাস্তুবাহী ট্রেনটিকে যারা বিদায় জানাতে গেছিলেন, আপনিও হয়ত ছিলেন সেই সমারোহে।

কর্তারা প্রথম থেকেই অনুসরণ করছিল উদ্বাস্তুদের। প্রথমেই ভুল হয়েছিল বছরের পর বছর Dole দিয়ে ক্যাম্পে জিইয়ে রেখে তাদের কাজের উদ্যম নষ্ট করে দেওয়া। দণ্ডকারণ্যে পৌছবার পরে, চাষের কাজে লাগবার জন্য প্রস্তুত, তখন দেখল জমি নেই, হাল, গরু, বলদ কিছুই নেই। কর্তারা দিল্লীতে বসে পরিকল্পনা রচনা করছেন, লোকসভায় পাশ হয়েছে, অর্থমন্ত্রক ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করেছেন (তাও শতটা নয়), হিসাবপরীক্ষক "আইটেম বাই আইটেম, মিলিয়ে দেখবেন, তারপর পাশ করবেন কিম্বা করবেন না। ততদিনে বর্ষা নামলো এবং অচিরে শেষও হয়ে গেল। উদ্বাস্তুর initiative জেগে উঠে কাজ না পেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কৃষকদের নিয়োজিত করলেন কর্তারা রাজপথে পাথর ভাঙার কাজে।

খবর পেয়ে বিধানবাবু ছুটে গেলেন দণ্ডকারণ্য। বললেন "করছো কি, এরা কি কখনো পাথর ভেঙেছে? এরা কুলি নয় কৃষক। জমি চাষ করে দেও, এরাই নিজ নিজ জমি সাফ করবে, চাষের উপযুক্ত করে নেবে। শুধু প্রথম কয়েক মাস খোরাকীটা চালিয়ে যেও, যেন উপোষে না মরে।" বিধানবাবুর পরে আর কোন মুখ্যমন্ত্রী দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে খোঁজ খবরটুকু নিয়েছেন বলে জানিনা। কংগ্রেসী সরকারেরও নয় অ-কংগ্রেসী সরকারেরও নয়। এমন কি, যে কমিউনিষ্ট পার্টি দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, উদ্বাস্তুদের সর্বনাশ করা হচ্ছে, চোখের আড়াল হওয়ার পরে, একবারও খবর নেননি তারা।

যে জমিতে উদ্বাস্তুদের বসাবার কথা ছিল, সরকারী কাগজপত্রে সেটা রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা। বহুবছরে

গিয়ে দেখা গেল, তার নীচু জমি সবটাই আদিবাসীদের অধিকারভুক্ত। তাদের তো আর উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, তাই জলহীন পাহাড় এলাকাই পড়ল উদ্বাস্তুদের ভাগে। সে এমনি জায়গা যে বাইরে থেকে কেউ যে যাবেন পরিদর্শনে, কর্তাদের সাহায্য ছাড়া তার উপায় নেই। 'হুস্তোর' বলে কেউ যে ছেড়ে পালিয়ে আসবেন সেই স্থান থেকে, তারও সুযোগ নেই।

তবু যাই হোক জমি পাওয়া গেল, চাল গম বীজ ধান সবই পাওয়া গেল অবশেষে। লাঙ্গল দিতে গিয়ে বুঝলেন কৃষকেরা যে জল ছাড়া ফসল তোলা যাবে না। চওড়াগোপ নদী নেই, বৃষ্টিপাত যে হয় তাও সামান্য। [নইলে কি জনমানবহীন পড়ে থাকে এত বড় একটা দেশ?] কিন্তু জলের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ হয়নি। ছোটখাটো scheme-এর কর্মও নয় সেটা। তাই বলে থাক যতদিন টাকা না আসে।—আমাদের দেশের সব পরিকল্পনাই এমনি একটা না একটা গলিতে এসে থেমে যায় কেন বলতে পারেন?

ওরিষ্যার ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এতদিন পরে Rengali Dam বাঁধা হচ্ছে; কাজ শেষ হলে আর জলের অভাব থাকবে না। তাহলে এই সময়টাতেই উদ্বাস্তুরা ওরিষা পরিত্যাগ করে চলে আসছেন কেন? কেন আসছেন জানিনা, তবে দেখেছি Dam বাঁধা নিয়েই হাঙ্গামা সুরু হয়ে গেছে। ১১ হাজার আদিবাসী পরিবারের জমি জলের নীচে তলিয়ে যাবে, সেই ভয়ে তারা আন্দোলন সুরু করেছে। কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। যে বস্তুটি তাদের জীবনের অনিবার্যভাবে যুক্ত, তার সবদিক নিশ্চয়ই গ্রাম-বাসীদের বুঝিয়ে বলা হয় নি, তাই এই বিভ্রাট ঘটে গেছে। বুঝিয়ে বললে বুঝবে না, এত মূর্খ ভারতীয় কৃষক নয়। সে নিরক্ষর, কিন্তু কিসে তার মঙ্গল হবে সে জ্ঞান টনটনে। নইলে সার আর কীটনাশক ওষুধ নিয়ে গ্রামে গ্রামে কাড়াকাড়ি পড়ত না।

শুধু ওড়িষ্যা নয় সর্বত্রই একই ঐ ব্যবস্থা। অনেক চাকঢোল পিটিয়ে রাজস্থানে ক্যানেল কাটা হল, আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম এবার রাজস্থান সবুজ হয়ে উঠবে। ক্যানেলে জল এলো; দশ বছর পরেও সেই জলে কি কি বাড়তি শস্য উৎপন্ন হতে পারে, সেটা কেউ হাতে কলমে দেখিয়ে বা শিখিয়ে দিলেনা কৃষকদের। গুজরাটের Mahikadana স্কীম সম্বন্ধেও সেই নালিশ শুনেছি। চওলে ড্যাম বাঁধা হল, শুনলাম এইবার চওলের পাহাড়ে সোনা ফলবে। তাকাতি ছেড়ে দিয়ে সবাই চাষের কাজে নামবে। সে আজ দশ বছর আগের কথা। এতদিনেও সেই জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে খাল কাটতে হবে, তার পরিকল্পনা রচিত হল না। চওলের জলের মাত্র ৩০ শতাংশ সেচের কাজে ব্যবহার হয় বাকি ৭০ শতাংশই নষ্ট হয়ে যায়। হায়দারাবাদের নাগার্জুন সাগর ড্যামের জল সম্পদের ৭০ শতাংশ Planned area তে পৌঁছায়, অথচ পাঞ্জাবের 'ভাক্রা নাঙ্গালের' জল Target areaর বাইরের জমিকেও সিক্ত করে। পাঞ্জাবে যেটা সম্ভব হয়েছে, হায়দারাবাদে তার অর্ধেকও সম্ভব হয় নি কেন?

৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে গ্রামোন্নয়নের জন্য। পঞ্চম পরিকল্পনার ১৩০ শতাংশ ব্যয় হবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জন্য, সে সবই কি জলে যাবে শেষ পর্যন্ত? গ্রামের মানুষরা কি সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এই পরিকল্পনা সফল করে তুলবার জন্যে? তাদের কি শিক্ষা দেওয়া হবে? তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার জন্য সরকারী স্তরকে কি চেষ্টা করা হবে? বুড়ি বছর ধরার সঙ্গে লড়াই করার পর যখন জল আসে প্রায় তখনই কেন কাজ ফিরে উদ্বাস্তুদের পালিয়ে আসতে হয় দেশে, এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করছে, আমাদের পরিকল্পনার সাফল্য বা ব্যর্থতা।

আমাদের পরিকল্পনা রচিত ও সম্পাদিত হয় Central planning এর নিয়মে। রচনা করেন উপরতলার যোজনা পর্ষদ, পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁরা, কিন্তু হাতে হেতেরে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই। রণাঙ্গনের জন্য পরে নীচের তলার মানুষদের উপর, যাদের অভিজ্ঞতার উপযুক্ত ব্যবহার হয় না।

ব্যবহার হয় না বলে কাজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। Central planning বস্তুটি এমনই শক্ত জেরে বাঁধাই যে একটু এদিক ওদিক হওয়ার যো নেই। প্রথমে ধরে নেওয়া হয়েছে হয়েছে যে প্রজার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনার দায়িত্ব এবং অধিকার শাসকের। তিনি যখন শাসকের পদ অধিকার করেন, তিনিই স্থির করে দেবেন সামাজিক অগ্রাধিকার বা Social priority; অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে দেবেন কিসে আমাদের মঙ্গল। উৎপাদন আধুনিকীকরনের জন্য (Rationalise) কি করতে হবে আদেশ দেবেন; যদিও নিজে এক ছটাক বস্তুও উৎপাদন করেন নি, চিরকাল করেছেন রাজনীতি। Equitable distribution এর নামে, নিরপেক্ষ ভাবে সকলের মধ্যে বণ্টনের অছুহাতে, রাষের হকের ধন কেড়ে নিয়ে শ্যামকে দান করবেন। এর সবটাই যদি স্বেচ্ছায় হত, সকলেই যদি নিজ নিজ ধন হাসি মুখে বিলিয়ে দেওয়া জন্য প্রস্তুত হতেন তা হলে আর কথা ছিল না। কিছু মানুষ প্রতিবাদ করে, তখন তাদের বলা হয় সমাজবিরোধী বা Anti Social কিম্বা বলা হয় নকশালবাদি। লৌহমুষ্টি প্রস্তুত রাখতে হয় শাসকের। কি জানি কখন দরকার হয়ে পড়ে। আর্মি এবং সি. আর. পি.র খরচ বেড়ে যায়। তথাপি কোন পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত সফল হয় না, আটকে পড়ে যায় পথে।

ব্রিটিশ অর্থবিজ্ঞানী নোবেল লরিয়েট von Hayck একখানা বই লিখেছেন, তার নাম Road to Sertdom। বইখানায় Central Planning এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। বুঝিয়েছেন কি ভাবে এই পরিকল্পনায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাশ হয়। বইখানা উৎসর্গ করেছেন দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশের সমাজবাদীদের উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্যে।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী নায়ক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফরিদপুরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় গত ২১ মে, শনিবার বেলঘরিয়া যতীনদাস নগর কলোনীর নিজ বসতবাড়ীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তিনি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন এবং সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। দেশ বিভাগের পর কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থেকেও নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে তিনি বহু জনহিতকর প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা ও কর্ম নিষ্ঠার জন্যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দলমত নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। আমরা তাঁর বিদেহি আত্মার শান্তি কামনা করি— পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাই।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীকীরোদ দত্ত

রাস্তার উপরে ঐসব ডাকাতিতে যুবকগণ সাধারণত মুষ্টিযুদ্ধের কৌশলই অধিক প্রয়োগ করত। কিন্তু সঙ্গে সামান্য কিছু অস্ত্রশস্ত্রও থাকত। প্রথমবারে ডাকাতিটি অনুষ্ঠিত হয় নারায়ণ গঞ্জে, টাকায় বসে হিসেব রাখবার বিপ্লবীদের মাত্র আশিটি টাকা নিয়ে ফিরে আসতে হয়। দ্বিতীয় ডাকাতিটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা শহরেই। সন্ধ্যার পরে ব্যবসায়ীগণ অর্থ নিয়ে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল বিপ্লবী কর্মীগণ ঐ অর্থ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা সংখ্যায় তিন চার জন থাকায় তারা বাধা দেয় এবং একজনকে ধরে ফেলে। বিপ্লবী কর্মী আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে ঐ ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাত করে। ফলে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। পুলিনবাবু বৈপ্লবিক প্রয়োজন মিটাবার জন্যই ডাকাতির সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু এই পথে ছুরিকাঘাত প্রভৃতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। উল্লিখিত ব্যবসায়ীর হাসপাতালে মৃত্যু হওয়াতে তিনি খুবই ব্যথিত হলেন এবং নির্দেশ দিয়ে ডাকাতি বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু বিপ্লবের নানা কাজে অর্থের প্রয়োজন খুবই বেশী তাই ডাকাতি বন্ধ করে রাখা বেশীদিন সম্ভব হলোনা। অন্যান্য কর্মীরাও তাঁকে প্রয়োচিত করতে লাগলেন। ফলে পুলিন বাবুও শেষ পর্যন্ত আবার ডাকাতি করবার নির্দেশ দিলেন। এবারে ডাকাতি করা হল বিক্রমপুরে শেখর নগরে এক গৃহস্থ বাড়ীতে। কিন্তু ডাকাতি করবার পূর্বে সকল কর্মীকেই একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হল। প্রতিজ্ঞাটি ছিল এইরূপ—"দেশোদ্ধারের জন্য গুপ্তভাবে সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে যে দল, যে অস্ত্রশস্ত্র এবং যেসব প্রস্তুতি দরকার তা যোগাবার জন্য এবং আত্মস্বার্থের পরিবর্তে দেশের স্বার্থের প্রয়োজনেই ডাকাতির প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ধর্মপরায়ণ, পরোপকারী, সজ্জনলোকের গৃহে কখনও ডাকাতি করা হবে না। যেসব স্থানে দলসাধারণ টাকার কম পাবার সম্ভাবনা সে সকল স্থানেও ডাকাতি করা হবেনা। যারা দেশদ্রোহী স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী সরকারের গুপ্তচর যারা অর্থ উপার্জন করতে দরিদ্র এবং দুর্বলের উপর অত্যাচার করছে একমাত্র তাদের গৃহেই ডাকাতি করা হবে।

ডাকাতির জন্য একটি প্রয়োজনও ছিল। ডাকাতি করতে গিয়ে সমিতির কর্মীদল মাঝে মাঝে পুলিশের কাছ থেকে বাধা পেতেন। এর ফলে বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে একটা সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টি হতে লাগল এবং সংগ্রামের কৌশল সম্পর্কেও তারা সচেতন হল। এদিক থেকে পুলিনবাবু নিজেও ডাকাতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। যাত্রা ডাকাতি এই ধরনের প্রথম ডাকাতি। প্রকৃতপক্ষে এই ডাকাতি ঢাকা এবং কলকাতা অনুশীলন দলের মিলিত ডাকাতি। ডাকাতির সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কলকাতা থেকেই গিয়েছিল এবং কলকাতা সমিতির দুজন কর্মীও এই ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। ডাকাতির আগে পুলিনবাবু কয়েকজন কর্মীকে গ্রামটি পরিদর্শন করবার জন্য পাঠালেন। তাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হল তারা যেন গ্রামটির একখানি মানচিত্র করে আনেন।

ছত্রিশটি যুবক এই ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন এবং বিপ্লবী কর্মীগণ অস্ত্রশস্ত্র ঢাকা থেকে নৌকাযোগে ডাকাতির জন্য যাত্রা করেন। গ্রামবাসী হিন্দু মুসলমান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিপ্লবী কর্মীদের বাধা দিল। কিন্তু আকাশ বিপ্লবীরা বন্দুক ছুড়ে তাদের প্রতিহত করলেন। গ্রামবাসীরা এরপরে বিপ্লবীদের নৌকা আক্রমণ করলেন। কিন্তু তাদের এ আক্রমণও সফল হলনা। ডাকাতির পরে বিপ্লবীগণ নৌকাযোগে যখন ঢাকায় ফিরছিলেন তাদের তৃতীয়বার আক্রমণ করা হয়। কিন্তু বন্দুকের গুলি চালিয়েই এ আক্রমণ ব্যর্থ করা হয়। যাত্রা ডাকাতিতে নেতৃত্ব করেন শচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকারী ছিলেন শশী সরকার।

এইভাবে ছোট নৌকাযোগে বিপ্লবীরা বড় নদীতে এসে পড়লেন। এখানে সুষ্টিত অবাধি বড় নৌকায় তোলা হল। কিন্তু এই করতে করতে সূর্যোদয় হয়ে গেল। বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহুলোক এসে সমবেত হল। তারা

বন্দুক নিয়ে বিপ্লবীদের নৌকা আক্রমণ করল। বিপ্লবীরা ছোট নৌকাটি নদীতে ডুবিয়ে দিয়ে বড় নৌকায় আশ্রয় নিলেন এবং নদীর মধ্যস্থল দিয়ে নৌকা চালাতে আরম্ভ করলেন। পুলিশ সরকার অন্য চারজনকে নিয়ে রাইফেলসহ নৌকার চারদিক উপর আক্রমণের নিযুক্ত হলেন। তারা মাঝে মাঝে রাইফেল-গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগল জনতার সংখ্যাও ততই বাড়তে লাগল। বিপ্লবীদের সময় সাতার গ্রামের পাশ দিয়ে নৌকা যখন চলছিল তখন মাতার থানার দারোগা বন্দুক ও পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে নৌকা আক্রমণ করল, তার সঙ্গে তিন চারটি নৌকাও ছিল। বিপুল জনতা ছিল তার সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দারোগাকেও তার পুলিশ বাহিনী নিয়ে সরে পড়তে হয়। প্রকৃত পক্ষে বিপ্লবীদের বিপুল অস্ত্রশস্ত্রই এসব গ্রামে তাদের রক্ষা করে। ক্রমে সন্ধ্যা হল এবং ঘুন মাসের আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। ক্রমে ঝড় আরম্ভ হল। এই ঝড়ের মুখে নৌকার পাল তুলে দেওয়া হল এবং দ্রুত গতিতে নৌকা এমনভাবে চলতে লাগল যে আক্রমণকারী দলের পক্ষে বিপ্লবীদের অনুসরণ করা সম্ভব হল না। বিপ্লবী কর্মীরা তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং মূল্যবান দ্রব্যসহ নিরাপদেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সমর্থ হন।

বাড়ী ডাকাতি সম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু মামলা প্রমাণিত হয় নাই। যে সমস্ত নির্দোষ ব্যক্তি ধরা পড়েছিলেন তারা সবাই মুক্তি পান। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য দুইজন পুলিশ কর্মচারী ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিচারপতি জেঙ্কিন্স এই সিদ্ধান্তে করেন যে দুটি নৌকা উপস্থিত করেছে এই দুটিই যে প্রকৃত ডাকাতির নৌকা তার কোন প্রমাণ নাই। তিনি বলেন পুলিশের বিভিন্নরূপ মিথ্যা আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং মোকদ্দমাটি মিথ্যা এবং পুলিশের কল্পিত মাত্র।

পুলিনবাবুর সৈন্যিক বাসভূমি গোনসিংহ গ্রামের পাশেই নড়িয়া বাজার। এত বড় বাজার বহু মহাজনের অনেক ব্যবসা এখানে চলছে। প্রতি মহাজনের আড়তেই আশি নব্বই হাজার টাকা সব সময়েই সঞ্চিত থাকে। পুলিনবাবু স্থির করলেন এখান থেকে লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ঐ টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র কিনে ভারতের ডাকাতি বন্ধ করে দিবেন। পুলিনবাবুর সহকারীগণ এ ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন। বাজারের মানচিত্র তৈরী করা হল। বাজারে যাতায়াতের সুবিধা এবং অসুবিধা সম্পর্কে সংবাদও সংগ্রহ করা হল। এই ডাকাতিতে নেতৃত্ব তার গ্রহণ করবেন মানস নেন। তিনি প্রথমে কলকাতা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই নড়িয়া ডাকাতি অবলম্বনেই তিনি চাঁদা সমিতির সঙ্গে মিশে গেলেন এর আগে যারা ডাকাতির পরে পুলিনবাবু ডাকাতি লব্ধ তিন হাজার টাকা কলকাতা সমিতির সম্পাদক সতীশ বসুর হাতে দেন। পি. মিত্রই পুলিনবাবুকে এই আদেশ দিয়েছিলেন। এই সময়েই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে কলকাতা সমিতি হতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি সরবরাহ করা হবে। নড়িয়া ডাকাতির আগেও সতীশ বসু অস্ত্রাদি পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি কলকাতা থেকে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে এক্স চাকা পাঠান এবং তার নিকট দুটি ট্রাঙ্কে কয়েকটি রাইফেল ও বহু কার্তিজ পুলিনবাবুর নিকট পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীকালে এই নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যই মহিতাবতীয় রাজনীতিতে মানবেন্দ্র রায় বা এম, এন, রায় নামে পরিচিত হন।

ডাকাতির নির্দিষ্ট দিনে যথারীতি মাতার আক্রমণ করা হল ছয়টি মহাজনের আড়ত থেকে লোহার সিন্দুক ভেঙে প্রায় দুই লক্ষ টাকা এবং কিছু সোনা রূপার অলঙ্কারও পাওয়া গেল। কিন্তু এদিকে এক হঠাৎ বিপদ ঘটে গেল ডাকাতির সময়। বিপ্লবী কর্মীদের হাতে মশাল থাকত। হঠাৎ একটি মশাল এক কর্মীর হাত থেকে পড়ে গেল। ঐ স্থানের পাশেই ছিল কয়েকটি কেরোসিনের টিন। মুহূর্তটা টিনও কয়েকটা ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই আগুন জ্বলে গেল। হঠাৎ এই অগ্নিকাণ্ড ঘটায় বিপ্লবী কর্মীগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন এবং হাতের কাছে যে যা সামান্য অর্থ পেলেন তা নিয়েই নৌকায় উঠলেন। ফলে নড়িয়া ডাকাতি আশানুরূপ সফল হয়নি। পুলিশ নড়িয়া ডাকাতি সম্পর্কে কোন সন্ধান পায় নাই। এখান সেখান থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে প্রমাণ অভাবে তাদের ছেড়ে দিতে হয়।

পুলিনবাবু এই সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। সারকুলার রোডের বর্তমান লেডিস পার্কের নাম ছিল তখন ভেডারেশন পার্ক। ঐ স্থানে ক্রমান্বয়ে তিন রাত্রিতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত পুলিনবাবুর সাক্ষাৎ এবং দীর্ঘ আলোচনা হয়। স্থির হয় পুলিনবাবু উপযুক্ত লোক দিবেন এবং আচার্য রায় তাদের বুলেট উপাদান নির্মাণে রসায়ন শাস্ত্রের সর্বাধুনিক প্রণালী শিখিয়ে দেবেন।

এই সময় পুলিনবাবু অধিকাংশ সময় কলকাতাতেই কাটাতেন। প্রায় প্রত্যহই পি. মিত্রের বাড়ীতে গিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। একদিন পি. মিত্র পুলিনবাবুকে জানালেন যে পুলিনবাবুর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ এক ষড়যন্ত্র মামলার চক্রান্ত করছে। পুলিনবাবু পি. মিত্রের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শাদি নিয়ে ঢাকায় চলে এলেন। ঢাকায় এসে তিনি দেখলেন পুলিসের তৎপরতা আগের চেয়ে আরও অনেক বেড়েছে। যাহারা পুলিনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন তাদের থানায় ডেকে নিয়ে নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে রাখাও হল। একদিন পুলিনবাবুর গৃহ তল্লাসী হল এবং কিছু চিঠি কাগজপত্রও নিয়ে গেল। পুলিনবাবুর পুত্রের একটি হাওয়া বন্দুক ছিল। এই খেলবার বন্দুকটি পুলিশ নিয়ে গেল এবং অস্ত্র আইনে তাকে গ্রেপ্তার করল। এর পরে আরও কিছু কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল। এর মধ্যে ছিলেন ঢাকার উকিল লোলিত রায়, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শশী সরকার, টাঙ্গাইলের মোক্তার, অমর ঘোষ এবং নিরাজগঞ্জ মিউনিসিপালিটির তাইস চেয়ারম্যান বঙ্কিম রায়। মোট পঞ্চান্ন জনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়ে ছিল। পুলিশ এর মধ্যে চুয়ান্নিশজনকে গ্রেপ্তার করে বাকী দশজন গ্রেপ্তার এড়িয়ে ফেরার হন। মহারাজ নামে পরিচিত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী এবং অমৃত হাজরার নামেও পরোয়ানা ছিল। কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার করতে পারা যায় নি, তারা পলাতক ছিলেন।

ঢাকার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বেন্টিক সাহেবের সম্মুখে প্রাথমিক বিচার আরম্ভ হল। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন। যুদ্ধহেতু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং রাজদ্রোহীতা আসামীদের এই তিন ধারায় অভিযুক্ত করা হল। রমনা মাঠের নিকটে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের নীচতলাতেই বিচার আদালত। আসামীদের পক্ষ সমর্থন করলেন শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, শশাঙ্ক বসু, বিভূ গুহঠাকুরতা, নিবারণ গুহ মুস্তাফী এবং আরও কয়েকজন উকীল। কলকাতা থেকে পি মিত্র একখানি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি শীঘ্রই ঢাকা আসছেন। এটা ছিল ১৯১০ সালের জুলাই মাস। কিন্তু সহসা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তার পক্ষে আর ঢাকা আসা সম্ভব হয় নাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসের প্রথমেই পি. মিত্র সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। দুই সপ্তাহ চিকিৎসার পরে তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি উঠে বসতে পারতেন এবং শোবার ঘরেও একটু ইটাচলাও করতে পারতেন। এই অবস্থায় ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য তিনি একদিন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়ীতে ডেকে পাঠান। সুরেন্দ্রনাথ এসে তিনি চিকিৎসকদের নির্দেশ এবং পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তার সঙ্গে ঘণ্টাধিককাল আসামীদের পক্ষ সমর্থন সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্থির হয় যে এক সপ্তাহ পরে সুরেন্দ্রনাথ আবার আসবেন এবং এ সম্পর্কে আলোচনা হবে। কিন্তু এই প্রথম আলোচনার পরই পি. মিত্র মাস্থাতিরিক্তভাবে আক্রান্ত হন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে সেপ্টেম্বর বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির অধিনায়ক পি. মিত্রের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার জ্ঞান ছিল। অন্তিমকাল আসন্ন বুঝতে পেরে তিনি ইংরেজীতে নিম্নোক্তরূপ উক্তি করেন।

"I feel my end is approaching do convey to my deer Pulin and my other Dacca boys now undergoing trial that my last thoughts are with them".

এ সম্পর্কে পুলিনবাবু নিজেও বলেছেন, 'তিনি যে শেষ পর্যন্ত আমাদের ভাবনাই ভাবিয়া গিয়াছেন তাহার সর্বশেষ পত্রে তাহারও উল্লেখ ছিল।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[সাংবাদিকতা]

তিনি যেমন ছিলেন একজন বিচক্ষণ আইনবেত্তা ও সাংসারিক নানা বিষয়ে পারদর্শী, তেমনি ছিলেন একজন বিভিন্নমুখী নিষ্ঠা বুদ্ধির একটি অদ্ভুত মিশ্রণের মানস প্রকৃতির অধিকারী। প্রতি রবিবারে তিনি কালী মন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে আসতেন। আবার যে সমস্ত লোক কোন আচার নিষ্ঠার ধার ধারতেন না তাদের সঙ্গে একত্রে বসে খেতেও তার কোন দ্বিধা ছিলনা। এমন কি খাদ্যবস্তুর মধ্যে কোন নিষিদ্ধ খাদ্য মিশ্রিত থাকলেও সেই নিষিদ্ধ অংশটুকু বিনা আপত্তিতে খেয়ে ফেলতেন। এ কথা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে হিন্দু সমাজের আচার-নিয়মের মধ্যে যে গোঁড়ামি আছে, তা কি ভাবে সময় সময় বিরুদ্ধ মতের সঙ্গে আপোষ করে মিলে মিশে চলতে বাধ্য হয়েছিল, তারই একটা রূপ-রেখা তুলে ধরতে চাই। এই ধরণের আপোষ এর আগের প্রজন্মের লেখকের কাছে গ্লানি বলেই মনে হত। দ্রুত এবং অনমনীয় জীবন-সূত্রের মধ্যেও উদার মতবাদের প্রেরণা প্রেরণা যোগে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। হিন্দু সমাজ এগিয়ে চলছে যদিও ধীরে—নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েই চলছে।

যা হোক, তার মৃত্যুর পরে তার পরিবারের জন্য কোন হিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা আমার এক মানসিক তৃপ্তিদায়ক কর্তব্য ও অধিকার বলে মনে করি। আমি তার পুত্রদের তৎকালীন লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণর স্বর্গত স্যার এডওয়ার্ড বেকারের সঙ্গে পরিচিত করে দিলাম এবং তাদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছিলাম। স্যার এডওয়ার্ড বেকার বিষয়টিকে উদার ভাবে গ্রহণ করলেন। উদার মনোভাবের জন্য খ্যাতি তার ছিল। কোন অন্যায়ের প্রতিবিধান করার ক্ষেত্রে বা মহান সরকার বাহাদুরের ঔদার্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি তার এই মহানুভবতা প্রকাশ করেছেন।

বন্ধু আশুতোষ বিশ্বাস এবং আমি দুজনে একত্রে পত্রিকাটির সম্প্রসারনার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলাম। আমরা কোন মুনাফা করতে পারিনি; তবে দেনা না করে খরচ বহন করতে পেরেছি, অন্ততপক্ষে আর লোকসান হত না। যে বছর আমি পত্রিকার ভার গ্রহণ করলাম। সে বছর থেকেই এর লোকসানের অবস্থা কেটে গেল। প্রিন্টিং প্রেস এবং প্ল্যান্ট ইত্যাদি কেনার জন্য যে সামান্য দেনা হয়েছিল, তা আমি শোধ করলাম। আমরা প্রচলিত সাংবাদিকতার ভূমিকাই অনুসরণ করে চলতে থাকি—সমালোচনা, মন্তব্য, সংবাদ সংগ্রহ। তবে শত্রুও যে প্রায়ই সৃষ্টি করিনি, তা নয়। ১৮৭৮ সালে বেঙ্গলী পত্রিকা অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার আগে একটি ঘটনা ঘটে যার দিকে হয়ত দৃষ্টিপাত করা যায়। স্যার এসলি ইডেন বাংলার লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। এই সময় তার কয়েকজন বন্ধু ও ভক্ত মিলে ইডেন হলে তাকে এক বিরাট সম্বর্ধনা জানানোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্যার এসলি বাংলার একজন যোগ্যতম লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণর ছিলেন। তিনি ছিলেন হেইলিবারীর লোক এবং একজন পুরাণ ধরণের আমলা। অভিজাত মহলে তার অনেক বন্ধু ছিল এবং সে সময়কার বাঙালী নেতাদের মধ্যেও তার বন্ধু ছিল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তার বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল। কৃষ্ণদাস পালকেও তিনি বেশ সহ্য করতেন। এ কথাও তার সম্পর্কে বলা যায় যে তিনি ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না, এবং তার সময়েই কলকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের মিঃ বি. এল. গুপ্ত ইলবার্ট বিলের উপরে তার নোট দিয়েছিলেন যে নোটের উপর বিতর্কের সূত্রপাত হয়। তিনি যদি আরও কিছুকাল লেপ্টেন্যান্ট

থাকতেন, তাহলে, আমার মনে হয়, তিনি সাভিসকে নিজের আয়ত্তে রাখতে পারতেন এবং ইলবার্ট বিলের পরিসমাপ্তি অন্য ভাবে ঘটত।

তার সম্পর্কে এতসব কথা বলা গেলেও, একথাও বলা যায় যে তিনি ছিলেন অন্তিমকালীন একজন বুরোক্র্যাট, এবং সর্ব প্রকার প্রগতি মূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে তার ছিল একটা গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস। মিঃ বাকল্যাণ্ড তার—"বেঙ্গল আন্ডার দেপ্টেক্টাণ্ট গভর্ণর" পুস্তকে লিখেছেন যে লর্ড রিপণ তার সম্পর্কে তাকে বলেছিলেন যে এতদ অন্যন্ত যত বিশিষ্ট এবং নিচুক তাত্ত্বিক চিন্তার উপর নির্ভরশীল আর কোন লোককে তিনি দেখেন নি। এই ভাবে স্তুতিমধুর করে লর্ড রিপণ তার সম্পর্কে এই কথাই বলেছেন যে তার বিচার বুদ্ধির মধ্যে আদর্শবাদের কোন প্রভাব ছিল না বা প্রশাসক হিসাবে নিজ কর্তব্য সম্পর্কে কোন উচ্চ ধারণাও ছিল না। প্রাত্যহিক নির্দিষ্ট কাজ গুলি করেই তিনি খুসী থাকতেন। স্যার এসলে ইডেন ভার্ণাকুলার প্রেস এক্টের একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন এবং প্রেসের স্বাধীনতা বা কোন স্বাধীন প্রতিষ্ঠানকেই তিনি পছন্দ করতেন না

জন প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন ব্যবস্থাকে তিনি বলেছিলেন যে তা তার নিজের দেশের মাটিতেই হবে একটি চিরকালীন রূপ চারা গাছ জায়গাবদলে পরীক্ষা করে দেখার প্রশ্নই ওঠে না।

এই রকম একজন শাসনকর্তা নতুন শিক্ষালাভে জাগ্রত বাঙালী সমাজের কাছে কোন শ্রদ্ধা ভালবাসাই পেতে পারেন না। বাঙালী সমাজ তখন তাকিয়ে ছিল এক নব ভারতের অভ্যুদয়ের দিকে, যে ভারতে গড়ে উঠবে নানা ধরণের মুক্ত, স্বাধীন, বিকাশশীল প্রতিষ্ঠান। তার ব্যক্তিগত বন্ধুদের কাছে তিনি প্রিয় হইতে পেরেছিলেন; কারণ তিনি তাদের এবং তাদেরই সুপারিশ ক্রমে অন্যদের অনেক খেতাব, সর্দারাবা উচ্চপদ দান করেছিলেন। তাই তারা স্বভাবতই তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং তাকে সম্মান প্রদর্শনের অভিলাষ তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাদের কিছু বলার অধিকার নেই। জনসাধারণ তার শাসন কালের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পায় নি যাতে তিনি তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন মূলক অনুষ্ঠানের দাবী করতে পারেন। আমি বেঙ্গলী পত্রিকায় এই চিন্তাধারাই প্রতিফলিত করলাম এবং এ সম্পর্কে পরপর কয়েকটি নিবন্ধ লিখলাম। আমি পরিষ্কার ভাষায়ই লিখলাম যে স্যার এসলে ইডেনকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য যদি কোন প্রকার জনসভা হয়, তা হলে তার প্রতি জনসমর্থনের প্রশ্ন প্রত্যাঘাত ধ্বনিত হবে। আমার লেখার ইঙ্গিতটুকু সরকারী উদ্যোক্তারা বুঝতে পারলেন। ফলে টাউন হলে জনসাধারণের সভা বলে যে সভা হওয়ার কথা ছিল, তা আর হল না। সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে "এ সভা হচ্ছে বন্ধু ও গুণগ্রাহীদের সভা।" এতে কারও কোন আপত্তি থাকতে পারে না এবং আপত্তি হয়ও নি। অবশ্যই বাংলোপুর লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্নরের বন্ধু ও গুণগ্রাহীদের কে নিয়ে যা ইচ্ছা করার অধিকার আছে জনসাধারণের তাতে হস্তক্ষেপ করা বা বাধা দেবার কোন অধিকার নেই। সে দিনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীদের অভিমতের এই ঘটনাটি ছিল একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রযাত্রার ব্যাপার। সেদিনের এই বিজয় সূচনা আজ এক সবল, সক্রিয় রূপ ধারণ করেছে যাকে আর অগ্রাহ্য করা চলবে না।

যাবতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ এক মাত্রার জন্য
প্রস্তুতকারক: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
শ্রীকণ্ঠ কুটীর • কুমার পুকুর • বালাসোর • ওড়িষ্যা

গান্ধী সংগ্রহালয়ে অচলাবস্থা

বঙ্কেশ্বর বর্দ্ধন, (সর্বদলীয় কমিটির আহ্বায়ক, ব্যারাকপুর)

৭

সংবাদদাতা। জনমতের চাপে গত ১৩ই এপ্রিল '৭৮ সন্ধ্যায় ব্যারাকপুর সর্বদলীয় কমিটির দ্বিতীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হয় গান্ধী সংগ্রহালয়ের (১৪ রিভারসাইড রোড) সামনের রাস্তায়। সভাপতি (প্রধান শিক্ষক) শ্রীযুক্ত সচীন্দ্র দাশগুপ্ত জনতার দাবি ব্যাখ্যা করে বলেন, ব্যারাকপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের গৌরব পূর্ব-ভারতের (বিহার বাদে) একমাত্র গান্ধী সংগ্রহালয়কে আবাসিক সম্পাদিকা ও তাঁর ধনপিতারূপী সভাপতির খেয়াল খুশীমতো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা চলবে না। এবং তাঁদের স্বার্থসিদ্ধিমূলক কার্যকলাপের প্রতিবাদে গত ১৭ই মার্চ থেকে সত্যাগ্রহরত সমস্ত কর্মীদের জীবিকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না।

কমিটির পক্ষথেকে সর্বশ্রী গিরীশ চন্দ্র দাশ, গৌর কুণ্ডু, বিশ্বনাথ হালদার, শৈলেন দাশ প্রমুখ দায়িত্বশীল স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ গান্ধী সংগ্রহালয়ের সভাপতি ও তাঁর পালিতা কন্যারূপী আবাসিক সম্পাদিকার স্বেচ্ছাচার মূলক বিভিন্ন কার্যকলাপের বর্ণনা দেন নানা তথ্য সহযোগে। তাঁরা যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন : আজকের দিনে গান্ধী সংগ্রহালয়ের মতো গণপ্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কর্মকর্তার স্বার্থ চরিতার্থ করা কোন মতেই বরদাস্ত করা চলে না। তাই আবাসিক সম্পাদিকা ও সভাপতিকে এখনে জবাব দিতে হবে,—কেন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের প্রাপ্য ইউনিফর্মের টাকা খরচ করেও তাঁদের জিনিষপত্র দেওয়া হয় নি ; কেন ২জন মালীকে আবাসিক সম্পাদিকার ব্যক্তিগত কাজ করতে অস্বীকার করায় বরখাস্ত করা হয়েছে ; কেন ৩জন কর্মীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দিয়ে আবাসিক সম্পাদিকার বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে ; কেন কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হিসেব ঠিকমতো রাখা হয়নি ; কিংবা কেন P. A. কে তাঁর মূল বেতনের সঙ্গে প্রাপ্য অন্যান্য ভাগ দেওয়া হয়নি ; কেন দারোয়ানকে অসুস্থ অবস্থায় তাঁরই প্রাপ্য ছুটিতে থাকাকালীন ছাঁটাই করা হয়, অথচ আবাসিক সম্পাদিকা বছরে প্রায় ৫।৬ মাস ছুটিতে থেকেও কিভাবে বেতন পান ; আর কেনই বা হিসাব রক্ষককে নির্দিষ্ট বয়সের আগেই অবসর নিতে বাধ্য করা হচ্ছে, অথচ 'সার্ভিস রুলস' ভঙ্গ করে কেনই বা সভাপতি মশায় তাঁর পালিতা কন্যারূপী আবাসিক সম্পাদিকাকে প্রায়ই বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন ?

এই সমস্ত বে নজীর কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করে। প্রধান অতিথি (প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন : জনসাধারণের সঙ্গে অবশ্য অচরণ করে, এবং মিউজিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ গণপ্রতিষ্ঠানের কাজে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েও আবাসিক সম্পাদিকা এখনো মাসিক মোটা টাকা 'জনসংযোগ ভাতা' সহ বেতন নিচ্ছেন, এটা কেবল লজ্জার কথাই নয়, তা রীতিমতো অবশ্য অপরাধ। তিনি আরো

বলেন, কাজই যখন মানুষের প্রকৃত পরিচয়, তখন আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে—গান্ধীজীর প্রায় ৬লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত গ্রামীন বিশ্ব-বিদ্যালয় মেদিনীপুর 'লোকভারতী' কী হাল হয়েছে এই একই সম্পাদিকা ও তাঁর ধর্মপিতারূপী সভাপতিরই হাতে। অতএব ব্যারাকপুর বাসীদের এখনে সাবধান হতে হবে। ব্যারাকপুরের গৌরব গান্ধীজির নামাঙ্কিত এই গণপ্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে; এবং সকলকেই আজ খেয়াল রাখতে হবে; গান্ধী সংগ্রহালয়কে কারো পরিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো কখনোই ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। সকলকেই আজ জাতীয় দায়িত্বের নামে শপথ নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সবশেষে আহ্বায়ক [স্বাধীনতা সংগ্রামী] শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বর্মন মশায় সমগ্র ব্যারাকপুর মহকুমার প্রচণ্ড বিক্ষোভের কথা প্রকাশ করে দাবি জানান—১) সত্যাগ্রহের মূল কারণ আবাসিক সম্পাদিকা ও সভাপতির স্বেচ্ছাচার এখনে বন্ধ করে জনস্বার্থেই অবিলম্বে সংগ্রহালয় খুলে দিতে হবে ও স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু করতে হবে; ২) সকল ছাঁটাই ও সাময়িক বরখাস্ত কর্মীকে নিঃশর্ত-ভাবে পুনর্বহাল করতে হবে এবং কর্মীদের এত দিনকার স্বাভাবিক প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাসহ বেতন ভাতা ছুটি ইত্যাদি বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে এবনি; ৩) অন্যথায় দিল্লীর গান্ধীস্মারক নিধি, ব্যারাকপুর গান্ধী সংগ্রহালয় কমিটি, এবং ব্যারাকপুর মহকুমা শাসক তথা রাজ্য সরকার প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত দায়িত্ব নিতে হবে যাতে গান্ধী সংগ্রহালয় জনস্বার্থেই অবিলম্বে খুলে দেওয়া হয় ও কর্মীদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হয়; ৪) কেননা, বর্তমান সভা-পতির বেআইনী মদতে ও উপরমহলের পুলিশের সহায়তায় আবাসিক সম্পাদিকা এমন জঘন্য স্বার্থ-সিদ্ধিমূলক সমস্ত কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন বেপরোয়াভাবে, একথা আজ আর কারো অজানা নয়। এমতাবস্থায় রাজ্যের প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আজ সুস্থির সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, গান্ধীজির নামাঙ্কিত ব্যারাকপুরের গৌরব এই গণপ্রতিষ্ঠানটিকে সর্বতোভাবেই বাঁচাতে হবে। প্রয়োজন হলে জনসাধারণকে দলে দলে সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। সকলেই এ বিষয়ে যথোচিত অবহিত হোন, এটাই ব্যারাক-পুর সর্বদলীয় কমিটির একমাত্র কামনা। রাজ্যের সংবাদ পত্রগুলিও এবিষয়ে যথোচিত সাহায্য করবেন, আশাকরা যায়।

পরলোকে প্রবীন বিপ্লবী অমিয়নাথ রায়

গত ৫ই মে প্রবীণ বিপ্লবী অমিয়নাথ রায় দক্ষিণেশ্বরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বৎসর। বাড়ী ছিল মৈমনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল। বাল্যকালেই তিনি "যুগান্তর" বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে বহুদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সর্বজন প্রিয়—বন্ধুবৎসল—অমায়িক। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন আদর্শবাদী, একনিষ্ঠ কর্মী। বহুদিন যাবৎ তিনি রোগ শয্যায় কষ্টভোগ করেছেন। আমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করি।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—BIRBHUM		
Bhowmik Nitya Gopal	Dangalpara, P. O. Suri	200	1. 4. 75
Bose Kalipada	P. O. Khayrasal	200	1. 10. 76
Dutta Smt. Payarani w/o Late Sambhunath Dutta	P. O, Hazratpur	100	
Mondal Up ndra Nath	Vill Kalikapur, P. O. Muluck	200	
Sen Smt. Tulsi Bala w/o Late Bhupendra Narayan	Huttola, P. O, Bolpur	100	
Sen Gupta Smt. Sova w/o Late Narayan Sen Gupta	Baidyanath Sen Gupta Road P O. Rampurhat	150	12. 7. 77
	Dist—BANKURA		
Sen Mahendra Kumar	P. O. Patrasayar	200	1. 10. 76
	Dist—24-Parganas		
Chowdhury Smt. Kalyani w/o Late Nihar Ranjan	Roynagar, P. O. Bansdroni	100	22. 7. 77
	Dist—MIDNAPORE		
Bera Bijoy Krishna	Baharampur, P. O, Dakshin Damodarpur	200	25. 3. 77
Bera Smt. Kadambini w/o Late Brindaban Bera	Uttar Bamanbar, P.O. Bamanbar	100	7, 11. 77
Bhim Smt. Lakshmi Bala w/o Late Bishnupada Bhim	Vill Nirvoypur, P,O. Khanchi	200	7. 4. 76
Chakraborty Ashutosh	Vill Dakanda P.O. Meghadanagar	200	1. 10. 76
Das Piyari Mohan	Vill Pathuria, P.O. Asadbola	200	26. 2. 77
Ghosh Ambujaksha	P. O. & Vill Kumararati	200	15. 8. 72
Hait Haradhan	Vill Keshabpur, P.O. Chaitanyapar ; Via Mahisadal	200	"
Maiya Nemai Chand	P. O. & Vill Gopalpur	200	31. 12. 73
Pal Rash Behari	Vill Krishnagar P. O. Contai	200	22. 3. 74
Sanyal Smt. Nirmala w/o Late Bholanath Sanyal	C/o Biswath Mukherjee P. O. Tamluk	200	1, 10. 76
Bibi Musammat Guljan Khatun w/o Late Sheik Alauddin	Vill Mohammadpur P. O. Rampur	100	

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—NADIA		
Chakraborty Smt. Anila w/o Late Amarendra Nath	Vill Birpara, P. O. Santipur	150	30. 10. 77
Dutta Kshitish Chandra	Vill Jagadanandapur P. O. Bethuadahari	200	25. 3. 74
Kapali Smt. Renu Bala w/o Late Joy Hari Kapali	Sakdaha Govt. Colony P.O. Sakdha (via Mejdia)	150	29. 3. 74
	Dist—MURSHIDABAD		
Bhowmik Smt. Prova Rani w/o Late Promendra Kumar	Vill Barna Colony P.O, Beldanga	200	1. 10. 76
Chakraborty Bela w/o Late Prafulla Kumar	9, Radhaballavpara, Sendabad P. O. Khagra	100	16. 4. 77
Dhar Smt. Lakshmi Rani w/o Late Kamakhya Prosad	30 Exhibition Bagan Road Gorabazar P. O. Behrampur	150	17. 6. 77
Ghosal Smt. Sabita w/o Late Debabrata Ghosal	Vill Siddhikali P. O. Sabitri (via Raghunathganj)	200	1. 10 76
Khan Abdul Hamid (Abas Hamid Khan)	P, O. Jiaganj, Shibtolaghat	200	2. 4. 74
	Dist—MALDA		
Chowdhury Fani Bhusan	P.O. & Vill Bhaluk Bazar	200	1. 10. 76
Saha Narayan Chandra	Puratali English Bazar P.O. Malda	200	
	Dist—DINAJPUR		
Bagchi Baidyanath	P. O. Balurghat	200	1. 4. 77
	Dist—JALPAIGURI		
Chowdhury Arun Chandra	P. O. & Vill Mohitnagar	200	1. 10. 76
Dutta Smt. Niva Rani w/o Late Birendra Nath	Silpa Samitipara, P.O. Kotwali	105	24. 11. 76
Neogi Smt. Mira w/o Late Kshitish Ch. Neogi	Ukilpara, P.S. Kotwali	100	27. 5. 70
Modak Surendra Chandra	Arvindanagar, P.O. Alipurduar Court	200	1. 10. 76
Sikdar Smt. Malina w/o Late Birendra Nath Sikdar	Purba Arvindanagar P. S. Kotwali	150	
	Dist—COOCH BEHAR		
Sarkar Smt. Leelavati w/o Late Prafulla Nath	Vill Chhatguriahati P. S. Kotwali	150	18. 10. 77
Sen Ananda Mohan	Tapurhat, Kotwali	200	1. 10. 71

RegdNo. R. M. 24511/71 | Diplabi Bangla | Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

13 JUN 1978

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅরবীন চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলি চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি রঞ্জন রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীঅগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবীরেন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৩নং বন্ধুদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং সার্ভিসিটী, ১৯ বি বেথুন সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

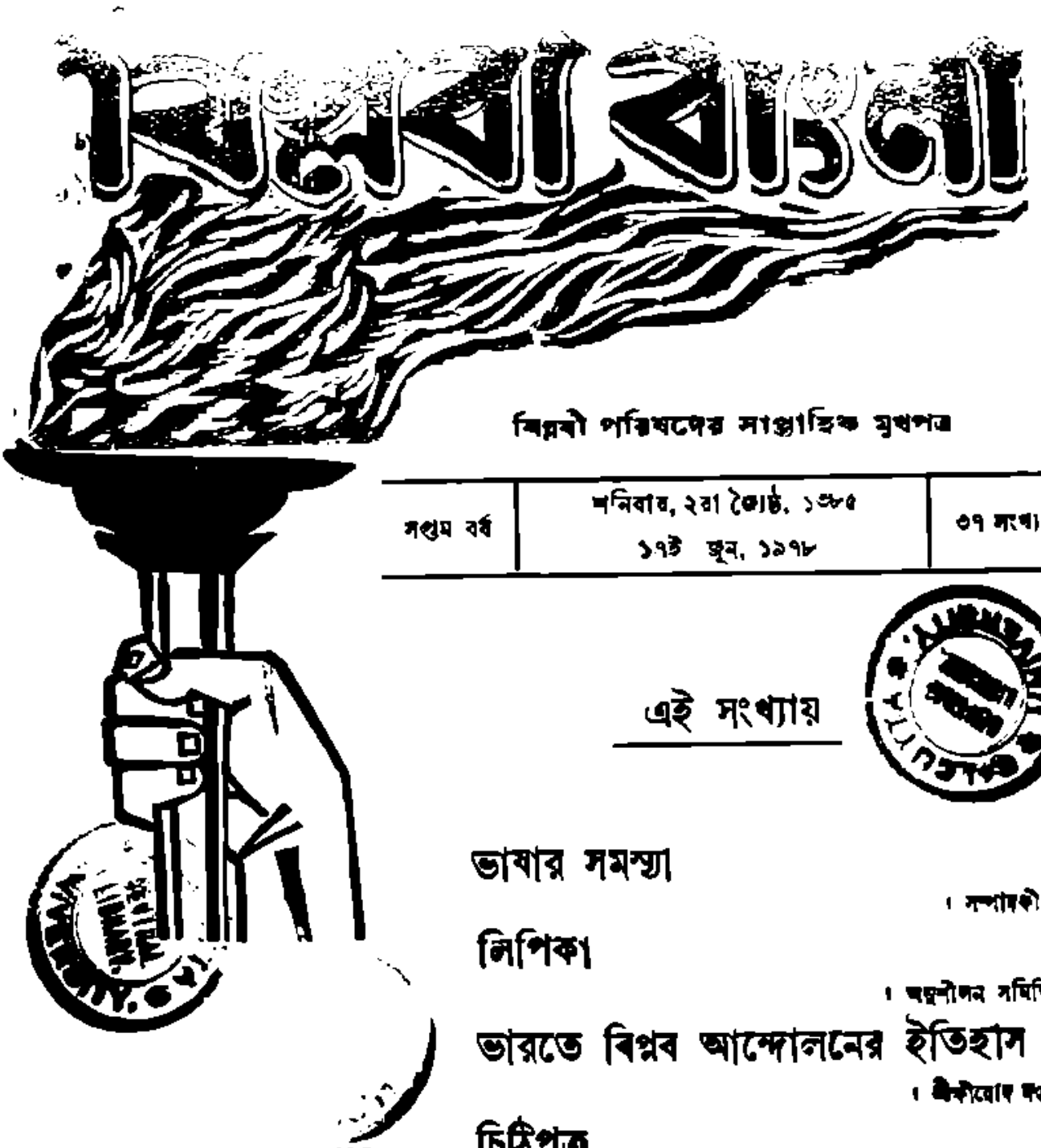

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ ১৭ই জুন, ১৯৭৮	৩৭ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

ভাষার সমস্যা
। সম্পাদকীয় ।

লিপিকা
। অনুশীলন সমিতি ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। শ্রীকীরোদ দত্ত ।

চিঠিপত্র
। শিবনাথ ব্যানার্জী ।

পুষ্পক রথের যাত্রী
। শ্রীমতী ছবি সেন ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

'জনতা' জনতাকে হতাশ করেছে
। ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

যে মানুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে সেই দেশের হিত-সাধনে সাধ্যানুসারে যত্নবান হওয়া তার জীবনের সকল প্রকার ধর্ম।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সম্পাদকীয়

ভাষার সমস্যা

গত ৪ঠা জুন রবিবারের স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, ভাষা সম্পর্কে তামিল নাদ সরকারের সন্দেহ নিরসনকল্পে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই তাদের জানিয়েছেন যে ১৯৬৭ সালের ভাষা আইন এখনও বলবৎ আছে এবং কোনরূপ সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। প্রধানমন্ত্রী এ সম্পর্কে আরও জানিয়েছেন যে এ আইন সংশোধনে কোন আশু সম্ভাবনা তিনি দেখছেন না। প্রধানমন্ত্রী তামিল নাদের অর্থবিষয়ক মন্ত্রী শ্রী কে. মনোহরনের নিকট এক পত্রে এ কথা জানিয়েছেন কিন্তু বিষয়টি যদি এতই সহজ হত তবে প্রধানমন্ত্রীর এই পত্র লেখার কি প্রয়োজন ছিল। তামিলনাদ সরকারের মনেই বা সন্দেহ দেখা দিল কেন এবং সে সন্দেহ নিরসনের প্রয়োজনই বা হল কেন? প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তা তাঁর নিজের মত হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীদের এবং সমগ্র মন্ত্রী সভারও কি এই একই মত? এ সম্পর্কে আমরা ঐ দিনেরই আরেকটি সংবাদের প্রতি প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তামিলনাদ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. জি. রামচন্দ্রন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একযোগে জানাচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় জনতা সরকার মুখে বলেছেন যে ভাষা সম্পর্কে তাদের নীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই কিন্তু পরোক্ষভাবে তারা অহিন্দী ভাষাভাষীদের উপর হিন্দী ভাষা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে তারা সাবধান করে দিয়েছেন যে এর ফলে দেশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

কিছুদিন ধরেই এই ধরণের কিছু কিছু সংবাদ আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কোন কোন রাজ্যে মাতৃভাষা ছাত্রদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য করার এরূপ বিধান করা হচ্ছে। একে অনেকে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে হিন্দীর প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে বলে আশংকা করছেন। অন্তত ভাষা সংক্রান্ত নীতির কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে বলে আমরাও মনে করছি। এ বিষয়ে আমরা জনতা সরকারকে একটি কথা স্মরণ না করিয়ে দিয়ে পারছি না। প্রতিবেশী বাঙলা দেশ সৃষ্টির কথা আমরা জনতা সরকারকে আজ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ইসলামের ঐক্য ভিত্তির উপরে যেদিন ভারত

ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের কোন প্রচেষ্টাই তাকে রোধ করতে পারেনি। কিন্তু সেই পাকিস্তানে ফাটল ধরল ভাষার আঘাতে উর্দু ভাষা এবং বাঙলা ভাষার পার্শ্বস্পারিক হানাহানিতে সেই ঐসলামিক ঐক্যও ভেঙে খানখান হয়ে গেল। সুতরাং ভাষা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমাদের আরও একটু ভেবে চিন্তে দেখা কি উচিত নয়। একবার এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে সেখান থেকে ফিরে আসার আর পথ থাকে না। তাই এ সম্পর্কে আমরা জনতা সরকারকে আরও একটু বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করছি। ১৯৬৭ সালের সেদিনের কথা মোরারজি দেশাই নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। যেদিন ভাষা সঙ্কট দেখা দিয়েছিল আমাদের জীবনেও। হিন্দী প্রেমীদের অত্যুৎসাহ যে দিন ভারতীয় জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে এনেছিল। সে অন্ধকার দূর করবার জন্য আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন সোদনের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু। অহিন্দী ভাষাভাষীদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারা যতদিন হিন্দীভাষাকে না চাইবেন ততদিন হিন্দী ভাষা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এ প্রতিশ্রুতি শুধু শ্রী নেহেরুই সেদিন দেন নাই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীও এ কথা অনুমোদন করেছিলেন, অনুমোদন করেছিলেন তৎপরবর্তী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও তবে আজ এমন কি ঘটল যাতে পুনরায় এ হিন্দী সমস্যা আবার আমাদের জীবনে নূতনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল? অহিন্দী ভাষাভাষীরা সে স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে হিন্দীকে সাদরে গ্রহণ করেছেন? একটি অহিন্দী ভাষী রাজ্যেও কি এরূপ কোন আইন প্রবর্তন করা হয়েছে? তবে কেন এ প্রশ্ন আবার নতুন করে দেখা দিল। বিহার সরকার আজ বাঙলা সরকারের নিকট চিঠি লিখছেন হিন্দী ভাষায়। এ পর্যন্ত এরূপ চিঠির সঙ্গে ইংরেজী প্রতিলিপি আসত। কিন্তু আজ সে প্রতিলিপি দেখা বন্ধ হল কেন বর্তমান অবস্থায় হিন্দীভাষীগণ কিছুটা অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন। তারা যে সুবিধা পাচ্ছেন তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে অহিন্দী ভাষীদের সেই সুবিধা পেতে হচ্ছে একটি তৃতীয় ভাষাকে আয়ত্ব করে। কিন্তু সে পথও যদি আজ, তাদের বন্ধ হয়ে যায় এবং সে জন্য যদি উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে না ওঠে তবে এই সকল অহিন্দীভাষী জনতা কি ভাষতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে পড়বেন না তাদের এই আশঙ্কা কি একেবারেই অমূলক? এই জন্যই আমরা জনতা সরকারকে আরও একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার আগে সমগ্র দেশে ভাষা হিন্দীর প্রতি আগ্রহ গড়ে তুলুন। তার আগে তারা যেন আগুন নিয়ে খেলা না করেন। এ ভাষার আগুন জ্বলে উঠলে তাতে শুধু হিন্দী প্রেমীরাই পুড়বে না পুড়বে সমগ্র জাতি। এ বিষয়ে আমরা সাবধান বাণী উচ্চারণ না করে পারছি না।

———

ফোন : ৭২-৫১৪৫

অনুশীলন সমিতি

৩২/৮ চণ্ডী ঘোষ রোড
কলিকাতা-৭০০০৪০

প্রিয় সতীর্থ,

সুদিন-দুর্দিনের সহযাত্রী মনে করে এক সঙ্কটময় মুহূর্তে সহযোগিতা লাভের আশায় আপনার দ্বারস্থ হচ্ছি।

দেশজননীর শৃঙ্খল-মোচন এবং সুখী সমৃদ্ধ শোষণমুক্ত ভারত গড়বার সংকল্প নিয়ে বিপ্লবের দুর্গম পথে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল বর্তমান শতাব্দীর প্রত্যূষে। সুদীর্ঘ ৪৫ বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলশ্রুতি খণ্ড-বিখণ্ড-খণ্ডিত ভারতের পরশাসনমুক্তি। সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়ের সেখানে সমাপ্তি; কিন্তু শেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে আরও বিঘ্নসংকুল দীর্ঘপথে আমাদের চলতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুরু হল শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনতার সংগ্রাম। বিগত ৩০ বছর ধরে শাসকগোষ্ঠি কত পরিকল্পনা কত প্রতিশ্রুতি দেশের মানুষকে দিয়েছেন দিয়েছেন কত আশা কত আকাশচুম্বী প্রলোভন, কিন্তু জনতা তিলে তিলে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে, মরছে, প্রতারিত হয়েছে। স্বাধীনতার তিলমাত্র স্বাদ ভোগ করতে পারে নি। সর্বত্র সর্বহারার মিছিল, দেশ বিভাগের কালে ছিল ওপার থেকে ভিটেছাড়া নিরন্নের মিছিল, গত একদশক ধরে তার সাথে যোগ দিয়েছে এপারের গাঁয়ের লোক। পৈতৃক ভিটা ছেড়ে শহরের ফুটপাথে গৃহস্থালি পেতেছে হাজার হাজার নতুন উদ্বাস্তু। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ফুটপাথেই জন্ম, ফুটপাথে মৃত্যু কি মর্মান্তিক দৃশ্য! যাঁরা দেশ শাসন করেছেন কুর্তা বদলিয়ে তাঁরাই আজ গদিতে বসে বলছেন দেশের শতকরা ৬০ ভাগের বেশী লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে নিষ্পেষিত হচ্ছে।

কার দোষ? কে দায়ী? কেবল কি শাসক গোষ্ঠী; না বিরোধীরাও। কই, নির্মমের শোষণে ধনীর কলঙ্কময় হাতে তাঁদের ত আঘাত করতে দেখিনি! 'আমাকে ভোট দাও, কেন্দ্রের হাত মজবুত কর; তবে মা তোমার দারিদ্র্য ঘুচবে!'—বলেছে গদিনশীন শাসক দল। ওদিকে বিপ্লবী-দর্শনে রঞ্জিত লাল পতাকা হাতে ছোট বড় মহারথরা বলছে—আজও বলেছে,—'আমাকে ভোট দাও, আমি তোমার নির্ভেজাল বন্ধু, আমি তোমার সব দুঃখ কষ্ট ঘুচাব।' যত তত্ত্ব, যত মন্ত্র, যত কুহেলিকাময় যুক্তি আউড়ে আসুক না কেন, ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে তারাও কিন্তু 'বুথের' দিকে জনতাকে ডেকেছে। পার্থক্য কোথায়—কোথায় জাল বোনা ছাড়া? ত্রিশ বছরে জনমানসে বিপ্লবের এতটুকু আগুনও তথাকথিত বিপ্লবী দলগুলি জ্বালাতে পারে নি। পেরেছে শুধু মিথ্যা আশা সৃষ্টি করতে আর 'পাইয়ে দেবার' রাজনীতির প্রলোভনের জাল বিছাতে তোমাকে 'বোনাস' আরও পাইয়ে দেব, 'মাগ্‌গি-ভাতা' না বাড়ালে 'ধনীর কালোহাত গুঁড়িয়ে দেব' সে কী হুংকার, সে কী প্রতাপ! যাত্রাদলের ভীমও পর্দার আড়ালে হাসে। মরে শুধু সরল বিশ্বাসীর দল বিগত ত্রিশ বছরে দু'একটি রাজ্যে ক্ষমতা

লাভ করেছে কবিকের জন্য, কিন্তু সর্বহারার দুঃখ এতটুকু ঘোচেনি। শোষকের কালোহাত গুঁড়িয়ে দেবার পরিবর্তে সে হাতের সাথে করমর্দন করছে, পাঁচতারা হোটেলে খানাপিনা করছে, শুধু খাতকের সাথে ভোটযুদ্ধ জয়ের গুপ্ত সন্ধানের পরামর্শে মহান্তদের আদর্শবোধে বাধাও ঘটেনি। বিশ্বাসভাজন শিষ্যের দল প্রভুর নির্দেশে 'বুথ' দখলের পায়তাড়া কষেছে। চলেছে মিছিল করে শ্লোগান দিয়ে কাতারে কাতারে। কোথায় এর শেষ? শেষ ঐ তীর্থস্থানে 'বুথে' (Booth) আর হাতিয়ার ব্যালট পেপার। বিপ্লবী আদর্শের যাঁরা ধারক, যাঁরা নায়ক,—তাঁরা অন্ধ, আজও অনুভব করতে পারছেন না,—সংগ্রামের আগুন নিস্তেজ হয়ে গেলে, তার শাণিত অস্ত্রের ধার বিনষ্ট হলে, সর্বোপরি সংগ্রামের পরিবর্তে পাওয়ার নেশায় তাকে মাতিয়ে তুললে এমন একদিন আসবে যখন বিপ্লবের নামও জনতা বরদাস্ত করতে পারবে না।

দোষ কেবল কি সদ্য গদিচ্যুত আর গদিপ্রাপ্তদের? না। দোষ আপনার আমার। সকলের পাপের ফল ভারত-জননী ভোগ করছেন। স্বদেশ-প্রেম দেশ থেকে নির্বাসিত। আবার নূতন করে সেই বোধ না জাগাতে পারলে মুক্তি সুদূর-অস্ত।

প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধ্যায়ে যে সব বিপ্লবী গোষ্ঠী মরণপণ করেছিলেন এবং দেশ পরশাসনমুক্ত হলে 'দেশবাসীর মোটা ভাত-কাপড়ের দুঃখ ঘুচবে'—এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; তাঁরাও কি তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন? সকলে না হলেও—অনেকেই সংগ্রামের পথ ছেড়ে ঘর বাঁধবার পথে মুঠো অন্নের জন্য আরও দশজন সাধারণ সংসারী যা করে থাকে—তাই করেছেন। অন্যায়-অত্যাচার-শোষণ-নিপীড়ন দেখেও প্রতিকার দূরের কথা প্রতিবাদও করেন নি! কণ্ঠ তাঁদের রুদ্ধ—ত্রিশ বছর ধরে কানাই-ক্ষুদির বংশধর পলাতক, পরাজিত।

এই অসহনীয় অবস্থা থেকে দেশবাসী কি মুক্তি পাবে না? কে তাকে মুক্তির সন্ধান দিবে? পুরানো বিপ্লবী গোষ্ঠীর অনেকেই পরপারে। যাঁরা এখনো জীবিত, তাঁরাও অনেকে পঙ্গু, অশক্ত। সামর্থ খুবই সীমিত। তা জেনেও একবার শেষ চেষ্টা করা যায় না কি? যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘর ছেড়ে আমরা বেরিয়েছিলাম,—সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন; আসুন সকলে মিলে প্রায়শ্চিত্ত করি।

পথ অজানা; তবে চলা শুরু করলে পথই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। প্রাথমিক প্রয়োজন সংগঠনকে সজীব সক্রিয় করে তোলা। তাত্ত্বিক প্রয়োজন নির্ভীক মত প্রকাশ করা; দেশ গঠনে যাঁরা সত্যিই ব্রতী তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা করা। এই উদ্দেশ্যে সমিতির পরিচালকমণ্ডলী যত সত্বর সম্ভব একটি 'মুখপত্র' প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।

মরণ পথের সহযাত্রী হিসাবে আমরা স-গোত্র। আপনার কাছে দাবী জানাবার অধিকার আছে বলেই মনে করি। আপনার সহানুভূতি, পরামর্শ এবং সহযোগিতা কামনা করি; কামনা করি পূর্বসূরীদের এবং জীবিত বয়োবৃদ্ধদের আন্তরীক আশীর্বাদ। ইতি—

বিনীত—

২২ শে মে, ১৯৭৮

অনুশীলন সমিতির পরিচালকমণ্ডলী

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীকীরোদ দত্ত

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ডব্লু কাজন ঢাকা পরিদর্শনে যান। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য বিপুল আয়োজন করা হয়। লাট সাহেবকে লাঠি খেলা দেখাবার জন্য শ্রীরামপুর থেকে পলিস্ত লাঠি খেলোয়াড় মার্তাজাকে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিনবিহারী দাস ঐ সময় মার্তাজার কাছ থেকে লাঠিখেলা শিখে নেন। ঐ সময়ে তিনি ছিলেন ঢাকা কলেজের ল্যাবোরেটরি অ্যাসিস্টেন্ট। পুলিনবাবু প্রথমে নিজের বাড়ীতেই লাঠি খেলা আরম্ভ করেন। সুরেন নাগ, যোগেন নাগ, জ্যোতিষ মজুমদার (বোচাবাবু) এই সময় পুলিন-বাবুর সঙ্গে লাঠি খেলতেন। নৃপেন নাগও এই সময় থেকেই পুলিনবাবুর সঙ্গে ছিলেন। পরে পুলিনবাবুর সঙ্গেই তিনি তিন আইনে বন্দী হন।

এরপরে রাজার দেউড়ীতে যোগেন নাগ লাঠি খেলার আর একটি আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। শিশির গুহ রায়, প্রফুল্ল কবীরাজ, বীরেশ গুহ মুস্তফী (স্বামী তুরীয়ানন্দ,) ক্ষিতিশ মুখার্জী, খগেন্দ্র চৌধুরী, যতীন সরকার, হেম ঘোষ, হেমেন্দ্র রক্ষিত, অতুল রায় চৌধুরী, যোগেশ রায়, এই সময় এখানে লাঠি খেলতেন। পরে নরেন সেন, প্রিয়নাথ দাসগুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ রায়, শচীন ব্যানার্জী প্রভৃতিও এই আখড়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শিশির গুহরায় ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে গোয়ালন্দ ঘাট স্টেশনে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবকে গুলি করেন। খগেন্দ্র চৌধুরী বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা, ধরাইনগর অস্ত্র মামলা এবং রাজাবাজার বোমার মামলার আসামী ছিলেন। যোগেশ রায়, মণীন্দ্রভূষণ রায় এবং শচীন ব্যানার্জী ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন।

১৯০৫ সালে জন্মাষ্টমীর দিনে পুলিনবাবু প্রথমে লাঠি খেলা প্রদর্শন করেন। এদিন তিনি লাঠি খেলেন সুরেন নাগের সঙ্গে। পুলিনবাবু এইদিন ছোরা এবং বল্লি খেলাও দেখান। পরবর্তী জীবনে সুরেনবাবু জার্মানী থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে এসেছিলেন।

এরপরে লাঠি খেলার তৃতীয় আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয় লক্ষী বাজারে। জ্যোতির্ময় রায়, প্রকাশ পাকড়াশী, নৃপেন চক্রবর্তী হিরণ্ময় গুপ্ত প্রভৃতি এখানে লাঠি খেলতেন। জ্যোতির্ময় রায় জন্মাষ্টমী ছোরাবাজি মামলায় দণ্ডিত হন। তিনি ঢাকার ষড়যন্ত্র মামলারও আসামী ছিলেন। নৃপেন চক্রবর্তী এবং হিরণ্ময় গুপ্ত গোয়েন্দা ইনেস্‌পেক্টর শরৎ ঘোষকে হত্যা করা মামলার আসামী ছিলেন। মাহেশ্বরীতেও একটি আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে লাঠি খেলতেন অমৃত হাজরা, যতীন রায় এবং অন্যান্য কয়েকজন। অমৃত হাজরা বারদা ডাকাতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ডাকাতির পরে তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা এবং রাজাবাজার বোমার মামলারও আসামী ছিলেন। যতীন রায় অনুশীলন সমিতির কুমিল্লা শাখার প্রতিষ্ঠাতা।

অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার পরে সমিতির প্রথম উল্লেখ যোগ্য কাজ হল রহমতউল্লার গুণ্ডার দল দমন। ঢাকার হিন্দু মুসলমান সকল নাগরিকই এই কুখ্যাত গুণ্ডার দলের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। ১৯০৬ সালের জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় প্রথমদিনে রহমতউল্লার সহকারী হাবিবকে ছোরা মারা হয়। এই মামলায় জ্যোতির্ময় রায় আট মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দ্বিতীয় দিনে ঐ শোভাযাত্রায়ই রহমতউল্লাকে

হত্যা করার চেষ্টা হয়। সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় কিন্তু তার একজন সহকারী নিহত হয়। এই সম্পর্কে সমিতির সদস্য খগেনঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কোন মামলা হয় নাই। সমিতির এই চেষ্টার ফলে রহমতউল্লার ওকালতী চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এই ঘটনার বিরূপ ফলাফলেও বিপ্লব থেমে না। সমিতির শক্তিবৃদ্ধিতে সরকারপক্ষ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তারা মুসলমানদের সমিতির বিরুদ্ধে উস্কানী দিতে লাগলেন এবং সমিতির বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্য সন্তবত কিছু মুসলমান নিয়োগও করেছিলেন। সরকারী উস্কানিতে উত্তেজিত হয়ে মুসলমানগণ একদিন পুলিনবাবুর গৃহ আক্রমণ করল।

পুলিনবাবু ঐ সময় ৫০ নং ওয়াডীতে একখানি বাড়ী ভাড়া করে বাস করতেন। এক রবিবার দুপুরবেলা কয়েকজন মুসলমান এক মুমূর্ষু বাছুরকে নিয়ে এসে পুলিনবাবুর বাড়ীর সামনে গোলযোগ আরম্ভ করল। তারা উত্তেজিত এবং উন্মত্ত হয়ে সমিতির সদস্যদের গালাগালি আরম্ভ করে। তাদের দাবী সমিতির সদস্যগণই বাছুরটির পা ভেঙে দিয়েছে এবং এর প্রতিশোধ না নিয়ে তারা যাবে না। তাদের নানা প্রকার বোঝাবার চেষ্টা হল কিন্তু তারা কিছুতেই নিবৃত্ত হলনা। উত্তেজিত মুসলমানগণ বাইরের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করল। পুলিনবাবুও লাঠি নিয়ে এসে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। ক্রমে মুসলমানদের সংখ্যা ছয় সাত শত হল। সমিতির কয়জন তরুণ পুলিনবাবুকে সাহায্য করতে লাগলেন। মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক থাকা সত্ত্বেও তারা পুলিনবাবুর লাঠির সামনে দাঁড়াতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তারা দূর থেকে ইঁটপাটকেল ছুঁড়তে লাগল। ঐ সময় পুলিশ এসে পড়ল। কিন্তু তারা আক্রমণকারী মুসলমানদের কোন কিছু না বলে পুলিনবিহারী এবং তার সঙ্গী কয়টি তরুণকেই গ্রেপ্তার করলেন। পুলিনবাবুর লাঠি চালনায় কয়েকজন মুসলমান আহত হয়েছিলেন। তাদের এবং বাছুরটিকেও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ডাক্তারের রিপোর্টে জানা গেল বাছুরটি স্বাভাবিকেই রোগা হয়ে পড়েছিল। তার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু এ সত্ত্বেও আক্রমণকারী মুসলমানদের একজনকেও গ্রেপ্তার করা হল না। বিচারে পুলিনবাবু একুশদিন এবং তার পাঁচটি তরুণ সঙ্গী পনেরদিন করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এ ছাড়া সকলেরই পনের টাকা করে অর্থদণ্ড হল। বিচারক বেটীং সাহেব তাঁর রায়ে বললেন, মুসলমানগণ গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে বাড়ী আক্রমণ করেছিল বটে কিন্তু পুলিনবাবু এবং তাঁর সঙ্গীগণ আত্মরক্ষার প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে। তিনজন মুসলমানকেও এক বিরুদ্ধ মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু বিচারে সকলকেই মুক্তি দেওয়া হয়। এ মামলার বিচারক মুক্তি দেখালেন যে ঘটনার সময় যত মুসলমান একত্র হয়েছিল, এই সকল মুসলমানদের মধ্যে পুলিনবাবুর পক্ষ থেকে মাত্র তিনজনকে সনাক্ত করা হয়েছে এ সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ব্যাপারটাই উচ্চ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ ঘটেছে এ দৃষ্টান্তে অসুবিধা হল না। পরে জানা গেছে মাত্র পাঁচ ছয়টি বালকের সাহায্যে এতগুলি মুসলমানকে আহত এবং পরাভূত করা পুলিনবাবুর পক্ষে কি করে সম্ভব হল এজন্য সরকারপক্ষও আতঙ্কিত হয়ে মামলায় পুলিনবাবুর যাতে শাস্তি হয় তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে হাইকোর্টে আপীল করা হলে সকলেরই কারাদণ্ড রহিত হয়। কিন্তু অর্থদণ্ডের টাকা সকলকেই দিতে হয়েছিল। এই ঘটনা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘটলেও সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের সম্পর্ক এই সময় খুব ভালই ছিল। তখন পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার ধর্মা হাঁঙ্গামা আরম্ভ হয় নাই। তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সদাচার রক্ষা করেই চলতেন।

চাকা ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন কলিনী গুপ্ত, পি. এল্ রায় এবং আরও কয়েকজন পি. এল্ রায়ের দৈনিক পারিশ্রমিক ছিল এক হাজার টাকা নিম্ন আদালতে এই মামলা প্রায় সাত মাস ধরে চলছিল। বিপ্লবী আসামীগণ থাকতেন জেলে, সমস্ত

সিপাহীগণ তাদের বিচারস্থানে নিয়ে আসত এবং সন্ধ্যায় বিচারান্তে আবার জেলখানায় পৌঁছে দিত। জেল খানাতে হাতকড়ি খোলার পরে উলঙ্গ করে তাদের তল্লাসী করা হত। সশস্ত্র প্রহরীগণ সমস্ত রাত্রি তাদের কক্ষের সম্মুখে পাহারা দিত।

পূর্বে যে বাড়ীতে অনুশীলন সমিতি ছিল সরকারপক্ষ ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়েছিল। সরকারী উকীল শরৎ ঘোষ এখানে প্রতিদিন সাক্ষীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেন এবং এজন্য পারিতোষিক পেতেন দৈনিক একশত টাকা। প্রায় চারশ লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল এর মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগই পুলিশের লোক।

শ্রীশ চ্যাটার্জী, শশাঙ্কবাবু, বিভূ গুহঠাকুরতা, বীরেন্দ্র বসুমল্লার, হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত এবং অন্য অনেকজন প্রবীন এবং নবীন উকীল আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু আসামী পক্ষে প্রধান পরিচালক ছিলেন ব্যারিষ্টার সি. আর দাস।

ঘোরতমার প্রথমদিকে কয়েকজন পল্লীবাসীর সাক্ষী পুলিশের পরামর্শ মত নানারূপ মিথ্যা সাক্ষী দিতে থাকে। এর ফলে একজন সাক্ষীকে বিক্রমপুরে তার নিজ বাড়ীতে মুগুর আঘাতে হত্যা করা হয়। এর ফলে পরের দিকে সকলেই সংযতভাবে সাক্ষী দিয়েছিল। এই সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রিয় দারোগা শরৎ ঘোষকেও হত্যা করা হয়। এই ভাবে ক্রমে বিচার শেষ হল। বিচারক রওজা শুনিয়ে সেই দিনই ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলেন। উকীল নলিতরায়, দুজন মুন্সী, শশী সরকার, বীরেন সেন, যোগেন্দ্র দাস, নলিনী গুহ, হেম বসু এবং আরও দু একজন মুক্তি পেলেন বীরেন সেনকে মুক্তি দিয়ে অন্য এক অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল। আশুতোষ দাসগুপ্ত এবং জ্যোতিষ রায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হল। তাদের কয়েকজন দশ বৎসর থেকে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

আসামীদের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আবেদন করা হল। হাইকোর্টে সি. আর দাস এবং ব্যারিষ্টার নিশীথ সেন আসামীদের পক্ষ সমর্থন করলেন। বিচারপতি হ্যারিংটন, বিচারপতি আশুতোষ মুখার্জী এবং বিচারপতি কেলপার্ট। হাইকোর্টের বিচার ছয়মাস কাল চলেছিল। কিন্তু রওজা দিতে আরও ছমাস দেরী হল। এই সময় দিল্লীর দরবার শেষ হলে ইংল্যাণ্ডের সম্রাট কলকাতায় এলেন এবং বন্দীদের মুক্তি হল বলে ঘোষণা করলেন। বহু উকীল এসে বিপ্লবী আসামীদের জানিয়ে গেলেন যে অনুশীলন সমিতির কর্মতৎপরতার জন্যই বঙ্গ ভঙ্গ রদ হয়েছে। কিন্তু বিচারের রায় প্রকাশে খুবই বিলম্ব হতে লাগল। এর কারণ সরকার পক্ষ থেকে অভিযোগ সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয় নাই। বিভিন্ন খুন ডাকাতি এবং রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ আনা হয়েছিল কিন্তু এই সমস্ত খুন ডাকাতি-যে অনুশীলন সমিতিই করেছে সরকার পক্ষের এই সমস্ত যুক্তিই অনুমান সাপেক্ষ ছিল কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর করে আসামীকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। আইনত সন্দেহের সুযোগ আসামীরই প্রাপ্য। তাই এ সম্পর্কে দার্জিলিংএ উচ্চ হাই কর্তৃপক্ষের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পরে স্থির হয় যে সাধারণ মামলায় সন্দেহের সুযোগ আসামীরই অনুকূলে যেলেও রাজদ্রোহ সূচক সন্দেহের সুযোগ সরকার পক্ষই পাবে। তবে এই অনুযায়ী সাজা বড়দের মামলা হওয়ার ফলে আসামীদের অপেক্ষাকৃত লঘু দণ্ড দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

হাইকোর্টের বিচারে পুলিনবিহারী দাস বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। আশুতোষ দাসগুপ্ত এবং জ্যোতিষ রায়ের দুয় বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হল। অন্যান্য বন্দীদের দণ্ড ও কমে দুই বৎসর থেকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড হল। দুই মাসে ঢাকা জেলে থাকার পরে তাকে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হল। এখানে একমাস থেকে তিনি আন্দামান যাত্রা করলেন। ১৯২১ সালে তিনি আন্দামান থেকে মুক্তি পান।

ঢাকা সমিতির উপরে দ্বিতীয় এক বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলায় ঢাকা সমিতির সাঁইত্রিশ জন কর্মীকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল। প্রাথমিক বিচারে কয়েকজন মুক্তি পেলেন। শেষ পর্যন্ত বরিশালের মায়রা জজ ক্যাসেইডের আদালতে ছাব্বিশ জনের বিচার আরম্ভ হল। দুজন রাজসাক্ষী হল। এদের নাম গিরীন্দ্র দাসগুপ্ত এবং রজনীকান্ত সেন। ছাব্বিশ জন আসামীর মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন, যতীন্দ্রভূষণ রায়, বীরেন বসু এবং দেবেন্দ্র মুচুরী প্রভৃতি। দেবেন্দ্র মোয়াখালি জেলার দুর্গাপুর স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা হয় ১৯১৩ সালে। কিন্তু ১৯১২ সাল থেকেই এর জন্য উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হয়েছিল। এ্যাডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর যামিনী দাসের দুই পুত্র সতেন্দ্র এবং গিরীন্দ্র অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। যামিনি দাস প্রথমেই বরিশালে এবং তার পরে ময়মনসিংহে সরকারীরূপে কাজ করতেন। কিন্তু দুই পুত্র মাতার সাথে ঢাকাতেই থাকতেন। সরকারী কর্মচারীর গৃহ নিরাপদ বলে ঐ গৃহে একটি ট্রাঙ্কে ডাকাতি লব্ধ কিছু অলঙ্কার রক্ষিত ছিল। গিরীন্দ্রের মা একদিন এ জানতে পেরে তার ঘরে স্বামীকে ডেকে এনে সবকথা স্বামীকে জানান। এদিকে গিরীন্দ্রের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে ট্রাঙ্কটি আনবার জন্য দলের নেতা মদন ভৌমিক এবং রমেশ আচার্য ঐ গৃহে যান। কিন্তু যামিনী বাবু মদনবাবুকে আটক করে পুলিশের হস্তে অর্পণ করে অলঙ্কার সহ ট্রাঙ্কটিও পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। গিরীন্দ্র ও মদনবাবুর বিরুদ্ধে আলাদা এক মামলা হয়। কিন্তু গিরীন্দ্র আদালতে বলেন যে মদনবাবু এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। ফলে মদনবাবু মুক্তি পান এবং গিরীন্দ্র আড়াই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই মামলাকে উপলক্ষ্য করেই বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার সৃষ্টি। গিরীন্দ্র দণ্ডিত হবার পরে মাতা ও পিতা জেলে মদনকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে থাকেন এবং ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হবার জন্য তাকে প্ররোচিত করতে থাকেন। রমেশ আচার্য এর কিছুদিন আগে বরিশাল বিপ্লবী সমিতির ভার নিয়েছিলেন। তিনি এবং যতীনরায় বরিশালশহরে একটি বোর্ডিং হাউস স্থাপন করেন। এই বোর্ডিং হাউসই ছিল বরিশালে সমিতির কেন্দ্রকেন্দ্রের অফিস। পুলিশ নিশি চক্রবর্তী নামে এক গুপ্তচরকে জ্যোতিষীর ছদ্মবেশে এই বোর্ডিং-এ রাখে। নিশি চক্রবর্তী এখানে থেকে সমিতির বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকে। এই ভাবে সব দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে সরকার পক্ষ নানা স্থানে গ্রেপ্তার আরম্ভ করে। রমেশ আচার্য গ্রেপ্তার হন বরিশালে এবং যতীন রায় গ্রেপ্তার হন ঢাকাতে। এছাড়া গোপাল মুখার্জী, দেবেন ঘোষ, চণ্ডী বসু, যতীন ঘোষ, সারদা ভট্টাচার্য, জ্ঞানরঞ্জন দাসগুপ্ত, নলিনী মিত্র, সতীশ চক্রবর্তী প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে আসামী করা হয়। এই মামলায় প্রতুল গাঙ্গুলী, মদন ভৌমিক, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রমেশ চৌধুরী এবং যতীন চৌধুরীর নামেও ওয়ারেন্ট ছিল, কিন্তু তারা ফেরার হন। সেশান আদালতের বিচারে রমেশ আচার্য এবং যতীন রায় বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। রোহিনীবাবু, নিবারণ কর এবং যতীন ঘোষের দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। প্রিয়নাথ আচার্য, কুমুদ নাগ, দেবেন্দ্র মল্লিক এবং গোপাল মুখার্জী সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নিশি ঘোষ, চণ্ডী বসু এবং দেবেন্দ্র ঘোষ পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৪ সালের পনেরই জানুয়ারী।

দি লং মার্চ

বিপ্লবী বাংলার সম্পাদক

মহাশয়,

আপনার ১৫ই বৈশাখের সম্পাদকীয় 'আগুন নিয়ে খেলা' ও 'দি লং মার্চ' প্রবন্ধ দুটির জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতিহাসের গোড়া থেকে আগুন নিয়ে খেলা চলেই আসছে। সেই আগুনে বহু জাতি, গোষ্ঠী শ্রেণী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবু আগুন নিয়ে খেলা চলছেই, আর দি লং মার্চ ও আগুন নিয়ে খেলার' আর একটা দিক। আগুন নিয়ে খেলা চলে আসছে, এবং চলতেই থাকবে। যতদিন না ঐ আগুনে শ্রেণী ভিত্তিক পুড়ে ছাই না হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এটা চলছে এবং চলবে।

তবে দি লং মার্চটা অত প্রাচীনও নয়, অত লম্বা (লং) ও নয়, তবে যদি ইহুদিদের ২০০০ বছরের হিসাব ধরা যায় তবে এটাই বোধ হয় ইতিহাসের সবচেয়ে লং মার্চ, তবু ১০/৩০ লাখ ২০০০ বছর চেষ্টা করে অনেক রক্ত ও চোখের জল খরচ করে প্যালেষ্টাইনে এসেছে আরও ৮০ লাখ বাকি কবে লং মার্চ শেষ হবে কে জানে? হয়ত তার আগে শ্রেণীহীন সমাজবাদী সমাজ গড়ে উঠবে, মানুষে সব ব্যবধান শেষ হয়ে যাবে। আমরা আজ সেই শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতে থাকি, এবং সেই সমাজ গড়ে তোলার লড়াই চালিয়ে যাই।

তারপরের 'লং মার্চ' মাও সে তুঙের নেতৃত্বে সেটাও চলেছিল ৬ হাজার মাইল ৬ বছর ধরে। তারও শেষ হয়েছে ১৯২৭ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৩ সালে—যখন ভারতের শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে তুঙের পাশে দাঁড়াবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকের হয়েছিল ১৯১৭ সালে কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে যে লং মার্চ আরম্ভ হয়েছিল তার একটা চূড়ান্ত রূপ নিল ১৯৪৩ সালে ৩৬ বছর পরে। তার পরেও লং মার্চ আরও ২৭ বছর চলছে—লং মার্চের শেষ এখনো দেখা যাচ্ছে না। যদিও দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ লোক সেই লং মার্চ কোন না কোন ভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে।

এর তুলনায় বিপ্লবী বাংলার লং মার্চ মাত্র ৩০ বছরের এই লং মার্চ অংশ নিচ্ছেন প্রায় এক কোটী বা দেড় কোটী লোক। ভারত বিভাগ মেনে নেবার পর থেকে এই লং মার্চে সামিল হয়ে চলেছেন, ইহুদিদের ২০০০ বছরের 'লং মার্চের' তুলনায় এটাকে খুব ছোট বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এক বা দেড় কোটী লোকের ব্যাপার বেদমা ভাবলে এটাও বেশ বড় বলেই মেনে নেওয়া উচিত।

গত ৩০ বছরে ৫০/৬০ লাখ উদ্বাস্তু হয়ে নানা লাঞ্ছনা দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া ভারতে এসেছেন কিন্তু তাদের পুনর্বাসন এখনও দূর অস্তে।

তাই লং মার্চের প্রস্তাব দেখে খুব অনুপ্রাণিত বোধ করছি। কম্পাসের সম্পাদক মহাশয়ও বলেছেন আসুন একটা কিছু করি। খুব আশার কথা মূল সমস্যা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না। টাকা তো কম খরচ হয় নি, তবে কিছু ছলো বা কেন? ৩০ বছর পরে আবার তাদের বাংলা দেশে ফিরতে হচ্ছে কেন? সব দোষ উদ্বাস্তু নেতাদের প্রচারের ফল বলা শুধু হাস্যকর নয় চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। জ্যোতি বাবুর যত দোষই থাকুক না কেন তাকে নির্বোধ মনে করার মত নির্বোধ কেউ আছেন কিনা জানি না।

আসল কথা হচ্ছে সব জিনিসটা ঢেলে সাজাতে হবে। তাদের সমস্যার কথা ভাবতে হবে। সমাধানের রাস্তা বের করতে হবে। তা হলেই এই বেড় কোটি লোকের লং মার্চ ও শেষ হবে, এবং সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। বিপ্লবী বাংলা সম্পাদককে আমার বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমার ৮২ বছরের শক্তিহীন শক্তি দিয়ে সকল রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

এই ব্যাপার নিয়ে বিপ্লবী পরিষদের একটা মিটিং ডাকা প্রয়োজন।

শিবনাথ ব্যানার্জী
৬৩।১ কালী ব্যানার্জী লেন,
হাওড়া।

৯।৬।৭৮

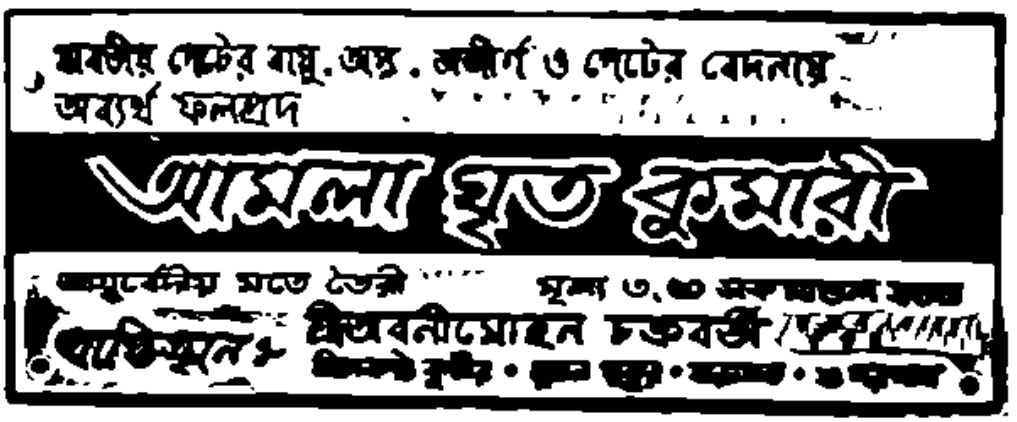

পুষ্পক রথের যাত্রী

শ্রীসতীভূষণ সেন

চলুন, এই পুষ্পক রথে চড়ে একটু ঘুরে আসা যাক্।

এর কলকব্জা, প্রত্যেকটি পার্ট, নিখুঁত কারিগরি রচনা। চমৎকার এ্যাসেম্বল করে, আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে ম্যানুফ্যাকচারার। দেখবেন কেমন Smooth এর গতি, কেমন Trouble free এর চলন চালন। উঠে পড়ুন, আর দেরি করবেন না। এরকম স্বয়ংক্রিয় একখানা গাড়ী যে হতে পারে, তা আপনার কল্পনার বাইরে।

উঠে পড়েছেন তো, এবার আপনাদের অনুরোধ করছি, নীচের এই নির্দেশ গুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিন ; মুখস্থ করে নিতে পারলেই ভালো। নইলে নতুন ধরনের গাড়ী তো, চলা ফেরায় ব্যাঘাত ঘটে যেতে পারে। নির্দেশগুলি যদি হারিয়ে যায়, কিম্বা দরকারের সময় কিছুক্ষণের জন্যও খুঁজে না পাওয়া যায়, তখন কিন্তু মহা বিপদ ঘটে যাবে। আপনারা যারা এই নির্দেশগুলির দিকে মনোযোগ না দিয়েই তাড়ি ঘড়ি চড়ে বসেছেন, গাড়ীখানা চালাবার সব আইন কানুন ঠেকে শিখতে শিখতে বিস্তর ক্ষতি করে বসতে পারেন, তাই এই অনুরোধ। মোটর গাড়ীর একজন ড্রাইভার, বাকি সব আরোহী। এ গাড়ীর কোন ড্রাইভার লাগেনা, এমনি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র গুটি। কিন্তু যাত্রীদের প্রত্যেকেরই কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। তাই আবার বলছি, মন দিয়ে শুনুন।

উপাদান—এই গাড়ী যেসব বস্তু দিয়ে নির্মিত, সেই উপাদানগুলির সঙ্গে আপনাদের খানিই পরিচয় হওয়া দরকার। তাই অবহিত হোন, দরকার বোধ করলে নোট নিতে পারেন।

প্রথম উপাদান বায়ু। যেটুকু বায়ু দেওয়া হয়েছে গাড়ীখানায়, ভেতরে এবং বাইরের চারদিক আবৃত করে, সে আর বেশী দেওয়া হয় নি। দরকার হলে যে অভাব দিয়ে আর একপ্রস্ত আনিয়ে বদলে নেবেন তার উপায় নেই। আকাশ জোড়া বায়ুমণ্ডল, দেখে মনে হবে বায়ুর বুঝি আর শেষ নেই। তা নয় মোটেও। তবে ভূমি ও জল আবৃত করে রাখবার মত যথেষ্ট বায়ু দেওয়া হয়েছে। আবরণটা খুব গভীর নয়, কাজ চলে যাবে, এই পর্যন্ত। বায়ুমণ্ডলকে যদি জলের densityতে reduce করা হয়, তবে মণ্ডলের সব বায়ু, ধর কোর দশ মিটার উঁচু একটি বায়ুর স্তর হবে। একটি দোতলা বাড়ীর সমান উঁচু।

তবে সেজন্য ভাবনার কিছু নেই। বায়ুর অভাবে মারা পড়বেন না। বায়ু সাধারণত নিজে নিজেই পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তবে আরোহীদের নিজের দোষে কিম্বা মনের ভুলে যদি বেশী নোংরা হয়ে পড়ে, তবে ভিন্ন কথা। খানিকটা পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন আপনাদের ফুসফুসও করতে পারে, করেও থাকে। দুদিন থাকুন, তখন বুঝবেন যা কিছুই বায়ুমণ্ডলে নিক্ষেপ করছেন, ধুলো বোঁয়া বিষাক্ত গ্যাস, কিম্বা কফ জাতীয় কিছু থুতু, যাই ছুঁড়ে দিন বায়ুমণ্ডলে, সবই আপনাদের কাছেই আবার ফিরে আসছে। প্রতি পাঁচ সেকেণ্ড পরপরই বায়ুর দরকার আপনার, সেইটি মনে রাখবেন। বায়ুকে তাচ্ছিল্য করবেন না, নোংরাও করবেন না।

দ্বিতীয় উপাদান জল। জল যা দেওয়া হয়েছে গাড়ীতে তা অত্যন্ত কম। গাড়ীখানার আকার যদি ডিমের মত ছোট হত, তবে যা জল দেওয়া হয়েছে এখানে সব মিলে একটি কৌটায় বেশী হত না। এই জলে অনেক প্রাণী সাঁতরে বেড়াচ্ছে, প্রয়োজন হলে তাদের প্রায় সবাইকে আপনি ভক্ষণ করতে পারবেন। বিদঘুটে [disagreeable] কোন বস্তু যদি জলে নিক্ষেপ করেন, খুব সাবধান হবে করবেন। কারণ জলের প্রাণীরা সেই বিদঘুটে বস্তুটি

ভক্ষণ করে নিজের দেহের কোষে কোষে সঞ্চয় করবে এবং পরে কোনদিন আপনি সেই প্রাণীটিকে ভোজন করলে বিপদে পড়ে যাবেন।—আর একটা দরকারী কথা হল এই, জলকে কখনো অবহেলা করবেন না, আপনার দেহের অধিকাংশ উপাদানই এই জল। জলের আর এক নাম জীবন।

তৃতীয় উপাদান মাটি। এই গগন বিহারী রথটি নির্মাণে প্রচুর মাটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্নরূপে এই বস্তুটি বিদ্যমান। এবং প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু এর অতি সামান্য অংশই যাত্রীদের কাজে লাগে। দেহযন্ত্রের ব্যবহারের দোষে সেই সামান্য অংশটুকুর ক্ষতি করে বসবেন না। মাটির উপরের যে স্তরটির উপরে পা ফেলবেন আর বিচরণ করবেন, কাজকর্ম আর বিশ্রাম করবেন, প্রয়োজন মত শস্য উৎপাদন করবেন, সেই স্তরটির যেন তাড়াহুড়ো করে ক্ষতি না করেন। এরই নীচে আছে উত্তপ্ত গলিত লাভার একটি সমুদ্র। যার উপরে পদ্মপত্রের মতন মাটির স্তরটি ভাসছে। সেই লাভার একমাত্র ফসল হল আগ্নেয়গিরি। আর কিছু হয় না সেই লাভা দিয়ে।

চতুর্থ উপাদান জীবন। উপরে যে তিনটি উপাদানের কথা বলা হল, বায়ু, জল ও মাটি, এদের সহায়তায় এখানে জীবনের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি যাত্রীর মাত্র একটি জীবন। তাই এটিকে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। খেলা খেলা করে নষ্ট করে উড়িয়ে দেওয়ার বস্তু নয় এটি। এর পরিচালনা, রক্ষণ ও মেরামত এবং শেষ কৃত্য, সব বিষয়েই কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া আছে। সেগুলি অবহেলা করবেন না। নির্দেশগুলি যে ভাষায় যা code এ লিপিবদ্ধ তার নাম D.N.A. code। সহজে বোধগম্য হবে এমন code নয়। তাতে কোন অসুবিধা হবে না, কারণ নির্দেশগুলি পরিপূর্ণ স্বয়ংক্রিয়, আপনাকে কিছু করতে হবে না। তবে একটি বিষয়ে সাবধান। বাইরে থেকে মহাজাগতিক রশ্মি যদি এসে পড়ে, কিংবা বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ হয়, সেটা হবে accident। তখন এই সব নির্দেশে কোন সুরাহা হবে না। জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। জীবন যদি এইভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, কিংবা যদি নতুন জীবনের জন্ম দিতে অসমর্থ হয়ে পড়ে, তখন কতকাল যে আবার অপেক্ষা করতে হবে নবজীবনের পুনরাবির্ভাবের জন্য, কেউ বলতে পারে না। পুশ্রক রথ একই গতিতে পরিক্রমা করতে থাকবে, হয়ত কোন দিনই আর জীবনের [illegible] সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে না।

পঞ্চম উপাদান শক্তি। এইপুষ্পক রথটির ডিসাইন [Desigen; এমনি ভাবেই বলা হয়েছে [এবং পুরোপুরি] test করে তবেই বাজারে ছাড়া হয়েছে] যে এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ, সর্বক্ষণ আলোনি আসছে সূর্য থেকে, একটি পয়সাও দাম দিতে হচ্ছে না। তবে কিনা নীচের নির্দেশগুলি খুব সাবধানতার সঙ্গে পালন করবেন। রথটিতে Reser fuel ও আছে, ঠেকা বেঠেকায় ব্যবহার করতে পারবেন। তবে Reserve fuel খুব বেশী পরিমানে নেই। যেটুকু আছে তা আছে fossil deposit এর মধ্যে। দরকার হলে ব্যবহার করা যাবে। তবে তার বিপদও আছে। কতগুলি Toxic material বাতাসে মিশে যাওয়ার ভয় আছে। সেগুলি যেন বায়ুমণ্ডলকে দূষিত না করে আর জীবের খাদ্যবস্তুর সংস্পর্শে না আসে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা অতীব জরুরী। এই reserve যদি রাক্ষসের মত ব্যবহার করা না হয়। যদি গ্রহ বাসিটির operating life জুড়ে একটু একটু করে খরচ করা হয়, তবে ভয়ের কিছু নেই। রাক্ষসের মত অল্প কদিনেই সব শেষ করে দিলে সমূহ বিপদ জানবেন।

Maintenance বা মেরামত ও রক্ষণ। এই গ্রহযানটির রক্ষণ নির্ভর করে যন্ত্রের সংখ্যা এবং constitnency-এর উপরে। যদি পরিমিত সংখ্যক যাত্রী আরোহণ করেন, তবে maintenance-এর অত কিছু করতে হবে না আপন সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে না। মেরামতি যা কিছু দরকার নিজে নিজেই হয়ে যাবে। বাইরে থেকে আলানী যা আসবে তাতেই কাজ চলে যাবে। নিরাপদে চালাবার পক্ষে ঐ আলানীই যথেষ্ট। তবে কিনা বহু ব্যক্তি যদি একই সঙ্গে হুড়মুড় করে এই যানটিতে চড়ে বসেন, তখন এক মহাসমস্যা দেখা দেবে। সমাধানটাও খুব সহজ হবে না। ব্যয় বহুল যে হবে সেটা বলাই বাহুল্য।

Emergency Repair বা জরুরী মেরামত। আপনাদের দোষে নয়, আপনাদের আগে যারা যাত্রা করে চড়ে গেছেন, তারা যদি অসতর্কতায় কিছু ক্ষতি করে দিয়ে থাকেন, বুদ্ধির দোষে কিংবা মনের অসাবধানতায়, তার জন্য সামলাতে হবে আপনাদেরই। তখন manufacturer এর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। যারা বিশ্বাস করেন, নিজের নিজের মত নিজ নিজ ভাষায় ডাকা ডাকি করলেন সৃষ্টি কর্তাকে। সাহায্য চাইবেন। কাজ যে কিছু হবে মনে হয় না, তবে হয়েও যেতে পারে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[আদালত অবমাননা ও কারাবাস]

আমার সাংবাদিক জীবনে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আদালত অবমাননার মামলা। এই ব্যাপারে আমাকে ছমাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এটা আমার পক্ষে একটা গৌরবের বিষয় (আমি তাই মনে করি) যে জন-স্বার্থে কর্তব্য সম্পাদনের আমাদের কালে ভারতীয়দের মধ্যে আমিই প্রথম কারাবাস করি। আজকাল স্বরাজিষ্টরা কারাবাসকে দেশ সেবার কাজে একটা যোগ্যতা বলে মনে করেন। ভাল কথা, আমি দাবী করছি, তাদের মত অনুসারেই সে দাবী করছি যে সে যোগ্যতা আমার আছে এবং যে সময়ে আমি সে যোগ্যতা অর্জন করেছি, তাদের মধ্যে কেউই তখনো সে যোগ্যতা অর্জন করেন নি।

আদালত অবমাননার মামলাটা এই রূপ: ১৮৮৩ সালে ৮ই এপ্রিল তারিখে বেঙ্গলী পত্রিকায় এই ছোট্ট সম্পাদকীয় নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়:

'হাই কোর্টের বিচারপতিগণ এবার কাল গোটা সমাজের কাছ থেকে সময় পেয়ে আসছেন, অবশ্য তারা যে সময় সময় ভুল করেন নি, তা নয়। কর্তব্য সম্পাদনে তারা অনেক সময় অনিষ্টকর অক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। তা যে তাদের ভুল-ভ্রান্তি যা-ই হয়ে থাক না কেন, তা কখনও হঠকারিতার বশে করা হয়নি বা সাধারণতম বুদ্ধি বিবেচনা প্রদর্শনের প্রশ্নে কিংবা শালীনতা বোধের প্রতি কোন অবহেলা দেখবার জন্য করা হয়নি। কিন্তু আমরা আজ আমাদের মধ্যে এমন একজন বিচার পতিকে পেয়েছি যিনি, যদি তিনি বাস্তবিকই জোড়াসেঁকো এবং ভুমুরের দিনগুলির কথা স্মরণে না রেখে থাকেন—তার হাইকোর্টের বেঞ্চে স্থান লাভ করার অল্প দিনের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রচুর পরিমাণে এমন অনেক কাজ করেছেন, যাতে তিনি যে তার এই উচ্চ পদের জন্য কতখানি অযোগ্যতা প্রদর্শন করেছেন, এবং প্রমাণ করেছেন যে এদেশের উচ্চতম আদালতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যে মর্যাদা ও সম্ভ্রমের ঐতিহ্যের ধারা চলে এসেছে তা তার নিজের স্বভাবের জন্যই তিনি রক্ষা করতে অক্ষম। আমরা সময় সময় জাষ্টিস্ নোরিসের বিচার পদ্ধতির উল্লেখ করেছি। কিন্তু এবারে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে। এ বিষয়ে আমরা আমাদের এক সমকালীন পত্রিকার স্তম্ভে যে সমস্ত ঘটনার বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা যা বলছি তা 'ব্রাহ্ম পাবলিক অপিনিয়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণের উপর ভিত্তি করে বলছি। যে সমস্ত ঘটনার কথা ঐ পত্রিকায় পাওয়া গিয়েছে, তা এই মিঃ জাষ্টিস্ নোরিস একেবারে হালকা মেজাজেই আমল দিয়ে ফেলে দিতে কৃত সংকল্প হয়েছেন। এই মহাপ্রভু সম্প্রতি যে অদ্ভুত ধরণের কাজটি করেছেন তা হল শনাক্ত করবার জন্য দেবতার প্রস্তর প্রতীক একটি শালগ্রাম শিলাকে আদালতে উপস্থিত করা। ইতি পূর্বেও সুপ্রিম কোর্টে এবং এই হাইকোর্টে বেশ কয়েকবার দেব দেবীর প্রতিমূর্তির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপার নিয়ে মামলা হয়েছে। কিন্তু কোন হিন্দু পরিবারের গৃহ-দেবতার প্রতিমূর্তিকে আদালতে টেনে এনে এভাবে সম্মান দেখান আর কখনই হয় নি। আমাদের কলকাতার এই জানিয়েল শালগ্রাম মূর্তির দিকে তাকালেন এবং বিচার করে বললেন, এটি একশত বছরের পুরানো হতে পারে না। মিঃ নরিস দেখছি কেবল মাত্র আইন ও ন্যায় শাস্ত্রেই পারদর্শী নন; হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমূর্তির মোক্ষণ বিচারেও পণ্ডিত। তিনি যে কী নন, তাই বলা কঠিন। কলকাতার হিন্দু সমাজ তাদের গৃহ দেবতার প্রতিমূর্তিকে

এই ভাবে আদালতে টেনে আনার ব্যাপারটা নীরবে সহ্য করবে কি না, তা তাদের বিবেচ্য বিষয়। তবে আমাদের মনে হয় এই ভয়ঙ্কর অপক-বুদ্ধি বিচার ধারার মূলে থাকা খেয়ালীপনার চূড়ান্ত অবসান করে জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

যে বিচারক জনগণের শুভবুদ্ধি সম্পর্কে এত অজ্ঞ এবং তাদের দ্বারা লালিত প্রত্যয়ের প্রতি এতটা সম্মান বোধহীন যে, যে পূজার বিগ্রহের কাছে কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্রীকৃত মন নিয়ে ব্রাহ্মণগনই যেতে পারেন সেই বিগ্রহকে আদালতে টেনে এনে পরীক্ষা করে দেখেন, তার সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কী হতে পারে? এই বিচার পদ্ধতি কি ভারত সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে? জন সাধারণের ধর্মানুভূতি সরকার উচ্চতম সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট এক সংবেদনশীল বিষয় বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, একজন বিচারক বিচারের নামে এই ধর্মীয় অনুভূতিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছেন না, এবং ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের বিদ্বেষনায় এমন একটি কাজ করেছেন যা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করেছে। আমরা আমাদের ধনিত এই বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা আশা করি সরকার বাহাদুর নিঃসন্দেহে এই বিচারকের আচরণ সম্পর্কে অবহিত হবেন।"

ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করেই এই ছোট্ট সম্পাদকীয় মন্তব্য রচনা করেছিলাম। এই পত্রিকা এখন আর নেই। এর সম্পাদক ছিলেন মিঃ সি. আর. দাশের পিতা ভুবন মোহন দাশ। ভুবন মোহন ছিলেন হাইকোর্টের একজন প্র্যাকটিশিং সলিসিটর। ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের দেওয়া এই খবরের কোন প্রতিবাদ না হওয়ায় উহাকে আমি সম্পূর্ণ সত্য বলেই ধরে নিয়েছিলাম। বিশেষতঃ এই কারণেও উহাকে সত্য বলে ধরে নেই যে ভুবন মোহন একজন সলিসিটর এবং আদালতের একজন পরস্ব ব্যক্তিরূপে আদালতের সমস্ত খবরই তিনি ভালভাবে রাখেন। আমি ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে প্রকাশিত ঘটনার সার অংশটুকুই পুনরায় প্রকাশ করেছি এবং তার উপরে মন্তব্য করেছি।

কয়েক দিনের মধ্যেই হাইকোর্ট থেকে এক আদেশ নামা পেলাম—আদালত অবমাননার জন্য কেন আমাকে অভিযুক্ত করা হবেনা, তার কারণ দেখাবার জন্য। ২রা যে তারিখে ঐ আদেশ নামা জারি হয় এবং ৫ই যে তারিখে শুনানীর দিন ধার্য হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার পক্ষে মামলা চালার জন্য একজন ব্যারিষ্টার পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ল। মিঃ মনোমোহন ঘোষ ছিলেন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। অবশেষে মিঃ ডব্লু সি. বানার্জি আমার পক্ষে সওয়াল করার জন্য দাঁড়ালেন। তবে তিনি পরিষ্কারভাবে এই সর্ত করিয়ে নিলেন যে আমি মিঃ জাষ্টিস্ নোরিস্ সম্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য করেছি, তা আমাকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং মার্জনা চাইতে হবে। একথা সত্য যে জাষ্টিস নোরিস্ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কৃষ্ণ ও জেক্রের সঙ্গে তার যে তুলনা করেছি, তা রাগের মাথায় উত্তাপের মুহূর্তে করে ফেলেছি। ওটা শোভন হয়নি এবং তা সমর্থনও করা যায় না। তাই আমি ঐ প্রস্তাবে রাজি হলাম।

৪ই যে তারিখে পাঁচজন বিচারকের এক ফুল বেঞ্চে মামলাটি উঠল। বিচারপতিদের মধ্যে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রও ছিলেন। বিচারক মণ্ডলীর প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রধান বিচারপতি স্বর্গত স্যার রিচার্ড গার্থ। ১৮৮৮ সালে আমি কলকাতা ছেড়ে বাগাকপুরে যাই এবং এই সময়ে আমি সেখানেই বাস করতাম। মামলার দিন সকালে আমি বাগাকপুরের বাড়ী থেকে কলকাতার আসার সময় আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাকে বলি যে আমার জেল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি সেজন্য প্রস্তুত হয়েই আমার বিছানাপত্র এবং কারাগারে বাসোপযোগী বিশ্রামের সময় পাঠ করার জন্য কিছু বই সঙ্গে নিয়ে আসি।

(চলবে)

'জনতা' জনতাকে হতাশ করছে

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত পনের মাস পূর্ব্বে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের পরিবর্ত্তে যে নূতন সরকার গঠিত হয়, সেই সরকার কোনও একটি সুগঠিত রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ, চিন্তাধারা ও নির্দ্ধারিত নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়নি, যদিও উক্ত সরকারের নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিগণ দাবী করেন যে তাঁরা বিভিন্ন দল থেকে এলেও—যথা, আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল (B, L, D), সোস্যালিষ্ট এবং কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসী (C, F, D) ইত্যাদি। তবুও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা বিভিন্ন মত ও পথের লোক হওয়া সত্বেও আজ জনগণের আশীর্বাদ পুষ্ট একটি দল—'জনতা দল'—তাঁদের ইতিপূর্ব্বের সকল দলের মিলন ও একীকরণের মাধ্যমে তাঁরা গঠন করেছেন—তাঁদের আর স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই—তাঁরা সবাই মিলে মিশে এক হয়ে জনতাদলে, পরিবেশিত হয়েছেন এবং তাঁরাই ভারতের বিপন্ন ও বিপ্লুত গণতন্ত্রকে জনগণের সাহায্যে উদ্ধার ও রক্ষা করেছেন—ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে এক নায়কতন্ত্রী ভারতের গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভারতীয় জনগণ বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা, আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে এই তথাকথিত একটি দলকে শাসন ক্ষমতায় বসিয়ে দিল এ কথা সত্য, কিন্তু আজ সেই জনগণই হতাশ চিত্তে আত্মসমীক্ষা করছে—তাদের কৃতকর্ম্মের ফলে তারা আজ দারুণ দুশ্চিন্তা ও হতাশাগ্রস্থ—কারণ তারা আজ দেখছে 'জনতাদল' আসলে কোন সুসংগঠিত একটি রাজনৈতিক দল নয়। এই দলের নেতারা দেশের ও জনগণের কল্যাণ চিন্তার চেয়ে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, পূর্ব্বদলগত স্বার্থ চিন্তায় মত্ত, ফলে নেতৃত্বের মধ্যে বিরোট ফাটল ও পরস্পর বিরোধী চিন্তা ও কার্য্যের স্বরূপ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে—আজ যাদের দাক্ষিণ্যে ও প্রয়োজনে ক্ষমতার শীর্ষে এই নেতৃবৃন্দ স্থান পেয়েছেন তাদের কথা এঁরা একেবারে ভুলে গেছেন, নচেৎ নেতাদের পরস্পরের মধ্যে এই বিদ্বেষ-বিসংবাদ এরূপ প্রকট হত না। তিন শীর্ষ নেতা—'প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, উপপ্রধানমন্ত্রী জগজীবন রাম ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং যদিও উপরে উপরে ঠিক আছেন—এরূপ ভাব দেখাচ্ছেন, তবুও ভিতরে ভিতরে একে অপরের উপর প্রাধান্য ও প্রভুত্ব বিস্তারের যে চেষ্টা করছেন তা আজ প্রকাশ হয়ে পড়ছে। জনতা দলের সভাপতি চন্দ্রশেখর উপরে খুব নিরপেক্ষতার ভান করলেও ভিতরে ভিতরে তিনি গোষ্টীতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ সক্রীয় দেখা যাচ্ছে। দলের অন্যতম সম্পাদক নানাজী দেশমুখ—যিনি নিজেকে আজও জনসংঘী ছাড়া আর কিছু ভাবতে রাজি নন। তিনি আবার এক নূতন খেলা দেখালেন—তাঁর যুক্তি হলো ৬০ বৎসরের বেশী বয়স নেতাদের সরকার থেকে সরে এসে গঠনমূলক কর্ম্মে আত্মনিয়োগ শ্রেয়, কারণ তাতে দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। এক সিলে তিনটি পাখী এক সঙ্গে সংহার করার বেশ যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা জনগণের সামনে তুলে ধরে কাজ হাসিলের চেষ্টা করলেন। তবে বয়োবৃদ্ধ তিন নেতাই—'অমৃতস্য বাল ভাষিতম্' বলে হেসে তাহা উড়িয়ে দিলেন এবং প্রত্যেক শীর্ষনেতাই এর পর থেকে, খুবই সতর্কভাবে পদক্ষেপ শুরু করলেন কারণ তাঁরা নিজেরা জানতেন এবং এখনও জানেন যে পঞ্চপ্রদীপের শিখা কখনও একটি শিখায় রূপান্তরিত হয় না বা হয়নি—শুধু আতঙ্কে, সমনির্য্যাতনে ও প্রবল চাপের বিরুদ্ধে সাময়িক এক হওয়া যায়, চিরদিন এক থাকা যায় না। চাপ সরে গেলেই, যে যার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করবে—আর হয়েছেও তাই। ইন্দিরাজীকে শাসন ক্ষমতাচ্যুত করতে সকলেই একই স্লোগান তুলেছিলেন—"ইন্দিরা হটাও দেশ বাঁচাও" ওটা ওঁদের মুখের কথা—আসল মনের কথা—"ইন্দিরা গান্ধীর বদলে বিরোধী শক্তিজোটকে সরকার দখলে সাহায্য কর, যাতে তাঁরা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অন্ততঃ একবারও শাসন ক্ষমতায় বসতে পারেন, নচেৎ সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থী ও দেশদ্রোহী কম্যুনিষ্ট (সি, পি, এম) দের সঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে, নির্বাচনী জোট বাঁধলেন কেন?

কমিউনিষ্টরা কি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে?" ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রলেটারিয়েট" এ ধ্রুব বিশ্বাসী দল কবে থেকে গণতন্ত্রী হ'ল? চন্দ্রশেখর, মোরারজী দেশাই, জগজীবনরাম, চৌধুরী চরণ সিং, অটল বিহারী বাজপেয়ী, বিজু পট্টনায়ক এবং জয়প্রকাশজী কি জানতেন না যে কমিউনিষ্টরা গণতন্ত্র বিশ্বাসী নয়?

দেশনায়কের মত প্রবীণ জ্ঞানী-গুণী জনের কি ইহা অজানা ছিল? তবুও ইন্দিরাজীকে গদীচ্যুত করার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর ও জোটবদ্ধ হয়েছিলেন কেন? কারণ একটাই—এবং তা হ'লো উত্তর ভারতে তখন জয়প্রকাশজীর মতে সাধারণ মানুষ জরুরী অবস্থার দাপটে "মিসাবন্দী, খোনাস বন্দী ও অযথা অত্যাচারিতভাবে 'মিসা' প্রয়োগের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত প্রায়—আর তৎকথিত সেই ক্ষিপ্ত প্রায় মানুষগুলিকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য এবং আখের গুছানোর অভিপ্রায়ে, সাপ, নেউল, বাঘ, হাতি, শৃগাল, গণ্ডার আর কুত্তার সকলে এক বিছানায় রাত্রিবাস করার মানসিকতা অর্জন করেছিল। ফলে ঐ সব গদী দখল সম্ভব হয়েছে। গদী দখল সহজ হলেও গদীরক্ষা করা আজ বেশ কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

যে দেশনায়ককে নিয়ে সারাভারত ১৯৭৭ এর শুরু হতেই বেশ প্রাণ চঞ্চল ও আশাবাদী এবং তাঁকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো—১৯৭৮ এর প্রথমার্দ্ধেই সেই জয়-প্রকাশজীর অতি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি এত দ্রুত এত অধিক ম্লান হলো কেন? তাঁর নিজের প্রদেশ বিহারে—যেখানে তাঁর ভাবমূর্তি অল্প কিছুদিন আগেও সমুজ্জ্বল ছিল, সেখানে তাঁর সভায় হঠাৎ ইট পাটকেল মার জুতা নিক্ষিপ্ত হয় কেন? তাঁরই আবাসস্থলের নিকটে "লালাশাহী নেহি চলেগা" স্লোগান উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হয় কেন? তিনি যে জাতিতে বিহারের লালাকায়স্থ বংশোদ্ভূত—আর কিছু নয়—এ কথা বিহারের, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত আপামরজনগণের কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় কেন? নির্বাচন পূর্বের বিশাল সেই ব্যক্তিত্ব তাঁর এত শীঘ্র লোপ পায় কেন? লোকনায়কের প্রভাব ও ইমেজ ১৯৭৭ সালে যা প্রবল ছিল,-১৯৭৮ সালে এসবের তা নিশ্চিহ্ন হয় কেন? অনেকের ধারণা—অন্ধ-লোককে অল্পদিন ভুল বুঝিয়ে কার্যোদ্ধার করা যায়, কিন্তু সব লোককে সব দিন সব ক্ষেত্রে ভুল বোঝানো সম্ভব হয় না। বিহারের যে ছাত্র যুব ও জনশক্তি আন্দোলন করে তাঁর উত্থান সম্ভব হলো ১৯৭৭ সালে—আবার সেই যুব ছাত্র ও জনগণই তাঁর পতনকে সম্ভব করে তুললো ১৯৭৮ সালে জাত-পাতের ভগড়াকে সম্বল করে যে জাত-পাতের ঘৃণ্য মানসিকতার স্বতন্ত্রতা দিয়ে আপাত সুবিধা আদায় করা হয়েছিল—সেই জাত-পাতের বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদকামী মানসিকতা আজ বিহারকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করেছে। সাপুড়ে সাপের ছোবলেই প্রাণ হারায়—ইহাই নিয়ম। ইন্দিরাজীকে গদীচ্যুত করার জন্য যে ষড়যন্ত্র সংঘটন করা হয়েছিল, সেই ষড়যন্ত্রেই জয়প্রকাশজী এখন দারুন আহত—তাই পুনরায় পুরু অন্ধকারের মধ্যে নূতন করে কোমর বেঁধে, তিনি নূতন বিভেদী শক্তির রূপে রাজনীতির ময়দানে অরাজনৈতিক ধুয়া ধরে আসর মাৎ করার কিকিরে সচেষ্ট হওয়ার তালে আছেন। তবে মানুষ একবার যে ফাঁদে মাৎ হয়েছে এবং যাঁর দ্বারা চরম ঘা খেয়েছে—তাঁর ফাঁদে আর পা দেবে না, কারণ ছাড়া একবার বেশতলায় যায়। একবারের বেশী নিশ্চয় নয়—তার তিক্ত অভিজ্ঞতাই তাকে সাবধান করে দেয়। জয়প্রকাশজীর দ্বিতীয় সর্বাত্মক বিপ্লব মাঠে মারা না যায়। বেলুচিস্তান অনগ্রসর ও দরিদ্র মানুষ জনতা দলেরও লোকনায়কের কুস্তিরাজ্রে বড়ই দ্রুত চিনে ফেলেছে। দরিদ্র ও অনগ্রসর মানুষ ইন্দিরার সমর্থনে অধিক সংখ্যায় না থাকলে, ইন্দিরাজী এত শীঘ্র জনতার মুখোমুখি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে সাহসী হতে পারতেন না। ইন্দিরাজীর দিকেই এবার পাল্লা বেশ ভারী বলেই বোধ হচ্ছে—আজমগড়ের লোকসভা নির্বাচনের ফল তাঁকে উত্তর ভারতের মাটিতে পা রাখার জায়গা করে দিয়েছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনে উত্তর ভারতে ও পূর্ব ভারতে ইন্দিরার ও কংগ্রেস দলের বিরাট পরাজয় হয়—এত শীঘ্রই যে তিনি পুনরায় তথায় নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন কেহই তাহা ধারণা করতে পারে নাই। জনতাদলের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বকলহই তাঁর এই জয়কে সম্ভব করেছে। যে আজমগড় থেকে ইতিপূর্বে ইন্দিরা রাজত্বকালে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ যাদব লোকসভার নির্বাচিত হয়েছিলেন তথায় অন্তবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) প্রার্থীর জয় নিশ্চয় ইন্দিরার পুনরুত্থানের সূচনা করে এবং তাহা সম্ভব হয়েছে জনতা দলে বিভেদ ও আত্মঘাতি ক্রিয়াকলাপের ফলে।

(চলবে)

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

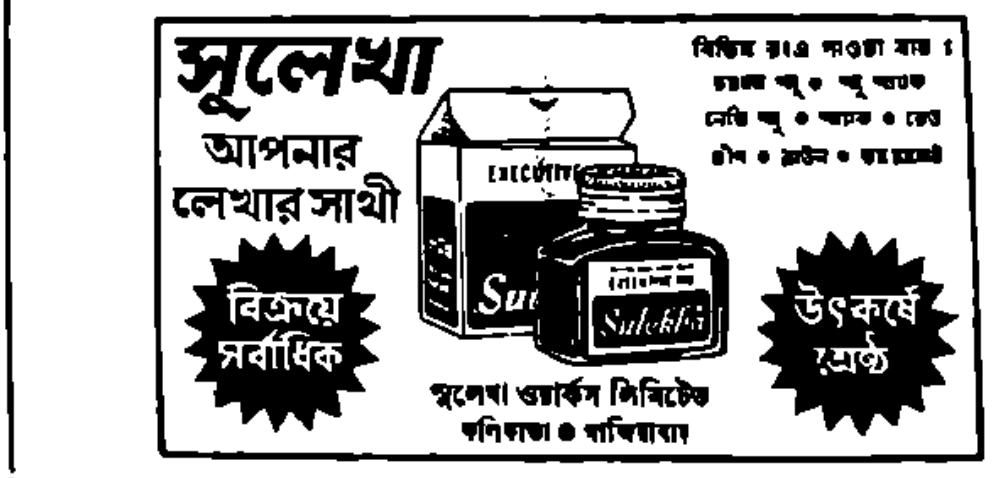

22 JUN 1978

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতারা—শ্রীনগেন্দ্রপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমনীন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং সার্ভিসিটী, ১১১ বি কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৮৫ ১লা জুলাই, ১৯৭৮	৩৯ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

এই সংখ্যায়

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ঐকীরোদ দত্ত ॥

বিচারের প্রহসন
। বিদ্রূপ ।

গৌহাটি কলতাবাজার সংগ্রাম দিবস
। রমেন্দ্র চন্দ্র দাস ।

মৃত্যু বাণ
। শ্রীমতী ভূলা সেন ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক মলিনী মোহন রায়চৌধুরী ।

ইতিহাস ও নেতৃত্ব
। কৌটিল্য ।

> বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীতে ও বর্তমানে দ্বিখণ্ডিত করিতেছে। যিনি সেতু নির্মাণ করিবেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।
>
> —রবীন্দ্রনাথ

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—HOOGHLY		
Banerjee Smt. Amiya w/o Late Nikhil Ch. Banerjee	T/5 Ganguly Bagan, Govt. Div. P. O Mahesh, P.S. Serampur	100	1. 10. 76
Chakraborty Smt. Panchu Bala w/o Late Narayan Ch'	P. O. & Vill Parshyampur P. S. Pursura	100	20. 4. 75
Chatterjee Smt Sudharani w/o Late Biswesar (alias Harendranath)	P. O. Adisaptagram P, O. Mogra	100	9. 7. 78
Mukherjee Smt. Jogmaya w/o Late Durgadas	P. L. Mukherjee Lane P O. Badreswar	150	12. 6. 77
Mukherjee Smt. Lila Debi w/o Late Sanat Mukherjee	Vill Kolora P O. Somra	100	20. 2. 78
	Dist—BURDWAN		
Dutta Sm Manurani d/o Late Ekkaru Dutta	Tantopara, Katwa Town, P. O. Katwa	100	15. 8. 72 (till gainfully employed or married whichever earlier)
Mukherjee Hazarilal	Kalanpur P. S. Ausgram	200	1. 10. 76
Biswas Surendra Nath	Sibtola P. O Kalna	203	7. 4. 77
	Dist—BANKURA		
Banerjee Smt. Bibharani w/o Late Narayan Prasad	Joyrambati P. O. Kotalapur	100	12. 1. 71
Dutta Smt. Moti Prova w/o Late Charubikash Dutta	Vill Rashtola P. O. Bishnupur	220	1. 10. 76
De Smt. Sabti Bala w/o Late Radha Gobinda (alias Rahanath)	P. O. Taldangra	150	22. 7. 77

(Contd. on 3rd cover)

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

[পূর্ব প্রকাশিত পর]

যাদুগোপালের যেদিন তল্লাসী হয় তার পূর্বদিন রাতে রাসবিহারী এখানে ছিলেন। রাত্রি দুইটা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে তিনি কয়েকখানি চিঠি লেখেন। এর মধ্যে দুখানি চিঠি ছিল দিল্লীর অধিবাসী আমীর চাঁদ ও লীননাথ তলোয়ারের নামে। আই. বি. ডি. এস. পি শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র তল্লাসীর পর এখান থেকে একটা ব্লটিং প্যাড নিয়ে যান। এই প্যাড থেকে সরকারী বিশেষজ্ঞগণ আমীর চাঁদ ও লীননাথের নাম উদ্ধার করেন। কয়েকদিন পরে দিল্লীতে আমীর চাঁদ ও লীননাথের গৃহ তল্লাসী হয়। আমীর চাঁদ ছিলেন দিল্লীর সেন্ট জোসেফ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাঁকে এবং লীননাথ তলোয়ারকে তখনই গ্রেপ্তার করা হয়। এই সঙ্গে আউধ বিহারী, বালমুকুন্দ, বসুধর শর্মা, বালরাজ এবং হনুমন্ত সহায় প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে দিল্লীর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়।

এর আগে ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে রাজকীয় শোভাযাত্রার বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপরে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। লীননাথ গ্রেপ্তারের পরে স্বীকারোক্তি করে এবং শেষ পর্যন্ত রাজসাক্ষী হয়। ফলে পুলিশ এই বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে কারা জড়িত জানতে পারে।

হরদয়াল নামে দিল্লীর এক বাসিন্দা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। এই সময় তিনি পাঞ্জাবের বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসে বিপ্লব মন্ত্রে দিক্ষীত হন। তিনি দিল্লীতে এসে একটি বিপ্লব সংগঠন গড়ে তোলেন এবং আমীর চাঁদ, বালমুকুন্দ, আউধ বিহারী প্রভৃতিকে দলভুক্ত করেন। ১৯০৫ সালে তিনি যখন সরকারী বৃত্তি পেয়ে অক্সফোর্ডে পড়তে যান তিনি বিপ্লবী সংগঠনের ভার সংগঠনের অন্যতম নেতা জিতেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের উপরে অর্পণ করে যান। ১৯০৮ সালে মুরারীপুকুর কেন্দ্রে তল্লাসীর রাসবিহারীর পত্র দুখানি পত্র সেখানে ধরা পড়ে। এর ফলে রাসবিহারীর গ্রেপ্তার হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এই সময় তেজরীয়ার শশীভূষণ রায়চৌধুরী তাকে একটা চাকুরী দিয়ে দেরাদুনে পাঠিয়ে দেন। এবার এক বিবাহ উপলক্ষ্যে জীতেন্দ্রমোহন দেরাদুন যান। এখানে রাসবিহারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয় জীতেন্দ্র মোহনকে কিছুদিন দেরাদুনে অবস্থান করতে হয়। এই রাসবিহারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব অচিরেই বৈপ্লবিক হৃদ্যতায় পরিণত হল। রাসবিহারী দিল্লীর বিপ্লবী দলভুক্ত হয়ে কাজ করতে থাকেন। কিছুদিন পরে জীতেন্দ্র মোহন ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য বিলাত চলে যান। এই সময় তিনি দলের নেতৃত্ব ভার রাসবিহারীর উপর অর্পণ করে যান। রাসবিহারীর নেতৃত্বগুণ ছিল অসাধারণ, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দিল্লীর সংগঠনের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠলেন। রাসবিহারী বলতেন বারে বারে শাসন সংস্কার ভারতবাসীর কাম্য হওয়া উচিত নয়। যতদিন রক্ত আমাদের শেষ লক্ষ্য নয়। আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাই। এ সমস্ত কথা তিনি ইংরেজী লিবার্টি এবং বাংলা স্বাধীনতা ইস্তাহারে লিখতেন। আউধ বিহারী এই সমস্ত ইস্তাহার কলুষি তলায় মুদ্রিত করতেন। বালমুকুন্দ তা বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করতেন।

১৯১১ সালে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে চন্দননগর সমিতির মিলন গঠিত হয়েছে। উভয় সংগঠনই তখন একসঙ্গে চলছে। রাসবিহারী ক্রমে দুই সংগঠনেরই নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন। অনুশীলন চন্দননগরের এক মিলিত সভায় রাসবিহারী প্রস্তাব করলেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যাকশনের পরিবর্তে এখন একটা বড়কিছু করতে হবে যাতে বিশ্ববাসী ভারতের বিপ্লবের বিষয় জানতে পারে। তিনি বললেন পূর্ব বৎসর সম্রাট পঞ্চম জর্জ এসে ভারতে আতঙ্কজনক করে রেখে গেছেন। এবারে ১৯১২ সালে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর উপলক্ষ্যে দরবারের আয়োজন চলছে। এতে বিশ্ববাসীর নিকট ভারতের রাজভক্তিই প্রচারিত হচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদ করব। আলোচনায় স্থির হল দিল্লীর দরবার অনুষ্ঠানে বড়লাটের উপরে বোমা নিক্ষেপ করতে হবে। রাসবিহারী বললেন দিল্লীতে এজন্য উদ্যোগ নিতে হবে বাঙালী বিপ্লবীদের। তাহলে উত্তর ভারত সংগঠনের সঙ্গে বাঙলা সংগঠনের সঙ্গতি আরও সুদৃঢ় হবে। রাসবিহারী দিল্লী যাবার সময় মতিলাল রায়ের কাছ থেকে একটি বোমা এবং বসন্ত বিশ্বাস নামে এক তরুণকে নিয়ে গেলেন। তিনি বসন্ত বিশ্বাসকে লাহোরে এক ঔষধের দোকানে চাকুরী দিয়ে রাখলেন। (ক্রমশঃ)

বিচারের প্রহসন / বিশ্বর '

গত ১৬ই জুন নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে সি. পি. আই. এম-এর সাধারণ সম্পাদক ই. এম. এস্ নাম্বুদ্রীপাদ বলেছেন যে শ্রীমতী গান্ধী দেশের এবং জনগণের বিরুদ্ধে যে ধরণের অপরাধ করেছেন তাতে জনতা সরকারের পক্ষে তার জন্য নুরেনবার্গ ধরণের এক বিচারের ব্যবস্থা করা উচিত এবং জনতা সরকার যেন এজন্য প্রয়োজন হলে দেশের জনগণের মতামত গ্রহণ করেন। আমরা জানি শুধু সি. পি. আই. এম-এর জেনারেল সেক্রেটারীই নয় দেশের আরও অনেক নেতা শ্রীমতী গান্ধীর বিচারের জন্য আগ্রহী। আমরা কিন্তু এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা পোষণ করি। আমরা বলি শুধু ইন্দিরাজীর বিচার ব্যবস্থাই নয় শাহ কমিশন এবং দেশের অন্যান্য স্থানে যেখানে যত কমিশনে পূর্বতন সরকার এবং তার কর্মচারীদের সমীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে অবিলম্বে তা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ইন্দিরাজীর বিচারতো জনগণের আদালতেই হয়ে গিয়েছে। আর বিচারের জন্য তিনি নিজেই তো এসে জাতির সম্মুখে বিচারের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। জাতি তাকে জানিয়ে দিয়েছে তাঁকে আর তারা চায় না। কিন্তু দীর্ঘ এগার বৎসর ধরে এই জাতিই তাঁকে চেয়েছিল এবং এই জাতিই তাঁকে বিপুল সংখ্যাধিক্যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল জনতা আদালতের শেষ বিচারে তা আর নস্যাৎ হয়ে যায় নাই। সেদিন দেশের জনগণই তাঁকে চেয়েছিল, জনগণের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি দেশ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের বিচার বুদ্ধি মত এবং আপন ক্ষমতা অনুযায়ী তিনি নিজ কর্তব্য পালন করেছেন। জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামরিক ক্ষমতার সাহায্যে তিনি তো ক্ষমতার আসন অধিকার করেন নাই। বিরোধীপক্ষ বলবেন, তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছিলেন কিন্তু এই জরুরী ক্ষমতা ঘোষণার ক্ষমতাও কি জনসাধারণই তাঁকে দেয় নাই। জনগণের কল্যাণে সেদিন তিনি যদি জরুরী অবস্থা ঘোষনার প্রয়োজন অনুভব করে থাকেন তবে কি অন্যায় তিনি করেছেন? জনগণই তাঁকে সেদিন প্রধান মন্ত্রীত্বে বরণ করেছিলেন, বলেছিলেন তুমি যেমন করে পার আমাদের শাসন কর, আমাদের কল্যাণ সাধন কর। বিরোধী পক্ষ বলবেন তিনি এলাহাবাদ বিচারালয়ের নির্দেশ অমান্য করেছেন কিন্তু তাঁর এ কার্যকে আমরা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে মনে করি না। এ কার্য করে তিনি জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এ কথা বলা যায় না। এলাহাবাদ বিচারের পূর্বেই তো জাতির নির্দেশ গ্রহন করবার জন্য তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন এবং জনসাধারণ বিপুল সংখ্যাধিক্যে তাকে বিজয়ী করেছিল। বিরোধী পক্ষ হয়তো বলবেন এ নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ ছিল কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর যদি ত্রুটি হয়েও থাকে দেশের অন্যত্র নির্বাচনে তো কোন ত্রুটি ছিল না।' ঐ সমস্ত স্থানে কি ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থিত প্রার্থীরা জয়লাভ করে নাই? তাদের সে জয় দেশের সর্বত্র ইন্দিরা সমর্থিত প্রার্থীদের জয় কি ইন্দিরা

গান্ধীর ভয়ই সূচীত করে না? এরদ্বারা কি বোঝা যায় না দেশ সেদিন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বই চেয়েছিল। সুতরাং এলাহাবাদ বিচারের বিরুদ্ধাচারণ করে তিনি আর যাই করে থাকুন গণতন্ত্রের পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন এমন কথা বলা যায় না। এই সমস্ত দিক বিচার করলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ইন্দিরাজী যদি কোন অপরাধ করে থাকেন নিঃসংশয়ে লঘু ভাবে বিচার করা চলে।

অন্য এক কারণেও এই সমস্ত কমিশনের বিচার প্রহসনের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। জাতি জনতা সরকারকে শাসন ক্ষমতায় আসীন করেছে, তাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুখী করবার জন্য তাদের অতীতকে সংশোধন করবার জন্য নয়। জনতা সরকারকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। অতীতেরও অতীত আছে। ইংরেজ শাসনে দেশে বহু অন্যায় অবিচার ও অনাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, জালিয়ানওয়ালাবাগ কি এই দেশেই অনুষ্ঠিত হয় নাই। সেইজন্য ভারতবাসীর পক্ষে ক্ষমতা পেয়েই সেদিনের কীর্তিত বড়লাটদের বিচারালয়ের সম্মুখে হাজির করা শোভন হত না সঙ্গত ছিল? জনতা সরকারও সেদিনের জন্য দেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন নাই। গদী তাদের একদিন ছাড়তে হবেই নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে আবার তাদের জনগণের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। সেদিন যদি জাতি তাদের ক্ষমতায় পুনরোপবিষ্টিত করতে অসম্মত হয় তবে আজ যে নজীর তারা পিছনে রেখে যাচ্ছেন সেই নজীরই কি তাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে না? সে দিন আর এক নূতন সরকার এসে যদি আজকার মোরারজী, চরণ সিং, জগজীবন রাম, বাজপেয়ী, রাজনারায়ণদের বিচারালয়ে টেনে আনেন তবে এদের পক্ষ থেকে সেখানে বলবার কী থাকবে? এই জন্যই জনতা সরকারের নিকট আমাদের অনুরোধ তারা কমিশনের সম্মুখে এই বিচার প্রহসন বন্ধ করে দেশের সুস্থ এবং স্বচ্ছ পরিবেশ গড়ে তুলুন অতীতের দিকে পা না বাড়িয়ে সামনে চলুন। সুখী এবং সমৃদ্ধ জাতি সৃষ্টি করুন। অনাহারে বা অর্ধাহারে আজ যারা অন্যায় অবিচারের পেছনে পিষ্ট হচ্ছে তাদের দিকে ফিরে তাকান। অতীতকে সংশোধনের চেষ্টায় ক্ষমতার অপব্যয় করা থেকে বিরত হোন।

যকৃতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০
প্রস্তুতকারক শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[আদালত অবমাননা ও কারাবাস]

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

অনশনের ছাপ বহন করে চলে। ইতিহাসের বহু ঘটনায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এলিজাবেথের যুগে জাতীয় জীবন ও কর্মোদ্যমের উৎসাহের মধ্যে তা দেখা গিয়েছে। কাব্য কবিতা, মৌলিক গবেষণা, বাণিজ্যিক ও নতুন জগত আবিষ্কারের জন্য সমুদ্র যাত্রার বিপুল কর্ম প্রয়াস—সব কিছুই পুরাদমে চলতে থাকে। ইংল্যাণ্ডের অন্তরাত্মা যেন এই সমস্ত প্রয়াসের মধ্যে উগরণ করে ফুটছিল। আদালত অবমাননার মামলায় যে জাগরণের সৃষ্টি হয় সে জাগরণের মধ্যেও এই রকমের এক উৎসাহের আবির্ভাব দেখা গেল—যদিও তা ইংল্যাণ্ডের জাতীয় উৎসাহের তুলনায় পরিমাণে অনেক কম। এই জাগরণ সাংবাদিক তৎপরতা বাড়িয়ে দিল। স্বর্গত কেশবচন্দ্র সেন "সুলভ সমাচার" নামে এক পয়সা দামের এক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই সস্তা দামের সাংবাদিকী নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। এখন জন-মনে সংবাদের ক্ষুধার তাড়না জাগ্রত হওয়ায় তা আবার সতেজ হয়ে উঠলো। বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গবাসী' নামে এক পয়সা দামের এক পত্রিকা চালাতে শুরু করলেন। তার দৃষ্টান্ত আবার অনুসরণ করলেন বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্তির। তিনি প্রকাশ করলেন "সঞ্জীবনী"। এই 'বঙ্গবাসী' এবং 'সঞ্জীবনী' বাংলার সাংবাদিক জগতে এখনও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে চলছে।

অতঃপর যতই আমাদের জন সভায় হাজারে হাজারে লোক সমবেত হতে থাকে, ততই আমাদের সস্তা দামের দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যাও এই সব প্রথম হাজারে হাজারে বেড়ে যেতে লাগল। কিন্তু এই গণ-অনুভূতির প্রবল উচ্ছ্বাসের পিছু পিছু আরও অনেক ব্যাপক ভাব বিকাশ ঘটতে থাকে। তারমধ্যে একটি হচ্ছে, আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এত কঠিন সংগ্রাম করে চলেছি, তাই এবং সেই উদ্দেশ্যকেই ভারতের শিক্ষিত সমাজ তাদের কার্যক্রমের পুরোভাগে রেখেছেন। আদালত অবমাননার মামলাটি (এই নামেই ঘটনাটি পরিচিত হয়) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সহিচ্ছা ও সৌভ্রাত্র বন্ধনকে দৃঢ়তর করে ঐক্য সংস্থাপনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। আমার এই নির্যাতনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে লাহোর, অমৃতসর, হৈদ্রাবাদ, পুনা এবং ভারতের অন্যান্য সব বড় বড় কেন্দ্রে জন-সভা সংগঠিত হয়। একজন খ্যাতনামা লেখক লেটজি দোরাবজি এই ঘটনাকে ১৮৮৩ সালের ১৮ই জুনের "গল্প এণ্ড গসিপ" নামক প্রত্রিকায় এই সমস্ত সভা-সমিতি ও বিক্ষোভ সম্পর্কে এক খোলা চিঠিতে যা লেখেন, তা হল :

"গত বছর আপনার কারা মুক্তির জন্য অনুষ্ঠিত উত্তর ভারতের এক জনসভায় আমি একজন বর্ষীয়ান সম্ভ্রান্ত কাশ্মীরী পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু তিনি একটি ইংরেজী শব্দের ভাব তার মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে পারেননি। এই বৃদ্ধ গম্ভীর প্রকৃতির ভদ্রলোক আপনার কারাবাসের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। অবোরে অশ্রু

বর্ণন করতে লাগলেন ; বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। সেই রুদ্ধ কণ্ঠেই তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন "আমাদের প্রিয়তম ভাইকে নিয়ে ওরা কি করছে ! আমাদের সুরেন্দ্রনাথ আজ জেলে।' প্রতি ভারতবাসীর হৃদয়েই এই রকম বেদনার আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। সমস্ত দেশ জুড়ে এক সার্বজনিক শোক প্রকাশ পেয়েছে।"

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ১৮৮৩ সালের রিপোর্টে আমার কারাদণ্ডের ফলে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তার উল্লেখ করে স্বর্গত আনন্দ মোহন বোস এইরূপ মন্তব্য করেন :—

"'অমঙ্গল থেকে মঙ্গল আসে'—এই প্রবচনের সত্যতা এই উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে যেভাবে প্রমাণিত হয়েছে, ইতিপূর্বে তা আর কখনই হয়নি। এই ঘটনায় যে সার্বজনিক শোক ও বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে তাতে এটাই প্রকট হয়েছে যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনগণ এখন একে অপরের জন্য অনুভব করতে শিখেছে আর এর ফলে তাদের মধ্যে অতি দ্রুত সমমর্মিতা ও ঐক্যের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বানার্জির অন্ততঃ এই একটি সান্ত্বনা আছে যে তার এই লাঞ্ছনা অতি লক্ষণীয় ভাবে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজের মধ্যে ঐক্যের আবির্ভাব ঘটিয়েছে যে ঐক্য সাধনায় তিনি এত আকুলভাবে প্রয়াস করেছেন। তার সে প্রয়াস, সে শ্রম বৃথা যায়নি।"

আমার কারাদণ্ডকে স্মরণে রাখার জন্য একটি জাতীয় অর্থ ভাণ্ডার খোলা হল। কৃষ্ণনগরের বাবু তারাপদ বানার্জি এই চিন্তাটি সূত্রপাত করেন। তার এই চিন্তাটি বেশ ফলবতী হয়েছিল ; কারণ, সেই থেকে জাতীয় উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি অর্থ-ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় বিশ হাজার টাকা। এই টাকা যারা দিয়েছিলেন, তারা এক সভায় মিলিত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যে ঐ টাকা কলকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে দেওয়া হোক। এই টাকার পরিমাণ সামান্য, ঠিকই। কিন্তু এই টাকাটা বেশ কাজে লেগেছে। আমরা এই টাকা দিয়ে আমাদের ইচ্ছামত ব্যয় করার জন্য একটা স্থায়ী অর্থ-ভাণ্ডার গড়ে তুলতে সক্ষম হলাম। এই ক্ষুদ্র তহবিলটি যে মূল কেন্দ্রবিন্দু গঠন করল, তা অন্য নানা উৎস থেকে টাকা জমা পেতে লাগল এবং তা রাজনৈতিক কর্মীদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করল যে সংগ্রামের জন্য রসদের অভাব কখন হবেনা। এই অর্থ-ভাণ্ডার সবচেয়ে বেশী কাজে লেগেছিল বঙ্গভঙ্গ রহিত আন্দোলনের সময়। কারণ, বঙ্গভঙ্গকে তখন যে রকম বিরক্তিকর ভাবে ঘটা করে একটা "স্থায়ী ঘটনা" বলে প্রচার করা হয়েছিল এবং সরকারী মনোভাবেও তা প্রদর্শিত হয়েছিল, তাতে আমাদের অবস্থাপন্ন স্বদেশবাসীগণ অন্তরে অন্তরে এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হওয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে অর্থ সাহায্য করতে পারছিলেন না।

এখানে মুহূর্তের জন্য একটু থেমে আমাদের সেই পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মী বাবু তারাপদ বানার্জির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রদর্শন করা কর্তব্য, ও যুক্তি সঙ্গত। সেই প্রাচীন নগরীতে তিনি সমস্ত গণ-আন্দোলনের সমর্থক। ক্ষেত্র বিশেষে নিজেই প্রবর্তক ছিলেন। তার মৃত্যু আমাদের এই জনতার দলের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছে। তার মত প্রভাবশালী সাহসী এবং উৎসাহী অন্য কোন একজন উত্তরসাধক পেতে বহু বিলম্ব হবে। সাধারণতঃ মফঃস্বলে বাস করে কোন জননেতা তাঁর স্থানীয় গণ্ডীর বাইরে কোন যশঃ, গৌরব বা সুখ্যাতি আজ বড় একটা করে উঠতে পারেন না। কিন্তু বাংলার জাতি গঠনের যে প্রয়াস চলেছে। তার ইতিহাস রচনায় যদি তারাপদ বানার্জি, অম্বিকাচরণ মজুমদার, বৈকুণ্ঠ নাথ সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অনাথবন্ধু গুহ, আনন্দচন্দ্র রায়, কিশোরীমোহন চৌধুরী প্রভৃতির মত মানুষের কীর্তির কথা উল্লেখ করা না হয়, তাহলে সেই ইতিহাস অপূর্ণ থাকবে। তাদের সকলেরই খ্যাতি হয়ত একই উচ্চক্রমের না হতে পারে ; কিন্তু তাঁরা সকলেই নানা অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তির মধ্যে দেশের জন্য কাজ করে গেছেন এবং কেউ কেউ সেজন্য দুর্ভোগও ভুগেছেন। তাদের কাজের দ্বারা তারা তাদের সব সামরিকদের কঠিন ঋণ বদ্ধ করে গেছেন। সে ঋণ অন্ততঃ পক্ষে তাদের সহকর্মীদের স্বীকার করতেই হবে।

আমার কারাবাস কাল আরম্ভ হয় ১৮৮১ সালের ৫ই মে এবং মুক্তি লাভ করি ৪ঠা জুলাই। এই ৪ঠা জুলাই পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনটি আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের দিন। আমার বন্ধুরা ঐ দিনটির তাৎপর্য্যের পুরা সুযোগ গ্রহণ করলেন। আমি এক 'আদর্শবাদের জন্য' কারা লাঞ্ছনা ভোগ করেছি। এটা সকলেই জানে যে গোড়া হিন্দু মতবাদের কোন প্রভাব আমার উপর নেই। আমার ভাবনা ছিল প্রগতিবাদী এবং আমার সামাজিক জীবন ছিল এই আদর্শের সূত্রে বাঁধা। আমার মত একজন লোক এই রকম ভাবনা যাপনা নিয়ে দেশের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণের দরদ-লালিত এক বিশ্বাস ও ভাবনাকেই উজ্জীবন রাখার জন্য এই নির্যাতন ভোগ করেছে —এটা কম গৌরবের কথা নয়। বাস্তবিকই দেশের সর্বত্র এই রকম একটা মনোভাব জেগে উঠলো। জনগণের উপর যখন এক প্রবল আবেগ ও অনুভূতির ঢেউ আসে তখন তা সব বাঁধ ভেঙে সীমা ছাড়িয়ে নানা খাতে প্রবাহিত হয়। ইলবার্ট বিল নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তাতেই দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা প্রতিরোধ সৃষ্টি হয় ও অস্থিরতার ভাব দেখা দিয়াছিল। আমার দেশ সেবার কথাও যে তারা ভাবেন নি, তা নয়। তারা এই সাধারণ বিক্ষোভের অংশীদার হলেন। আমার ব্যক্তিগত বন্ধুরা আমার লাঞ্ছনায় দুঃখ ও খেদ প্রকাশ করলেন। তাদের কাছে মনে হল যে আমার প্রতি কারাদণ্ডাদেশ চরম অন্যায় করা হয়েছে। আমার বন্ধু মিঃ বি. এল. ও তখন কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমার প্রতি দণ্ডাদেশের সংবাদ শোনা মাত্র তিনি আদালতের কাজ বন্ধ করে দিয়ে সোজা চলে এলেন প্রেসিডেন্সী জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে। এক বড় একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর আমার প্রতি এই প্রকাশ্য ও অকপট সহানুভূতিপ্রদর্শন—যার মর্ম ছিল দেশের উচ্চতর আদালতের এই বিচারকে প্রচ্ছন্ন ভাবে অস্বীকার করা—একটা আলোচনার, এমন কি প্রত্যক্ষ মন্তব্যের, বিষয় হয়ে পড়ল। আধা সরকারী প্রচার-পত্র বলে খ্যাতি আছে—এমন একটি লন্ডন প্রতিষ্ঠিত সংবাদ পত্র এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করান। কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপারে আমার বন্ধু মিঃ বিহারীলাল গুপ্তের মানসিক স্থৈর্য্যকে কখনও বিচলিত করতে পারেনি। তিনি তার আত্মবিশ্বাসকে লঘু না করে জীবনের উজ্জ্বল দিকের প্রতিদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ধীরে ধীরে চাকুরীর ক্ষেত্রে পদোন্নতির পথেই এগোতে লাগলেন; হাইকোর্টের অস্থায়ী জজের পদে উন্নীত হলেন এবং পরে একটি ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কারাগারে আমাকে একজন প্রথম শ্রেণীর লঘু অপরাধে অপরাধী রূপে গণ্য করা হত। আমাকে আমার ইচ্ছামত লিখতে পড়তে দেওয়া হত। বেঙ্গলী পত্রিকার জন্য আমার লেখা আমি চালিয়ে যেতে লাগলাম। আমার চিঠি-পত্র ও টেলিগ্রাম না খুলেই আমার কাছে দেওয়া হত এবং জেলের অভ্যন্তরস্থ গেটগুলির ভিতর দিয়ে যাতায়াতের সময় কোন তল্লাশী করা হত না। আমার সঙ্গে জেলখানায় যারা দেখা করতে আসতেন, তাদের সংখ্যা কত হবে, সে বিষয়ে কোন বাধা নিষেধ ছিল না। নানা রকমের ফল (তখন আমের মরশুম ছিল) এবং অন্যান্য খাদ্য বস্তু কোন রকম আপত্তি না তুলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তাছাড়া সুপারিন্টেনডেন্ট নিজেই আমার কষ্ট লাঘবের জন্য তার নিজের যা সাধ্য তা করেছেন। কয়েদীদের গণতির পরে গেটের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত এবং তখন আর কোন সাক্ষাৎ প্রার্থীকে আসতে দেওয়া হত না। সন্ধ্যার সময়টা কাটাবার জন্য বাইরে হাজত ঘরে রক্ষিত সহ বন্দীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। তারা আমাকে গান বাজনা শুনাতে চাইতেন। কিন্তু আমি দেখলাম, ওটা কারা বিধির বিরোধী। তাই আমি তাতে রাজি হলাম না। আমার বন্দীদশা আমি এক রকম আনন্দেই কাটিয়েছি—কেবলমাত্র একঘেয়েমিই যা একটু পীড়া দিয়েছে। কারণ আমার কাছে এই কারাবাস একটা শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের কাল বলেই মনে হল—যে বিশ্রাম ইতিপূর্বে বহু বছরের মধ্যেও পাইনি, এবং দেখলাম যে কারাগারে থেকে বাইরে আসার সময় আমার ওজন কয়েক পাউণ্ড বেড়ে গিয়েছে।

(চলবে)

গৌহাটি কলতাবাজার সংগ্রাম দিবস

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস

অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে গত ১৫ই জুন কলেজ ষ্ট্রিট স্থিত কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে গৌহাটি কলতা বাজার সংগ্রাম দিবস উৎযাপিত হয়। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বিপ্লবী তারা-নাথ লাহিড়ী, জীবনতারা হালদার, নলিনী গুপ্ত, ব্রজেন্দ্র দাস, প্রবীর ঘোষ, দীনেশ ঘটক, প্রফুল্ল সেন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গৌহাটি ও কলতা বাজারে বিপ্লবীদের ইংরেজের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের তাৎপর্য্য ও অভূতপূর্ব ত্যাগের আদর্শ তুলে ধরেন বক্তাগণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা বানচাল করার জন্য ইংরেজ প্রথমে সৈন্য ছাউনীর উপর আক্রমন চালায় পরে বৈপ্লবিক সংগঠনের উপর আক্রমণ করে। সৈন্য বাহিনী নিরবে এই আক্রমণ সহ্য করে যায়, ফিরোজপুরে বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই-এ ভারতীয় সিপাহীদের পঞ্চাশ জন মৃত্যু বরণ করে। সিঙ্গাপুরে 15th Mahammedan Platoon এবং 35th শিখ রেজিমেন্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রায় এক সপ্তাহ বিদ্রোহের শাসন কায়েম রাখে। জাপানী সৈন্যের সাহায্যে ইংরে-জেরা সিঙ্গাপুর পুনর্দখল করে। রাসবিহারী জাপানে চলে গিয়ে অস্ত্রসম্ভার পূর্ণ জাহাজ ভারতে বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই সংবাদ নিয়ে অবনী মুখার্জি ভারতে আসার পথে সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার হন। তল্লাসী চালিয়ে তাঁর কাছে একটি নোটবই পাওয়া যায়। এই নোটবইয়ে বিপ্লবীদের কয়েকটি ঠিকানা ছিল। বিপ্লবীরা এই খবর পেয়েই আক্রমণের আশঙ্কায় বিপ্লবীদের কেন্দ্রগুলি চন্দননগর ও আসামে স্থানান্তরিত করে এবং ইংরেজের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ নয়, পালাবার কোন পথ না থাকলে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নীতি গ্রহণ করে। গৌহাটিতে দুইটি কেন্দ্র ছিল। একটি আঁধারগাও। আধারগাও বাড়ীতে ছিলেন নলিনী ঘোষ, প্রভাস লাহিড়ী, মনীন্দ্র রায়, প্রবোধ দাস এবং যুগান্তর বিপ্লবী দলের অতিথি অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৪ সনের ২৩শে ডিসেম্বর সেই সময়ের বিপ্লবীদের আবদ্ধ রাখার জন্য বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত দালান্দা থেকে নলিনী ঘোষ, প্রবোধ বিশ্বাস ও প্রবোধ দাশগুপ্ত পলায়ন করেন। দ্বিতীয় কেন্দ্রটি ছিল ফাঁসি বাজারে। এই বাড়ীতে ছিলেন নলিনী বাগচী, তারাপ্রসন্ন দে, নরেন ব্যানার্জি।

১৯১৮ সনের ৭ই জানুয়ারী পুলিশ অতর্কিতে ঘিরে ফেলল আঁধারগাও বাড়ীটি। তখন রাত্রির গভীর অন্ধকার বিপ্লবীরা ঘুমিয়ে, কেবল মাত্র একজন পাহারায় ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘুমন্ত বিপ্লবীদের জাগিয়ে হুঁশিয়ারী দিয়ে বলে

উঠলেন পুলিশ। দলনেতা নলিনী ঘোষের নির্দেশে বিপ্লবীরা সবাই হাতের উদ্যত পিস্তল বাগিয়ে নিজ নিজ পজিশনে যুদ্ধের জন্য দাঁড়ালেন। পুলিশ অফিসার ঘরের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করা মাত্র দলনেতা আদেশ দিলেন ফায়ার। চলল গুলি বর্ষণ। ইতিমধ্যে ঐ বাড়ী হইতে পালাইয়া যাওয়ার রাস্তার সন্ধান পাওয়ায় দলনেতা আদেশ দিলেন তোমরা সরে পড়, দলনেতা একাই দুই হাতে দুইটি পিস্তল নিয়ে সংগ্রাম চালাতে লাগলেন। এই খণ্ডযুদ্ধে পুলিশের ২০ জন আহত হয় এবং পুলিশবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। দলপতিও নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন।

অতিথি বিপ্লবী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বিপ্লবীরা ১৯১৮ সালের ৯ই জুন মধুগ্রহ পাহাড়ের কাছে এসে সমবেত হন। পুলিশ সারা সহর খোঁজে বিপ্লবীদের কোন সন্ধান না পেয়ে পাহাড়টি ঘিরে ফেললো। চললো এখানেও খণ্ডযুদ্ধ। নলিনী বাগচী ও প্রবোধ দাশগুপ্ত পলায়নে সমর্থ হলেন নলিনী ঘোষ, অরেন ব্যানার্জি ও তারাপ্রসন্ন দে আহত অবস্থায় ধৃত হন সিরাজগঞ্জে ভেনিজোলা গ্রামে গোবিন্দ কর ও নিকুঞ্জ মালের খণ্ডযুদ্ধ হয়। নিকুঞ্জ মাল আহত ও গোবিন্দ করের শরীরে সাত জায়গায় গুলিবিদ্ধ হয়। এই ধরণের প্রতিরোধ বিভিন্ন জায়গায় চলিতে থাকে। শেষ সংগ্রাম হয় ঢাকা সহরে কলতা বাজারে।

নলিনী বাকচী গৌহাটি হতে পাহাড় পর্বতের মধ্য দিয়ে বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে কলিকাতা গড়ের মাঠে উপস্থিত হন। অবসন্ন দেহ, তদুপরি রোগের যন্ত্রণায় নলিনী বাকচী অচৈতন্য অবস্থায় গড়ের মাঠে পড়িয়া থাকে। খবর পেয়ে বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী নলিনী বাকচীকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যান। কয়েক দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে নলিনী বাকচীকে সুস্থ করিয়া তোলেন। নলিনী বাকচী সুস্থ হয়েই ঢাকায় চলিয়া যান, তাঁহার সঙ্গে সামিল হন বিপ্লবী তারিণী মজুমদার। তাহারা ঢাকার কলতা বাজারে একটি বাড়ীতে অবস্থান করিতে ছিলেন। ১৯১৮ সনের ১৫ই জুন তাঁদের বাড়ী পুলিশ আক্রমন করে। বিপ্লবীদ্বয় প্রতিরোধ করে। পুলিশ পক্ষের কয়েকজন আহত হয়। তন্মধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বসন্ত মুখোপাধ্যায়ের আঘাত ছিল গুরুতর। তারিণী মজুমদার শহীদের গৌরব দৃপ্ত মৃত্যু বরণ করেন। পুলিশ কর্তার প্রশ্নের উত্তরে শহীদ নলিনী বাকচী মৃত্যুর শিয়রে মুমূর্ষু অবস্থায় শেষ কথা বলে গেলেন Let me die peacefully, Don't disturb. বৈপ্লবীক মন্ত্রগুপ্তির দৃঢ়তার এক অভিনব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

ইংরেজ সরকার বুঝতে পারল অভ্যুত্থান রোধ করা গেলেও বিক্ষোভ প্রশমিত হয় নাই, দিনে দিনেই সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিতেছে। এই পরিস্থিতিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ১৯১০ সনে মন্টেগু চেমস ফোর্ড রিফর্ম আক্ট ঘোষণা করে। ফলে পরবর্তী পর্য্যায়ে গণ আন্দোলনের সুযোগ হল।

সভাপতি মহাশয় ও জীবনবাবু তাঁদের ভাষণে স্বাধীনতার ৩০ বৎসর পরও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিপ্লবীরা যথা মর্যাদা পায় নাই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

দীনেশবাবু, প্রবীরবাবু, নলীনি বাবু গৌহাটি ও কলতা বাজারে সশস্ত্র বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে বিপ্লবীরা যে আদর্শ ও নিষ্ঠা দেখায়েছেন তাহাতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য যুবকদের ও রাজনৈতিক দলগুলিকে আহ্বান জানান। ব্রজেনবাবু বিপ্লবীদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য তুলে ধরেন।

সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম প্রাণদানকারী শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সভাপতি মহাশয় শহীদ তারিণী মজুমদার ও শহীদ নলিনী বাকচীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।

ইতিহাস ও নেতৃত্ব

কৌটিল্য

ইতিপূর্বে লিখেছিলাম, নেতৃত্ব কি গাছের ফল, টুক করে হাতে পড়বে? নেতৃত্ব ঘটনা-সংযুক্ত ইতিহাসের গর্ভে প্রত্যহে জড়িয়ে থাকে। যে-সব ঘটনায় অন্তরালে প্রকৃত শক্তি লুক্কায়িত থাকে, তাকে উপযুক্ত সময়ে, জন-সমক্ষে উদ্বোধন করাই হলো সঠিক নেতৃত্বের কাজ। গত ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেসের প্রভাবে ও সহায়তায় যে নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল তার অবসান না ঘটলেও, জনসাধারণ তাতে ক্লান্তি বোধ করছিল। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর, কংগ্রেসের মধ্যে যে ভাঙাভাঙি দেখা দেয় তাতে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়েনি। সাদা চোখে দেখা গেল, ক্ষমতায় যাঁরা আছেন তাঁরাই আসল কংগ্রেস। কংগ্রেস যদি সংগ্রামী মনোবৃত্তির দ্বারা গঠিত না হতো তবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসই আসল কংগ্রেস বলে মনে হতো। প্রকৃতপক্ষে তা নয়, সেইদিন থেকেই কংগ্রেসকে টুকরো-টাকরা করার কাজ অতি সন্তর্পণের সহিত শুরু হয়। এটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে ক্লাইভরা শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ভারতে আসেনি। নব নব রূপে অতীতেও এসেছে। আজও আসছে। সম্ভবত ভবিষ্যতেও আসবে। এত খোলা দরজা-জানালা দিয়ে তারা আসবে না এমন কথা আমাদের ভাবা ভুল। ভারত রাশিয়ার মত কথাট-বদ্ধ সমাজ নয়, উন্মুক্তদ্বার সমাজ। কাজে এর সুবিধে-অসুবিধে দুই নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। বিষ্ণুরা দানা বাঁধবেই। এটা অতি সাধারণ কথা। কিন্তু এই সাধারণ কথার অসাধারণত্বটুকু আইন্‌স্যার্গের মত তলায় থাকে। কিন্তু এই অন্তর্জলী বিষ্ফোড় দানা বাঁধতে পথ পেতো না, যদি ক্ষমতাসীন দল নব্য রাজনৈতিক দর্শন সৃষ্টি করতে পারতো। ক্ষমতার মোহ যেমন আছে, তেমন আবার ভাবের বা চিন্তাধারার মোহও আছে। নারোদ্নায় এই ধরনের একটা চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের চিন্তার ক্ষেত্রে আরো গভীরভাবে নাড়া দেয়, এমন একটা—কিছু চিন্তা ধারার সূত্রপাত করা উচিত ছিল।

এই 'অবশ্য উচিত-কার্যটি' সমাধা হয়নি। ফলে যুক্তি শাস্ত্রবিহীন। উত্তেজনার অসংখ্য যুবকেরা ঘুরেফেরাতে লাগিল। মূল কাণ্ডের (কংগ্রেস) ওপর আস্থাহার উপদ্রব বেড়ে গেল, মূল কাণ্ডটিকে আর দেখাই যাচ্ছিল না। যখনই কোথাও কোন অতিরিক্ত উত্তেজনার জোয়ার আসে, তখনই বুঝতে হবে, কোন একটা শৃঙ্খলাকে ভাঙবার জন্য পেছন থেকে তাগিদেরার শক্তি জুটেছে। বর্তমান ক্লাইভেরা এইভাবেই সংগঠনের মধ্যে ঢোকে। বাইরের হাততালি, উত্তেজনার মোহে যুবকদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। উত্তেজনাহীন, ঘৃণাবহীন কাজে আর যুবকদের মন বসেনা, পাওয়া যায় না। এই বলহীন যুবকদের প্রতিটি কর্ম্ম সমালোচনার বস্তু হয়ে ওঠে। এর একেবারে চরম দৃষ্টান্ত হলো গৌহাটি যুব কংগ্রেস সম্মেলন। ক্লাইভেরা তখন সম্পূর্ণ মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিয়েছে যুব কংগ্রেসকে। এই ধারাকে—অর্থাৎ ভয়াবহ ধারাকে, বাঁধ দিয়ে কেউ আটকাতে পারেনি। এইটেই হলো ক্লাইভদের সমাজ লাভ। হাততালি প্রশংসা, অযাচিত গুণ কীর্ত্তন, আর অসংযত হাতে অর্থের প্রলেপ—এর ফসল তুলতে কদিন লাগে? এ তুলো ফসল নয়, পরিকল্পিত প্রথায়, সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তায় বোনা ফসল। তুলতে বেশী সময় লাগার কথা নয়। ঠিক সময় মত জমিকে ছাড়া করে দিয়ে সব ফসল তুলে নিয়ে গেল। বন্যাগর্ভা জমি, বন্যা জমিতে পরিণত হলো, আগে চিন্তায়

গ্রন্থিকের কথা বলেছি। অর্থাৎ নব্য রাজনৈতিক দর্শনের অভাবের কথা বলেছি—এইবার বন্যা যদি দেখে তাই মনে হলো। অর্থাৎ কংগ্রেস ক্ষমতায় এলো বটে, কিন্তু নোতুন চিন্তার ক্ষেত্রে নিঃস্ব হতে বসল।

নরোত্তার চেষ্টা যাতে ব্যর্থ হয় তার লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এবং সংসদীয় গণতন্ত্র যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে না পারে তার জন্য নেপথ্যে আয়োজন চলতে লাগল। সংসদের ভিতরে, কি বাইরে, শুধু ক্ষুব্ধ উত্তেজনার বান ডেকে যেতে লাগল। এই উত্তেজনার গতি প্রকৃতি ভারি অদ্ভুত। হঠাৎ দেশের কয়েকজন নেতা, স্থির করে ফেললেন, দেশময় অসাধু লোকেরা সব লুটে পুটে খাচ্ছে। আর অবশ্য (যার কোন অবয়ব নেই, শ্রেণী থাকতে পারে) অতীব দুঃখ কষ্টের মধ্যে আছে গণতন্ত্র বিপন্ন। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র ভারি অভিনব। এ ইংলণ্ডের পাঁচ কোটি লোকের গণতন্ত্র নয়, ষাট কোটি লোকের গণতন্ত্র। যে ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্র বা পার্লামেন্ট মডেল আমাদের জন্যে বাছা হয়েছে। সেখানেও অনেক লড়াই করতায় হয়েছে। ইংরেজরা তাদের সংসদের ইতিহাস মোটামুটি ১২৯৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ধরে। তখন আমরা ভারতীয়রা কোথায়? তার কিছু দিন আগে শতাব্দীর প্রথম দিকে ১২০৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। তখন ভারতের জাতীয়তাবোধই বা কোথায় ছিল? আর গণতন্ত্রই বা কোথায় ছিল? এর মধ্যে রাজা প্রজার লড়াই ইংরেজরা করেছে। ধর্মের নামে লড়াই করেছে। আমরা ত শুধু হাজার বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এর আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইসলামের রাজত্ব কালে নানাবিধ আন্দোলনের সন্ধান মেলে। কিন্তু তাদের চরিত্র আলাদা জাতের। আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল মাত্র তিরিশ বছরের। এই তিরিশ বছর সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্নধর্ম, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস, বহু বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থাও ঐতিহ্যকে, মোটামুটি একটা আপোষ-রফার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। ফলে কোথাও, রাষ্ট্রচিন্তের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কোথাও অমীমাংসীত অভিযোগ ক্ষোভের ভুমে উঠেছে। আবার কোথাও বা নোতুন জাতের সুবিধাবাদ জন্ম নিয়েছে। এর বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দিয়েছে, কোথাও কোথাও জাতীয় গঠনমূলক কাজ এই সব উপরিতল সমস্যার কারণে ব্যাহত হয়েছে। বহুচাষী, বহু ধর্মের দেশে বর্তমান কালের ধাঁচে-গড়া সংসদীয় গণতন্ত্র কায়েম করা যে, কি দুরূহ কাজ তা ভুক্তভোগী দেশ ছাড়া আউকে বোঝানো যাবেনা।

এখানে ধর্মীয় কারণে দাবী; অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতার জন্য রক্ষা কবচ দাবী, জাতীয় সর্বাঙ্গীণ কারণে কোন শ্রেণীই ঐকান্তিকভাবে শ্রম, অধ্যবসায় বিনিয়োগ করতে রাজী নয়। রাষ্ট্র এখন কুঠুরী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তার কারণ, রাষ্ট্রের প্রতিটি কুঠুরীতে এ-রক্ষা কবচ, সে-রক্ষা কবচে ভর্তি হয়েগেছে। কথায় বলে যার রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। এও যে তাই হলো। আর যে শ্রেণী সুখ-সম্পদ ও সুবিধা-সুযোগের ইতিমধ্যেই তবিলদার হয়ে বসে আছে তাদের সামনে হঠাৎ একটা বিরাট বিশ্বের দরজা খুলে গেল। অর্থাৎ যে শ্রেণীটি প্রাক্তন সরকারের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের বংশধরেরা আইন, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যে নব্য সম্পদ-ভিত্তিক একটি নবীন শ্রেণী হয়ে সমাজে দেখা দিল। এরাই ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম পাণ্ডির নেতা হয়ে বসতে চাইলেন। অবিশ্যি অনেকেই পারলেনা সে সারিতে বসতে। কিন্তু দেশের আমলাতন্ত্রে এঁদের হাত অতি গভীরে কাজ করতে লাগল। এঁদের ওপর যদি হুকুম থাকে ঘরে নিয়ে আসবার, তবে ঘেঁষে নিয়ে আসবে। অবশ্য অবস্থায় ঘাড়াবাড়ির জন্য এঁরা অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। প্রকৃত নেতৃত্বকে বিকৃত করে দেখানোর জন্য এরা অনেকাংশে দায়ী। নইলে বিশ্বস্ত কর্মসূচি নিয়ে মনে-প্রাণে কাজ করলে দেশের লোকের কংগ্রেসের প্রতি কোন ক্ষোভ থাকতে পারত না। ক্ষোভটা তাইতে রাখার জন্য ফাইভেরা আছেন, আর এই শ্রেণীটি তাঁদের হাতে অজ্ঞাতসারে

(চলবে)

মৃত্যু বাণ

শ্রীসতী ভূষণ সেন

নগ্ন তুলতুলে শরীর, একটা শক্ত আবরণও নেই গায়ে। চারদিকে নখী দন্তী পশুরা, বিশাল বিশাল হিংস্র জন্তু। এমন জোর নেই গায়ে যে ওদের কারো সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারবে। একটা ভয় ভয় ভাব নিয়ে মানুষটার যে দেখলে কেউ থমকে দাঁড়াবে। দৌড় মেরে যে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবে তেমন গতি নেই পায়ে। তবু আদিম মানব এই বর্বর পৃথিবীতে টিকে থাকতে পেরেছিল। পেরেছিল তার দুটি অসাধারণ অস্ত্রের সাহায্যে, যা বাইরে থেকে দেখা যায় না। সেই জগতে আর কারও তেমন হাতিয়ার ছিল না। হাতিয়ার দুটির প্রথমটি তার প্রখর বুদ্ধি, দ্বিতীয়টি তার দেহের কৌশল। বিপদের সঙ্কেতেই নিজ থেকে সজাগ হয়ে উঠবার ক্ষমতা। বাইরের কারও নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না অটোমেটিক।

আদি মানব ছিল শিকারী। খিদে পেলে শিকার করত। শিকার শেষে আহারাদি সমাপন করে বিশ্রাম করত। গুহার সামনে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকত। সব সময় সজাগ থাকতে হত পাছে আর কারো শিকার হয়ে পড়ে। পাকস্থলী হজমের কাজে ব্যাপৃত হত, দেহ শিথিল হত, চোখ বুঁজে আসত। হঠাৎ একটা শীতল ছায়ার পরশ লাগল কিম্বা কারো চোখের আলো পড়ল দেহে। অমনি চোখ খুলে যেত। সজাগ হয়ে উঠত দেহ, শরীরের প্রতিরোধ (defence) কেন্দ্রগুলি আলোড়িত হয়ে উঠত। রক্ত থেকে পর্কয়া আসত, চর্বি আসত ত্বিকার্ত থেকে, পেশী ও স্নায়ুর শক্তিবৃদ্ধি করত। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হত দেহ। নাড়ীর স্পন্দন বাড়ত, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হত, রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেত। হজমের কাজ স্থগিত রাখত পাকস্থলী। পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ুক্ত করতে হবে শত্রুর মোকাবিলায়। রক্ত ঘন করবার (Coagulation) রসায়ন প্রস্তুত হয়ে থাকত কেটে ছিঁড়ে গেলে রক্ত বন্ধ করার জন্য। ধমনীর রক্ত স্রোত বাড়তো, লাল কণিকার দল (red cells) স্পীলন্ (spleen) থেকে বেরিয়ে সেই স্রোতে মিশে যেত। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়িয়ে দ্রুত কার্বন ডাই অক্সাইড আবর্জনা পরিষ্কার করত। যখন দেহের অভ্যন্তরে এই সব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তখন হাতের কাছে যে লাঠি ছিল সেইটি তুলে নিত মানব। এরপর শত্রুকে আক্রমণ করবে, না গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিবে, স্থির করবে তার অভিজ্ঞতা। এই দুইটি হাতিয়ারের শক্তির উপর নির্ভর করে মানুষ টিকিয়ে রেখেছে পৃথিবীতে।

একদিন যা ছিল শক্তির উৎস, আজ সেটাই হয়েছে আমাদের মৃত্যুবাণ। জীবিকার জন্য এখন বনে বনে শিকার করতে হয় না। খুঁজতে হয় আফিসে আফিসে চাকরী। বিপদের সম্ভাবনা কিই বা থাকতে পারে এই সভ্য জগতে, এক চেয়ার ভেঙে যাওয়া ছাড়া ? তাই সেটিকে রাখবার জন্য কতো পরিশ্রম করতে হয়। চাকরীর ব্যাপারে কোন প্রেশারের সম্মুখিন হলে তখন, আগের দিনের মত বিপদের ঘণ্টা বেজে ওঠে, রক্তের রাসায়নিক প্রক্রীয়া কাজ সুরু করে। প্রেশার তাদেরই তত বেশী, যারা যত উপরে; যত বেশী মানুষকে পরিচালিত করবার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত। চাপটা তাদের উপরেই বেশী।

মনে করেন, অফিস গিয়ে দেখলেন টেবিলের ওপর একটি মেমো ; আপনার ডিপার্টমেন্ট অন্য ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাব। আপনি বিপদের সংকেতে চমকে উঠলেন, হরমোনরা (Hormones) ছুটলো রক্তস্রোতে, নাড়ীর স্পন্দন বেড়ে গেল। আপনি কি উপরওয়ালার সঙ্গে লড়াই করতে পারেন ? আপনি কি পালিয়ে বাঁচতে পারেন ? কোনটাই নয়। মনের ক্রোধ মনে চেপে, ঠাণ্ডা মাথায় 'মেমো' র জবাব লিখতে হবে। বিপদটা যদি শেষ পর্য্যন্ত কেটে যায় তো ভালই, ক্ষণস্থায়ী stress এর উপর দিয়েই ফাঁড়া কাটলো। আক্রমণ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, যদি বাড়তে বাড়তে চলে, তখন দেহের প্রতিরোধ (defence) যন্ত্রের উপর চাপ পড়বে, জমে ওঠে রোগ।

রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থা তো চোখের সামনে দেখছেন। রাজনীতি মানেই দড়ির উপর খেলা। এগিয়ে যেতেই হবে পিছু হটা চলবে না। এক একটা সংকট আসে যখন এগোনোও যায় না পেছোনোও যায় না!

শেষটায় যদি অবশ্যই হ'ল তো সাদিস্হোমে গিয়ে দীর্ঘ বিশ্রাম নিন, অথবা হার্ট মেয়াদত কায় আবার প্রতিষ্ঠ ওপরে চড়ুন। আর পরাজিত যদি হয়ে থাকেন, আপনি হবেন রাজনীতির উপেক্ষিত, অনংখ্য Elderly statesman দের একজন। বড়জোর জনসভায় সভাপতি হবার ডাক আসবে, তার বেশী কিছু নয়।

আমরা যারা হরিপদ কেরানীর দল, আদিম মানবের রক্তের উত্তরাধিকার থেকে আমরা কেহই বঞ্চিত হইনি। আফিসে যাই, যা পেয়েকিয়ে আসি যেন অন্য একটি মানুষ। কেউ কিছু বলতে গেলে চটে উঠি। বেঁকা বেঁকা কথার জবাব ছুঁড়ে মারি। বাড়ীর লোকরা বুঝে ফেলেন অফিসে কিছু হয়েছে। হয়ত অফিসে কিছুই হয় নি যা হয়েছে পথে। সহযাত্রীর থেকে আসতে হয় ট্রেন নয় বাসে। গাড়ীতে গাড়ীতে ওঠা আর গাড়ী থেকে নামা সে এক কঠোর অভিজ্ঞতা। আফিস যাবার কথা ভাবলেই বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। কি জানি আফিস যেতে পারব কিনা, ফিরে আসতে পারব কি না।

সোডার বোতল যেমন ভিতরের গ্যাসের চাপে আপনি ফেটে যায়, মনের ভিতর ক্রোধ বা দুশ্চিন্তা জমলে তার চাপে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কাজ কর্মের 'টেনসন' হার্টকে দুর্বল করে ফেলে। সেটা সামলাতে হয় আপনাকেই। এটা সামলাবার ক্ষমতাও মাটির নীচে সঞ্চিত তেলের মত সীমাবদ্ধ। সবটুকু খরচ করে বসলেন তো ফুরিয়ে গেল সকল। যদি এমন জীবিকা বেছে নিয়ে থাকেন যাতে Stress or tension খুব বেশী, তবে আপনার stress সামলাবার ক্ষমতা খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। তখন সহজেই coronery-র শিকার হবেন। Coronery না হলে অন্য কিছু একটা ধরবে, ulcer Asthma বা colaitis যে কোন একটা ধরতে পারে। কিম্বা accident করে বসতে পারেন পথে। মোদ্দাকথা এই, যে-মানব একদা বুক ফুলিয়ে শিকার করে ফিরতেন, কাউকে পরোয়া করতেন না, আজ বিশ্বজয়ের পরে এখন নিজেকেই নিজে শিকার করে মরছেন।

করোনারির প্রথম লক্ষণ বুকের ভেতর পিন ফুটানো বা ছুরি বেঁধানোর মত ব্যথা। ব্যাথটি টের পেলেন আর বুঝলেন মৃত্যুবান চিহ্ন এঁকে গেল। কিন্তু মৃত্যুদূত যখন পুরন ধরিয়ে দিয়েছিল তখন জানতেও পারেন নি। কদিন ধরে মনে হচ্ছিল জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, কিছুই হল না। বিরক্তি ধরে গেছিল দুনিয়ার উপরে। কেবে অন্ধ ধরে মনে করছিলেন, সব শালাই আমার বিরুদ্ধে। আরো খাটতে হবে নইলে ওরা আমায় ডুবিয়ে ছাড়বে। অথচ কাজেও মন দিতে পারছিলেন না। বুঝতে পারেন নি, যে তখনই মৃত্যুদূতের আনা গোনা সুরু হয়েছে। এরপর একদিন ঘাম ছুটলো, নাড়ীর গতি বাড়লো, যেমায় ঘেউ গেল। ছুটলেন ডাক্তারের কাছে, একগাদা ওষুধ গিললেন। তখনকার মত লক্ষণগুলি চাপা পড়ল, কিন্তু রোগ নির্মূলময় হল না।

ওষুধের গন্ধে যে একগাদা 'Dont' চাপিয়েছিলেন চিকিৎসক, তার ফলে বেঁচে থাকবার মজাটাই উবে গেল। ঘি খেও না, মাখন খেও না, মাংস খেও না সন্দেশ খেও; মদ খাবে না, সিগারেট ছোঁবে না। যদি ছেলে ধরেন ডাক্তারবাবুকে তিনি স্বীকার করবেন, অনেক পেসেন্ট দেখেছেন এদব খেয়েও যারা দীর্ঘদিন বেঁচে আছেন। তাহলে আপনিই বা নিজেকে বঞ্চিত করবেন কেন? সাধ্যে কুলায় ওজন করবেন, না কুলায় 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ' সে তো শাস্ত্রেই আছে। ঋণ শোধ করতে না পারলে করবেন না। তাতে worry করবার কি আছে?

মৃত্যু ব্যাধিকে রুখবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নতুন জীবন দর্শন অবলম্বন করা। ট্রেন মিস্ করলে অস্থির হন না? ওটাই তো শেষ ট্রেন নয়। পরের ট্রেনে চাপবো। মর্যাদার চিহ্ন [Status Symbol] যার জন্য মানুষ প্রাণপাত করছে তার জন্য পরোয়াই করব না। বেশী কাইল জমলে, অর্ধেক পাঠিয়ে দেব সহকারীদের টেবিলে, Refer to Das' আর Refer to Bose' নোট দিয়ে। মরতে হয় ওরা মরুক। বেশী খেটে লাভটা কি হয় বলতে পারেন? প্রমোশন, মাইনে বাড়া যথাসময়ে সব হয়ে যাবে, কাজ করুন আর নাই করুন।

পা ব্যাজ ম্যাজ করলেই ছুটি নিয়ে বাড়ী বসে থাকবেন। যাদের পা ম্যাজম্যাজ করে না, যারা উইলার্স হর্স-এর মত হাটেন, আর চ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত খাটেন, মরতে মরতেও তারা আফিসে হাজিরা দেবেন। এবং তাতেই মারা পড়বেন। মৃত্যুবান তাদের ওপরেই তাক্ করছে।

Contd. from 2nd cover

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—BIRBHUM		
Dutt Pasupati	Vill Mundra, P.O. Hazratpur Khyralal	200	1. 10 76
Pal Krishnagati	Vill Sarpalshan, P O. Latdaha P. S. Bolpur	200	
	Dist—MURSHIDABAD		
Kar Smt. Gitarani w/o Late Suresh Ch. Kar	Sayedabad, P. O. Khagra	100	1. 10. 76 onwards
Goswami Satya Narayan	Vill Khodirpur Colony P. O. Baruipara	200	1 10. 76
	Dist—JALPAIGURI		
Chanda Anil Kumar	Vill Adarpara, P. O. Kotwali	200	1, 4. 77
Dutta Smt. Bani w/o Late Srimanta Kumar	Silpasamitipara, P O. Jalpaiguri	100	28. 11. 75
Dutta Smt. Joymani w/o Late Bidhu Dutta	39, Deshbandhupurgram P. O. Jalpaiguri	150	17. 1. 78
Dutta Narendra Nath	Debinagar P. S. Maynaguri	200	1. 10. 76
Sengupta Khagendra Kr,	P. O. Mainaguri	200	
Ghose Roy Mukundalal	P. O. Dalsinghpara, Tea Garden	200	15. 8. 72
	Dist—COOCH BEHAR		
Ghose Khagendra Nath	Vill & P. O. Changrabandha	200	1 2. 76
	Dist—MIDNAPORE		
Barik Bana Behari	P. O. & Vill Bhaduria	200	15. 8. 72
Bhanya Smt. Rohini Sundari w/o Late Rajendranath	P. O. & Vill Bhakutia	100	1. 10. 76
Das Gopal Chandra	Vill Ramchandrapur P.O Shrirampur P.S. Protabpur	200	
Hazra Smt. Sachabala w/o Late Sudhir Ch. Hazra	Vill Kerak P O. Kalyanpur P S. Mahisadal	100	
Paria Bhutnath	Vill Narubhunachak P. O. Jamua Lachimpur	200	15. 8 72

RgodNo. R. M .24911/71 | Diplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
পাক্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

4 JUL 1978

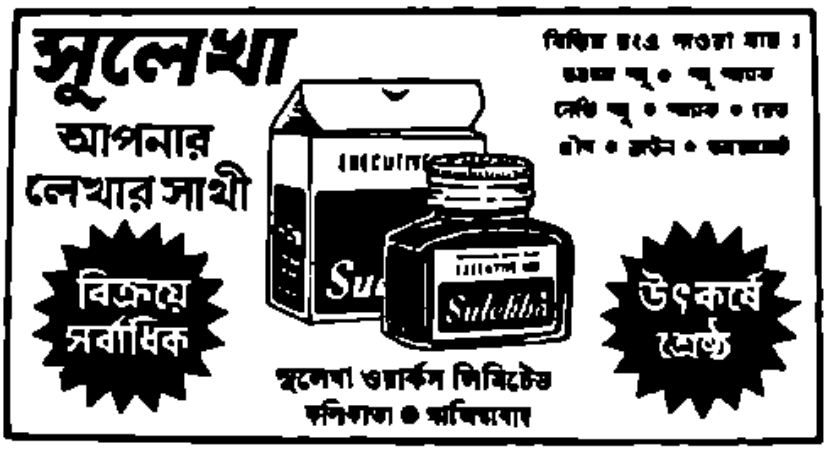

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীসুশ চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীসাহি পরল রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবীরেন গুহ।
দিল্লী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্গভবন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১৩ নং কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০১

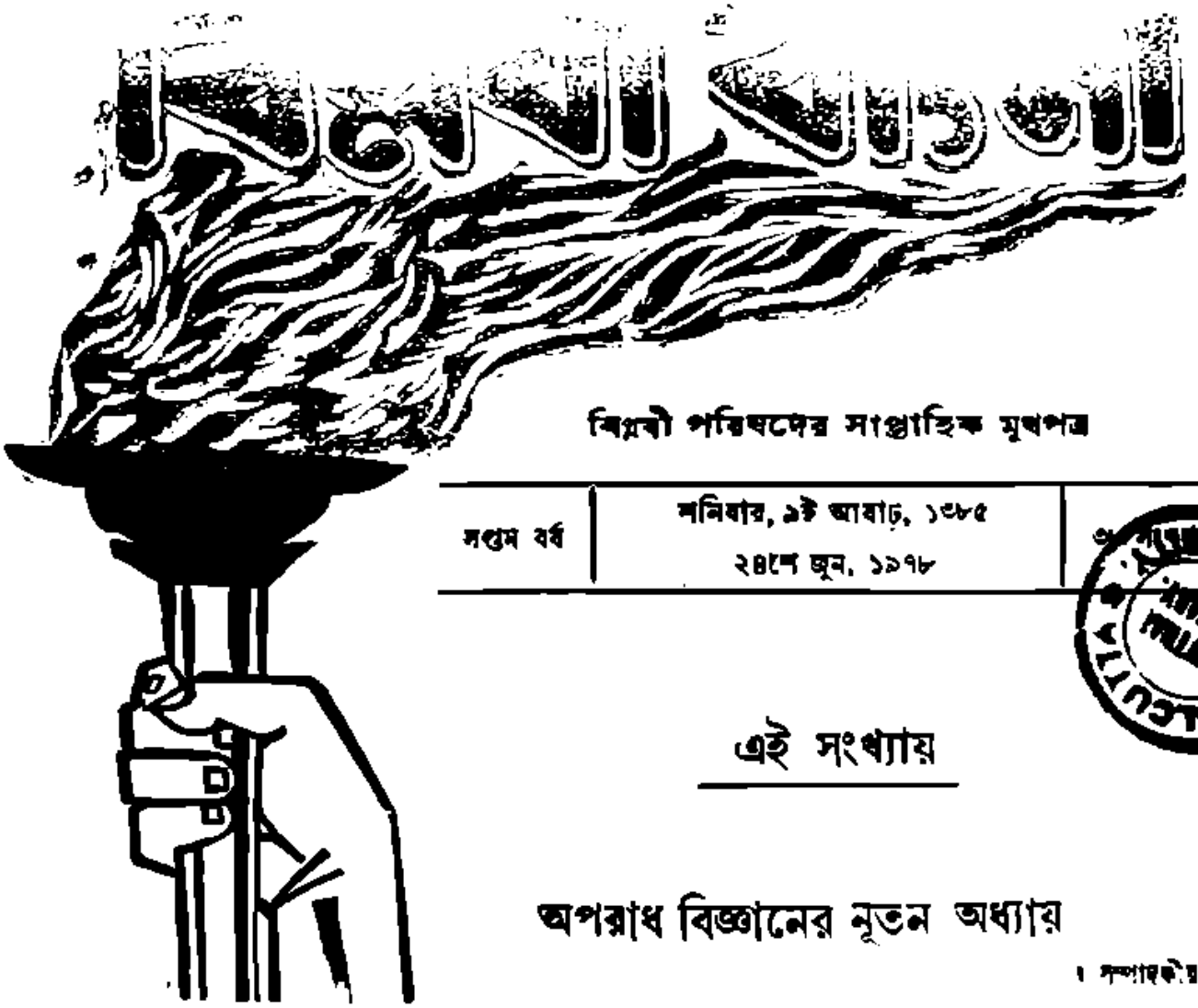

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৩৮৫ ২৪শে জুন, ১৯৭৮	

এই সংখ্যায়

অপরাধ বিজ্ঞানের নূতন অধ্যায়

। সম্পাদকীয় ।

রাজরত্ন দেশবন্ধু

। হুমায়ুন ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। শ্রীক্ষীরোদ দত্ত ॥

লঙ্কা দাহন

। শ্রীসতী ভূষণ সেন ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক নলিনী মোহন রায়গুপ্ত ।

'জনতা' জনতাকে হতাশ করেছে

। বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

লক্ষ লক্ষ লোক যাহা ভোগ করিতে পারিল তাহা অর্জনের মূল অধীকৃতিই শ্রেষ্ঠতম বিধান।

—গান্ধীজী

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Distt.—CALCUTTA		
Banerjee Brojan Rakhal	15 Naktala Lane, Calcutta-47	200	1, 4, 78
,, Sakdhar	44 Incinerator Road, Cal-28	200	,,
Basu Chunilal	13B Bhabananda Road, Cal-26	200	,,
Basu Smt. Pratima w/o Late Benoy Bose (ex-Andaman)	Block No. 9/J Flat 4 Kustiya Govt. Housing Estate Tiljala, Calcutta-37	100	20. 1. 78
Biswas Kumud Ranjan	C/o Sishu Sahitgor Samsad 32A Acharya P. C. Road. Cal-9	200	15. 8. 72
Biswas Sunirmal	18/9 Dover Lane, Calcutta-19	200	1. 10. 76
Chakraborty Brojan Behari	52/3B Strand Road, Cal-7	200	15, 8, 72
Hrishikesh	3/54 Jatindra Nagar, Cal-56	200	27. 1. 76
Harinarayan	13A Ramnath Biswas Lan Calcutta-9	200	1. 10. 76
Chatterjee Smt. Bela w/o Late Benoy,Chatterjee	21 Beniatola Street, Cal-5	200	26. 12. 77
Chatterjee Smt. Probha w/e Late Dwijendra Nath Chatterjee	16 Station Road, Calcutta-21	150	25, 11. 76
Chowdhury Miss Dipa d/o Subimal Ranjan Chowdhury	115C, Regent Park, Cal-40	100	1. 11. 77
Das Amulya Kumar	3/1/B Gobinda Bose Lane (Santi Kutir) Calcutta-25	200	29, 9. 73
Das Hari Mohan	122 R. N. Guha Road Subedar's Rly. House, Room 12 Ground Floor, Calcutta-28	200	1. 4. 74
De Basanta Kumar	129A, Unique Park, Cal-34	200	1. 4. 78
Gupta Smt. Niharkona w/o Late Parbat Mohan Gupta	21/1 Mahendra Garden Road Calcusta-30	150	31. 12. 77

Contd. on 3rd cover

সম্পাদকীয়

অপরাধ বিজ্ঞানের নূতন অধ্যায়

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নব্য প্রথায় ও প্রকান্ত কৌশলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইতিপূর্বে পাকীস্তানের নেতা লিয়াকৎ আলী খানকে প্রকাশ্য লোকচক্ষুর সমক্ষেই হত্যা করা হইয়াছিল। কালস্তক যম জনতাকে জনতা দল নহে এমন সুকৌশলে সাজাইয়া রাখা হইয়া ছিল যে, কাহারো চিন্তা করার অবকাশ মাত্র ঘটে নাই, কোথা হইতে কি ঘটিয়া গেল। এমন তড়িৎ গতিতে কাজটি সম্পন্ন হইয়া গেল দেখিয়া আলাদিনের দৈত্য ও বোধ হয় তরকাইয়া যাইত। খুনীর হদিস্ নাই। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল আততায়ীর দেহটি বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হইল। প্রথা ও কৌশলের দিক হইতে এতাতীয় যেমন অভিনব, তেমন বিস্ময় কর সেকালে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ডক্টর ডল্‌ফাসি হত্যাকেও হারমানাইয়া যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যাটা প্রকাশ্যেত বটেই, আরও সূক্ষ্ম প্রথায় কাজটি সমাধা হইয়াছে। ওসোয়াল্ডকে লিফ্‌টের ভেতর চুকাইয়া হত্যা করা হইয়াছিল কি কৌশলে ওসোয়াল্ডের হত্যাকারী সেখানে পৌঁছিল, কেমন করিয়া চকিতে, নিবিঘ্নে সমস্ত লাকী-সাবুদের উৎস মূল নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল তাহা ভবিষ্যৎ নাট্যকারদের গবেষণার বিষয়। লিয়াকৎ আলী হত্যার পর কেনেডি হত্যা আন্তর্জাতিক জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া ছিল তাহা অচিরেই বন্ধ হইয়া অবশ্য কমিশন বসাইতে কোন রাষ্ট্রই কার্পণ্য করেন নাই। এই খুন খরাবির জন্য আজ আর তেমন কেউ মাথা ঘামায় না। ইহার পর চিরপরিচিত অথচ কিছুটা নূতনত্বের দাবী করিতে পারে এমন প্রথায় হইল মুজিব হত্যা। সৈন্য বাহিনীতে প্রকাশ্য বিদ্রোহ নাই, কোন উত্তেজনা নাই, কয়েক জন ব্যক্তি (সৈন্য বাহিনীর) ব্যক্তি গত আক্রোশের তাড়নায় মুজিবকে প্রায় সবংশে নিধন করিল। কয়েকদিন কূট-নৈতিক ঘুঁটি চালাচালির পর মাছে মাছ, জলে জল যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। ইহার নাম আন্তর্জাতিক রাজনীতি সব রাজনীতির সেরা। এখানে বন্ধু শত্রুতে পরিণত হইতে তিলমাত্র সময় লাগে না, আবার শত্রু বন্ধু হইতেও সময় লাগে না। সবই ভেল্কী বাজি। ভানুমতীর খেল। মুজিবের পর pending list-এর সুলকিনার আলি ভুট্টো রহিয়াছেন। ফাঁসীর দড়িটা একবার এ পাশে দুলিতেছে, আবার ও পাশে দুলিতেছে,

অনেকটা ঘড়ির দোলকের মত বলিতে হইবে। কখন যে ভয়ঙ্কর অনিবার্য বিনাশের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে, তাহা কেউ জানে না। অবশ্য ঘড়ি কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরাইবার ক্ষমতাও কোন কোন শক্তি রাখে, এটা জানা উচিত। ইমাম ইতিমধ্যেই বলিয়া দিয়াছে, ভুট্টোকে লইয়া ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করিলেন, দোস্তী ও সাহায্য দুই-ই হারাইতে হইবে। পাকীস্তানের স্মরণ রাখা উচিত। আফগানিস্তান এখন রুশ-আকৃষ্ট হইয়াছে। ভুট্টোর প্রথম পর্য্যায় মামলিক উৎপাটনের ব্যবস্থা হইয়াছে, দ্বিতীয় পর্য্যায় কি হইবে খোদাই জানেন।

এবারে আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সেই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলা করার জন্য কি সব ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার বিশ্লেষণ করা যাউক। ইতিপূর্বে জাতীয় আন্দোলনের সময় বিক্ষোভ প্রদর্শন একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হইয়াছিল। সেই সব পদ্ধতি প্রয়োগের কৌশল ছিল নীরবে কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শন। অথবা বিক্ষুব্ধ ভাষায় শ্লোগান উচ্চারণ করিয়া সরবে বিক্ষোভ প্রদর্শন। ইহাতে সবাই বুঝিত, সত্যই হোক, বা ভ্রান্তিই হোক, কিছু সংখ্যক লোকের কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আছে। এই বিক্ষোভের পরিধি স্বল্পই হোক বা ব্যাপক হোক, ইহা একটি বাস্তব ঘটনা বলিয়া স্বীকৃত হইত। ভারত বর্ষের বিগত যুগে খুব সংখ্যক নেতাই ছিলেন যাঁহাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় নাই। বিগত যুগে বিক্ষোভের একটা বৈশিষ্ট ছিল, বা চরিত্র ছিল। কিন্তু একালে বিক্ষোভ প্রথা উদ্ভাবনেরও শেষ নাই, আর অবশিষ্ট ভাষা প্রয়োগেরও মাত্রা নাই। আজ বস্ত্রাহীন উদ্ধতা, অশ্রাব্য ভাষার যথেচ্ছ প্রয়োগ, রাস্তা-ঘাট ব্যারিকেড করা—নামান্তরে স্বেচ্ছাচার অসৌজন্যের সুনিপুন 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতি বিক্ষোভের মহামারী কাণ্ডের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার তুলনায় ইতিপূর্ববর্তী গান্ধীজীর প্রতি জুতো নিক্ষেপ, বা নেহেরুজীর কৃষ্ণপতাকা দাহ অতি আভিজাত্যের বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহার নাম হনুমানের লঙ্কা দাহন কাণ্ড নহে, ইহার নাম হুল্লোড় কাণ্ড। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ত্রাস ও বিভীষিকার আবহমণ্ডলের মধ্যে আসল লক্ষ্য বস্তুকে হত্যা করা। এ জাতীয় চতুরালির মজা হইল এই যে, কাহাকেও দোষী বলিয়া সনাক্ত করা যাইবে না বা সাব্যস্ত করা যাইবে না। কেননা কালান্তক যম জনতা (দল নহে) উহার নেতৃত্ব দিতেছে। জনতার অবয়ব নাই। কিন্তু রুঢ় কণ্ঠস্বর আছে, আর দর্শনীয় বস্তু হিসেবে একটি বিরাট জনস্রোত আছে। কে কাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া নিমিত্তের ভাগী হইবে। তার চেয়ে এই-ই ভাল, জনবিক্ষোভ মিছিলে সবাই নেতা। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিবার ইহা সুকৌশলে রচিত, আপত্ত নির্দোষ অথচ গভীর ষড়যন্ত্র মূলক একটি জাল। এই জালে লক্ষ্য বস্তুকে ফেলিতে পারিলে, মৃত্যু সুনিশ্চিত। কেন না, এই জালে মুক্তা কাঁদ রহিয়াছে। একবার আটকাইয়া

গেলে আর রক্ষা নাই। ওদিকে নিন্দাধ্বনি, এদিকে আসল লক্ষ্য বস্তুকে তাক্ করিয়া বিক্ষোভ ষড়যন্ত্রকারীরা ঘুরিতেছে। যেখানে সুযোগের অভাব, সেখানে লক্ষ্য বস্তু ঘাতকের হাত হইতে বাঁচিয়া গেল। এ ঘাতক একজন ফুলের মালাদানকারীও হইতে পারে। এ জাতীয় ষড়যন্ত্রের মাঝে এমন ব্যাপক সামাজিক সংযোগ ঘটে যে, কাহাকেই এতটুকু সন্দেহ করিবার অবকাশ দেয় না।

আমাদের বর্ত্তমান আলোচনায় ভুবনেশ্বর ও কটকের বিক্ষোভ মিছিলের প্রশ্নটি আসিয়া পড়িতেছে। ইন্দিরা গান্ধীকে লক্ষ্য করিয়া তামিল নাড়ুতে এইরূপ সাজানো উত্তেজনার অভিনয় হইয়াছিল। এই ছক কাটা উত্তেজনার অন্তরালে যে একটি গভীর ষড়যন্ত্র ছিল তাহা পুলিশের বয়নামায় প্রকাশ পাইয়াছে। তামিল নাড়ুতে পুলিশ ডি. এম. কে. নেতা করুণানিধির বিরুদ্ধে ইন্দিরাকে হত্যা বড় যন্ত্রের অভিযোগ আনিয়াছে। বিচারে এবং সাক্ষীসাবুদের জেরায় আরো প্রকাশ পাইবে তাহা আমরা জানি না। তবে ইহা যে একটি মারাত্মক রাজনৈতিক প্রবণতা বিক্ষোভ মিছিলের নাম করিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উড়িষ্যা এককালে দেশীয় রাজাদের স্বেচ্ছাচারের লীলাভূমি ছিল। তারপরে মঠ-মন্দিরে ধর্মের অনুশাসনও বেশ কড়া। এই দেশে রাজা প্রজার ভাবটা সমাজদেহের বিভিন্ন শিরায় উপশিরায় থাকা অসম্ভব নহে। আর অসম্ভব বলি কেন, বাস্তবে আছেই ই। এই সংস্কারাচ্ছন্ন দেশে কেউ যদি আদিবাসী ও হরিজনদের কথা লইয়া দাবী দাওয়া করে তবে তার ভাগে রক্তচক্ষু জুটিবেই। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আজ ইন্দিরা গান্ধী যে জনগনের কথা বলিতেছেন, তাহা বুঝাতে আদীবাসী ও হরিজন। আরও সাধারণ মানুষ আছেন যাঁদের শ্রেণীবিন্যাস আমরা জানি না। এই জাতীয় সাধারণ মানুষের দরবারে ইন্দিরা গান্ধী উপস্থিত হওয়াতে উপর তলার রাউতারী, পট্টনায়েক, সিং দেও-এর দল ক্রুদ্ধ হইবেন তাত জানা কথা।

বহু শাসন সংস্কারের রাজনৈতিক সংস্কারের পরও প্রাক্তন রাজাদের দুষ্ট প্রভাব কাটে নাই। এখানে স্বতন্ত্র ও নব্য হিন্দুবাদী জন সংঙ্ঘের প্রচার, মন্দিরের সেবাইত সমাজের স্বিত স্বার্থের প্রভাব—এইসব মিলিয়া এক অপূর্ব রাজনৈতিক স্বার্থ দানা বাঁধিয়াছে। এই দানাবাঁধা রাজনৈতিক স্বার্থ জনতা দলের স্বার্থে পরিণত হইয়াছে। এই সম্মিলিত চিন্তাধারার সুবাসায় জনতা দলের মধ্যে এমন ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, ঘৃণা-বিদ্বেষে প্রতিটি কর্ম্মীই যেন মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক চিন্তার দিক হইতে ইন্দিরা গান্ধীকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া জনতা দল এখন 'জরুরী অবস্থা' নামক একটি ভূতকে দাঁড় করাইয়া জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের, আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছেন।

উত্তেজনার মদ একবার গিলিলে, তাহার ক্রিয়া দেখা দিবেই। তাই ইউপাটেকেল ছোঁড়া, রাস্তা অবরোধ কারোত আছেই, তার উপর স্ট্রাটেজিটা এমন হওয়া চাই যাতে করে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। কটক, ভুবনেশ্বরে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি এই কৌশল-টাই প্রয়োগ করা হইয়াছিল। জনতার প্রকোপ যদি ইন্দিরা গান্ধীর জীবন অবসান হইত তবে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিত না। কেন না, রাগে, ক্ষোভে জনতা (দল নহে) ইন্দিরা গান্ধীকে টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। ইতিপূর্বে ইন্দিরা গান্ধী একবার উড়িষ্যাতেই আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। তখন তিনি প্রধান মন্ত্রী। এইবার দ্বিতীয় আক্রমন। অতএব দেখা যাইতেছে তামিল নাড়ু হইতে ওড়িষ্যা পর্যান্ত একই আক্রমণের কৌশল মনে হয় কোন একটি শক্তিশালী সংগঠন এই ঘৃন্য কাজে হাত পাকাইতেছে। তাহাদের বাহিরের ছদ্মবেশী বিক্ষোভ মিছিলকারী।

———

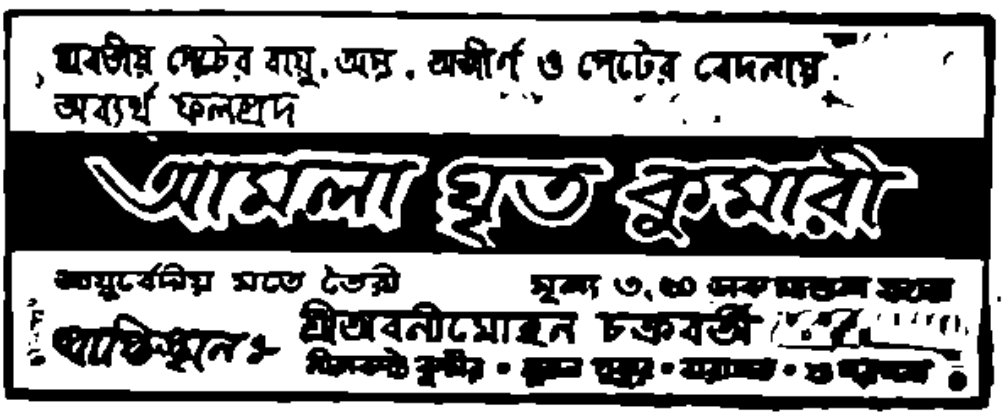

রাজরত্ন দেশবন্ধু

ছন্দারাণী

হে পূর্ণ চিত্ত, উদার মহত্ত্ব—সত্য রিক্ত চিত্তরঞ্জন—
হে মহান পবিত্র, মহৎ চরিত্র, অন্তর নারায়ণ।
সৃজিল সৃষ্টি, মহৎ কৃষ্টি, শুভ্র মহত্ত্বে অমর প্রাণ,
হে চিত্তরঞ্জন, রিক্ত সজ্জন, হে মুক্ত নিরভ বরণ ॥

ত্যাগের মন্ত্রে, রাজনীতি তন্ত্রে, তুমি হে কালের শঙ্কর,
রজগুণে ভোগী, হে কর্মযোগী, হে রাজ যোগী—হে কান্তার ;
ভোগেতে ধীমান, ত্যাগেতে মহান, শুদ্ধ গুণের আধার—
হে চিত্তরঞ্জন, হৃদয় ভজন—দীন বন্ধের অন্তর ॥

কল্লোল তুমি, উচ্ছল তুমি, অন্তঃ মহৎ হে অনুরাগী,
হে বঙ্গের মতানী, বঙ্গের দানী হে বঙ্গের ত্যাগী বিবাগী—
ধর্মে মহান—কর্মে মহান, তুমি হে দীনের সহযোগী,
হে চিত্তরঞ্জন, সত্য সাধন, সত্য হে মহৎ বৈরাগী ॥

দীনবন্ধু, দেশবন্ধু, বঙ্গবন্ধু, গাহে বঙ্গ তবগান,
বাঙ্গালী তোমায় ভোলেনি আজিও—বাঙ্গালীর তুমি প্রাণ,
হে চিত্তরঞ্জন, মুক্ত বন্ধন, হে দীন বঙ্গের সন্তান ॥

স্বাধীনতা কামী, দানশীল নামী, তিমির তিমিত আজ,
ভারত মাতার, ভাঙ্গি অন্তর, বিখণ্ডিত মস্তিত ভাজ—
তুমি নিরঞ্জন, করেছ গর্জ্জন, তুমি গড়েছ স্বরাজ
হে চিত্তরঞ্জন, বিপদ ভঞ্জন, মুকুট হীন রাজ ॥

কজ্জল হয়ে, উজ্জ্বল হয়ে, তুমি আছ সকলের অঙ্গে,
সঞ্চিত দয়া, সিঞ্চিত মায়া, গাঁথিয়াছ মোদের সঙ্গে ;
গৌরবে তুমি, সৌরভে তুমি, মহীরুহ হইলে এ বঙ্গে—
হে চিত্তরঞ্জন, দীন রঞ্জন, প্রীতি ফুলে ফুটেছ রঙ্গে ॥

দীনের দয়াল, হৃদয়ে কাঙাল—বঙ্গ কাঁদিছে বিরহে,
বাঙ্গলা আজিকে, ডাকিছে তোমাকে, হে বঙ্গবন্ধু দানী হে ;
তব নাম লয়ে, তব দান পেয়ে—আলোকে রাখো জাগিয়ে—
হে চিত্তরঞ্জন, রাজ রতন, তোমায় স্মরণ করি হে ॥

'জনতা' জনতাকে হতাশ করছে

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আজমগড় জনতা প্রত্যাখ্যান করে ইন্দিরার দিকে ঝুঁকেছে। জনতা দলের মধ্যে সংহতির অভাব প্রকট। পূর্বে যাঁরা জনসংঘী, বি. এল. ডি. সি. এফ. ডি, সোস্যালিষ্ট ইত্যাদি ছিলেন। এখন জনতার মধ্যে তাঁরা তাহাই আছেন এবং নিজ নিজ খাতই আজও তাঁরা বজায় রেখে চলেছেন। সংবাদে প্রকাশ C, F, D, আলাদা গোষ্ঠীচক্র বজায় রাখার জন্য এক সম্মেলন নিজেদের লোকদের নিয়েই ডাকতে চান। উদ্দেশ্য জনতা দলের মধ্যে C, F, D, সদস্যদের কিছু অধিক সুবিধা আদায় করা। জনতা নামে জনতা, কাজে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী মতাবলম্বী কিছু রাজনৈতিক জুয়াড়ীর আপৎকালীন গাঁটছড়া ছাড়া আর কিছুই নয়—জনতা দলের নেতারা নিজেদের কৃতকর্মের দ্বারা ইহাই বারে বারে জনগণের সামনে প্রমাণ করে দিচ্ছেন।

জনতার বিভিন্ন দায়িত্বশীল নেতাদের যে সব উক্তি ও পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রচারিত বিবৃতি প্রায়শই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে, তাহা পাঠে ইহাই মনে হয় যে 'জনতা' খুব শীঘ্রই বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ যাদবের আস্থা ভোট গ্রহণ ও তাঁর জয়ে দলের সভাপতির নিরুত্তর থাকা, অপর পক্ষে রাজনারায়ণের উল্লাস ও চরণসিংয়ের অভিযোগ কি সূচনা করে? ইতিপূর্বে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী দেবীলালের ভাগ্য পরীক্ষায় ও জয়ে অসুস্থ চরণসিংএর নিশ্চিন্তভাবও দলের অভ্যন্তরে বিভক্তির যে প্রকাশ লক্ষিত হয় তাহা সুস্থতার লক্ষণ নিশ্চয় নয়; বরং দলের মধ্যে উপদলের সৃষ্টি যার পরিনাম ভয়াবহ। প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় এক নম্বর নেতা, দুই নম্বর নেতা হলেন দেশরক্ষামন্ত্রী এবং তিন নম্বর নেতা স্বয়ং মন্ত্রী তবুও সম্প্রতি বিদেশসফরের সময় প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেসাই তাঁর সাময়িক অবর্তমানের সময় (১২ দিনের বেশী নয়) তাঁর মন্ত্রীসভার দুই নম্বর নেতা জগজীবন রামকে মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকার ও উক্ত সভার সভাপতিত্ব করার অধিকার অর্পণ করতে পারলেন না, কারণ চরণসিং তাতে ক্ষুব্ধ হবেন এবং ফলে প্রধান মন্ত্রীকে হয়ত দেশে ফিরে আসার পর আস্থা ভোটের সম্মুখীন হতে হবে। জনতার মধ্যে এই অবস্থায় বারে বারে আত্মপ্রকাশ কি বিপদজনক নয়? রাজনারায়ণের সাম্প্রতিক উক্তিগুলি কি জনতাদল ভেঙে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে না? তাঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী হুমকিয়ারী দিয়ে দলের শীর্ষ নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন "মোরারজী দেশাইয়ের মত সৎ, নিষ্ঠাবান ও কর্মক্ষম প্রধানমন্ত্রীকে যদি ভুলে তাঁর সরার প্রচেষ্টা দলের মধ্যে জানা বাঁধতে থাকে, তবে জনতা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে এবং জনতার সবাই এর ফলে চরম বিপদগ্রস্ত হতে বাধ্য হবে। তিনি যদিও জনসংঘী তবুও তার চোখের বালি অটলবিহারী বাজপেয়ী যেন এই সুযোগে প্রধানমন্ত্রীর গদী আঁকড়াবার চেষ্টা না করেন। তাঁর বিবাদ স্বয়ংএর 'বাজপেয়ীজীর' সঙ্গে। এদিকে চন্দ্রশেখরের কানে এবার জল ঢুকতে শুরু হয়েছে—তিনি হা প্রফুল্লসেন যো প্রফুল্লসেন গাইতে শুরু করেছেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীদের উল্লেখযোগ্য জয়। পশ্চিমবঙ্গে জনতাদলের এ্যাডহক কমিটি করার সময়ে মধু লিমায়ের, বিজয় সিং নাহারের ও চরণ সিং বংশবদ সুশীল ধাড়ার সৎ-পরামর্শে, দলপতি চন্দ্রশেখরজী যেন সুচিন্তিত ভাবে ও বাস্তব পন্থায় প্রফুল্ল সেনকে রাজ্য দলের সভাপতি ঘোষণা করলেও এমন সব সম্পাদকমণ্ডলী ও সহ-সভাপতি মণ্ডলী নির্ধারণ করে দিয়ে ছিলেন যে সেন মশাইয়ের নাভি-

খাস দেন অচিরে নির্গত হয়—আর সভাগুলির যা সব নাম লিপিবদ্ধ করে দিয়ে ছিলেন তাতে সেন মশায়ের পক্ষে কমিটি পরিচালনা করা সত্যই অসম্ভব ছিল। বেশ ভেবে চিন্তে অতি উত্তম ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। তার পরিণামে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে নামে জনতা দল আছে, কিন্তু জনতাদলের রাজনৈতিক স্থিতি প্রায় শূন্যমার্গে বিচরণশীল। ভাগ্যের পরিহাস ইহাকেই বলে। চন্দ্রশেখর আজ অখ্যাত সলিলে নিমজ্জমান—উদ্ধারের আর কোন আশা বা অবকাশ নেই। প্রবীণ গান্ধীবাদী পশ্চিমবঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনতা নেতা প্রফুল্লসেনকে ইন্দিরার একজনের বশংবদ তরুণ তুর্কি নেতা চন্দ্রশেখর অ্যাসেস্ (Assess) করতে বা করার সময়ে যাদের ঘনিষ্ট মনে করে পরামর্শ নিয়েছিলেন তারা চন্দ্রশেখরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে নিজ নিজ রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও সহজে জনতার শীর্ষারোহনের পথ তৈয়ারী করার আনন্দে তাঁকে বোধ হয় প্রতারিত করেছিল—ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গে জনতার ভরাডুবি. এখন আর ছেড়া চুলে খোঁপা বাঁধা সম্ভব নয়। প্রফুল্লসেন আর জনতায় ফিরিতে চান না এবং বোধহয় ফিরিতে পারিবেন না—কারণ চন্দ্রশেখরের মতে তার দলহীন গণতন্ত্র" পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে এক অভিনব সাড়া জাগিয়েছে—চন্দ্রশেখরের ধারণা, বোধহয় "গান্ধীবাদ" সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করে, তাই প্রফুল্লদার এই বিরাট সাফল্য যদি তিনি অন্ততঃ ছয় মাস সময়, নির্বাচনের আগে পাইতেন তবে নিশ্চয় তিনি পশ্চিমবঙ্গে সকারের নির্বাচনে সি, পি, এমকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম হতেন। তাঁর ডাক জনতার কানে পৌঁছেছে—দুঃখের বিষয় জনতার শীর্ষ নেতা বা জনতা দলের কানে পৌঁছায় নি—কি নির্মম সত্য। জনতা সভাপতি চন্দ্রশেখর আজ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু এত দেরী হয়ে গেছে যে সে ভুল শোধ করার আশা অতি ক্ষীণ, বোধ হয় এখন ভুল স্বীকার সত্ত্বেও তার সংশোধন সুদূর পরাহত। এখন তিনি কেন্দ্রীয় নিষ্কামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্রকে ধরেছেন—যেমন করেই হউক প্রফুল্ল সেনকে দলে ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রতাপচন্দ্র আবার শ্রীমতী আত্তা মাইতি ও দিলীপ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলে মিলে প্রফুল্লসেনকে বোঝানোর কাজে ব্রতী হতে রাজি হয়েছেন। উপরন্তু প্রতাপবাবু পশ্চিমবঙ্গের জনতা দলের এম, পি ও এম, এল, এ দের নিয়ে বৈঠক করার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছেন।

যদি প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কিছু আশার আলোক পরিদৃশ্যমান হয়, তবে চন্দ্রশেখর পশ্চিমবঙ্গ জনতা দলের ব্যাপারে যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার, প্রফুল্লবাবুর হাতে তুলে দিতে এবার সম্মত। এমন কি প্রফুল্লবাবুর যান রা থা র জন্য রাজ্য জনতা দলের কার্য্য নি র্বা হ ক সমিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তনেও তিনি রাজি। এক কথায় প্রফুল্ল সেন যে পন্থা ও মত পোষণ করবেন, রাজ্য দলে তাহাই গ্রহণীয় হবে। ভবিষ্যতে চন্দ্রশেখর প্রফুল্ল সেনকে আর অপমান করতে সাহস করবেন না যেরূপ তিনি অতীতে বিধান মিত্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে করেছিলেন। চন্দ্রশেখর দেখে শেখার লোক নন—ঠেকে শেখার কচিবাচ্চা। এত করেও এ রাজ্যে জনতা দল শেষ পর্য্যন্ত খোপে টিকিবে ত? জনতা সভাপতি একের পর এক ভুল করেছেন, তাই তাঁর নিজের দলের মধ্যে তাঁর নেতৃত্ব কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে, বোধহয় শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হতে পারে; যদিও তিনি পদত্যাগে একান্ত নারাজী। সংবাদে প্রকাশ গত ৩রা জুন '৭৮ তিনি সাংবাদিকদের কাছে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করে বলেন "জনতা দলের জাতীয় পরিষদ সাংগঠনিক নির্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত, বর্ত্তমানের কার্য্য নির্ব্বাহকদের কাজ চালিয়ে যেতে নির্দ্দেশ দিয়াছে। কারণ, নির্বাচনের আর তেমন দেরী নাই"। তিনি আরো বলেছেন, "জাতীয় পরিষদ জনতা মন্ত্রীদের ও সদস্যদের ঘন ঘন পরস্পর বিরোধী বিবৃতি না দিয়ে নিজ নিজ কর্মে ব্রতী থাকতে নির্দ্দেশ দিয়েছে; কিন্তু তথাপি তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে মন্ত্রীরা দলের নির্দ্দেশ বেমালুম করেই চলেছেন"। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিংহের বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন তাঁর বিবৃতির বিরুদ্ধে আমরা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছি না। এটা

একটা বিশেষ ব্যাপার"। তিনি আরো বহু উক্তি সাংবাদিক দের কাছে করেন যার মূল কথা মনে হয় এখন বলে তাদের রয়েছে—এ তাদের রোধ করার শক্তি, তিনি নিজেই পক্ষপাত দুষ্ট বলে হারিয়েছেন। আমরা জানি তার ঘনিষ্ট জনতামহল শুরুতেই উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রসর হয়ে, শেষে চরণসিংয়ের লাপটে রামমনোহরকে সে আসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এবারে আস্থা ভোটের ব্যাপারে চন্দ্রশেখর ও রামধন দুই-জনেই রামমনোহরের বিরোধী পদচ্যুতমন্ত্রী সত্যপ্রকাশ মালব্যের পিঠ চাপড়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম—এবারেও চন্দ্রশেখর ও রামধন, চরণসিংয়ের কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হন। সেই জন্যই কি দল-নেতার নির্দেশ চরণসিংয়ের উপর প্রযোজ্য নয়? চন্দ্রশেখর সত্যই নিজের দোষে ও নিজের রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতায় উত্তর প্রদেশে মোক্ষম হার স্বীকারে বাধ্য হয়ে চরণসিংয়ের ব্যাপারে আর বীরত্ব দেখাতে চান না। দলের সভাপতি যেখানে এরূপ একজন ক্লীব এবং দলের মধ্যে যাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রায় শূন্যের কোঠায়—তাঁর আর যারে যারে উত্তর প্রদেশের লৌহ-মানব চৌধুরী চরণ সিংয়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার সাধ কেন? সাধ্য যেখানে নাই—সেখানে সাধ যত প্রবল হউক না কেন, তাকে সংযত করতে হয় এ কথা কি চন্দ্রশেখর জানতেন—না।

সংবাদে প্রকাশ জনতা সংসদ সদস্য সুব্রহ্মণ্যম্ স্বামী পাটনায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ৬ই জুন '৭৮ তারিখে বলেন—জগজীবন রাম সম্প্রতি লন্ডনে গিয়ে বলেছেন "হরিজনদের উপর যে অত্যাচার চলছে তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ারই কথা। চরণ সিংও কৃষি সংস্কার নিয়ে অনেক কথা বলেছেন আর বিদ্যু পট্টনায়কের আপাতত কাজ হলো নৈনতোষের রাজনীতি করা। স্বামী বলেন, জনতা নেতৃত্বের দফতাটা হল—অনেক নেতা, তাঁদের চিন্তাধারাও অনেক রকমের আর সেই চিন্তাধারার মধ্যে সংগতি নেই—তাই তিনি জগজীবন রাম, চরণসিং ও বিদ্যু পট্টনায়ককে পরামর্শ দিয়েছেন—বৃথা বাক্য ব্যয় না করে তাঁরা নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজ নিজ চিন্তাধারার রূপ দিয়ে নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন—তথা নিজ নিজ রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন। ডঃ স্বামী আরো বলেন,—মোরারজী দেশাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আস্থা ভোট নিতে হবে বলে যাঁরা চেঁচাচ্ছেন, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। দেশাই প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁর সততা সন্দেহাতীত এবং এই বেশী বয়সেও তিনি বেশ কার্যক্ষম। কিন্তু জনতার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজনারায়ণের দাবী ভিন্নরূপ—তিনি চান চন্দ্রশেখরকে নূতন করে সভাপতি নির্বাচিত হতে হবে। কারণ বর্তমান কর্ম পরিষদের মেয়াদ ১লা মে তারিখে শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ডেরও পুনর্গঠন দরকার। নেতৃত্ব বদল হওয়াও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। জয়প্রকাশের বিবৃতি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বলেন, এতে জনতা নেতাদের বড় চোখ খুলে যাওয়া উচিত। জয়প্রকাশ বলেছেন, কংগ্রেস যা করত, জনতাও তাই করছে। সংবাদে আরো প্রকাশ—চন্দ্রশেখর এবং পাঁচজন সাধারণ সম্পাদক, কার্য নির্বাহক পরিষদের গত বৈঠকে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তাঁদের বিরত করা হয় এ কথা জনতা সাধারণ সম্পাদক রবি রায় জানেন। উপরোক্ত সংবাদগুলি কি জনগণকে বিচলিত ও মর্মাহত করে না? জনতাদলের পদ্ধতি বিনষ্ট প্রায়। কাজেই সাধারণ মানুষ যারা লোকনায়ক ও জনতা নেতাদের কথায় ও নির্বাচনী ইস্তাহারে, প্রাক্ নির্বাচনকালে বিশ্বাস স্থাপন করে জনতার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল, তারা যদি আজ লোকনায়ক ও জনতা নেতৃত্বকে প্রশ্ন করে যে 'ভ্রষ্টাচার, চোরাকারবার, ধেকাবী, মাগ্গি, জোতদার ও ধনিক-বণিক শ্রেণীর জুলুম, শিক্ষাক্ষেত্রে অনাচার, অবিচার ও অন্যায়, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি, অসম বণ্টন ব্যবস্থা, সরকার পরিচালিত শিল্পে অশান্তি ও লোকসান, বিচারের নামে প্রহসন, হরিজনদের উপর অত্যাচার ও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি। এ সব আজও দেশ থেকে দূর হচ্ছে কেন বা দূর করার কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে না? যদি প্রশ্ন করে

লোকনায়কের প্রথম সাংবিক বিপ্লবে জনতার ক্ষমতালাভ এবং দ্বিতীয় সাংবিক বিপ্লবে ভারত বা জনতার স্বর্গ লাভ অথবা গদালাভ হলে কে বা কোন দল তখন ভারত শাসনের অধিকার পাবে? যদি শ্রীমতী গান্ধী আর একবার পুনরায় ক্ষমতায় আসেন, তখন জয়প্রকাশজীর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে কি? তা যদি হয়, তবে তাঁর সকল কল্পিত সাধু প্রচেষ্টা পুনরায় বানচাল হয়ে যাবে না কি? তিনি সর্বোদয় নেতা ছিলেন, সম্পূর্ণ রাজনীতি বিবর্জিত হঠাৎ কেন রাজনীতির পঙ্কিল পরিবেশে নিজেকে নিমজ্জিত করলেন? কি তার উত্তর? কেনই বা জেনে শুনে এই ভ্রান্ত অবরোহন? তিনি ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বকালে শ্রীমতী গান্ধীকে যে সব অনাচার, অবিচার ও ভ্রাষ্টাচারের সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখে ছিলেন, তার কত জনতা দলের রাজত্বকালে তার কি কোনও সুরাহা হতে দেখেছেন? ইতিমধ্যে প্রায় পনের মাস গত হল, কিন্তু জনতা যে তিমিরে সেই তিমিরে। জয় প্রকাশজীও এখন বুঝতে পারছেন যে অবস্থা ক্রমশই ঘোরাল হয়ে আসছে। তিনি ঈশান কোণে ঘোর ঘন ঘটার অর্থাৎ প্রথম স্তরের সংকেত পাচ্ছেন সর্বাত্মক বিপ্লব সম্বন্ধে জয়প্রকাশজীর মতে—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাবগত বা বুদ্ধিগত শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবকেই তিনি বুঝেন। তাই জনগণ যদি আজ প্রশ্ন করে যে—হে লোক নায়ক! তব সৃষ্ট জনতাদল উক্ত সাতটি বিপ্লবের মধ্যে কোনটি সাধন করার কাজ হইতে জনতাকে রেহাই দিবে? দুঃখের বিষয় জনতাদল তার অর্থনৈতিক নীতি বা কার্যক্রম আজও স্থির করিতে ও তাহা রূপায়িত করিতে পারিল না। এভাবে আর কতদিন জনগণ অসহনীয় দুঃখ-দারিদ্রের বোঝা বহন করতে পারবে? সবেরই একটা সীমা আছে। ন্যায় নীতির বাণী পরিবেশন যত সহজ বোধ হয় সেই প্রার্থিত ন্যায় ও নীতির বাস্তব রূপায়ণ তত কঠিন। তাই জনতাদল ও তার সমর্থকরা যত গজরাচ্ছে তত বরষাচ্ছে না—কেবল ফিরিস্তি সার।

এদিকে সংবাদে প্রকাশ, রাজনারায়ণ কেন্দ্রীয় সরকারে মন্ত্রী চরণ সিংহের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন জনতাসভাপতি নিজেই দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন—'সর্বাত্মক বিপ্লবের' জন্য কর্মীদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে নারোয়ায় যে শিবির চলছে তথায় গত জুন চন্দ্রশেখর উপস্থিত ছিলেন—তাঁর এই উপস্থিতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও নীতি বিগর্হিত। তিনি আরো বলেন, জনতা পার্টির মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপনের জন্য উক্ত শিবিরের আসল উদ্দেশ্য, কংগ্রেস ও জনতা পার্টির বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে এমন একটি কর্মীগোষ্ঠীকেই তথায় ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে যারা পরবর্ত্তিকালে 'তৃতীয় শক্তি' হিসাবে পরিচালিত হবে এবং পরিচিতও হবে। রাজনারায়ণ জানতে চান চন্দ্রশেখর কি ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে জনতা পার্টি বলে কোন দলের অস্তিত্ব এদেশে আর নেই—যার সভাপতি তিনি নিজে।

এই যেখানে জনতাদলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, যেখানে পরস্পরের উপর কেবল দোষারোপ, অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং ঈর্ষা আর সর্বোপরি একে অপরকে ছোট করার আপ্রাণ চেষ্টা, সেখানে জনতাদলের সর্বনাশের আর কত দেরী? জনতা ভেঙে খান্ খান্ টুকরা টুকরা হয়ে অচিরে ক্ষমতাচ্যুত হবে বলে আশঙ্কা হয়। এই সব অসঙ্গতি, বিভেদ, বিবাদ অবিশ্বাস ও স্ব-স্ব প্রধান হওয়ার নীতি জনতার পনের মাসের রাজ্য শাসনকার্যকে ব্যর্থতায় পর্যবেসিত করেছে। ফলে মূল্য বৃদ্ধি, ভাক্তিভেদ, প্রশাসনিক চরম অযোগ্যতা, বেকারীবৃদ্ধি, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, চোরাবাজারী, দুর্নীতি অনাচার অবিচার অত্যাচার প্রভৃতির দাপটে জন-জীবন অতিষ্ট ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছে। জনগণ তাই দারুণ হতাশায় ভুগছে এবং জনতাকে সহ্য করতে আর রাজি নয়। বোধহয় এখন যদি পুনরায় লোকসভার নির্বাচন হয়, তবে জনগণ নিশ্চয় জনতা ছাড়া অন্য যে কোন দল বা বা অন্যান্য সকল দলকে ভোট দেবে। জনতা জনতাকে সত্যই আজ হতাশ করেছে। বিহারে সম্প্রতি পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে কংগ্রেসই

(১১ পাতায় দেখুন)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[আদালত অবমাননা ও কারাবাস]

বেলা সাড়ে দশটার সময় আমি কোর্টে হাজির হলাম। আদালত কক্ষ এবং প্রাঙ্গন বেইনী ক্রমবর্ধমান জনতায় ভিড়ে গমগম করতে লাগল। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় মিলে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল। ছাত্ররাও দলবদ্ধ হয়ে বিপুল সংখ্যায় আদালতে এসে হাজির হল। এই ছাত্রদলের মধ্যে এমন কয়েকজনকে লক্ষ্য করেছি যারা পরবর্তীকালে রাজকর্মচারীরূপে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বিচারে আমার প্রতি শাস্তিদানের রায় ঘোষণা করার পরেই যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে ছাত্রগণ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই রকম বিক্ষোভের ক্ষেত্রে যেমন হয়, এখানেও তাই হল। তারা বাড়ীঘরের জানালাগুলি ভাঙতে আরম্ভ করল এবং পুলিশের গায়ে ঢিল ছুড়তে লাগল। সেই বেপরোয়া যুবকদের মধ্যে একজন ছিল আশুতোষ মুখার্জি যিনি পরবর্তীকালে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলররূপে এত নাম করেছেন। আর একটি যুবক বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে আইন ভঙ্গ করেন। তার এক সপ্তাহের জন্য কারাদণ্ড হয়। প্রেসিডেন্সী জেলে আমি যে সেলে থাকতাম, তার মুখোমুখী বিপরীত দিকে একটি সেলে তাকে রাখা হয়। এই যুবকটি প্রতিদিনই সকাল বেলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করত এবং প্রণাম জানাত। পরে এই যুবকটি একজন সাব-রেজিষ্ট্রার হয়েছিলেন বলে আমি শুনেছি। এই ঘটনার ফলে তার জীবনে কোন অনিষ্টই হয়নি, সরকারেরও কোন ক্ষতি হয়নি। এই সমস্ত ঘটনাকে বড় করে দেখানো এবং তার জন্য বাস্তবিক পক্ষেই যা নেয় এমন একটা অজুহাত খুঁজে বেড়ানোর মত ভুল প্রায়ই করা হয়ে থাকে। আজ কালকার দিনে কোন যুবক এই রকম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করলে সারা জীবনে তাকে আর সরকারী চাকরী পেতে হবে না বলে আমার ধারনা। সমান অধিকার দাবীর সংগ্রাম তখন সবে শুরু হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব তখন এখনকার চেয়ে কতকটা উদার ও কম নির্দয় ছিল। সুখের বিষয় সেই পুরানো দিনে ফিরে যাওয়ার মত কিছু কিছু লক্ষণ এখন প্রকাশ পাচ্ছে।

যাক্, হাইকোর্টের চারদিকের রাস্তার কথা ছেড়ে এখন আদালত কক্ষের কথায় আসা যাক। যে কক্ষে বিচারকগণ সমবেত হবেন সে কক্ষটি লোকের ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে গেল। মেঝেতে বা গ্যালারিতে এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা ছিলনা। আমাকে কৌঁসুলীর সঙ্গে কনুই দিয়ে ঠেলেঠুলে কোন রকমে পথ করে নিতে হল। তখন সময় সাড়ে এগারটা বেজে যায়। কিন্তু বিচারপতিগণ তখনও আদালতে আসেন নি। তারা প্রধান বিচার পতির কক্ষে নিভৃতে গোপন আলোচনায় রত ছিলেন। পরে আমরা জানতে পেরেছি কি বিষয় নিয়ে এই গোপন আলোচনা হয়েছিল। কি শাস্তি দেওয়া হবে তাই নিয়েই এক গভীর পরামর্শ চলছিল। বিচারকদের অধিকাংশই ছিলেন ইয়োরোপীয়। তারা আমাকে কারাদণ্ড দেওয়ার পক্ষপাতী। মিঃ আর্থার রথেনস্ত্র মিত্র চেয়েছিলেন কেবলমাত্র জরিমানা করতে। এই রকম একটা সংবাদ

বটে যায় যে আগের দিন প্রধান বিচারপতি তার বাড়ীতে ডিনারে তার সঙ্গে দেখা করে তথা বলেন এবং নানা যুক্তির অবতারণা করে তাকে অধিকাংশের সহিত একমত হতে রাজি করাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই গোপন বৈঠকে সেই চেষ্টাই আবার করা হয়। এই চেষ্টায় অন্যান্য বিচারপতিদের ব্যক্তিগত প্রভাবের চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু জাস্টিস্ মিটার তার মত পরিবর্তন করলেন না। তিনি ইতি পূর্বেকার টেলরের মামলায় প্রধান বিচারপতি তার বার্গেস শিকদ্ অভিমানাই যথেষ্ট শাস্তি বলে মনে করেছিলেন।

অবশেষে সাড়ে এগারটা বেজে গেলে পরে পাঁচজন বিচারপতি আদালত কক্ষে উপস্থিত হলেন এবং আসন গ্রহণ করলেন। প্রধান বিচারপতি তার সহ বিচারপতিদের অধিকাংশের পক্ষে বিচারের রায় পাঠ করলেন এবং রায়দানের কাগজের সঙ্গে এক টুকরো কাগজ সংযুক্ত করে—যা দেখলেই বোঝা যায় যে ওটা পরে প্রস্তুত করা হয়েছে—পাঠ করে শুনালেন যে তিনি এবং তার অন্যান্য সহ বিচারকগণ মিঃ জাস্টিস মিটারের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তার পরে জাস্টিস মিটার তার ভিন্ন মতের কথা পড়ে শুনালেন। এর পরে বিচারকগণ আদালত কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান এবং জনতাও আস্তে আস্তে আদালত কক্ষ থেকে চলে গেল।

এদিকে রাস্তায় তখন হাজার হাজার লোক জড় হয়েছিল। তাদের মধ্যে উত্তেজনা এমন কি ক্রোধেরও লক্ষণ দেখা গেল। আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদালতের দুয়ারে একটি কয়েদী গাড়ী প্রস্তুত ছিল। কিন্তু জনতার মধ্যে উগ্রভাবে দেখে আমাকে একটি প্রাইভেট গাড়ীতে করে বিচারকগন যে পথে আদালতে প্রবেশ করেছিলেন সেই পথ দিয়ে বাইরে নিয়ে এক খোয়াল পথে প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হল। জেল সুপারিন্টেনডেন্ট মিঃ লেরিমোর কারাগারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলেন। মিঃ লেরিমোর ছিলেন একজন সহৃদয় আইরিসম্যান। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল; কারণ আমরা দুজনেই কলিকাতা মিউনিসিপাল কমিশনারগণে একত্রে একই টেবিল ঘিরে বসে কাজ করেছি। সরকারী কর্মচারীর দায়িত্বের মধ্যে থেকেও বর্তমানে সম্ভব সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার তিনি আমার সঙ্গে করেছেন।

প্রেসিডেন্সী জেলে আমাকে যখন নেওয়া হয়, তখনও এটা জানা যায়নি যে আমাকে দেওয়ানী কাটকে রাখা হবে না ফৌজদারী কাটকে রাখা হবে। মিঃ লেরিমোর এ সম্পর্কে আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তিনি আগেই আমাকে জানিয়ে দেন যে যদি আমাকে ফৌজদারী কাটকে রাখার নির্দেশ আসে, তাহলে তিনি আমাকে একটি পৃথক সেলে রাখবেন এবং কয়েদীর পোষাক পরতে বাধ্য করবেন না। কিন্তু এই রকম কোন আর ঘটল না, কারণ আমাকে দেওয়ানী কয়েদীরূপে গণ্য করারই নির্দেশ এসে যায়। মিঃ লেরিমোর আমাকে দেওয়ানী কাটকে একটি ঘরের উপর তলায় বেশ ভাল জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই দিনই বিকেল বেলায় আমার বন্ধু কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. এল. গুপ্ত আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে ও তার সাধ্যমত কারাগারে আমার জন্য সুব্যবস্থা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

একথা বলতেই হয় যে কারাধিকারিকে কোন প্রকার শিথিল না করেই তারা বস্তুপক্ষ আমার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং মনোভাবের প্রতিও যথাযথ মর্যাদা দান করেছেন। আমাকে কখনও "ফাইলে" যেতে বলা হয়নি। প্রতিদিন বিকেলে কারাকক্ষের অঙ্গণে এই "ফাইল" করতে হয়। আমি ঐ সময় বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই যথেষ্ট মনে করা হত। বাইরে থেকে যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, তাদের সকলকেই দেখা করতে দেওয়া হত; এবং প্রতিদিন এই দর্শকের সংখ্যা হত কুড়িতে কুড়িতে। আমার চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামাদি যথাযথভাবে আমাকে দেওয়া হত। এই চিঠি-পত্র ও টেলিগ্রামের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে মিঃ লেরিমোর

আমাকে বলেন যে এজন্য তাকে একজন বিশেষ পিওন নিযুক্ত করতে হয়েছে। আমার স্ত্রী একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক মাননীয় রবার্ট নাইট তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা আমার কারাদণ্ডের নিন্দা করে পরপর কয়েকটি নিবন্ধ লেখেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ন্যায় ও সুবিচারকে সাহসের সহিত সমর্থন করেছিলেন। ভারতের জনগণও মিঃ রবার্ট নাইটের এই সৎকার্যের তারিফ করেছেন। তারা তার বিরুদ্ধে বর্ধমান রাজকর্তৃক আনীত এক মানহানির মোকদ্দমায় তাকে সাহায্য করার জন্য এক অনুষ্ঠান করেন এবং একটি অর্থ ভাণ্ডার খোলেন। সেই সভায় আমিও একজন বক্তা ছিলাম।

আমার কারাদণ্ডের খবর যে কেবলমাত্র কলকাতায় এবং আমার প্রদেশের জন-মনের উপরই গভীর রেখাপাত করে, তা নয়; সমগ্র ভারতের জন-মনের উপরও তা গভীর রেখাপাত করে। আমার কারাবাসের দিন কলকাতার ভারতীয় এলাকায় সমস্ত ভারতীয় দোকানপাট ও ব্যবসাকেন্দ্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ থাকে। এজন্য কেউ কোন নির্দেশ দেন নি বা কোন তরফ থেকে কোন রকম চেষ্টাও করা হয়নি। ছাত্ররা শোক প্রকাশ করল। কলকাতায় সভা, শোভাযাত্রায় বিক্ষোভ এত প্রবল ও বিরাট আকার ধারণ করে যে কোন হলঘরই এত লোকের জন্য স্থান দিতে পারেনি, কাজেই বাজারে বাজারেই এই লোক সমাবেশ হয়। এই সময় থেকেই খোলা জায়গায় জনসভা করার রেওয়াজ দেখা দেয়। এই সমস্ত বিক্ষোভ-সভা কেবলমাত্র সমাজের উচ্চস্তরের অথবা শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সাধারণ মানুষও হাজারে হাজারে এই সমস্ত জন-সভায় যোগদান করে। এই ঘটনা হিন্দুদের ভয়ানুভূতিকে আপ্লুত করে তোলে। এক হিন্দুদের বিরুদ্ধে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছে। আইনের দিক থেকে এ ব্যাপারের যে তাৎপর্যই থাকনা কেন (আর সাধারণ মানুষ সে সমস্ত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না) নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ, সত্য বুঝেই হোক বা ভুল বুঝেই হোক, মনে করলেন যে এটা একটা অপবিত্র কাজ করা হয়েছে। শিক্ষিত সমাজ নিষ্ঠাবানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন ঠিকই; কিন্তু তাদের প্রেরণা হল অন্য ধরনের। আষ্টিন্ নবিস তার নিজের বিচার বিভাগীয় কাজে নিযুক্ত থেকে অসঙ্গতভাবে ইলবার্ট বিল বিতর্কে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই কারণেই শিক্ষিত সমাজের মধ্যে উত্তেজনার তাপ-মাত্রা বেড়ে যায়। তারা আরও মনে করলেন যে মিঃ আষ্টিন্ মিটার টেলরের ব্যাপারে নজিরে যে অভিমানা হওয়ার কথা বলেছিলেন, তাই-ই যথেষ্ট ছিল। তাই তারা আমার এই দণ্ডাদেশের মধ্যে এক ঘৃণীয় মনোবৃত্তির গন্ধ পেলেন যা উচ্চতর আদালতের ঐতিহ্যের পক্ষে এক অশোভন ব্যাপার।

কেবল মাত্র বঙ্গভঙ্গ সংশোধনের দাবীতে যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল সে আন্দোলন ছাড়া ১৮৮৩ সালের এই আন্দোলনের মত আর কোন আন্দোলন আমার সারা রাজনৈতিক জীবনে দেখিনি। ১৮৮৩ সালের বাংলার এই জনজাগরণ যেমন ছিল নির্ভেজাল তেমনই তা ছিল ব্যাপক। সমস্ত বাংলাদেশকে তা একেবারে ছেয়ে ফেলল। আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে এবং হাই-কোর্টের বিচারের প্রতিবাদকল্পে প্রায় প্রত্যেকটি সহরে জন-সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনমত এতপ্রবল আকার ধারণ করে যে কোথাও কোথাও সরকারী কর্মচারীরাও সেই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সেজন্য লাঞ্ছনাও ভোগ করেন। কিন্তু এই বিক্ষোভ একটা সাময়িক, অস্থায়ী বিস্ময়কর ঘটনা ছিল না। তা প্রদেশের জন-জীবনের উপর স্থায়ী দাগ রেখে যায়।

কোন এক বড় ঘটনাকে উপলক্ষ করে একবার যদি জন-মানস জাগ্রত হয়, তাহলে তা সব দিকেই প্রকাশ লাভের জন্য ছটফট করতে থাকে। তা প্রকাশ পেতে চায় সুমধুর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়, সংবাদপত্রের পাতায়, বক্তৃতা মঞ্চের আবেগ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় এবং নানা নতুন কর্মোদ্যম ও প্রয়োগের মধ্যে যা দৌলিকতা ও সাহসিকতার অন-

(চলবে)

লঙ্কা দাহন

শ্রীমতী ভূষণ সেন

"অনন্তর হনুমান এক গৃহের উপর থেকে অন্য গৃহের উপরে এবং বহু প্রাসাদ ও উদ্যানে অগ্নি বিস্তার করে বেড়াতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির ভবন দগ্ধ হল কিন্তু হনুমান বিভীষণের গৃহ ছেড়ে দিলেন।"—

রামায়ণ।

•

"কে বলেছে জনতাদল ভেঙে পড়েছে? একদম বাজে কথা।"

স্থান স্যানফ্রান্সিসকো, কাল, ১০ই জুন ১৯৭৮। প্রবাসী ভারতীয়দের সম্বাবেশ। ভারতীয়দের প্রশ্নের উত্তরে মোরারজি যা বললেন, হতে পারে সেটা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস না করলেই বা কি? একে বিদেশ তার উপরে প্রকাশ্য জনসভা। ঐ রকম উত্তর তাকে দিতেই হবে। মোরারজি ভালো করেই জানেন প্রবাসী ভারতীয়রা কিছু খান খান না। তারা কর্মিষ্ঠকর্মা মানুষ, নইলে এই দূর বিদেশে, কঠিন প্রতিযোগীতার মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন না। ভারতের রাজনৈতিক সঙ্কটে নিলিপ্ত থাকবার মানুষ নন তাঁরা, প্রমাণ পাওয়া গেছে এমারজেন্সির সময়। ইদানীং সারা দুনিয়ার মানুষ শুনছে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বেঁটে কাটানো ধাপাধাপি। দেখছে তাঁর 'চাট' ছোঁড়ার বহর। ঠিক মত লাগলে একটি ধাক্কেই 'জনতা'র গাড়ীখানা গুঁড়ো হয়ে যাবে। তাই সকলকে আশ্বস্ত করতে হয় মোরারজির, নিজে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।

ধাপাধাপি করা আর কুস্তির প্যাঁচ মারা, এটা আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক কাজ কর্মের ষ্টাইল। ষ্টাইলটি বিকসিত হয়ে উঠেছে ইদানিং। চার বছর আগে, একটি নাটকীয় মুহূর্তে হয়েছিল আজকের গল্পের আরম্ভ।

"আরে মশায়, আপনি আবার আমার খাদের হলেন কবে?"—সেদিন টেলিফোনের রিসিভার তুলেই চমকে উঠেছিলেন চৌধুরী চরণ সিং। গলার স্বরে মানুষটিকে চিনে নিতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয়নি। বিস্মিত হয়েছিলেন, রাগও কম পান নি। সেই সময়ে রাজনারায়ণ তাঁকে সরাসরি ফোন করলেন, দেখলেও কেউ বিশ্বাস করতো না। দুজনের এমনই সম্পর্ক। তার উপরে একেবারে খাদের। এতদিন তো নাম শুনলেই দাঁত কড়মড় করে উঠতেন। নতুন নামকরণ করেছিলেন 'দেয়ার সিং'। তখন রাজনারায়ণ ছিলেন সি বি গুপ্তের চাকর বাজনাদার। আর চৌধুরী ছিলেন তাঁর এমিনিমং ওয়ান।" আজ ভিগবাজি খেয়ে একেবারে চরণ সিং এর সেবক হয়ে বসলেন যে, বিষয়টা কি?

তখন মনে পড়ল; রাজ্যসভার কে কে বিড়লা নির্বাচন প্রার্থী, প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়েছেন রাজনারায়ন। বিড়লা ইন্দিরার বন্ধু অতএব তাঁর শত্রু। রাজনারায়ণ সি বি গুপ্তের বন্ধু, সমান পরিত্যাজ্য। এর বেশী এতদিন আর চিন্তা করেন নি চৌধুরী। তবে কি বিপাকে পড়ে সমাজতন্ত্রী রাজনারায়ন অবশেষে নত হয়ে 'কুলাক' শ্রেণী চরণ সিং এর সহায়তা প্রার্থী হলেন? তাই যদি হয়ে থাকে অতি উত্তম সুযোগ। একটা প্রবাদ আছে না "কাটা দিয়ে কাটা তোল!" চৌধুরী উঠে বসলেন।

ফোনে উত্তর দিলেন, "দেখা করতে আসছেন, তার আর কথা কি? আপনি আসতে চাইলে কথতে পারে, এত বড় পালোয়ান কে আছে?"...সেই ১৯৭৪ সাল থেকে রাজনারায়ণ চৌধুরী চরণ সিং এর খাদের। নেতা তিনি নন, কোনদিন হতেও চান না। তিনি চিরদিন সেবক,

হনুমানজীই তাঁর জীবনের আদর্শ। জীবনের আরম্ভে তিনি ছিলেন গুরুজী রাম মনোহর লোহিয়ার খাদেম। তাঁরই পায়ের কাছে বসে নেহরু বিরোধী সরকার বিরোধী বুলি মুখস্থ করতেন। আসল মার্কসইজমের পাঠ সুরু করার আগেই অকালে গুরুজীর দেহান্ত হয়ে গেল। মনের দুঃখে তিনি সমাজতন্ত্রীদল পরিত্যাগ করে 'লোহিয়া হেটাও' গুরুজীর খাদেম হয়ে বসলেন। তাঁর নিজের কিছু বলতে দুনিয়ায় কেউ নেই। দুচারজন সাঙ্গ পাঙ্গ থাকে, তিনটা পাটকেলটা ছোড়ে, উপদ্রব করে। কাগজে বড় হরফে নাম ছাপা হয়, আর তা হলেই টাকা পয়সার অভাব হয় না। যত কিছু ওঁড়াই দেখেন রাজনারায়ণের, উদ্দেশ্য ঐ কাগজের প্রথম পাতায় নাম ছাপানো।

যখন সি বি গুপ্তের সেবক ছিলেন তখন রাজনারায়ণের মাসিক খরচ ছিল দশ হাজার টাকা। লক্ষ্ণৌর বিধানসভা হোষ্টেলে থাকতেন, সঙ্গে থাকতো একজন ঠাকুর, দুজন চাকর, গা ডলবার জন্য একজন পালোয়ান, একজন হিন্দি টাইপিষ্ট, একজন হিন্দি শর্টহ্যাণ্ড রাইটার, একজন ইংরাজি টাইপিষ্ট [আংরোজি-হঠাও তখনো সম্পূর্ণ হয়নি] এবং কিছু সাঙ্গো-পাঙ্গ। মাসে অন্ততঃ দশটির আকাশে উড়তেন, তিন চারশ লিটার পেট্রল পুড়তেন গাড়ীতে। এক হাজার টেলিফোন কল, তার মধ্যে পঞ্চাশটি ট্রাঙ্ক। যোগ করে দেখুন কত হয়। নতুন কিয়াট গাড়ীখানা গুপ্তজীর উপহার। শান্তিভূষণকে ইন্দিরার বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলায় গুপ্তজীই নিযুক্ত করে-ছিলেন। গুপ্তজীর খাদেম হওয়াতেই পরিচয় হয়েছিল মোদী গ্রুপ, জয়পুরিয়া গ্রুপ ও মোহন গ্রুপের ধনপতিদের সঙ্গে। তাঁরাই রাজনারায়ণকে বিড়লার বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন, রথির চালতে লাগলেন। ইদানীং সি বি গুপ্ত রাজনীতির অস্তাচলে চলে পড়েছেন শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, বুকের ভিতর pace maker, তাই অনেক ভেবে চিন্তে রাজনারায়ণ গুপ্ত-হেটাও চরণ সিংয়ের খাদেম হয়ে বসেছেন।

প্রধানমন্ত্রী যে জনতাদলের ভাঙ্গনের সম্ভাবনাকে সেদিন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, ঘুণাক্ষরে ভেবেছিলেন এগুলো রাজনারায়ণের কাগজের প্রথম পাতার নাম ছাপাবার কৌশল, আর কিছু নয়। বিধানসভা নির্বাচনে হারবেরিলী কেন্দ্রের সব কটি আসন জনতা'র হাত থেকে বেড়িয়ে গেল, সেই লুপ্ত সম্মান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা। ঘুণাক্ষরে চরণ সিংএর রোগজর্জরিত অসহায় অবস্থা দেখে ভেবেছিলেন এইবার রাজনারায়ণ 'চরণ-হেটাও' বাবুজির খাদেম হয়ে বসলেন, তারই পূর্বাভাষ এই মেঘগর্জন। শুধু রাজনারায়ণ নয়, জনতাদলের আরও অনেকজন প্রবীণ নেতা, নিজ নিজ পদ-মর্যাদা ভুলে প্রকাশ্যে দলাদলি সুরু করেছেন সেটাও দেশাই এর দৃষ্টি এড়ায়নি। রাজনারায়ণ নিজে যে সব বক্তব্য রাখছেন সেগুলি দলের একতা এবং শৃঙ্খলার পক্ষে মারাত্মক। দেশ পরিত্যাগের পরে ইদানিং যে সব খবর পেয়েছেন, তাতে দেখেছেন যে রাজনারায়ণ তার নিজের স্বাভাবিক বিচ্ছেদপন্থী বাহিনীকে ছাড়িয়ে গেছেন। তবু তাঁর Conviction এর মূলে এই বিশ্বাস ছিল যে মুখে উঠে যে যতই বেফাঁস কথা বলে-ফেলুন, জনতাদলের সকলেরই কিছু একযোগে মতির বিকৃত ঘটবে না।

আমরা কিন্তু ঘটনার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করে স্তম্ভিত না হয়ে পারছি না। মোরারজী দিল্লী ছাড়লেন আর অমনি রাজনারায়ণ দলের নেতৃত্ব পরিবর্তনের আইন সঙ্গত যুক্তি প্রচার সুরু করলেন। মনে রাখবেন তিনি একজন পাশ করা এডভোকেট, যদিও মামলা মাথায় কখনো কোর্টে যাননি। প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করে সভাপতি চন্দ্রশেখরের নাম উল্লেখ করে আক্রমণ করলেন [৫, ৬, ৭৮]। দুদিন পরে অন্য একজন জনতা নেতা তাঁর আক্রমণের Target হলেন। পরের দিন দলের Homogeneity সম্বন্ধে প্রকাশ্যে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। পরদিন বললেন চন্দ্রশেখরের দলপতি নির্বাচনটা আইন সঙ্গত হয় নি ; তার রাজনৈতিক কর্মধারা এবং উপরতলায় উঠবার কৌশল সমর্থন যোগ্য নয়। এখন তো প্রতিদিন একটি করে প্রেস কনফারেন্স ডাকছেন আর বহুরূপের 'পাটা'র প্যাচ দেখাচ্ছেন।

একমাত্র চন্দ্রশেখরই টারগেট নন। অন্যান্য প্রবীণ দেশ নেতাদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লেশ মাত্র শ্রদ্ধা নেই।

মোরারজীর জনতা সংসদীয় দলের নেতৃত্ব লাভ সম্পর্কে গর্ব করে বললেন, দেশাইকে নেতা নির্বাচনে আমিই তো সাহায্য করেছি। চরণ সিং নেতৃত্বের দাবি প্রত্যাহার করে চিঠি দিয়েছিলেন, সে চিঠিখানা জয়প্রকাশ ও কৃপালিনীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল কে? দেশাইয়ের যে সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সে কথাটি কখনই মুখ ফুটে বলে বসলেন না। শিকের তোলা রইল ভবিষ্যতের জন্য।

দেশাইকে গদীতে বসাতে গিয়েই তো জগজীবন রামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে অবনতি। তবে চরণ সিং সম্বন্ধে এখনো তিনি অতীব প্রদ্ধাশীল এবং কর্তব্য পরায়ণ। বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁর দল (অর্থাৎ লোদিয়া) কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছেন ১৯৬৮ সালে। আর চরণ সিং ছেড়েছেন ১৯৬৯তে। জনতাদলে আর যাঁরা যোগ দিয়েছেন, কংগ্রেস পরিত্যাগ করার গৌরব আর কেউ দাবি করতে পারেন না। এমন কি মোরারজীর কংগ্রেস ছাড়েন নি; কংগ্রেস [সং] নিয়ে বসে ছিলেন। চন্দ্রশেখর নিজ থেকে কংগ্রেস ছাড়েন নি। তাঁকে বিতাড়িত করা হয়েছিল।

জনতা দল থাকবে না লাট উঠবে স্থির করছেন জনতা দলের নেতৃবৃন্দ। তার পূর্বে চরণ সিং এর দেখা উচিত তার 'বাবুরা' যে হটকারী ও এলোমেলো পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরই স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে, সেটা কি অতিরিক্ত বেপরোয়া হয়ে পড়ছে না? তাঁর এই সেবকটির রাজনীতির হাইল খুবই ইতর। সেটা নতুন কিছু নয়। গৃহমন্ত্রী নীরবই বুঝবেন রাজনীতির রণাঙ্গনে দীর্ঘস্থায়ী জয়ের পক্ষে এগুলি মোটেও কার্যকরি হয় না: তিনি অসুস্থ, স্বাস্থোদ্ধারের জন্য সূর্যকুণ্ডে বিশ্রাম করছেন: এত সব কথা ভাববার ইচ্ছা বা ক্ষমতা আছে কিনা সন্দেহ। আজকের রাজনৈতিক পাশা খেলায় B. L. D. যারা পার্টনার সেই জনসংঘের নেতাদের কর্তব্য খুব পরিষ্কার। হয় তাঁরা রাজনারায়ণের মুখে লাগাম কষবার দাবি জানাবেন, তাকে শিষ্টাচারিতা শেখাবেন, আর তা যদি না পারেন, হতাশ হয়ে দেখবেন, তাঁদের চোখের সামনে দলের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুতগতিতে। পাহাড়ের গায়ে ধসের মত Chaos এর দিকে ছুটে চলেছে দেশ। তখন কে থাকবেন সভাপতি আর কে হবেন প্রধানমন্ত্রী, এসব প্রশ্ন হবে অবান্তর। আসল প্রশ্ন হবে, গণতন্ত্র থাকবে না করবে যাবে।

'জনতা' জনতাকে হতাশ করেছে

(নবম পৃষ্ঠার পর)

নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। পশ্চিমবঙ্গে 'জনতা' পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে গো-হারান হেরেছে। যতদিন যাবে ততই 'জনতা' ক্ষীয়মান হতে বাধ্য হবে, পরিশেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে লুপ্ত হবে—ইহাই জনতার শেষ পরিণতি বলে অনুমান হয়। ওড়িষ্যায় জনতাদলের শাখা সংগঠন, যুবজনতা সম্প্রতি শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর অনুগামী-দের উপর যে বর্বরোচিত প্রাণঘাতহীন আক্রমণ করে তার নিন্দা করার ভাষা আমাদের জানা নাই। তবে জনতা দলনেতাদের প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করে—ইহাই কি লোকনায়ক বাহিত বিশুদ্ধ জনতামার্কা গণতন্ত্র—না জরুরা-ভস্ম স্বৈরাচারের বাস্তব স্বরূপ? কি ভয়ঙ্কর ও নির্মম হত্যাভিযান ভুবনেশ্বর বিমান বন্দর হইতে কটকের পথে জনগণ সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করিল? ইন্দিরাগান্ধীকে হত্যা করিতে পারিলেই কি জনতাদল কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে বহাল তবিয়তে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে? কিছুতেই তা আর সম্ভব হইবে না। ইন্দিরার অভাবে ভারতে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হইবে এবং সেই অবসরে আশঙ্কা হয়, সামরিক বাহিনীর প্রধান গণরাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে অগ্রসর হবেন—যা কোনও রাজনৈতিক দলের বা ব্যক্তির কখনই কাম্য নয়। জনতাদল যদি যুবজনতাকে এখনই সংযত ও সংহত করিতে না পারেন, তবে অচিরেই সারা ভারত বিপন্ন হবে—বহুত্যাগ, ভিতিক্ষা নির্যাতন, কারাবরণ, আত্মত্যাগ ও ফাঁসির মঞ্চে প্রাণদানের ফলে কষ্টার্জিত ও জনগণের বহুদিনের আকাঙ্খিত স্বাধীনতা বিলিপ্ত ও ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হবে বলে আশঙ্কা করার যুক্তিসংগত কারণ আছে। ইন্দিরাজীর উপর বলপ্রয়োগের উক্ত ঘটনায় শুধু ভারত নয় সারা বিশ্ব আজ চকিত ও মর্মাহত, একথা জনতা নেতাদের স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক। ভবিষ্যতে এরূপ জঘন্যতম ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে রাষ্ট্রনেতাদের সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে সচেতন থাকা ও ইহা প্রতিরোধ করার মত মানসিকতা ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যাতে রক্ষিত হয় তার জন্য সচেষ্ট থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীকীরোদ দত্ত

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা যখন অনুষ্ঠিত হয় অনুশীলন সমিতির বহু বিপ্লবী কর্মী তখনও ফেরার ছিলেন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময় তাঁদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এদের মধ্যে কয়েকজন মামলাচলার শেষ দিকে এবং অব্যবহিত পরেই ধরা পড়েন। এই সকল বিপ্লবী কর্মীকে আসামী করে বরিশালের দায়রা জজ ক্যাম্বাইডের আদালতে এক পৃথক বিচারের ব্যবস্থা হয়। এই মামলা বরিশাল অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। মামলা আরম্ভ হয় ১৯১৫ সালের ১৯শে মে এবং রায় প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। আসামীদের মধ্যে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী পনের বৎসর, যতন ভৌমিক, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, রমেশ চৌধুরী ও খগেন চৌধুরী দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। হাইকোর্টে আপীল করলে প্রফুল্ল গাঙ্গুলী এবং চৌধুরী মুক্তি পান।

১৯০৮ সালের জুন মাসে বারী ডাকাতির পরে অমৃত হাজরাকে গ্রেপ্তার করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। তিনি কেয়ার ঘরে কলকাতা চলে আসেন। এখানে এসে ক্রমে তিনি চন্দন নগরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। সে যুগে চন্দন নগর থেকেই বিভিন্ন বিপ্লবী সংস্থায় রিভলবার সরবরাহ করা হত। চন্দননগর থেকে রিভলবার সংগ্রহ করাই অমৃত হাজরার উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে চন্দননগরে বোমা তৈরীর ভারও অমৃত হাজরার উপরে পড়ে। এ সম্পর্কে মতিলাল রায় বলেন, "১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমেই দৃঢ় হয় শশাঙ্ক ওরফে অমৃতলাল হাজরাকে পাইয়া এতদিন যে বোমা টিনের কৌটায় সিটরিক এ্যাসিড ভরিয়া তার জড়াইয়া ফসফরাস ক্যাপের সাহায্যে অত্যাচারীর প্রাণনাশের জন্য ব্যবহার করা হইতেছিল অতঃপর তাহা কাঁচ আবরণে নির্মাণ করার সুযোগ হইল। টিনে বিদীর্ণ হওয়ায় যে ফলনাশ হইত কাঁচ আবরণের ফোটে বিস্ফোরক বস্তুর বিদারণে এইরূপ বোমার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। এই কলের কৃতিত্ব একমাত্র শশাঙ্কেরই। ২৯১/১ আপার সারকুলার রোডে অমৃত হাজরা বাস করতেন। অনেক সময় এখানে বসেই তিনি বোমা তৈরী করতেন। ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বর এই বাড়ী তল্লাশী হয় এবং কিছু বোমা তৈরীর মাল মশলা ধরা পড়ে। সরকারী বোমা বিশেষজ্ঞগণ বলেন এখানকার তৈরী বোমাই দিল্লীতে হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টায় এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে বিদীর্ণ হয়েছে। তাঁরা বলেন সকল বোমাই একই কারিগরের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজাবাজারে ২৯৬/১ আপার সারকুলার রোডের বাড়ীটি তল্লাশীর পরে সেখানে বীরেশ দাশগুপ্ত, সারদা গুহ এবং চন্দ্রশেখর সে গ্রেপ্তার হন। মোকদ্দমার প্রাথমিক বিচার হয় আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিস্টার ডিকের আদালতে। এই সময় ১৯১৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর কালীপদ ঘোষ ওরফে উপেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী স্বাধীনতা ইস্তাহার সহ কলেজ ষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার হন। এরপর প্রায় দুই মাস পরে ১৯১৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী খগেন্দ্র চৌধুরী ধরা পড়েন। এদের সকলকে আসামী করে রাজাবাজার বোমার মামলা নাম দিয়ে এক মামলা সৃষ্টি করা হয়। নিম্ন আদালতের বিচারে সকলকেই দায়রা সোপর্দ করা হয়। দায়রার বিচারেও অতিরিক্ত জর্জ মিস্টার প্যাটন সকলকেই দণ্ড দেন। কিন্তু হাইকোর্টে আপীলে বীরেশ দাশগুপ্ত, সারদা গুহ, চন্দ্রশেখর সে, কালীপদ ঘোষ মুক্তি লাভ করেন। শশাঙ্ক ওরফে অমৃত হাজরার পূর্ব দণ্ড পনের বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডই বহাল থাকে। রায়ে তিনজন জজই একমত হয়ে বলেন, "শশাঙ্কই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান ব্যক্তি এবং তার হাতে নির্মিত বোমা ভারতের নানাস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।"

(চলবে)

Contd. from 2nd cover

Name	Address	Amount Rs.	Date
Ghosh Smt. Navarani w/o Late Nalini Kr. Ghosh	4/21/1A, Jahura Bazar Lane Calcutta-42	200	18. 10 75
Gupta Prabhat Chandra	7 Thakurbari Road, Cal-26	200	1 11. 77
Kar Suresh Chandra	BD 122 Salt Lake City Calcutta-64	200	1 4. 78
Lahiri Sailendra Karta	33/2 S K. Deb Road, Cal-48	200	1. 10. 76
Majumdar Inju Bhusan	Mahesh Choudhury Lane Calcutta-25	200	1 S. 77
Roy Rabindranath	6/2 Hayat Khan Lane Calcutta-9	200	29. 3. 74
Sanyal Bhabani	18 Rastragram Avenae Calcutta-28	200	1. 4. 78
De Sarkar Taranath	55 Ripon Street, Cal-16	200	1. 4. 76
Sen Gupta Nirmalandu	19A Banerjeepara Lane Calcutta-31	Pension previous sanctioned. Cancelled because of higher income	
Singh Sarwan	244 Lansdowne Road, Cal-29	200	30. 10. 76
	Dist—24 PARGANAS		
Bhakta Adityachandra	Vill Uludanga P.O. Maslandapur	200	1. 10 76
Bhattacharjee Sukhendra Bikash	180/5 Ashokenagar	200	7. 5. 74
Basu Mallick Barendra Nath	2 Jawpur Road	200	19 10 74
Nandi Smt. Nani Prova w/o Late Sukumar Nandi	2A Nilkanta Chatterjee St, Belghoria	150	10. 2 78
Pal Pabitra Mohan	19/5 Newlane P.O. Batanagar	200	1. 4 76
	Dist—HOWRAH		
Mukherjee Smt. Annapurna w/o Late Sankar Mukherjee	16 Shibgopal Banerjee Lane Salkia	200	4. 74

RgedNo. R. N .24912/71 Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

0/36 28 JUN 1978

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীশুভ চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতার—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমণীন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১৫ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০১

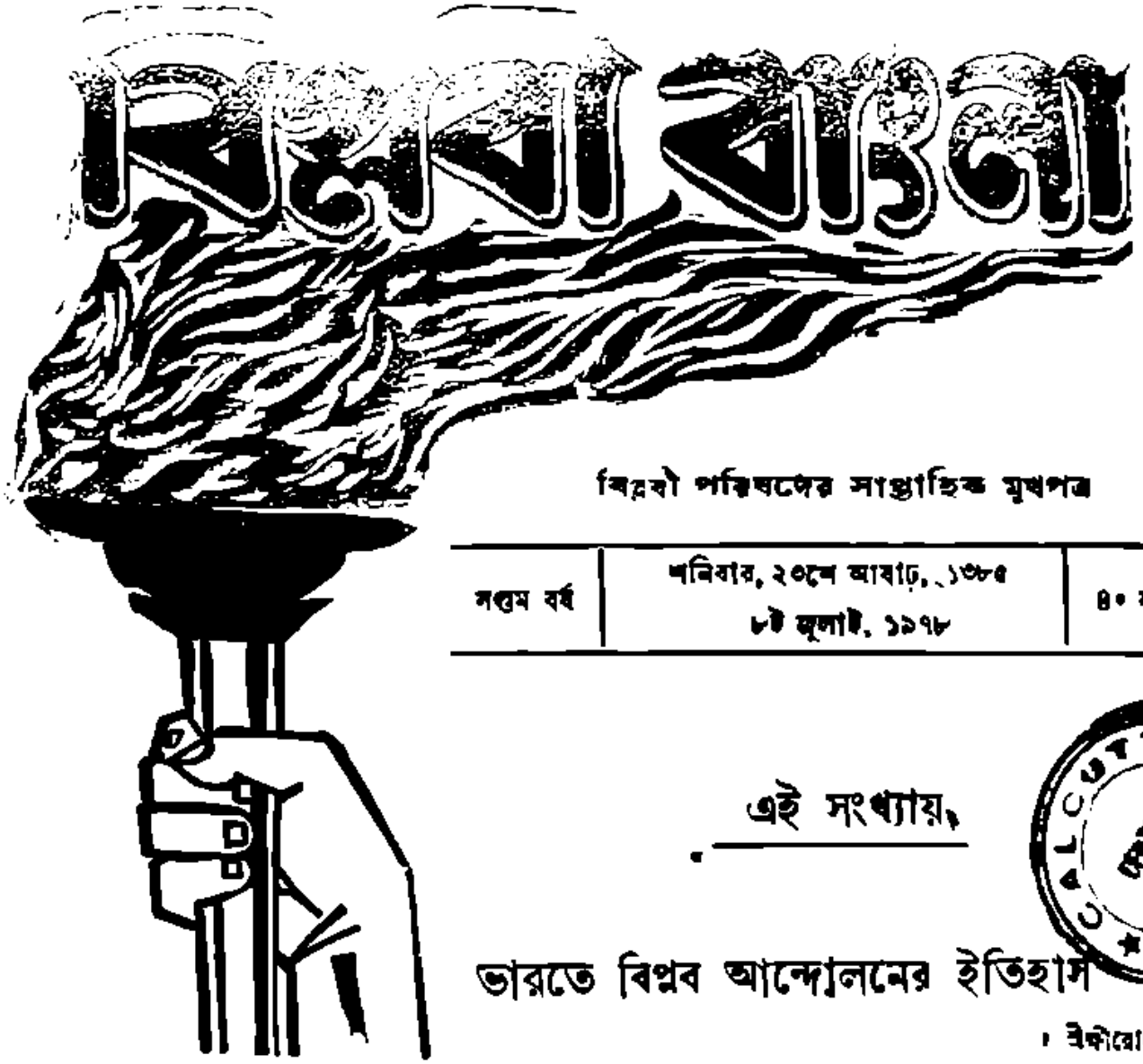

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ২০শে আষাঢ়, ১৩৮৫ ৮ই জুলাই, ১৯৭৮	৪০ সংখ্যা

CALCUTTA
NATIONAL LIBRARY

এই সংখ্যায়,

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। ঐকীরোদ দত্ত ॥

মহানায়ক রাসবিহারী

। শ্রী শিব নাথ ব্যানার্জি ।

যোগ সাধনা ও শ্রীঅরবিন্দের মৌন নির্দ্দেশ

। শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় ।

নাহি মানে হাল

। শ্রীসতী দুলাল সেন ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

ইতিহাস ও নেতৃত্ব

। কৌটিল্য ।

বিধার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানতঃ এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্ত গঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভব।

—রবীন্দ্রনাথ

যোগ সাধনা ও শ্রীঅরবিন্দের মৌন নির্দ্দেশ

শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

যোগশাস্ত্র যোগসাধনা ভারতীয় কৃষ্টিধারা বা কালচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। অতি প্রাচীনকালের যোগী যাজ্ঞবল্ক্য হরাত্রের প্রভৃতি ঋষির যোগসিদ্ধির খ্যাতি বেদ-পুরান উপনিষদে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান কালে- অর্থাৎ ইতিহাসের যুগে বুদ্ধদেব, গোরক্ষনাথ, এবং অতি—আধুনিক যুগে ত্রৈলঙ্গ স্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, রামদাস কাঠিয়াবাবা থেকে সুরু করে শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত বহু যোগীসাধকের জীবনী আলোচনা করে, নিছ যোগীদের অলৌকিক ও অসাধারণ কর্মতৎপরতা ও জ্ঞানের নিখুঁত বিশুদ্ধতার কথা আমরা অবগত হতে পারি। বিপ্লবী সমাজে, তথা রাজনীতিক্ষেত্রে এ-সব আলোচনার কোন উপযোগীতা আছে কি না, সে টুকু অংশটি পর্য্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। তাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

উপরে উল্লিখিত সিদ্ধযোগী ও যোগসাধকদের মধ্যে হয়তো বা শ্রীঅরবিন্দেরই একটি মাত্র নাম, যা ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে তথা বিপ্লবী সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত। তাই তাঁরই জীবনীর কিছুটা পর্য্যালোচনা এক্ষেত্রে খুব বেশী অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির যোগসাধনা একটি মূল অঙ্গ।

সেদিনও ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। এদেশের পাশ্চাত্য ধরনের নূতন রাজনীতি তখন আবেদন নিবেদনের পর্য্যায় ছেড়ে একটু দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে তখন সশস্ত্র বিপ্লববাদেরও সোড়াপত্তন হয়েছে। সেদিনকার সেই নিত্য বিপ্লববাদের অগ্রগামীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলেন।

এই কারাভোগের পরে অত্যন্ত অকস্মাৎ এই শ্রেষ্ঠ মনীষি, নেতা, রাজনীতি ত্যাগ করে যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পরম নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞাসহকারে এই সাধনাতেই নিরত থেকে গেলেন।

শ্রী অরবিন্দের জীবনের এই পটপরিবর্ত্তন সে সময়ে বহু লোকের কাছেই নিতান্ত দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে। এতে তিনি বহু নিন্দা ও বহু প্রশংসাই অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ করেন নি, কারো সাথে কোন তর্কেও প্রবৃত্ত হননি। শুধু মাত্র দুটি প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধে জনসাধারনকে উপহার দিয়ে তিনি তাঁর স্বনির্ব্বাচিত কর্মপন্থা, অর্থাৎ যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করে গেছেন। এই দুটি প্রবন্ধের নাম—"স্বাধীনতার অর্থ" এবং "আমাদের আশা"।

এ-দুটি প্রবন্ধের কথা আমরা পরে আসব। বর্ত্তমানে যোগসাধনা, এবং অরবিন্দ-জীবনের কোন মৌন নির্দ্দেশ তারই মাধ্যমে পাওয়া গেছে কি না, সেইটুকুই মাত্র আমাদের আলোচ্য।

আজ থেকে প্রায় ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে লেখা উপরোক্ত প্রবন্ধ দুটির থেকে আমরা শ্রীঅরবিন্দের তৎকালীন মনোভাবের কিছুটা অবশ্যই আঁচ করতে পারি। সেই ৬০/৭০বছর পূর্বে সে-গুলিকে অত্যন্ত অবাস্তব ও কল্পনা বিলাস, অর্থাৎ বর্ত্তমানকালের পরিভাষায় Utopian বলে মনে করাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল! এবং তাই-ই হয়েছিল; আজ কিন্তু এই দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরে—অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে, বিশ্বের, তথা ভারতের সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বহুতর পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। এ-সব পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। এ-সব পরিবর্ত্তন ও প্রগতির ফলে এদেশের বহু চিন্তাশীল লোকের মনে ভারতীয় কৃষ্টিধারা, বিশেষ করে যোগসাধনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সহনশীলতা এবং কেত্রবিশেষে কৌতূহল বা শ্রদ্ধার উদ্রেকও হয়েছে। পারি-

পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের প্রভাবে ভাবেরও এরূপ পরিবর্তন হয়, এ-কথা স্বীকৃত।

শ্রীঅরবিন্দ বহু গ্রন্থে ও প্রবন্ধে ভারতীয় কালচারকে বিশ্বের অন্যান্য ভাবধারার উপরে স্থান দিয়ে গেছেন, রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি অনেক বিদেশী মনীষিও অরবিন্দের জীবনীর পর্যালোচনা করেছেন, তাই এদেশে ও বিদেশে ভারতীয় ভাবধারার সম্বন্ধে বর্তমান কালে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে আর হচ্ছে। এ-সবের মূলে, শ্রীঅরবিন্দের পাশ্চাত্য জগতের রাজনীতি ত্যাগ করে ভারতীয় ভাবে ভাবিত হয়ে, জীবনের কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তনের ব্যাপারটি অনেকখানি কাজ করেছে এটুকু অস্বীকার করার কোন কারণ আছে বলে মনে করা যায় না।

আশৈশব নির্ভেজাল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কালচারের পরিবেশে পরিপালিত, পরিবেষ্টিত ও পরিপুষ্ট অরবিন্দ এমন কি, বাংলা ভাষায় লিখতে বা বাংলা বলতে অনেক বয়স পর্যন্ত তেমন দক্ষ ছিলেন না বলেই আমরা জানি। এ-হেন একটি ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত সহসাই যেন ভারতীয় যোগ পন্থায় দৃঢ় বিশ্বাস ও অনন্যমনতা নিয়ে পরম শ্রদ্ধাভরে সেই পন্থা অনুসরণ করে, সারা জীবনভর নিযুক্ত থাকলেন, এটা কী ভাবে সম্ভব হল, তা' আজও অনেকেরই বোধগম্য হয় নি।

অরবিন্দ কি বিপ্লবী ভাবধারার ও বিপ্লবী আন্দোলনের দায়ীত্বকে পরিহার করে আত্মসুখের সন্ধানেই পরিচালিত হয়েছিলেন? আমাদের তা' মনে হয় না, কারণ যোগপন্থা তপস্যা অর্থাৎ সুখত্যাগের পন্থা। এই সুখত্যাগকে ব্রত হিসাবেই পালন করে, পরিণামে সর্বত্যাগে তার সমাপ্তি করতে হয়, যোগসাধনার এইটিই ক্রম। এতে সংকীর্ণ আত্মসুখের কিছু আছে কি?

তবে কি যোগপন্থার মধ্যেই এমন কিছু আকর্ষণীয় আছে যা শ্রীঅরবিন্দের মত প্রতিভাকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল? এই লোকোত্তর প্রতিভার ও তাঁর কার্যকলাপের সমীক্ষা ও মূল্যায়নের হয়তো আজই উপযুক্ত সময়।

যোগ সাধনার সিদ্ধি যে পথে আসে,—সে-পথ হল অভ্যাস ও বৈরাগ্যের। পাশ্চাত্যদেশীয় ভোগবিলাসের শিক্ষা-দীক্ষায় মহাপণ্ডিত অরবিন্দ এই পন্থার মধ্যে এমন কি আকর্ষণের বস্তু পেলেন যার টানে তিনি যোগ পন্থাকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলে সিদ্ধান্ত করে জীবন পথে অগ্রসর হয়ে গেলেন?—

বৈরাগ্যের পথকে বিশ্বকবি পরিহার করেছেন। তিনি বলেছেন,—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি,—সে আমার নয়; অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।"—পরন্তু এ-কথা বলার পরেও, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—" ইত্যাদি। এতে কি মনে হয় না, যে, অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনের অনুসৃত পথ যদিও পৃথক-পৃথক, তবুও এদের মধ্যে অবশ্যই মূলগত কোন ঐক্য রয়েছে,—যে-ক্ষেত্রে উভয়েই উভয়কে শ্রদ্ধা করতে পারে?—সে-বস্তু কী?

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা স্পষ্টভাবে জানি, যে তিনি বিশ্বভাবে ভাবিত মহাকবি, কোন স্থান কালের সংকীর্ণ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও, তিনি দেশপ্রেমিক। ভারতের উন্নত ভাবধারা বিশ্বের অঙ্গনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দান করে সমগ্র বিশ্বের ও বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেম ও কল্যাণের সঙ্গীত সৃষ্টি করাই তাঁর জীবন-বেদ। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের পরম ও চরম আদর্শও যে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও আদর্শ থেকে পৃথক কিছু নয়,—শুধু পন্থাটিই পৃথক,—এ-টুকু হয়তো সর্বসাধারণের কাছে তেমন সুস্পষ্ট নয়,—বর্তমান লেখকের তাই বিশ্বাস। সর্বসাধারণের কাছে শ্রীঅরবিন্দ তাই দুর্বোধ্য।

এর কারণ,—যোগশাস্ত্র ও যোগসাধনার সম্বন্ধে সর্বসাধারণের স্পষ্ট জ্ঞানের অভাব—এবং যোগ সাধনার কর্মপন্থার অসাধারণত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ভুল ধারণা।—বহুপ্রকার অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অভ্যাসের ফলে যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। এ-ধারনাই লোকে সাধারণতঃ পোষণ করে।

কিন্তু সত্যই কি যোগসাধনার মধ্যে অস্বাভাবিক বা অসাধারণ কিছু আছে?—যোগপন্থা সম্বন্ধে অতি সাধারণ কিছু তথ্য অবগত না হলে এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে

না। কারণ,—বিদ্যা-তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত, কুসিদ্ধান্তেরই নামান্তর মাত্র।

সেই অতি সাধারণ তথ্যগুলি পরিবেশনের পূর্বে হয়তো, বর্তমান বিশ্বের মনুষ্য সমাজের অবস্থাগুলির কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করলে, বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝবার সহায়তা হবে। তাই, সামান্য একটু আলোচনা করতে হল।—

প্রথমতঃ, দেখা যাচ্ছে, প্রবহমান জড় বিজ্ঞানের এবং তার কারণ কার্য্য পরম্পরার অনুসরণ করে, আজ সমগ্র বিশ্বের মানব সমাজের কিয়দংশ গ্রহে-উপগ্রহে মানবজাতির বিজয়বার্ত্তা পৌঁছে দিয়েছে। যান-বাহন, সংবাদ আদান-প্রদান, নিত্যনৈমিত্তিক জীবন-যাত্রানির্বাহের উপযোগী যান্ত্রিক—ব্যবস্থা,—ইত্যাদির আর অন্ত নেই। বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া ও উন্নতির সুফলের কথা শতমুখে বললেও শেষ করা যাবে না। কিন্তু একটা সামান্য প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে অনুরোধ করা যায়।—প্রশ্নটা এই—বিশ্বের মনুষ্য-সমাজের শতকরা কতজন মানুষ এ-সব যান্ত্রিক আবিষ্ক্রিয়া ও উন্নতির সুফলের ব্যবহার করতে বা সুযোগ নিতে সক্ষম?—আর যাঁরা সক্ষম, এবং সমস্ত সুযোগগুলির পূর্ণ ব্যবহার করছেন, তাঁরা হাজারেও দশজন হবেন কিনা,—সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।—বাকীরা নয়শত নব্বুই জনই হয়তো নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সুদ্ধ নেত্রে চেয়ে তাঁদের করুণা ভিক্ষা করছে না কি?

বহু মনীষি ও মানব দরদীর দৃষ্টি এই প্রভেদ ও বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মানব সমাজের নানান অব্যবস্থাকে এর জন্য দায়ী করেছেন। অধিকাংশই বলেন, মানব-সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা, ও তৎপ্রসূত কাঞ্চন কৌলিন্যের ভাব-ধারাই এর মূল কারণ। কাঞ্চন কৌলিন্যের অধিকারীরা সেই কৌলিন্যের কিয়দংশও হয়তো ছাড়তে নারাজ হয়ে যে সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছেন,—তাতে বিশৃঙ্খলাটি দূর না হয়ে বরং বেড়েই চলেছে। অন্ততঃ যেখানকার সমস্যা সেখানেই আছে।

দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরের পার্শ্বে অথবা তাকে নানা উপায়ে উৎখাত করে' তার অধির উপরেই, কাঞ্চন কৌলিন্যে গৌরবান্বিত ব্যক্তির বহুতল অট্টালিকার আবির্ভাব আজ দৈনিক ঘটনার পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। —একটা সময় ছিল, যখন শিক্ষিত সমাজ এসব কাজে লজ্জাবোধ করত, অন্ততঃ একটা চক্ষু লজ্জার নামান্ত আবরণও তাতে থাকত। আজকাল এ-সব বালাই আর নেই,—বহুতল প্রাসাদের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব আজ দৈনিক বস্তু—এতে পৌরোহিত্য করতে বিশিষ্ট সমাজসেবী, সম্মানিত ব্যক্তি বা প্রধান অতিথির অভাব হয় না। এই পৌরোহিত্যে লজ্জিত হওয়া বহু-দূরের কথা, এটি নিতান্ত স্বাভাবিক ও গৌরবের ব্যাপার বলেই আজ সমাজে পরিগৃহীত হয়ে চলেছে।

কিছু কিছু মানব-দরদী গবেষণা করে চলেছেন, কোন আইনজ্ঞ বা রাজনীতিজ্ঞ আইনের ও রাজনীতির ফিরোতী আওড়াচ্ছেন, আবার কেউ কেউ সমাজতন্ত্রী শাসন যন্ত্র প্রস্তুত করতে এগিয়ে যাচ্ছেন, কেউ বা "One World"-এর দৌহাই দিয়ে সমগ্র জনসাধারণকে উপহার দিচ্ছেন, আবার কেউ বা সশস্ত্র বিপ্লবের ডাকাডাকি প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এ-সব হল, সমাজের মধ্যে চিন্তাধারার ও বিশৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত। বাস্তব জগতের বিশৃঙ্খলারই প্রতীক এই চিন্তাধারার বিশৃঙ্খলা।

এই বিশৃঙ্খলার ভামাডোলে নিজেদের অভিমতের ঢাক বাজিয়ে, এই হট্টগোলকে তুঙ্গে উঠাতে বহু মানব দরদী মনীষিই ইচ্ছা করেন না। কেউ কেউ এ সমস্যার সমাধানে পাশ্চাত্য ভাবধারার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে, ভারতীয় ভাবধারার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। ভারতীয় যোগ-সাধনাই এদের দৃষ্টি বেশী করে আকর্ষণ করছে বলেই বর্ত্তমান লেখকের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের মূল কোথায়, তাই বলছি।—

যোগশাস্ত্রও তার আধিকগুলিকে নিয়ে বর্তমানে পৃথিবীর নানান দেশে একপ্রকার কর্মতৎপরতা ও আন্দোলনের সূত্র-পাত হয়েছে শীঘ্রই হয়তো এ-সব কর্মচাঞ্চল্য একটি আন্তর্জাতিক রূপ নিতে পারে, এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে—একথা হয়তো কিছুটা নিঃসংকোচেই

পড়া যেতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানিতে তো আছেই, বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীণউড শহরেও একটি যোগাশ্রমে কয়েক শো ছাত্র-ছাত্রীও যোগাভ্যাস চালিয়ে যাচ্ছে বলে এদেশের কয়েকটি খবরের কাগজে সংবাদ বেরিয়েছে। এদেশী সংবাদ পত্রের কথাকে যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে বলতেই হবে, যে গ্রীণউডের বর্তমান যোগাশ্রম স্থাপন ও পরিচালনার মূলে রয়েছে ওদেশের লোকের প্রবল আগ্রহ। সেখানকার সাংবাদিকেরাও নাকি যোগ সাধনার সাফল্যের কথা ফলাও করে প্রচার করছে। দিনকতক আগে ঐতি দেব নামে একটি বাঙ্গালী মহিলা এখানে বিলাত থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর ধারণা ভারতের যোগসাধনার যে অমৃতরসের সন্ধান আজ পশ্চিমীরা পেয়েছে, তার কিছু অংশও যদি আজকের ভারতবাসীরা গ্রহণ করতেন, তাহলে দেশ অনেক উপকৃত হত। তিনি বলেন,—পুষ্টিকর খাদ্য এবং ভিটামিন ওষুধ না খেয়েও, সাধারণ সহজ জীবন যাপন করে, যোগাসনের দ্বারা অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। স্ত্রীলোকের রূপচর্চার ক্ষেত্রেও আসনের উপযোগীতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত।

এ সব কথার মধ্যে অত্যুক্তি একটুও নেই; এগুলি অতি খাঁটি কথা। সে বিষয়েও কোন সন্দেহের কারণ নেই। যোগাসনের উপযোগীতা নিটোল স্বাস্থ্য ও নিরোগীতা লাভের পক্ষে বর্তমান জগতে প্রায় সর্বজন স্বীকৃত হয়ে উঠেছে। এমন আরো অনেক বিষয়েই যোগসাধনার মধ্যে পশ্চিমীরা বহু প্রকার সুফল ও ব্যবহারিক লাভের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে, পেয়েছে এবং চর্চা করলে ভবিষ্যতেও পাবে। কিন্তু এ সব লাভই কি যোগসাধনার "অমৃতরসের সন্ধান?" এমন কি স্ত্রীলোকের রূপচর্চার ক্ষেত্রেও যোগাসনের উপযোগীতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে বলে শ্রীমতী দীপ্তি দেন যে কথা বলেছেন,—সেই টুকুই কি যোগসাধনার "অমৃত রসের সন্ধান"?—সে সন্ধান পেলেই কি আমাদের দেশ খুবই উপকৃত হবে?

যোগ সাধনার মোট আটটি অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই আটটির মধ্যে আসন অঙ্গটির অভ্যাসের মাত্র কিঞ্চিৎ স্বাদ পেয়েই কি যোগ সাধনার অমৃত রসের সন্ধান পেয়েছি বলে বাহু-তুলে নৃত্য করা যায়? আর, পাশ্চাত্য দেশীয়েরা আজ যোগ সাধনার অমৃতরসের সন্ধান পেয়েছে বলে সর্বাত্মক সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য করা যায়?—এ সম্বন্ধে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ সংশয়ের সৃষ্টি হওয়াটা মোটেই বিচিত্র নয়। তবে, ওরা অর্থাৎ পাশ্চাত্যেরা যদি সেরসের কিঞ্চিৎ সন্ধান পেয়েও থাকে, আর যদি সে রসের লোভে যোগপন্থার আচরণে অগ্রসর হয়,—তবে এই 'পরধর্ম' আচরণের ফল যে তাদের পক্ষে 'ভয়াবহ' হবে না, তার কোন গ্যারান্টি আমরা আজ পর্যন্তও পাইনি।—এ পরিণামের কথাই গীতায় আছে। আমাদের মনে হয়, ওরা, অর্থাৎ পশ্চিমীরা, আজ পর্যন্ত যোগ সাধনার যে দিকের একটু সন্ধান পেয়েছে, সে দিকটা হল যোগ বিভূতির। আমাদের কিন্তু ধারণা একটু অন্য রূপ। অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে অসাধ্য কাজও যোগ বিভূতির দ্বারা সাধ্য হয়,—এটুকুর সন্ধান ওরা মুখ্যভাবে পেয়েছে বলেই আমাদের ধারণা। যোগ সাধনাকে ওরা বিশেষ করে সার্কাস বা ভোজবাজীরই একটি বিস্তৃত সংস্করণ বলে ধরে নিয়েছে বলে মনে হয়। পশ্চিমী ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিতে এর বেশী কিছু ধারণা করাও সম্ভব বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

কিন্তু যোগশাস্ত্র বা যোগ সাধনার মুখ্যফল বিভূতি অর্জন করা নয়, এবং বিভূতির মাপকাঠিতে যোগী বা সাধুসন্তের বিচারও হয় না,—একথা গোড়াতেই বলে রাখা ভাল। পরে আমরা প্রকৃত মূল্যায়নের পদ্ধতির কথা বলব।—

সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ঝিনুকটা সমুদ্রের বিচার করতে গেলে, শুধুমাত্র সমুদ্রের সীমাহীন বিস্তার, তরঙ্গ ভঙ্গের নৃত্যকলা ও ভাসমান বস্তুগুলির লীলাখেলার বাহ্যিক বর্ণনা করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সমুদ্র মন্থন করে অমৃত-ভাণ্ডউদ্ধার করার বাসনাটি কল্পনা রাজ্যেই পর্যবসিত হয়ে পড়বে।

(চলবে)

ইতিহাস ও নেতৃত্ব

কৌটিল্য

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পুতুল হয়ে কাজ করলেন। কংগ্রেসই স্থায়ি হোক, বা অবস্থার চাপে পড়ে হোক, এই শ্রেণীটিকে বড় সিঁড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের বোধ হয় একটা বড় আশঙ্কা ছিল, পাঞ্জাব থেকে শুরু করে সমগ্র ভারতে যে হিংসাশ্রয়ী সামাজিক মনোবৃত্তির জঘন্য বিকাশ ঘটেছে, তাকে যদি বাড়তে দেওয়া হয় তবে ভারত নব-লব্ধ স্বাধীনতা-টুকু থাকবে না। ফলে উঁচু বাঁধের খাদলাতন্ত্র প্রধান হয়ে উঠলেন।

সেই খাদলাতন্ত্রীয় ঐতিহ্য চলতেই লাগল। এদের ক্ষমতা মানুষ বাইরে থেকে বুঝতে পারেনা।

ফাইল সর্বস্ব সরকারের ফাইলের অন্তরালে মন্ত্রীরাও চাপা পড়ে যান। এদিকে ইতিহাসের আর একটা দিকে ঘাটতি থেকে গেল। কংগ্রেস নেতৃত্ব এতদিন একটা অজুহাত নিয়েই আন্দোলন করেছে। ব্রিটিশ নেতৃবর্গকে দেশীয় সেনাবাহিনীর মনোভাব এরা জানত না। যে-হেতু এই শ্রেণীটির সঙ্গে তেমন কোন যোগাযোগ ছিল না। সেই হেতুই এই শ্রেণীটিকে Unknown Quantity বলে ধরে নিতে হবে। পক্ষান্তরে কংগ্রেস কর্মীদের শৃঙ্খলা, অনিয়ন্ত্রিত, সেনাবাহিনীর কায়দায় সংগ্রামী মনোভাব গড়ে তোলা হয়নি। কংগ্রেসের সাংগঠনিক দিকের এই দুর্বল স্থানটা থেকেই গেল। দেশ স্বাধীন হবার পর অথবা আগে একটা গৃহ যুদ্ধের ভূমিকা ইতিহাসে থাকে। যেহেতু কংগ্রেসের কোন প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী তখন ছিলনা, সেই হেতুই কংগ্রেস তেমনি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু আজ জড়িয়ে পড়েনি বলে, কাল যে জড়িয়ে পড়বেনা, ইতিহাসের এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বস্তুত সেই ভূমিকারই আবির্ভাব গত কয়েক বছর ধরে হয়েছে। আর এই সব গৃহযুদ্ধের ভূমিকার অন্তরালে বিদেশী শক্তির অদৃশ্য হাতের ছাপ থাকে। কংগ্রেস নেতৃত্ব ধর্মের নামে যে হিংস্র বিরোধ দেখেছে তাতেই হতচকিত। নেতৃত্বের এমন শক্তি ছিলনা যে, বিশাল ভারতের অভ্যন্তরীন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোকে নিজেদের কর্মীবাহিনী সংগ্রামে শায়েস্তা করে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ফেলে যাওয়া এক, আর আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রত্যক্ষ আঘাতের বিরুদ্ধে-প্রতি আঘাত সৃষ্টি করা আর এক। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার, স্বাধীনোত্তর যুগে যেসব রাজনৈতিক শক্তি কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, তারা কেউই গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংসা পন্থায় বিশ্বাস করেন না বা প্রয়োজনের প্রায় সত্যাগ্রহী। বাইরে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টির প্রয়োজনে জেলে উপবাস। ওপর তলাকার সাময় সত্যাগ্রহীর ভেতরে হিংস্রমনোবৃত্তিটা প্রচ্ছন্নভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে। গত বেল ধর্মঘট (১৯৬৯) এই দ্বৈতমনোবৃত্তির আদর্শ দৃষ্টান্ত। সাময়িক শান্তি মাত্র তাৎক্ষনিক পুলিশী ব্যবস্থার দ্বারা পাওয়া যায়। কিন্তু কংগ্রেসবিরোধী আভ্যন্তরীন শক্তিগুলি যদি বুঝতে পারতো, যে পন্থা তারা গ্রহন করেছে সে পন্থা তাদেরই চৌহদ্দির সীমানার মধ্যে থাকবে না। পুলিশকে দিয়ে যতগুলি করানো সম্ভব হবে ততই কংগ্রেস সরকার জনসাধারনের কাছে অপ্রিয় ও হেয় হবে। আর যে প্রানগুলো যাবে? তা গৃহযুদ্ধে অমন অনেকটি হয়েই থাকবে। ওসব লড়ায়ের কৌশল মাত্র। সেই লড়াইয়ের কৌশলে যাঁরা প্রান দিয়েছেন, যাঁরা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে, জাতীয় সম্পত্তি বিনাশ সাধন করেছেন তাদেরকে আজ অ-কংগ্রেসী সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করছে। দেশ প্রেমের এমন বিকৃত, ব্যাখ্যা। বিশ্বাস্তিকর ব্যবস্থাবোধ হয় কোন দেশে নেই। গণতন্ত্র এই বিকৃত ব্যাখ্যার জন্যই একদিন বিপদগ্রস্ত

হবেন। কারণ উত্তর প্রদেশ সরকার কম্যুনিষ্টদের পরিচালিত অন্তর্ঘাতমূলক কাজকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলে কখনই স্বীকার করবেন না। কারণ সেখানে জনসঙ্ঘ, বি. এল. ডি. সোসালিষ্ট পরিচালিত সরকার যদিও বাইরের পোষাকী নাম জনতা তাদের সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনকে কখনই গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলবে না। বরং বলবে গণবিরোধী আন্দোলন। এই পরিস্থিতিতে এক রাজ্য আর এক রাজ্যের বিরোধী হয়ে উঠবে। কেন্দ্র যদি দুর্বল থাকে এই বিরোধীতা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারবে না। কম্যুনিষ্ট পার্টি [সি. পি. এম.] ইতি মধ্যেই কেন্দ্রকে দুর্বল করার কাজে উঠেপড়ে লেগেছে। ক্ষমতা চাই, অধিক ক্ষমতা চাই। এমন কি ওঁরা (সি. পি. এম.) যে আইন পাশ করবেন তার ওপর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন যাতে দরকার না হয়—সেই মর্মে গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করতে হবে।

ভারতের মাটিতে আর এক ধরনের গৃহযুদ্ধের ভাব আসন্ন হয়ে উঠতো যদি মোগল, পাঠান, তুর্কীদের মত ইংরেজেরা এদেশের মাটিতে বসবাসের সিদ্ধান্তনিত। এদেশের মাটি তারা দখল করেছে সত্য কিন্তু এদেশের মাটিতে বসবাস করে একটি নোতুন ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজ সৃষ্টিকরা যাঁরা ক্ষমতায় অসীম বলীয়ান হবে। ভারতবর্ষে ইঙ্গ-ভারতীয় বলে পরিচিত যাঁরা তাঁরা খুব সামান্য স্থান ভারতে দখল করেন। তাছাড়া উপনিবেশ স্থাপন এবং সেখানে বংশ পরম্পরায় বসবাস এটা শ্বেতজাতি ইংরেজের মনে কোন কালেই ছিল না। তার কারণ বোধহয় ইংরেজেরা দেখেছে নব্য চিন্তাধারা, নব্য শিল্প সম্ভার এবং শিল্প বিপ্লব তাদের জন্মভূমিতে ঘটেছে। তাঁরাই এদেশে সেই চিন্তা কর্ম ও বিজ্ঞানের সন্ধান এনেছে। কাজেই এদেশের মাটি অন্য যে কারণেই আকর্ষনীয় হোক, নব্য বিজ্ঞান, নব্য চিন্তাধারার কারণেই আকর্ষনীয় নয়। তাছাড়া যদি ব্রিটিশ সৈন্যকে ভারতীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে খাড়া করিয়ে এক নোতুন ধরনের গৃহযুদ্ধের ভূমিকা ইংরেজ রচনা করতে পারত। কম্বোডী ইন্দোচীনে এই জাতীয় যুদ্ধ দুইয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু ইন্দোচীনে জাপানী যুদ্ধের ফলে ইন্দোচীনে ছোট ছোট জাতিগুলির মধ্যে যে সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের দেশের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে সে জাতীয় সশস্ত্র সংগ্রামী মনোভাব ছিল না। তারা অস্ত্রের ব্যবহার, যুদ্ধের গঠন শক্তি কি, তা জানত না। এই ইংরেজরা যদি স্থানীয় ইংরেজ হয়ে স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে লড়াইয়ে নামত তবে আজ আর একটি ফিলিপিন স্থান তৈরী হতো। এবং ইহুদিদের মত অতি দ্রুত তারা ফিলিপিন স্থানকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে পারতো। তার কারণ, সমগ্র পশ্চিম জগৎ ফিলিপিন স্থান। তখন হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান আন্তর্জাতিক রাজ্যের খানাখন্দে খাবি খেতো। ভারত ইতিহাসে এমন সম্ভবনা ছিল। এদেশে তুর্কী, পাঠান, মোগল যা করেছে ইসলামের নামে ইংরেজও সেই কাজ করতে পারতো ফিলিপিন ধর্মের নামে।

ভারতবর্ষের ভাগ্য ভাল, য়োরোপিয়ার ইতিহাস এখানে দেখা দেয়নি। সে ইতিহাস পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। তুর্কী, পাঠান, মোগলদের সেই ইতিহাসের ধারা যেন নিতে হয়েছিল। অর্থাৎ তারা যে সব পার্বত্য দেশ থেকে এখানে এসেছে সেখান থেকে ভারত সেইকালে যথেষ্ট উন্নত ছিল। মরুভূমির দেশের লোকেরা ভারতের শস্য-শ্যামল সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। কাজেই বসবাস করে, তাদের ধর্মকে হিন্দু সাধারণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে, একটি নোতুন সম্প্রদায়ের জগত সৃষ্টি করতে হয়েছিল। পাঠান-মোগলদের সম্বন্ধে সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা কেন বলা হয় বোঝা মুস্কিল। এক কাবুল শাহানশাহ বাবর মোগল-পাঠানদের রাজত্ব ভারতের চৌহদ্দির মধ্যেই ছিল। সাগর মেখলা ভারতবর্ষে, সাগর না পেরিয়ে তুর্কী, পাঠান, মোগলেরা এসেছে স্থল পথে। এককালে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে টিবেটো-বার্ম্যানগোলীয়ের আধিপত্য ছিল। তারা তখনও ইতিহাসের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আসেনি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলই তখন ইতিহাসকে নোতুন মোচড় দিয়ে দিল্লীর পথে নিয়ে এসেছে। তখন পর্বত ও পর্বতসঙ্কুল সড়কই ছিল ইতিহাসের সদর রাস্তা। আজ বহুকাল পরে কারাকোরামের

পাহ-চলা পথ গাড়ির চৌকের পথ হলো। এর পরিণতিতে ইতিহাসের নোতুন পত্রবিকাশ অনিবার্য্য। কোতারি-কায় মৃত্যু আর কারাকোরাম ভারতের কণ্ঠে নাড়ানীর মত লেগে থাকবে। যাক্ সে অন্যঅধ্যায়। আজ বড় প্রয়োজনে চর্চ্চ কার্জনের কথা মনে পড়ছে। দেশের শাসন ক্ষমতা অধিগত হবার পর কার্জন ও যে ভারতের নিরাপত্তার কথা ভেবেছে, একজন ভারতবাসীকেও সেই ভাবেই ভাবতে হবে। নিরাপত্তা, সে ভারতের নিরাপত্তাই হোক সেখানে কোন জাত ধর্ম্মের বালাই নেই। রাষ্ট্র নিরাপত্তা সব দেশেই, সব কালে একই ধরণের। অস্ত্রের বিবর্ত্তন ঘটে কিন্তু ভূগোলের পরিবর্ত্তন নেই।

ফরাসীরা ইন্দোচীনে জাপানের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আবার মার্কিণ সাহায্যে ইন্দোচীনকে করে পাবার চেষ্টা করেছিল। ইংরেজ এই জাতীয় ভুল করেনি ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটাটা উল্টো করে ধরতে চায় নি। প্রায় সাতশ বছর ধরে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বুঝেছে যে ক্ষমতার অতিরিক্ত চাপ পরে বুমেরাঙ্ হতে পারে। কারণ তার ইতিহাসে আছে আপন রক্তের সন্তানেরাই বিদ্রোহী হয়েছে। জাতি এবং রাজার নামে তা আটকাতে পারেনি। ইয়ান স্মিথ অনেকটা সেই ধরনের বিদ্রোহ করেছিল বটে, কিন্তু আফ্রিকাবাসীদের জাতীয়তা বোধকে আমল দিতে চায়নি। ফলে মার খেয়ে গেল। আমেরিকা উপনিবেশে, কানাডায়, বা অষ্ট্রেলিয়ার সে সমস্যা ছিল না। একমাত্র কানাডায় ফরাসীদের নিয়ে সমস্যা ছিল। তাও ভারত অধিকারের পর কেটে যায়। কাজেই সংসদীয় গণতন্ত্রে যে শক্তিটা ক্ষুণ্ন হতে থাকে তার সবল এবং দুর্বল দিক গ্রহণ করে ব্রিটিশ জাতি তার সিদ্ধান্তে পৌছায়। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি, বহু জাতিক, বহু ভাষা ও বহু ধর্ম্মবিশিষ্ট ভারতে গত তিরিশ বছরধরে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তাকে খারাপ করে গণতন্ত্রের পাওয়া বিধিসম্মত পথে, গৃহ যুদ্ধের দিকে টেনে নেবার ঝোঁক বিরোধীদের (অর্থাৎ কংগ্রেস বিরোধীদের) প্রথম থেকেই ছিল। এই গৃহ যুদ্ধের ঝোঁকের দিকে অগ্রগামী নেতৃত্ব দেয় ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি। আজ সি. পি, এম, নেতা, জ্যোতির্ভূষণ ইন্দিরা গান্ধীকে যুদ্ধাপরাধী বিচারের খাঁচে, বিচার করার জন্য দাবী করছেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণা কি কারণে হয়েছিল, এবং তার কোন যৌক্তিকতা ছিল কিনা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক বিচার করবেন। কোন রাজনৈতিক দল এই জরুরী অবস্থা সৃষ্টিতে ইন্ধন জুগিয়ে ছিল কিনা, এবং কাদের কুকর্ম্মের ফলে ভারতের রেলপথের অর্থনীতি থেকে শুরু করে সাধারণ অর্থনীতিতে বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছিল, যার ফলে-কারখানার উৎপাদন-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করে তুলেছিল ? এক কথায় জাতির অর্থনীতি নিয়ে কারা ভাঁটা খেলা শুরু করেছিল ? এই সব বিপর্য্যস্ত অবস্থাকে ক্ষমতা দখলের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেক চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, নৈরাশ্যে আবিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীকে, পুলিশকে, বিদ্রোহ করতে বলা। দেশের সৈন্যবাহিনীকে, রাজনীতির মধ্যে অর্থাৎ দলীয় রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট রাজনীতির একটি কৌশল। যদি একবার সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ দানা বাঁধতে সুরু করা সম্ভব হয়, তবে বাইরে শ্রেণী যুদ্ধের কাজ তরান্বিত করা যেতে পারে। কল-কারখানা বন্ধ করে এই বিদ্রোহের পরিপূরক হিসেবে কাজ করা যেতে পারে এই যুদ্ধে উৎপাদন ব্যাহত করতে পারলে জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা নিরারণ সঙ্কটময় করে তোলা সম্ভব। এই সর্ব্বনাশা বিপদের ধ্বনি রেল ধর্ম্মঘট থেকেই বাজতে থাকে এর সঙ্গে ললিত নারায়ণ মিশ্রের হত্যাকাণ্ড গভীর সংকটের প্রথম ফুরণ বলেই মনে করা শ্রেয়। ইন্দিরা গান্ধী কেন, যাঁর হাতেই নেতৃত্বের দায়িত্ব থাকতো তাঁকেই ভারতীয় গঠনতন্ত্রের বিশেষ ধারাটি প্রয়োগ করতে হতো। আর এই ধারা প্রয়োগ করেছিল বলেই অন্যথা খুনখরাবি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জনতা সরকার হাতে ক্ষমতা পেয়ে বহিলাডিলাহ, পহলগবে, কি কাণ্ড করেছে, কাশী, কানপুর ও আগ্রার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আজ ভারতীয় সংবাদপত্র নির্জ্জীব রোগে ভুগছে। এই সব কাহিনী ওরা এখন আর বের করেন না সংবাদপত্রের বড়কর্তা

বক্তৃতা দিতে পারেন নি বলে তখন মনে-মনে ভারি পোসা ছিল। কিন্তু আজ? আজও আর তাঁদের হাত চেপে ধরেন নি। স্বাধীনভাবে সব ঘটনা প্রকাশ করার বাধাটা কোথায়? বাধা কোথায়? সে আছে সূক্ষ্ম সূত্রের টানে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। অথচ বন্ধন ঠিকই আছে। এক চেটিয়া ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন পেয়ে-পেয়ে, আর বেতনভুক সাংবাদিকদের বেতন স্ফীতকায় হয়ে-হয়ে, সংবাদপত্রের মালিক প্রভু, অন্নদাস সাংবাদিকেরা —এক নোতুন কৌলিন্য-জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সাংবাদিকেরা দুনিয়ার স্বাধীনতা আর গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে মাথা ঘামান, কিন্তু নিজেদের এই স্বাধীনতা আছে কিনা, এমন কথা কাউকেও জানান না অথচ জানে সবাই। মালিকের অগোচরে, কোন কিছুই ছাপা হয় না। প্রভু ভৃত্যের পরস্পর পৃষ্ঠ কণ্ডুয়ন সম্বিতির যে সুখের স্বর্গটা তিল সেখানে ইন্দিরাপার্টি একটু চল ফুটিয়ে দিয়েছিল। এদিকে সরকারী বিজ্ঞাপনের সেবা-পাট বসাবে, আবার একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন সরট কেটে টানবেন তা হবে না। কংগ্রেস সরকার (ইন্দিরা সরকার) বলেছিলেন, সে হবে না, একটা বেছে নাও। তাই আজ ইন্দিরা গান্ধীর তীব্র সমালোচনা হচ্ছে। আসলে ভারতবর্ষের সংবাদ পত্র কিন্তু বরাবর বৈতালিকের গান করে। আজ দেখছি জনতা সরকারের পক্ষে সি. পি. এম. ও বন্দে বৈতালিকের গান শুরু করেছে। নাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন ইন্দিরা গান্ধীর জন্য হুরেমবার্গ ধাঁচের বিচার ব্যবস্থা হোক ইন্দিরা গান্ধী ফাসিস্ট। কিন্তু রুশ-জার্মান চুক্তির সময় হিটলার ফাসিস্ট ছিলেন না। তাকে মার্কসীয়মতে পরিশুদ্ধ করে। এই কম্যুনিষ্টরা একদিন হিটলারের স্বপক্ষে প্রচার করেছিলেন। তার পর যেদিন রুশ-জার্মান চুক্তিতে চিড় খেল, সেদিন থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল, আর ভারতের দেশ প্রেমিক কংগ্রেস কর্মীরা ভণ্ড। এত রকমের জাতীয়তা বিরোধী কাজ সি. পি. আই. করছে। দেশ স্বাধীন হবার পর ওরা যখন "নানকিংএর পথ, আমাদের পথ" বলছিলেন তখন যদি জাতীয়তা বিরোধী কাজের পূর্বাপর বিচার হতো অনুসন্ধান হতো, তবে ভারতের মাটিতে অনেক আগেই হুরেমবার্গ ধাঁচের বিচার সম্পন্ন হতো। তখন কমরেড নাম্বুদ্রিপাদ কোথায় থাকতেন তা আজ বলা মুস্কিল। অজীবন এক নায়কতন্ত্রের গান গেয়ে হঠাৎ গণতন্ত্রের সুরে গলা ভাঁজলে কি আসল সুর ঢাকা যায়? তাই বলে কমরেড নিজের দিকে তাকিয়ে অন্যকে ফাসিস্ট বলুন। কমরেড ষ্টালিন কত লোক হত্যা করেছে হিসেব দিয়ে তার পর অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করুন। আর সেই ষ্টালিনের বন্দনা গানে আপনারাই মশগুল ছিলেন। আপনাদের দেশের জনতা সরকার এই একবারে কতগুলো খুন করেছে তিরিশ বছরের ইতিহাস তার কাছে সামান্যতম উপমায়ও আসেনা। পঞ্চনগরের সেই মরা মানুষগুলোর প্রেতাত্মা বাইলাডিলার মরা মানুষগুলোর প্রেতাত্মা কি আপনাদের ছেড়ে দেবে? কেন খুনীদের আপনারা আজ মদত দিয়ে যাচ্ছেন?

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

মহানায়ক রাসবিহারী

হার্ডিঞ্জের উপর বোমা কে ফেলেছিলেন ?

শিবনাথ ব্যানার্জী

২২শে এপ্রিল তারিখে শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় বিপ্লবী বাংলায় একটি সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন নাম "বিপ্লবী রাস বিহারীকে জন মানসে পৌছাতে হবে"। প্রবন্ধটি পড়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি এবং লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিপ্লবী রাসবিহারী বোস সত্যিই মহানায়ক ভারতে এবং ভারতের বাইরে তাঁর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সমস্ত পৃথিবীতে অতুলনীয় বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না

কোয়েটা পেশোয়ার থেকে পাঞ্জাব, দিল্লী, মীরাট, বেনারস, কলিকাতা, বারাকপুর এমন কি ভারতের বাইরে সুদূর সিংগাপুর পর্যন্ত প্রায় ৩০টী বৃটিশ সেনানিবাসের মধ্যেই ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেই বিপ্লবী কমিটি গঠন এবং সর্বত্র একই দিনে ১৯১৫ সালে ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে একই সময়ে বিদ্রোহ আরম্ভ করার সকল রকমের প্রস্তুতি করা। দুর্ভাগ্য ক্রমে এ সংবাদ বৃটিশ গোয়েন্দারা জানিতে পারায় তারিখ বদল করে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখেই সর্বত্র একযোগে বিদ্রোহ আরম্ভ করা এবং রহ ছাউনিতে কৃতকার্য্য হওয়া এমন একটি কাহি যার তুলনা পৃথিবীর বিপ্লবী ইতিহাসে বিরল।

দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপরভীষণ বিস্ফোরকে বোমা ফেলে, হাতির উপরেই বিরাট শোভাযাত্রার মধ্যে ভীষণভাবে আহত করাও ইম্পিরিয়াল শোভা যাত্রা ছত্রভঙ্গ করা তার পরই সহকারী বসন্ত বিশ্বাসকে সাথে করে রেল ষ্টেশনে গিয়ে দেরাদুনে পৌছান এবং পরদিনই দেরাদুনে এই বোমা মারার নিন্দা করে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া শরদিন্দু অমনিবাসের কাহিনীর চেয়েও রোমাঞ্চকর।

তার অতি ধূর্ত্ত নিপুন বৃটিশ গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথের আত্মীয় পরিচয়ে মহারাজ টেগোর নামে, জাল পাশ পোর্ট নিয়ে জাপানে পাড়ি দেওয়াও একটি বড় কীর্তি

তারপর জাপানে থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে গিয়ে জাপানে বিয়ে করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তখন একজন জাপানী মেয়েকে বিপ্লবে অনুপ্রাণিত করে

শুধু বিয়ে করাই নয়, জীবন ব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামে সাথী করে নেওয়া এমন কি তার মা বাবা ও পরে তাদের ছেলে ও মেয়েকে বিপ্লবের জন্য উৎসর্গ করাও একটা অতুলনীয় কীর্তি।

আরও একটি অতুলনীয় কীর্তি হল যে তিনি ৫০ বছর নিরলসভাবে সেবা বিবাস থেকে আরম্ভ করে বহু বিপদ সংকুল কাজে সর্ব্বদা ব্যাপৃত ছিলেন—অনেক বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়েছেন, বহু বছর জেল ও আন্দামানে কালাপানিতে কাটিয়েছেন। কেউ কেউ ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান করে গেছেন যেমন ক্ষুদিরাম, সন্তোষ বোস প্রভৃতি সম্মুখ সমরে প্রাণ দিয়েছেন যেমন যাদু যতীন, বিনয় বাদল দীনেশ প্রভৃতি কিন্তু মহানায়ক রাসবিহারী কি এদেশে কি বিদেশে একবারও গ্রেপ্তার হন নি। কয়েকবার পুলিশ তাঁর গোপন আড্ডা ঘিরে ফেলেছে কিন্তু অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে কখনও মেথর সেজে কখনও কুয়োর মধ্যে ডুব দিয়ে পুলিস ও সশস্ত্র সৈন্যদের ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপন করে ধেড়াজাল ভেদ করে চলে এসেছেন—এটাও একটা অতুলনীয় কীর্তি।

সর্বোপরি নিজের সারা জীবন ব্যাপী ও সারা এশিয়া ব্যাপী বৈপ্লবীক সংগঠন আই. এন. এ. প্রভৃতি বৈপ্লবিক সাধনা ও নেতৃত্বকে স্বেচ্ছায়ে ও সানন্দে নেতাজী সুভাষের হাতে তুলে দিয়েছেন এমন বৈপ্লবিক মহত্বের তুলনাও জগতে মেলে না।

আশাকরি ব্রজেন্দ্র বাবু ও বিপ্লবী বাংলার ও বিপ্লবী পরিষদের অন্য সহকর্মীগণ বিপ্লবী মহানায়কের বিভিন্ন কেন্দ্রের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাগুলিকে জনমানসে ক্রমশঃ তুলে ধরবেন—যাতে ভবিষ্যতে পৃথিবীর লোকে মহানায়ক সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার ছবিটি দেখতে পায় ও অনুপ্রাণিত হতে পারেন।

একটি ব্যাপারে একটু মতভেদ দেখা যাচ্ছে। লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর ঐ সময়ে ও ঐ স্থানে ঐ ভাবে বোমা মারার পরিকল্পনা শুধুমাত্র তার প্রায় প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও মহানায়কের মস্তিষ্ক প্রসূত ও কার্য্যে পরিণত যার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা চরম ধাক্কা খেল। এমন কেহ কেহ বলিতেছেন মহানায়ক রাসবিহারী নিজেই বোমাটি ফেলেছিলেন আবার কেহ বলিতেছেন বসন্ত বিশ্বাসই বোমা ফেলেছিলেন যদিও বিপ্লবী রাসবিহারীর পরামর্শ প্রয়োজনীয়। কলিকাতা (চন্দন নগর) থেকে বিশেষ শক্তিশালী বোমা তৈরী করান। বোমা ফেলার জন্য বিশেষভাবে বসন্ত বিশ্বাসকে নির্বাচিত করা ও গাছে পাথর ফেলিয়া বোমা ফেলার (হাউপার থ্রোলিক) কায়দায় ট্রেনিং দেওয়া, মেয়েবেশে সাজিয়ে চাঁদনী চকের রাস্তার ধারে দোতলায় মেয়েদের মধ্যে বসিয়ে রাখা ইত্যাদি বিবরণ অনেক প্রত্যক্ষদর্শী বা অংশ গ্রহণকারীর বক্তব্য থেকে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কে এবং কোথাথেকে বোমাটা ফেলেছিলেন তাহার সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য আজও পাওয়া যায় নি; বিপ্লবী বাংলা অফিসে বা অন্য কোথাও ১২/২০ জনের একটি বৈঠক করে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসার দরকার। এটা বৈপ্লবিক কর্ত্তব্যও।

———

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিনবিহারি দাস ধৃত হলে মাখনলাল সেন অনুশীলন সমিতির কার্য্যভার গ্রহন করেন। অল্প কিছুদিনের জন্য তিনিই ছিলেন সমিতির অধিনায়ক। ১৯০৮ সালের মে মাসে তিনি তাঁর নিজ গ্রাম সোনারঙ্গে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ই ছিল সমিতির কেন্দ্র। ১৯১১ সালে তিনি প্রস্তাব দেন যে বিপ্লবাত্মক সশস্ত্র কার্য্যক্রম কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা হোক। কিন্তু সমিতির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, যতীন আচার্য্য, নরেন সেন প্রভৃতি তাঁকে সমর্থন না করায় মতভেদ হেতু মাখনবাবু সমিতির সংস্রব ছেড়ে দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই সমিতির এই কেন্দ্র পুলিশের নজরে পড়ে এবং সমিতির এই ক্ষেত্রে চারিদিকে কয়েকজন পুলিশের চর নিয়োগ করা হয়। ফলে এই অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসীরা সমিতির বিরোধী হয়ে ওঠেন। সমিতির পুকুরে গরু স্নান করানো নিয়ে তাদের সঙ্গে সমিতির কর্মীদের এক বিরোধ হয়। সরকারী গোয়েন্দা এবং স্থানীয় মুসলমান গোয়েন্দাদের অপচেষ্টায় বিপ্লবী কর্মীদের বিরুদ্ধে এক মামলা আনয়ন করা হয় যে তারা তাক বিভাগের পিওনের মেল ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছে। এই মামলা সম্পর্কে সমিতির চোদ্দ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় এঁরা সকলেই ছিলেন জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিচারে যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর চার মাস, যোতীন রায় এক মাস কারাদণ্ড এবং অন্য চার জন পঁচিশ টাকা করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই মিথ্যা মামলায় ঐ অঞ্চলের রহুল দেওয়ান এবং অন্যান্য কয়েকজন সমিতির কর্মীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল। এজন্য ১৯১১ সালের ১২ই জুলাই সমিতির পক্ষ থেকে রহুল দেওয়ান, তার ভাই এবং অন্য একজনকে হত্যা করা হয় পুলিশের পক্ষে গোয়েন্দা কার্য্য করার জন্য এই বৎসর আরও কয়েকটি হত্যা-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। বিক্রমপুর রাউত ভোগ গ্রামের মনমোহন দে পুলিশের পক্ষে সমিতির সভ্যদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নিযুক্ত ছিল। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায়ও সে সাক্ষ্য দিয়েছিল। ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্য দিয়ে বাড়ী আসার পথেই ১৯১১ সালের ১০ই এপ্রিল তাকে হত্যা করা হয়। ঢাকা জেলার গাউদিয়া নিবাসী রাজকুমার রায় এই সময় ময়মনসিংহে গোয়েন্দা দারোগা নিযুক্ত ছিলেন শেরপুরে এক ডাকাতি সম্পর্কে সমিতির কয়েকজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গিয়ে তাদের উপর চরম অত্যাচার করে। ১৯১১ সালের ১৯শে জুন তাকে হত্যা করা হয়। মনমোহন ঘোষ যখন নারায়ণগঞ্জে সাবরেজিষ্ট্রার ছিলেন সাধির পাড়া নৌকা চুরি নামে এক মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তিনি সমিতির সভ্য ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী এবং অন্যান্য কয়েকজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। মামলার সাক্ষীদের দিয়ে তিনি মিথ্যাকথা বলাবার চেষ্টা করেন। সাক্ষীদের মধ্যে একজন ছিলেন সাধির পাড়া স্কুলের শিক্ষক শীতল চক্রবর্তী। তিনি পুলিশের শেখানো কথা বলেন এজন্য মনমোহনবাবু তার গালে এক চড় মারেন। এরপর মনমোহন বাবু বরিশালে বদলী হয়ে যান। বরিশালেও নজন কমিটি একডাকাতির ব্যাপারে তিনি সমিতির কর্মীদের বিশেষভাবে নিগৃহীত করেন। ১৯১১ সালের ১১ই ডিসেম্বর গুলির আঘাতে তাকে হত্যা করা হয়। ১৯১২ সালের প্রথম দিকেও সাধনা চক্রবর্তী নামে একজনকে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া রতিলাল রায় নামে জনৈক গোয়েন্দা পুলিশকে হত্যা করা হয় ১৯১২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। রতিলাল রায় ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় একজন প্রধান সাক্ষী ছিলেন।

১৯১০ সাল থেকেই আরম্ভ করে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় সমিতির সঙ্গে সরকারের একটা পরোক্ষ সংগ্রাম চলছিল এ সকল হত্যা কার্যের একটিরও সন্ধান পাওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। একটি মামলায়ও অপরাধী প্রতিপন্ন হয় নাই, এমনকি কয়েকটি ঘটনায় সরকারের পক্ষে মামলা দায়ের করাই সম্ভব হয় নাই। বঙ্গ বিভাগই এর কারণ বলে সরকার সন্দেহ করে এবং বঙ্গ বিভাগ রহিত করে জনসাধারণের এই বিক্ষোভ দূর করার চেষ্টা হয় বলে বহু বিশিষ্ট লোকের ধারণা।

এই সমস্ত খুন এবং কয়েকটি ডাকাতির ঘটনাই বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়ভুক্ত ছিল। বড়দলে যে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় ফরিদপুর জেলার রজনী সাহা সেই ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করে। গ্রেপ্তার হওয়ার পরে সে স্বীকারোক্তি করে এবং পরে রাজসাক্ষী হয়। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হরিণীরঞ্জন দাসের খুন সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। তার গৃহে ডাকাতির অপরাধ পাওয়া গেলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। খুনে রিভলবার রাখার জন্য সাতবছরের দেড় বৎসর এবং ডাকাতির মাল রাখার জন্য পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বরিশালের দুই ষড়যন্ত্র মামলা এবং অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলা দুটিতেই রাজসাক্ষী ছিল। মামলার পরে সরকার পক্ষ থেকে ওঁকে বিলেত পাঠানো হয়। গিরিনাথ আচার্য্য অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট নেতা রমেশ চন্দ্র আচার্য্যের খুল্লতাত ভাই। বিক্রমপুরের বানাড়ী গ্রাম আচার্য্য পরিবারের বাসস্থান। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় গিরিনাথ সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মান্দ্রাজের ত্রিচীনপল্লী জেলে কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। সুশীল ঘোষ নামে জনৈক পোলেন্দা দারোগা সেখানে গিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলায় গিরিনাথকেও রাজসাক্ষী করা হয়েছিল। ১৯১১ সালের শেষ দিকে রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রমেশ চন্দ্র আচার্য্য এবং যোগীন্দ্র চক্রবর্তীকে ময়মনসিংহের জামালপুর সাব-জেলে এনে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিসের সন্দেহ তারা ডাকাতির উদ্যোগ আয়োজন করছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করা সম্ভব হয় নাই। ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১০৯ ধারা অনুযায়ী তাদের একবৎসর কাল আটক হয়।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা এবং বরিশালের দুইটি ষড়যন্ত্র মামলায় সমিতির বহু বিশিষ্ট কর্মী ধৃত হওয়া সত্ত্বেও সমিতির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সমিতির সপ্তম সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অমৃত হাজরা। বাঘা ডাকাতি সম্পর্কে ওঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায়ও তিনি আসামী ছিলেন। কিন্তু পুলিশ অনেক চেষ্টাসত্ত্বেও তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনাই। ১৯১২ সালের প্রথমদিকে অমৃত হাজরা কলকাতায় রাজা—বাজারে অবস্থান করছিলেন। ২৯৬/১ আপার সারকুলার রোডে শশাঙ্ক হাজরা নামে তিনি থাকতেন। বাড়ীটি ছিল ছোট দোতলা ঘর কিন্তু ছাদ ছিল খোলা। বাড়ীর নীচে ছিল ট্রাম কন্ডাক্টরদের মেস। এখানে অমৃত বাবু লেমোনেড তৈরীর একটি কারখানা পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু আসলে এটা ছিল সমিতির বোমা তৈরীর কারখানা। এখান থেকে অমৃত বাবু চন্দননগরে বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে এবং কাশীর শচীন সান্যালের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন। এদিকে সমগ্র ১৯১৩ সাল ব্যাপী ও সমিতির কার্য্যকলাপ চলছিল। চন্দননগর কর্মীদলের সঙ্গে সংযোগের ফলে রাসবিহারী সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাসবিহারী বসু এবং শচীন্দ্র সান্যাল এই রাজাবাজার কেন্দ্রে ঘনঘন যাওয়া আসা করতেন। ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে লর্ডহার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ১৯১৩ সালের ২৭শে নভেম্বর আসামে শ্রীহট্টের মৌলবী বাজারে ম্যাজিষ্ট্রেট গুডলিফকে হত্যা করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এখানে দলের বিশিষ্ট কর্মী যোগীন্দ্র চক্রবর্তী বোমাবিস্ফোরণে নিহত হন। ১৯১৩ সালে ১৭ই মে লাহোরে লরেন্স উদ্যানে বোমা বিস্ফোরণের পরে সমিতির কর্মী বসন্ত বিশ্বাস গ্রেপ্তার হন। এ ছাড়া কলকাতার গোলদীঘিতে রিভলবারের

(চলবে)

নাহি মানে হাল

শ্রীমতী ভুবন সেন

"নাহি মানে হাল
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ় সম"—রবীন্দ্রনাথ

বজরাটার উপরে শনির দৃষ্টি পড়েছে। বোঝা গেল প্রথম অন্ধ্র, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের পরে এক একটি পরাজয়ের সংবাদ আসে আর তার চাপে জোড়াগুলো মড় মড় করে ওঠে। বিপন্ন মাঝি ভগবানকে ডাকতে থাকে।

জন্মলগ্নেই বোঝা গেছিল 'জনতা'র জোড়াগুলো মোটেই 'টাইট' হয়ে বসেনি। তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে হয়েছিল তো, তাই বজরার তলির তক্তাখানা [Keel] শক্ত করার সময় ছিলনা। দেখে শুনে কেউ আশা করেন নি যে পুরো পাঁচ বছর এটা service দিতে পারবে। চাপ যখন বাড়বে জোড়াগুলো আলগা হয়ে খুলে আসবে। দু'এক বছর টিকে থাকলেই যথেষ্ট। ওর প্রয়োজন ছিল ইন্দিরাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। সে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন যদি ভেঙে পড়ে পড়ুক। ভাঙা তক্তাগুলোর কিছু রেখে কিছু বর্জন করে, কিছু নতুন কাঠ লাগিয়ে, নতুন করে গড়া হবে বজরা।

এতদিন যে টিকে ছিল জনতাদল, তার কারণ লোকসভা নির্বাচনের অভূতপূর্ব সাফল্য। নইলে সোড়া থেকেই লেগেছিল গোলমাল। তাপ্পি তুপ্পি দিয়ে চালাতে হয়েছিল। নির্বাচনের ধামামা মাত্র বেজে উঠেছে, একজন সেনাপতি নির্বাচন করে ময়দানে নামতে হবে। চরণ সিং আশা করেছিলেন তিনিই হবেন প্রথম সেনাপতি, কারণ উত্তর ভারতের হিন্দি বলয়ে তাঁর সংগঠনই সবচেয়ে মজবুত। অথচ নির্বাচিত হলেন মোরারজি, সংগঠন বলতে যাঁর বিশেষ কিছুই ছিল না। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের অবস্থার গতিকে চরণ সিং প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে এসেছিলেন; মোরারজি নির্বাচিত হয়েছিলেন। যদিও চরণ সিং যে রাজ্যগুলিতে নির্বাচন পরিচালনা করেছিলেন সেগুলিতেই অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছিলেন। এবং মোরারজির উপরে যেসব রাজ্যের ভার দেওয়া হয়েছিল, সেগুলিতে হয়েছিল পরাজয়। এর পরে মন্ত্রীত্বের দপ্তর বন্টন নিয়েও মন কষাকষি কম হয় নি। অবশেষে জনতা মোর্চা ভেঙে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জনতাদল গঠিত হল, উপদলগুলি জনতার স্রোতে অন্তর্হিত হলেন ১৯৭৭ এর মে মাসে। তবু অবস্থার কোন উন্নতি হল না। বিধান সভার নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হল। দূর থেকে আমরা ভয়ে চোখে উঠলাম, ঝড়ের মুখে এবার ডুবলো বুঝি বজরা। চোখ খুলে দেখি, একবার টলমল করে, আবার সোজা চলেছে। রাজ্যে রাজ্যে মধ্যবর্তী সভা গঠনের সময় লাগলো আর এক ঝাপটা। সেটাও কাটিয়ে উঠলো শেষ পর্যন্ত, ঐ লোকসভা নির্বাচনের জয়ের শক্তিতে।

যে চারখানা তক্তা জুড়ে জনতা নির্মিত, জনসংঘ, লোকদল, সমাজবাদী ও কংগ্রেসী, ভারতীয় সমাজ জীবনের এরা এক একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবক্তা। জনসংঘ হিন্দু সম্প্রদায়ের, লোকদল সম্পন্ন কৃষক সমাজের, সমাজবাদী সংঘের বুদ্ধিজীবি কায়িক গোষ্ঠির নির্ভরশীল। পুরানো অভ্যাস কি সহজে পরিত্যাগ করা যায়? এতদিন যাদের নিয়ে সংগঠন করেছেন, যাদের মঙ্গলের চিন্তা করেছেন, সুখ দুঃখের ভাগ নিয়েছেন, এখন ক্ষমতায় রাজা হয়ে বসেছেন বলেই কি হট করে তাদের কথা ভোলা যায়? পারা যায় জনতার সমস্তের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতে? কংগ্রেসীরা

আবার ভিন্ন চিন্তাধারার মানুষ। এক জীবন কংগ্রেসের আদর্শে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ভারতের হিন্দু, অহিন্দু, বুদ্ধিজীবি ও শ্রমজীবি, সমৃদ্ধ কৃষক ও ভূমিহীন ক্ষেত মজুর, সকলেই কংগ্রেসের আশ্রয়ী। কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠির সংগঠন নয় কংগ্রেস। কোন একটি বিশেষ স্বার্থেরও নয়। এক গোষ্ঠির স্বার্থে অন্য গোষ্ঠীর বিরোধীতা তার কল্পনার বাইরে। কংগ্রেসের সঙ্গে অন্য তিনটি দলের পার্থক্য এইখানে।

জনসংঘ হিন্দু-সম্প্রদায়ের নেতা ভারতের মুসলিম খৃষ্টান বা সাম্যবাদীকে [যারাই আচরণত্য ভারতের বাইরে] ভারতীয় বলে স্বীকার করে না। লোকদল, উত্তর ভারতের জাঠ আহির প্রভৃতি মধ্যবর্ণের সম্পন্ন কৃষক সমাজের নেতা। উচ্চবর্ণের বুদ্ধিজীবি বা নিম্নবর্ণের ক্ষেত মজুরের কোন স্থান নেই লোকদলের সংগঠনে। সমাজবাদীর কর্মক্ষেত্র শহরের কর্মিক ও শ্রমিকের সমাজে গ্রামের ভূমিহীনের মধ্যে সংগঠনের চেষ্টা কখনো করেন নি। একমাত্র কংগ্রেসের মঞ্চেই সর্বভারতীয় সকলের আত্মীয়তা। সকলের জন্যই কংগ্রেসের দরজা খোলা। সকলের সমস্যাই কংগ্রেসের সমস্যা; সেগুলির মধ্যে মিলনের সূত্র অনুসন্ধান তারই কাজ। জনসংঘ, লোকদল, সমাজবাদী সকলেই অবিলম্বে হিন্দি প্রচলনের পক্ষপাতি। কংগ্রেসই তার বিপক্ষে অবস্থিত।

চরণসিং এর সাংগঠনিক শক্তির আকর্ষণেই জনসংঘ লোকদলের সঙ্গে আঁতাত করেছিল। নইলে এদের মধ্যে আদর্শগত কোন মিল নেই। জনসংঘ হিন্দু সমাজকে সংঘবদ্ধ করতে চায়, লোকদল চায় হিন্দু সমাজকে বিচ্ছিন্ন করতে। মধ্যবর্ণদের অন্য সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে শক্তিমান করে তোলাই লোকদল গঠনের উদ্দেশ্য। তাদের বক্তব্য হল এই—"মধ্যবর্ণরাই ভারতের মেরুদণ্ড, ভারতের খাদ্যোৎপাদক। যুগে যুগে ক্ষুদ্রিতের মুখে তারাই অন্ন যুগিয়ে এসেছে। তাদের সমৃদ্ধিই ভারতের সমৃদ্ধি, তাদের দুর্বলতাই ভারতের দুর্বলতার কারণ। জনসংঘ লোকদলের সহায়তায় কয়েকটি রাজ্যে মন্ত্রীত্ব লাভ করেছে ঠিকই কিন্তু দলের সংগঠন ব্যাহত হয়েছে উত্তর ভারতের পল্লীতে। যুল যা প্রোথিত করেছিল ইতিপূর্বে, সেখানে জলসেচ করা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে জনসংঘের একটা অংশ লোকদলের সমালোচনায় মুখর হয়ে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকলো। ঘরোয়া স্বরে কংগ্রেসকে সমর্থন করলো।

জনসংঘের বিশ্বাস, আগামী বছরই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে জনসংঘের সংগঠন আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। সেইজন্যে জনতাদলের সভাপতির পদটি তার চাই। সেই লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি রেখেই তারা কংগ্রেসের বিশ্বাস অর্জনে ব্যস্ত। রাজনারায়ণের আক্রমনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে সমর্থন করল আসের রাজনারায়ণের চেয়ে প্রধান দাবী, অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা. সেই দাবি যে জনসংঘেরও, সেটাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলল না। এখন চরণসিংএর আক্রমনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রকে পূর্ণ সমর্থন করতে প্রতিদানে কেন্দ্র একটা মূল্য তো দিতে চাইবেন। উপযুক্ত মূল্য পাওয়া না গেলে কংগ্রেসের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া তো কঠিন নয়।

ইদানীং খুব দুর্দিন চলছে চরণ সিং এর। সেই যে বিপ্লবের বেলচি গ্রামে চামারদের পুড়িয়ে মেরেছিল মধ্যবর্ণের হিন্দুরা, সেই ঘটনার পরে অনুরূপ আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাগুলি নতুন কিছু নয়, প্রায়ই ঘটে থাকে। ইদানীং ইন্দিরা সেগুলি নিয়ে অতিরিক্ত 'পাবলিসিটি' দিচ্ছেন, গৃহমন্ত্রীকে হতমান করার চেষ্টা করছেন। কয়েকটা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাও হয়েছে এখানে ওখানে। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ভয় পেয়ে গেছে, মুসলিমরাও আশ্বস্ত হয়নি। ইদানীং যতগুলি নির্বাচন হয়েছে, প্রত্যেকটিতেই হরিজন আদিবাসী ও মুসলিমরা 'জনতা'র বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। ইন্দিরাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন 'গৃহমন্ত্রী', 'কানমলা' খেয়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। সাহকমিশনও হাস্যাস্পদ হয়ে পড়েছে, ইন্দিরার মূর্তিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কোন দিকেই আলো দেখতে পাচ্ছেন না গৃহমন্ত্রী।

যে বর্ণসংগ্রাম (Caste war) শুরু হয়েছিল চরণসিংএর ক্ষমতার কেন্দ্র বিহার ও উত্তর প্রদেশ, সেটা বাড়তে

বাড়তেই চলেছে। এটা মার্কসবাদীদের শ্রেণী সংগ্রাম নয় যে চোখ বুজে থাকবেন। জয় প্রকাশের সাম্যিক বিপ্লব নয় যে উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। যে মূর্তি পরিগ্রহণ করছে, এই সংগ্রাম সেটা সাম্যিক অরাজকতা। গ্রামে মধ্যবর্ণ ও নিম্নবর্ণে সংগ্রাম, সহরে সংগ্রাম উচ্চবর্ণে ও মধ্যবর্ণে। প্রথমটির মূলে ভূসম্পত্তি ও দ্বিতীয়টির মূলে চাকরীর বাটোয়ারী। এরই সুযোগ নিয়ে ঘাটে নেমে পড়েছে চোর ডাকাত ও গুণ্ডাতন্ত্রীর দল। আইন ও শৃঙ্খলায় কর্ণধার লোহার মানুষ চরণসিং আজ ব্যর্থ।

গৃহমন্ত্রী হিসাবে তিনি ব্যর্থ। দৈবের খেয়ালে যদি কখনো প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে সক্ষমও হন, সেখানেও তিনি ব্যর্থ হবেন জনসংঘ বা লোকদলের মত কোন বিভাগীয় শক্তি (Sectional force) ক্ষমতা অধিকার যদি বা করতে পারে, ক্ষমতা রক্ষা করতে পারবে না। ক্ষমতা রক্ষা করতে হলে তাদের কঠোর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেটা ইন্দিরাও পারেন নি। যদিও কংগ্রেসের একটা সর্বভারতীয় আবেদন ছিল, যা আর কারো নেই, এবং ইন্দিরাই ছিলেন তার অভিসন্ধানী নেত্রী। তিনি পারেন নি তার internal contradiction এর জন্য।

এই যে এত বছর স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে কংগ্রেস, কত স্বপ্ন দেখেছে আর সেই সপ্নভঙ্গে যাওয়ার পরে কত নিশ্বাস ফেলেছে, তার কোনটাই বৃথা হয় নি। এই সংগ্রাম ও বিরতির ফাঁক দিয়ে কংগ্রেস একটা অভিনব রাজনৈতিক চাতুর্য্য সংগ্রহ করেছে, আর সপ্তরঙের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে দেশে। একটা সামাজিক রাজনৈতিক সমঝোতা আনবার চেষ্টা করছে। পরিপূর্ণ সফল সে হয়নি, হলে তো দেশ বিভাগই হোত না।

যে সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে তার পরিণতি কি জানি না। আমরা কেউ জ্যোতিষী নই। ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করে আমাদের দৃষ্টি যায় না। অত দূরের কথা ভাবতেও ভরসা পাই না। আমার আপনার ভাবনা বড় অলক্ষুণে যা ভাবি তা হয় না। যা স্বপ্ন দেখি তা বলে না। তাই সুখবাদের কথা মনে করতেও ভয় করে, পাছে ভেঙে যায়। আশাকে বেশী দূর ডানপালা ছড়াতে না দেওয়াই ভালো। যদি তা নিষ্ফল হয় সব দুঃখ যে আমাদের ঘাড়েই ভেঙে পড়বে।

———

যকৃতের পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায় অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ এক মাত্রার জন্য
প্রাপ্তিস্থান:- শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
শ্রীকণ্ঠ কুটির • হুগলী গুজরাত • মহারাষ্ট্র • মধ্যপ্রদেশ

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[আদালত অবমাননা ও কারাবাস]

৪ঠা জুলাই তারিখে সকাল বেলা আমাকে জেল থেকে খালাস করা হয়। তার আগের দিন ২৪ পরগনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্স জেলখানায় আমাকে দেখতে এলেন। মিঃ ষ্টিভেন্স পরবর্তী কালে কিছু দিনের জন্য বাংলার লেফটেনান্ট গভর্ণরের পদে অস্থায়ীভাবে কাজ করেছিলেন। তার এই হঠাৎ আমাকে দেখতে আসার কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই বোঝা গেল। আমি বারাকপুরের কাছে ঘনিরামপুর গ্রামে বাস করতাম। ২৪ পরগণা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল ঐ জায়গা। তার মনে একটা আশংকা দেখা দিয়েছিল যে আমার মুক্তির পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কালে সেখানে বিক্ষোভ দেখা দেবে। তাই তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন, কোন বিক্ষোভ যাতে না হয়, আমি যেন সে জন্য কোন ব্যবস্থা করি। তার এই মতের সঙ্গে একমত হওয়ার কোন কারণ আমি পেলাম না। আমার বন্ধুরা এবং প্রতিবেশিগণ বারাকপুরে কি করতে চান, তা আমি তাকে বললাম। কারণ তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, কোন রকম আন্দোলন যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা করতে। আমি তাকে বললাম যে রাস্তায় কোন গান বা শোভাযাত্রা হবে না। তবে আমাকে স্বাগত জানাবার জন্য রেলষ্টেশনের কাছে আমার বন্ধু বাবু হরকিশন সরকারের বাড়ীতে একটি সভার অনুষ্ঠান হবে। এটা তার নিজের বাড়ী, সাধারণের মিলিত হওয়ার জায়গা নয়। আমি আরও বললাম যে, এজন্য ইংরেজের কাছে তার বাড়ী কেন দুর্গ বিশেষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজারূপে আমাদেরও নিজ বাড়ীকে দুর্গের মত ব্যবহার করার অধিকার আছে এবং বন্ধুদের এই প্রস্তাবকে নিরুৎসাহিত করার মত কোন পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না। মিঃ ষ্টিভেন্স এর পরে আর তার কথা নিয়ে জের করেননি, এবং আমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বললেন যে তিনি বারাকপুর রেলষ্টেশনে উপস্থিত থেকে যাতে সব কিছুর ভালভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে, তা দেখবেন। আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে কতকটা কৌতুকের ছলে বললাম, জেলার প্রধান সহকারী কর্মচারী আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কৌশলে উপস্থিত থাকবেন—এতে আমার পক্ষে এক মহা সম্মানের বিষয়। ঠিকই তিনি ৪ঠা জুলাই তারিখে সন্ধ্যার সময় বারাকপুর রেলষ্টেশনে আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একজন বাঙ্গালী সহকারী পুলিশ সুপার একখানি আলাদা গাড়ীতে ষ্টেশন থেকে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় তিন মাইল পথ আমাকে অনুসরণ করে চলেন।

রাজনৈতিক কার্য্যাবলী

আগেই বলেছি, কারাগারে আমার বাধ্যতামূলক অবসর জীবনটা আমি বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়েছি। কারণ এই সময় আমি পরিপূর্ণ বিশ্রাম পেয়েছি। কিন্তু মুক্তির পরে আমার উপর শুরু-ভার রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব এসে পড়ল। আমি "জাতীয় অর্থ ভাণ্ডার" গড়ে তোলার আন্দোলনটিকে হাতে নিলাম। ১৮৮৩ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়।

(চলবে)

Regd.No. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

c/3t

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'ফলিতজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল, বি (কলি ') এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ব্যতীত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যান্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক ন্যূনপক্ষে ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা :
পি-৩৪, কানুনগো পার্ক, পড়িয়া, ২৪ পরগণা
৫ নং বাসরুট, বৈষ্ণবঘাটা ষ্টপ।

11 JUL 1978

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীগণেশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীসতি সরল রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতারা—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীমনিল লেহেড্ডা। প্রচার সচিব—শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত।
বিপ্লবী বাংলা কার্য্যালয় :—৪নং বন্ধুরদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ৩০শে আষাঢ়, ১৩৮৫ ১৫ই জুলাই, ১৯৭৮	৪১ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

আর কত দিন ?

। সম্পাদকীয় ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। শ্রীঅরোদ দত্ত

যোগ সাধনা ও শ্রীঅরবিন্দের মৌন নির্দ্দেশ

। শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় ।

নাসিকা সংকট

। শ্রীমতী সুধা সেন ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক নলিনী মোহন রায়চৌধুরী ।

জনতাদল কোন পথে

। বাসবীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

যে মোর দুর্ভাগা দেশ
যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে,
তাদের সবার সমান।

—রবীন্দ্রনাথ

আর কত দিন?

এ বরং ভালই হইল। এতদিন একটা পাঁচতালিবিশিষ্ট ছাতার তলায় দাঁড়াইয়া যাহারা অবিরাম জরুরী জুজুর ভয় দেখাইতেছিলেন, বাইরের ঝড় ঝাপটা গায় লাগিবার আতঙ্কে যাঁহারা নিজেদের দুর্ব্বলতার ফুটো স্থানটা পটটি লাগাইয়া চলিতেছিলেন, তাঁহারা আজ একেবারে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত অকালে ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছেন। জনতাদল ভাঙ্গিতেছে অর্থাৎ যে সব রঙের সমাবেশে ঘট-কলসী সাজানো হইয়াছিল তাহা সামান্য রোদের ছোঁট লাগিতে চটা রঙের মত ফাটিয়া পড়িতেছে। যে রাজনৈতিকদল জরুরী জুজুকে পুঁজি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল আসলে জুজু তাহাদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে তাহা প্রেতাত্মারূপে ক্ষণিক জাগিয়া আবার ঝিমাইয়া পড়ে। জনতা দলের শ্রেষ্ঠ দাবীদার, ভারতের একমাত্র পরম হিতৈষী ভাঠ নেতা চরণ সিং দেশটাকে গরু গাড়ির অর্থনীতির দিক টানিয়া লইয়া যাইতে না পারিয়া ভারি গোসা করিয়াছেন। গাড়ি টানিতে পথে যে এইরূপ খানা খন্দ পড়িবে তাহা তিনি ইতিপূর্ব্বে খতাইয়া দেখেন নাই, অথবা তিনি নব্য ক্ষমতার মোহে তাহা কর্ত্তব্যের মধ্যে আনেন নাই। দেশ প্রেমের এই বিশুদ্ধ সংস্করণে তাই মোরারজী এমন ধুলি নেবেন ছিটাইয়া সারা মুখ ধুলিলিপ্ত করিয়া ইহা চৌধুরী সাহেব ভাবেন নাই। প্রথম হইতেই চৌধুরী সাহেব দলের মধ্যে জগদ্দল পাথরের মত একটি ভার হইয়া বসিয়াছিলেন।

কেন্দ্রে শনির মত সর্ব্বত্রই জুজু রহিয়াছে। তাহার নাম জরুরী জুজু। ইন্দিরা গান্ধীকে এই জুজুর সঙ্গে জড়াইয়া যে বিষাক্ত বিবৃতি চৌধুরী সাহেব রোগশয্যা হইতে ছাড়িলেন, তাহা যুগপৎ প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব ও জনতা দলের সদ্য গজানো শিকড় ধরিয়া টান দিল। ইতিপূর্ব্বে রাজনারায়ণী বুলিতে যে বিষ ছিল তাহা একার হজম করার পক্ষেই বিষম, তার চৌধুরী সাহেব যুক্ত হইলেন। এমন নীলকণ্ঠ দেশে নাই, এই সব গলাধকরণ করিবেন। সিমেন্ট দেয়া হাঁড়িতে অতিরিক্ত জলের চাপ পড়ায় সিমেন্ট ফাটিয়া ভেতরের ঘোলা জল সব বাহির হইয়া পড়িল। দেশবাসী জানিল ইন্দিরা গান্ধীর গ্রেপ্তার একটা ফুৎকারেই লঘু ক্রিয়া। এটা যে একটা তামাসা তা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রামও বললেন, কিন্তু সবচেয়ে বড় তামাসা শুরু হইল দলীয় সভাপতি চন্দ্রশেখর ও স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে লইয়া, যৌথ নেতৃত্বের পবিত্র গাত্র স্পর্শ করিয়া যে সব মহৎ প্রতিজ্ঞা

এ যাবৎ করা হইয়াছিল, যে তুচ্ছ পাত্রে রক্ত চন্দন এখনও শুকায় নাই, এখনও সেই লিখিত সনদ জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে—সেই পবিত্র যৌথ নেতৃত্বের পশ্চাৎ দেশে চৌধুরী চরণ সিং ছোরা বসাইয়া দিলেন। ইহা কম আফসোসের কথা। জনসংঘের নেতা অটল বিহারী, প্রতিজ্ঞার অটল দল ভাঙ্গা হইবে না। গাছের গোড়া কাটিয়া যদি আগায় জল ঢালিতে হয় তাহাও সই, কিন্তু দল ভাঙ্গা হইবে না। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দলের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হইয়াছে, ইতিমধ্যেই ভারতীয় লোকদলের কর্তারা মোরারজী দেশাইয়ের বিরুদ্ধে এক একটা বিষাক্ত বিবৃতি দিয়া, মন্ত্রীত্ব পদ ত্যাগ করিতেছেন। এমন শৃঙ্খলা; এমন দলীয় শৃঙ্খলা যে দলের (জনতা দলের) আঁতুড়ের গন্ধ যায় নাই সেখানেই সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা রোগের লক্ষণ। এই অস্থিরতা প্রবণতা আজ সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। ইহার একটা বিশেষ কারণ হইল বিশ্বের দ্রুত রাজনৈতিক কর্ম্ম ও মেজাজ। হয় তো দলের জন্মই মুসলিম লীগের মত বিশ্বের হইতে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শুধু বিষোদ্গার করিয়া এবং জনসাধারণকে তাদের প্রকৃত দায়িত্বের ভূমিকা হইতে দূরে সরাইয়া এমন একটি অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, যে তাহারা উত্তেজনা বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে। উত্তেজনার খোরাক না থাকিলে এমনি বক্তৃতাও ভাল লাগে না। ভারতবর্ষে এই পরিস্থিতি গুরুতর বিপদের সংকেত বহন করে। আজ রাজনীতিক দলকে যেভাবে ছেটো কেনা বেচার পরিণত করা তার অনিবার্য্য ফল হিসেবে দেশ গঠন ধামাচাপা পড়িয়া যাইবে। আর কলহ-কোন্দলে যেটুকু সহনশীল তাবৎকালে হইয়াছিল তাহাতে মরিচা পড়িয়া যাইবে। বস্তুত পক্ষে তাহাই হইয়াছে। Rolling Plan নামক একটি কথা বাহির হইয়াছে। ইহার নাক, মুখ দেহবপু কি রকম তাহা বোঝা যাইতেছে না ওদিকে চৌধুরী চরণ সিং তাহার বিবৃতি বলিতেছেন, নেহেরুবাদ বনাম গান্ধীবাদ লড়াই শুরু হইয়াছে। কে বাঁচিবে তাহা বলা দুষ্কর, তবে দেশবাসী বাঁচিবে ত? ইহাই আমাদের জিজ্ঞাসা। কিন্তু ভাব দেখিতেছি, যদি দলই না থাকিল, ক্ষমতা হস্তচ্যুত হইল, তবে দেশের মানুষ দিয়া কি হইবে? এমতাবস্থায় দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে নির্বাচনের মারফৎ নূতন করিয়া জনমত যাচাই করা উচিৎ।

———

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীকীরোদ দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুলিতে গোয়েন্দা পুলিশ হরিপদ দে নিহত হন ১৯১৩ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর এবং এর পরের দিনই ৩০ শে সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের গোয়েন্দা ইন্‌সপেক্টর ধরিম চৌধুরী নিহত হন। এই সকল ঘটনার পরেই ২১ শে নভেম্বর সমিতির রাজাবাজার কেন্দ্র তল্লাসী হয়। দিল্লীতে হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টার পরে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। তল্লাসীর ফলে এখানে দলের সিবার্টি লিফলেট পাওয়া গিয়েছিল। রাজাবাজারে অনুসন্ধানের ফলে নারিকেলের মালা পিউরিক এ্যাসিড এবং বোমার খোল প্রভৃতি পাওয়া যায়। সরকারী বিশেষজ্ঞগণ বলেন দিল্লীতে মৌলবী বাজারে এবং লাহোরে যে ধরণের বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে তা একই ধরনের উদ্ভাবনী শক্তি প্রসূত এবং রাজাবাজার কেন্দ্র থেকে এর উদ্ভব বলে মনে হয়। রাজাবাজার কেন্দ্র তল্লাসীর পরে দীনেশ গুপ্তগুপ্ত, সরলা গুহ এবং চন্দ্রশেখর দে এখানে গ্রেপ্তার হন। পরে কালীপদ ঘোষকে কলেজষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার করা হয় ৬ই ডিসেম্বর। দুই মাস পরে ১৯১৪ সালের ২৬ শে জানুয়ারী বরাহনগরে খগেন্দ্র চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আলিপুরের ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা ইন্‌সপেক্টর বীরেন্দ্র ঘোষকে ১৯১৪ সালের ১৯ শে জানুয়ারী চিৎপুরে হত্যা করা হয়।

চোদ্দমাস আন্ডারট্রায়াল থেকে ১৯১৫ সালে ১৩ই ফেব্রুয়ারী পুলিনবাবু ঢাকায় আসেন। এরপর থেকেই কর্তৃপক্ষ ষড়যন্ত্র মামলার উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করে। ৩রা আগষ্ট রাত দুইটার সময় এক সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাধারণ আদালতে বিচার না হয়ে রমনার মাঠে এক নির্জন বাড়ীতে আদালত বসে। সেখানেই ম্যাজিষ্ট্রেট বেন্টিঙ্ক প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ করেন। মামলা আরম্ভ হতেই উকীল হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, কলকাতার পি. মিত্র, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, হিরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মাঝে মাঝে গিয়ে তাদের নির্দেশ নিয়ে আসতেন। দুই তিন মাস ধরে এখানে স্বাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হয়। তারপরে একমাত্র আসামী টাঙ্গাইলের অমরেন্দ্রনাথ ঘোষকে মুক্তি দিয়ে অপর চুয়াল্লিশ জনকে দায়রা সোপর্দ করা হয়। ১৯১১ সালের ২রা জানুয়ারী ঢাকায় অতিরিক্ত জজ মিষ্টার হুইটের আদালতে দায়রা বিচার আরম্ভ হয়। এবারের আদালত বসেছিল ঢাকার ডিসট্রিক্ট বোর্ড ভবনে। আসামী পক্ষ সমর্থন করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তিনি ছয় মাস যাবৎ এই মামলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সরকার পক্ষে কৌসলী ছিলেন মিষ্টার গার্থ, মিষ্টার আলটন এবং মলিনী গুপ্ত আসামী পক্ষে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, শশাঙ্ক বসু, বিভূচরণ গুহঠাকুরতা, বিনোদচন্দ্র গুহমুস্তফী, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন মজুমদার, মন্মথ বসু, তরণী সাইন প্রভৃতি উকীলগণ দেশবন্ধুকে সাহায্য করেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার একটি বিশেষত্ব এই যে মামলায় কোন রাজসাক্ষী হয় নাই। হেমেন্দ্রবাবু মাঝে মাঝেই কলকাতা গিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং মোকদ্দমার কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে আসতেন। অনুশীলন সমিতির অধিনায়ক পি. মিত্রের সঙ্গেও মাঝে মাঝে তিনি সাক্ষাৎ করতেন। মামলা চলতে থাকা কালে ২৮শে সেপ্টেম্বর পি মিত্রের মৃত্যু হয়।

দায়রা বিচারে পুলিনবিহারী দাস, আশুতোষ গুপ্তগুপ্ত এবং জ্যোতির্ময় রায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হন। মধ্যপাড় গ্রামের প্রবীন কর্মী গোবিন্দসেন এবং ঢাকার উকীল ললিতমোহন রায় ও আরও ছয় জন দায়রা বিচারে মুক্তি পান। বাকী সকলেই বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হন। হাই-কোর্টে আপীল করা হয় বিচারপতি হ্যারিংটন, স্যার আশুতোষ মুখার্জী এবং স্যার কাণ্ডপোডেলির নিকট আপীলের শুনানী হয়। আপীলের বিচারে পুলিনবাবু, জ্যোতির্ময় রায় এবং আশুতোষ গুপ্তগুপ্তের যাবজ্জীবন দ্বীপা-

ছয় থেকে ছাদ পেয়ে তারা সাতবৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। দীনেশ গুহমুস্তফী প্রভৃতি একুশজন মুক্তিলাভ করেন প্রফুল্ল সেন, রাধিকা রায়, ক্ষীরোদ গুহ, শান্তি মুখার্জী, জ্যোতি সেনগুপ্ত, নিশিকুমার মিত্র প্রভৃতি বিপ্লবী কর্মীগণ বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পরেও অনুশীলন সমিতিকে দমন করা সম্ভব হয় নাই। ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মামলা চলতে থাকা কালেই মামলা তদন্তকারী গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর শরৎঘোষকে গুলি করা হয়। নৃপেন চক্রবর্তী এবং হিরণ্ময় গুপ্ত শরৎ ঘোষকে গুলি করেন। বিচারে তারা দুজনেই মুক্তি পান। গোয়েন্দা কনষ্টেবল রজনীলাল রায়কেও এই সময়েই গুলি করে হত্যা করা হয়। এছাড়া বহু ডাকাতিও এই সময় অনুষ্ঠিত হয়। হলদিয়া ডাকাতি হয় ১৯১০ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর। ১৯১০ সালের ৭ই নভেম্বর ফরিদপুরে কলারগাঁও ডাকাতিতে বারো হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। ৩০ শে ব্রিশাল জেলার দাদপুর ডাকাতিতে প্রায় সত্তর হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। ১৯১১ সালের ৩০শে ফেব্রুয়ারী পতিতসার ডাকাতিতে সাড়ে পাঁচহাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। ২৯ শে ফেব্রুয়ারী গাইবিয়া ডাকাতিতে আট হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। ৩১ মার্চ হুকার ডাকাতিতে এবং ১লা জুন মাদারিপুর ডাকাতিতে কয়েক হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। ২০ শে জুলাই গোলকপুরের জমিদার গৃহ থেকে কতকগুলি বন্দুক অপহৃত হয়। এ ছাড়া এপ্রিল ও মে মাসে রজনীলাল সরকার, কালী বসু, বিভূতি প্রভৃতি ডাকাতিতে কয়েক-হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়েছিল। ১৯১২ সালের ১০ই জুলাই ঢাকা জেলার পানাম নামক স্থানে এক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ২০ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই জুলাই মাসেই সমিতির অধিনায়ক নারায়ণ চক্রবর্তীকে হত্যা করা হয়। ৯ই নভেম্বর কয়েকজন কর্মী কুমিল্লা শহরে ডাকাতির উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছিল। পুলিশ হঠাৎ তাদের সন্ধান পেয়ে গ্রেপ্তার করে। বিচারে রমেশ আচার্য প্রভৃতি দশজনের সাত বৎসর করে কারাদণ্ড হয়। আদিত্যচরণ সেন, ঠাকুরদাস পাল প্রভৃতি মুক্তি পান। ১৯১২ সালের ১৯ই নভেম্বর ঢাকা জেলার প্যারীশাখারীর বাড়ীতে ডাকাতি করে এক হাজার টাকা এবং কিছু গহনা পাওয়া যায়। এই ডাকাতি সম্পর্কেই গিরীন্দ্র দাসের গৃহে অনুসন্ধান পাওয়া গেলে তার পাঁচ বৎসর কারা-দণ্ড হয়। ১৯১০ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত এই অনু-শীলন সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত এই সকল ঘটনা সম্পর্কেই কর্তৃপক্ষ বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করে। বরিশাল সমিতির পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ ঘোষ পরে ঢাকা থেকে রমেশ আচার্য গিয়ে জেলা সংগঠনের কার্যভার গ্রহণ করেন। অল্পবয়স্ক যতীন রায়ও ছিলেন সমিতির একজন বিশিষ্ট কর্মী। যতীন রায় ফেণ্ডরায় নামে পরিচিত।

বিভিন্নস্থান থেকে সাঁইত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা আরম্ভ করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পরে নয়জনকে মুক্তি দেওয়া হয়। বরিশালের মামলা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে শেষ পর্যন্ত ছাব্বিশ জনের বিচার হয়। দুইজন রাজসাক্ষী হয়। এদের নাম গীরীন্দ্র দাসগুপ্ত এবং রজনীকান্ত দাস। বিচারে ছাব্বিশ জন আসামীর মধ্যে নরেন্দ্র সেন, মুনীন্দ্রভূষণ রায়, ধীরেশ বসু হেমেন্দ্র মুকুটি প্রভৃতি চোদ্দজন মুক্তি পান। হেমেন্দ্র মুকুটি নোয়াখালি জেলার গোসাই দুর্গাপুর স্কুলের হেড-মাষ্টার ছিলেন। বাইশ জন নিম্নলিখিত রূপ বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হন।

১) রমেশ আচার্য ঢাকা বানারিপাড়া বারো বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত।

২) যতীন রায়—বারো বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত।

৩) রোহিনী গুহ—দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত।

৪) নিবারণ কর—দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত।

৫) যতীন ঘোষ—দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত।

গিরিনাথ আচার্য, কুমুদ নাগ, দেবেন্দ্র মল্লিক এবং গোপাল মিত্র প্রত্যেকেই সাত বৎসর করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নিশি ঘোষ, চণ্ডী বসু এবং দেবেন্দ্র ঘোষ পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সমগ্র ১৯২৩ সাল ধরে এই মামলা চলে ১৯১৪ সালের পনরই জানুয়ারী বিচারক রায় দেন। (চলবে)

জনতাদল কোন পথে

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি কিছুদিন ধরেই জনতা দলের মধ্যে একটা উত্তাপ দানা বাঁধছে। এদের উত্তাপ অল্পের অসহ্য। অন্তত জনতার পরিবেশ যে সুস্থ নয় এটা কিছুদিন ধরেই বোঝা যাচ্ছিল। এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে একটা শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যই দল মিলিত হয়েছিল গত ২২শে জুন। কিন্তু সেখানে আর যাই হোক শান্তির বাতাস যে বহে নাই তা আমাদের দূরে থেকেও বুঝতে ভুল হয় না। দলের নেতৃস্থানীয় ষোলজনের বিরুদ্ধে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে কার বিরুদ্ধে তবে প্রকাশ্য প্রচার অভিযান চালিয়েছিল সংসদীয় বোর্ডের কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কাল উত্তাপ কমে নি বরং বেড়েছে। একদল বলছেন, দলের জাতীয় কর্মসমিতির যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই জবাবদিহি নোটিশ দেওয়া হয়েছে বাইশে এপ্রিলের সে মিটিংএ এমন কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। সুতরাং এই কারণ প্রদর্শনের নোটিশ অবৈধ। দলের বিশিষ্ট নেতা এবং জনতা দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং বলছেন এই শোকজ নোটিশ দলের মৃত্যুর সঙ্কেত। এ পথে জনতা দলের মৃত্যুর পদধ্বনিই শোনা যাচ্ছে এবং এর পরে তাঁর নিজের পক্ষে আর মন্ত্রীপদে আসীন থাকা সম্ভব নয়। এর পরে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক জনতা দল কোনদিকে চলছে।

আজ পর্যন্ত জনতার আয়ুষ্কাল দেড় বছরের মধ্যে তার ভালমন্দ সম্পর্কে কিছুই বলিনি। জনতা দল যেদিন ছিল না সেদিনও দেশ ছিল এবং ভবিষ্যতে একদিন জনতা দল যদি না থাকে তাহলেও দেশ থাকবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ একান্তই ভবিষ্যতের হাতে। তা সত্ত্বেও জনতার কার্যকাল পূর্বভাবেই ভোগ করবে এটা ধরে নিয়ে আমরা আজ কয়েকটি কথা জানিয়ে দিতে চাই। আমরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে যেদিন সে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল সেদিনের অভিনন্দনের কথা। এরূপ অভিনন্দনের সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই দেখা যায়। কিন্তু আমরা যদি ভাতি ভুল করেছিল সেই প্রথম দিনেই। শিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হয় সেদিন কোন গৃহে আনন্দের রোল উঠে না কিন্তু নবকান্তিকে হাতে সংসার পরিচালনার ভার অর্পণের আগে দীর্ঘদিন ধরে তাকে লালন পালন করতে হয়। শিক্ষায় দীক্ষায় দৃঢ় করে তুলতে হয়। কিন্তু তা না হয়ে জনতা শিশু প্রথম দিনেই পরিণত বয়সের দায়িত্ব নিয়ে চলছে। শিশু অপরিণত বয়সে দায়িত্বভার পেয়েই ভুলের পর ভুল করে আসছে।

কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে পিতৃ-পিতামহের ঐতিহ্য নিয়েই শিশু জন্মলাভ করেছিল। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের এ ধর্ম সে ঠিকই চিনেছিল তাই বিভিন্ন দলের মিলনে সৃষ্ট ভারতের শাসকদল খুবই স্বাভাবিক হয়েছিল। তাই জাতীয়তাকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। কিন্তু প্রথমদিন থেকেই তার পদক্ষেপে ভুলের পর ভুল হতে লাগল। ঐক্যের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করেই সে ভুলে গেল মিলনের মধ্যেই ঐক্য আছে। জাতীয় জীবনে সে মিলনের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করল না। সে সন্ধান করতে লাগল পুরাতন দুঃখের বোঝাটুকু। এরই ফলে সবার দেশের জনসাধারণ যে আনন্দময় পরিবেশে

সৃষ্টি হয়েছিল তা রূপে উঠে গেল। সেখানে দেখা দিল পারস্পরিক দোষত্রুটি সন্ধানের পালা। জনতা জীবনে আজও সেই দোষত্রুটি সন্ধানের পালাই চলছে।

জন্মলাভের পরে শিশু প্রথম আশ্রয় করে তার মাকে, নবজাতক তার মাকেই প্রথম চেনে। কিন্তু জনতা শিশু জন্মলাভ করার পরে তার মা দেশকেও ভুলে গেল। মানুষের সুখ-দুঃখ বেদনার দিকে একবারও তাকাল না। দেশের শিল্প ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষের জীবনে আজ দুঃখ দুর্দশা চলছে সেদিকে সে একবারও দৃষ্টি দিলনা। সে শুধু পুরাতন গৃহের আবর্জনার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল। নূতন গৃহের নির্মাণক্ষেত্রে আজ চলছে লক আউট, ধর্মঘট, কারখানা বন্ধ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চলছে রাজনৈতিক দল সমূহের অস্থিরতা, কর্তব্য বিমূঢ়তা এবং পরস্পর হানাহানি। সাধারণ মানুষের জীবনে চলছে অনিশ্চয়তা, দৈনন্দিন অনাহার এবং অবিচার এবং অন্যায় উৎপীড়ন ও শোষণের ফলে জনজীবন যে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে জনতা সরকারের তা দেখবার ফুরসুত কোথায়। গত ষোল মাস ধরে সে শুধু ইন্দিরা গান্ধীর বিচার বিশ্লেষণ নিয়েই পড়ে আছে। আমরা আজ জনতা সরকারকে এ থেকে বিরত হয়ে দেশে শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করছি। এর ফলে শুধু যে জাতি বাঁচবে তা নয় জনতা জীবনের উত্তাপ ও ঘ্রাণ হয়ে তার পারস্পরিক দোষত্রুটি সন্ধান দূর হবে, আকাশ নির্মল হবে।

(চলবে)

বিপ্লবী সুধীর চন্দ্র মজুমদারের

—স্মরণ সভা—

আগামী ১৬ই জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ টায় অনুশীলন ভবনে সুধীর চন্দ্র মজুমদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীপৃথ্বীশ চন্দ্র বাগচি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন। সকলের সবান্ধব উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

ইতি—

শ্রীশচীন্দ্র নাথ গুহ ঠাকুরতা

সম্পাদক।

১০ই জুলাই, ১৯৭৮।

অনুশীলন ভবন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[রাজনৈতিক কার্য্যাবলী]

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পরে আমি জানতে পেরেছি যে বারাকপুরে ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যদের কোন সম্ভাব্য ঘটনার মোকবিলা করার জন্য সারাদিন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। বেঙ্গিনেটের অফিসারদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভারতীয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন আমারই মত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। এরা পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সরকারের আদেশের ফলে আমার বিরুদ্ধে যে মামলা হয় সে সম্পর্কে তাদের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয় এবং তারা আগে যা শুনেছেন তার চেয়ে আরও বেশী করে কিছু জানতে চান। আমলাতন্ত্র সব সময়েই স্নায়ুপীড়িত ও সন্দেহ প্রবণ হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারে তারা জনসমাবেশ ও সম্ভাব্য বিক্ষোভ বন্ধ করতে চেয়েছিল। এরা মুহূর্তের মত এত তোড়জোড় করে আন্দোলন দমনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল যার ফলে আমার কারাদণ্ডের কথা এমন শ্রেণীর লোকের মধ্যেও প্রচারিত হয়ে পড়ে, যারা তাদের বাসভূমির ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরের জগতে কখন কি ঘটছে তার কোন খবরই রাখে না।

আমার সম্মানার্থে কোনরকম জনসমাবেশ যাতে না ঘটে সে সম্পর্কে তাদের যে উৎকণ্ঠা তা, আমার কারাবাস কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আমাকে জেল থেকে খালাস করার সময় যে ছোট্ট কৌশলটি অবলম্বন করা হয়েছিল, তাতেও প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় সকাল ছটায়। অন্ততঃ ১৮৮৩ সালে এটাই নিয়ম ছিল। কিন্তু আমাকে ভোর চারটার সময় ঘুম থেকে ডেকে তুলে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে করে শহরের নানা আলো ঘুরিয়ে এনে জেলর সাহেব "বেঙ্গলী" পত্রিকার অফিসে বেলা ছটার সময় ছেড়ে দিয়ে যান। এই সব কাণ্ড কারখানা করা হয়েছে বিক্ষোভ বা জন সংঘট এড়াবার জন্য। কিন্তু এটা উট পাখীর কৌশলের মতই একটা কৌশল। এর ফলে হল এই যে যেখানে মাত্র এক জায়গায় একটি জন সংঘট হত, সেখানে দু-জায়গায় দুবার তা হল। আমার জেল-খালাসটি দেখবার জন্য যে জনতা সকাল বেলা প্রেসিডেন্সী জেলের চারদিকে জড় হয়েছিল। তারা সেখান থেকে চলে "এল বেঙ্গল" পত্রিকা অফিসে। এই চালাকি জনতার উৎসাহ ও আগ্রহ দ্বিগুন বাড়িয়ে দিল। একবার তাদের সমাবেশ হল জেলখানার সামনে, আর একবার হল "বেঙ্গল" অফিসের সামনে। বিপদে বুদ্ধি ঘটে আসে, যদি আদৌ সে বুদ্ধি আসে। যারা নিজেদের সবজান্তা মনে করে-দৃঢ় ভাবে সে বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে থেকে সময়ের ক্রম-বর্ধমান ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রতি চোখ-বুজে তাকাতে চায় না, তাদের অবস্থা এরকমই হয়।

রাজনৈতিক কার্য্যাবলী

আগেই বলেছি, কারাগারে আমার যাযাবরসুলভ অবসর জীবনটা আমি বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়েছি। কারণ এই সময় আমি পরিপূর্ণ বিশ্রাম পেয়েছি। কিন্তু মুক্তির পরে

আমার উপর গুরুভার রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব এসে পড়ল। আমি "জাতির অর্থ ভাণ্ডার" গড়ে তোলার আন্দোলনটিকে হাতে নিলাম। ১৮৮৩ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় দশ হাজারের উপর লোক সমাগম হয়েছিল। সভায় প্রস্তাব গৃহীত হল যে ভারতে এবং ইংল্যাণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় অর্থ-ভাণ্ডার গঠন করা হোক। আদালত অবমাননার মামলা এবং ভারতের ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের ক্রম বর্ধমান আন্দোলন আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল। এবং আমরা অন্যান্য প্রদেশ সমূহকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানালাম। ইলবার্ট-বিল আন্দোলনই পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেয় যে সারা ভারতের লক্ষ্য ও আকাঙ্খার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আদালত অবমাননার মামলা সেই ঐক্যের অনুভূতিকে আরও জাগিয়ে তুলেছে। এখন আমরা আমাদের নিজেদের প্রদেশের বাইরে তাকাতে শুরু করলাম, যিনিত ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা ও নৈতিক সমর্থনের মধ্য দিয়ে আমাদের শক্তি ও অনুপ্রেরণা লাভ করিতে চাইলাম। কংগ্রেস আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে যে নৈতিক পরিবর্ত্তনের পরিবেশ রচনার প্রয়োজন ছিল, তা ইতিপূর্বেই কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের বুকে গোড়া পত্তন হয়ে গেছে। এই সম্মেলনে ভারতের সর্ব প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি প্রেরণের আহ্বান জানান হয়েছিল।

ইলবার্ট-বিল বিতর্ক ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঐক্য বোধকে আরও বাড়িয়ে দিল। এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ডিফেন্স এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলল এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে তার শাখাও স্থাপিত হল। তারা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ও বিশেষ অধিকার সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে দেড় লাখ টাকার উপর অর্থ সংগ্রহ করেন। তাদের সংগঠন ও অর্থ সংগতি তাদের উদ্দেশ্যকে সাফল্য দান করল। সারা ভারতের শিক্ষিত সমাজ আগ্রহের সহিত এই সংগ্রামের গতি লক্ষ্য করতে থাকেন। তাদের চোখের সামনেই ইলবার্ট-বিল আন্দোলন, ও সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অন্য সব ব্যাপার ঘটছে। এই আন্দোলন তাদের যে শিক্ষা দিল তার প্রতি তারা উদাসীন থাকতে পারেন না। এই শিক্ষা ছিল-সংঘবদ্ধ হও, সংগঠন কর। শিক্ষিত সমাজের মনের মধ্যে এ ক্ষেত্রে একটা বঞ্চনাদায়ক অবমাননা বোধের পরিস্থিতিতে এই শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এই শিক্ষার ফল ফলিয়েছে। এই শিক্ষা পরিবেশকে শক্তিশালী করে কংগ্রেস আন্দোলন সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করেছে এবং আমি আগেই বলেছি বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই কলকাতায় প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলন সংগঠনে আমার প্রয়াসের অংশ নেহাৎ কম ছিলনা। ইলবার্ট-বিল আন্দোলনের প্রতি শিক্ষিত ভারতের একই জবাব ছিল এই জাতীয় সম্মেলন। এ যেন তাদের সোনার বর্ণ শিংগার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করা এক জোয়াল টানার ষাঁড়। তিন দিন ধরে সম্মেলনের কাজ চলে—২৮শে থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

যে সমস্ত প্রধান প্রধান প্রশ্ন আজও পর্য্যন্ত কংগ্রেস মঞ্চের মূলীভূত প্রশ্নরূপে দাঁড়িয়ে আছে, সেই সমস্ত প্রশ্নই তখনকার দিনেও আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয় এই সম্মেলনে প্রতিনিধি পরিষদ অথবা স্বায়ত্বশাসন, শিক্ষা (সাধারণ এবং কারিগরী (ফৌজদারী মামলা পরিচালনা সম্পর্কে প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক্ করণ এবং সর্বশেষে সরকারী কর্মে আরও অধিক পরিমানে আমাদের দেশের লোককে নিয়োগ করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়। প্রাচ্য জাতি সমূহের প্রতি দরদী মিঃ উলফ্রিড ব্লাণ্ট এই সময় ভারত-ভ্রমণ করছিলেন। তিনি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর "ইণ্ডিয়া আণ্ডার রিপন" পুস্তকে এই সম্মেলন সম্পর্কে তিনি যে ধারণা নিয়ে গিয়েছেন তা এই ভাবে বর্ণনা করেছেন:

"এখন বেলা ১২টা। আমি জাতীয় সম্মেলনের প্রথম

সভায় সেলাম। এই সম্মেলন বাস্তবিকই একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা। প্রায় সব বড়-বড় শহর থেকেই প্রতিনিধিগণ এসে এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন, এবং বন্ধু যেমন বলেছেন বাস্তবিকই তাই—এই সম্মেলনে জাতীয় পার্লামেন্টের প্রথম সূত্রপাত বলা যায়। একটি পরিকল্পনার উপর আলোচনা নিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হল। পরিকল্পনাটি ছিল শিল্প-শিক্ষার জন্য দেশের ছেলেদের ফ্রান্সে পাঠাতে হবে। কিন্তু আসল বিষয়টি ছিল সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি কর্তৃক সিভিল সার্ভিসের উপর আক্রমন। আমার জীবনে আমি যত ভাল বক্তৃতা শুনেছি তার মধ্যে তার বক্তৃতা একটি, এবং ঐ বিষয় সম্পর্কে আমার নিজের যে ধারণা তা তার ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। অন্যান্য বক্তারা তত ভাল বক্তা না হলেও তাঁরাও তাদের যোগ্যতা প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া একজন বুড়ো মত ভদ্রলোক এমন এক কৌতুকপূর্ণ বক্তৃতা করেন যে সকলে তাতে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। আমাকে সভায় কিছু বলতে আহ্বান করা হল। কিন্তু আমি রাজি হইলাম না। কারণ আমার ভ্রমন কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে আমার মতামত ব্যক্ত করতে ইচ্ছুক ছিলাম না। তবে বোম্বেতে আমি আমার মনোভাব প্রকাশ করব। সভায় উপস্থিত একমাত্র ইয়োরপীয় আমিই ছিলাম, এবং এই রকম একটা গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনার সময় উপস্থিত থাকতে পেরে খুবই আনন্দ লাভ করেছি। সভার আলোচনা পদ্ধতি আরও উপযুক্তরূপে পরিচালিত হতে পারত, যদি কে কে বক্তৃতা করবেন সে সম্পর্কে আগে থেকেই একটু বন্দোবস্ত করে নেওয়া হত। তবে মোটামুটি ভাবে সভার কাজ প্রশংসনীয় ভাবেই শেষ হয়েছে। ব্যানার্জি এবং বসু দু-জনেই উঁচু দরের বক্তা। সভার অনুষ্ঠান হয় এলবার্ট হলের উপর তলায়। সভায় শতখানেক লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার আগে একটি জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। গায়ক বেশ একজন জোর গলায় গাইয়ে ছিলেন। তিনি গীটারের মত একটি যন্ত্র-সংযোগে গান করেছিলেন।"

১৮৮৪ সালে আমি আর একবার উত্তর ভারত পরিক্রমায় গিয়েছিলাম। কলেজের কাজ করে, গরমের দীর্ঘ ছুটির সময় ছাড়া অন্য সময় কোন অবসর আমার ছিলনা। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমি কলকাতা থেকে যাত্রা করি। উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবের অত্যধিক গরম হাওয়ার ফলে রেল ভ্রমণ আরও কষ্টকর হল। আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন আমার এক প্রিয় বন্ধু বাবু গোবিন্দ চরণ দাস। হায়! সে বন্ধুটি আজ আর জীবিত নেই। তিনি হাই-কোর্টে ওকালতি করতেন এবং রিপন কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষাদান কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

আমরা লাহোর, অমৃতসর, মুলতান, রাওয়ালপিণ্ডি, আম্বালা, দিল্লী, আগ্রা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস এবং বাঁকিপুর পরিভ্রমণ করি। মুলতানের গরম হাওয়ার কথা আমি এখনও ভুলতে পারছি না। আমরা একটা বিশেষ আম্বালা-গাড়ী নিয়ে যাত্রা শুরু করি। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করা এবং বাংলা ও উত্তর-ভারতের যোদ্ধা-প্রকৃতির মানুষদের মধ্যে বন্ধুত্বের-ভাব জাগ্রত করা। সেদিন আমরা কোন কাজের লোক বলেই গণ্য হতাম না। সব সময়ই কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করে এ-কথাই জানিয়ে দেওয়া হত যে আমাদের যেকোন রকম রাজনৈতিক দাবী দাওয়ার কথাই হোকনা কেন, তা কেবলমাত্র গঙ্গাতীরবর্তী লোকদেরই দাবি যাদের ভিতর থেকে সৈন্য বাহিনীতে একজন লোকও পাওয়া যায় না এবং যারা উত্তর ভারতের শক্ত-সমর্থ জনগণ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ভাবে না হলেও আলাদা ভাবে বাস করে। এই রূপ কথাকে আমরা পরিহার করতে চাই। আজ কংগ্রেসের আবির্ভাবে সেই রূপ কথার কায়দা কেটে গিয়াছে। আজ স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপ্ত বিপুল সংখ্যক কণ্ঠ প্রত্যহ বর্ত্তমান ভারতের দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ জীবনের বাণী ঘোষণা করছে।

দশ বছর আগে আমাদের যে আহ্বান বাণী ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, এ-বারেও আমরা সেই একই আহ্বান জানিয়েছি। সিভিল সার্ভিস সমস্যা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে

ভারত যে আবেদন করেছিল, সে আবেদন এখনও মঞ্জুর হয়নি। সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বয়সের উর্ধতম সীমা এখনও বাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। কেবল মাত্র বিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের রীতি প্রবর্তন করে সামান্য একটুখানি সংশোধিত নমনীয় ভাব দেখান হয়েছে। উত্তর ভারতের বড় বড় সহর গুলিতে জনসভা করে সেই আবেদনই আবার জানান হল। এলাহাবাদ এবং কানপুর থেকে আরম্ভ রাওয়ালপিণ্ডি ও মুলতান পর্য্যন্ত সমস্ত বড় বড় শহরেই এই সভার অনুষ্ঠান হয়। সরকারের কাছে এই আবেদন করার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের কাছেও এক আবেদন জানিয়ে বলা হল যে আমাদের যেমন একটা অখণ্ড ভারতের মনে তোলা হয়েছে রাজনৈতিক কাজের জন্য সেই রকম একটা জাতীয় অর্থ-ভাণ্ডার গঠন করা হোক। অনতিবিলম্বেই আমাদের আন্দোলন সফল হল। শীঘ্রই সরকারের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেল। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এলা সর্ব-লম্বত ডেসপ্যাচে ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করা হল। এই ডেসপ্যাচে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়সের সীমা বাড়িয়ে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। পরের বছর একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিয়োগ করা হল এবং এই সুপারিশ ক্রমে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের উর্ধতম বয়স সীমা বাড়ীয়ে বর্ত্তমানে যা চলছে তা করা হল।

১৮৮৪ সালে লর্ড রিপন ভারত ত্যাগ করলেন। এই সময় জন সমাবেশ ও শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে জন-মনের যে অনুভূতি প্রকাশ ঘটে এর আগে ভারতের ইতিহাসে তা আর কখনো ঘটেনি। এংলো-ইণ্ডিয়ান সরকারী কর্মচারীরা যারা জনগণের কাছ থেকে সর্বদাই বিচ্ছিন্ন ও আলাদাভাবে বাস করতে অভ্যস্ত, তারাও উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলেন যে একটি জাতীয় আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। এই জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে ইতি পূর্বে তাদের ক্ষীণতম ধারণাও ছিল না।

"এ-ব্যাপার যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে এর অর্থ কী"? —এই শিরোনাম দিয়ে ভারতের অর্থ সচিব স্যার অকল্যাণ কলভিন্ বিস্রান্তচিত্তে একখানি প্যাম্পলেট প্রকাশ করলেন। এই প্যাম্পলেটখানা সে সময়ে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, এবং বহুলোক তা পাঠ করেছে। এই জন সমাবেশ ও শোভাযাত্রার ভৌতুস আমলা তন্ত্রের কাছে এক নতুনের আবির্ভাব রূপে দেখা দিল। তাদের এই উপলব্ধি কলকাতা থেকে বোম্বে পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করল, এবং অবসর প্রাপ্ত ভাইসরয় লর্ড রিপন যে সহর অতিক্রম করে গিয়েছেন তার সর্বত্রই শোভাযাত্রা ও বিদায় সম্বর্দনার আয়োজন করে জনগণ তাদের হিতৈষী রাজ-পুরুষের প্রতি তাদের আন্তরিক ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই সাবিক আলোড়নের স্বরূপ বর্ণনার জন্য এক প্রোজ্জ্বল সুষমামণ্ডিত অলংকারিক ভাষার সাহায্য নিয়ে—স্যার অকল্যাণ কলভিন্ বললেন "উন্মুক্ত উপত্যকা ভূমিতে শুধু অগ্নি জীবন-প্রেরণা লাভ করেছে।"

(চলবে)

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

যোগ সাধনা ও শ্রীঅরবিন্দের মৌন নির্দ্দেশ

শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতীয় যোগশাস্ত্রও সেইরূপ একটি সমুদ্রবিশেষ। এর বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে,—এর বিশাল বিস্তার ও তরঙ্গ গর্জনই মাত্র নজরে আসে। দুই একটি সন্ধানী ব্যক্তিকে মাত্র এর গর্ভস্থিত—রত্নাবলীর সন্ধানে নিযুক্ত দেখা যায়। বহু লোভনীয় বস্তুর আশ্বাসের আভাসই মাত্র এতে সূচিত হয়। সমুদ্র-মন্থনের ব্যাপক উদ্যোগ আর অমৃত-ভাণ্ড উদ্ধারের জটিল ব্যাপারটি নিয়ে কে আর মাথা ঘামাচ্ছে ?

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতাকে যদি আমরা "আসুরিক" নাম দেই, তবে বহু বিচক্ষন লোকও যে তাঁতে উঠবেন তাতে সন্দেহ নেই,—কিন্তু এ-কথা হয়তো অস্বীকার করার উপায় নেই, যে, এই সভ্যতার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির প্রেরণাটাই "আসুরিক" আখ্যায় অভিহিত হওয়ার যোগ্য। —কিভাবে,—সেই আলোচনায় আমরা পরে আসব,—পাঠক যদি ধৈর্য্য সহকারে—ততক্ষন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন, তবেই তিনি নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। —কারণ, লোভ ও লাভের আশাই—এদের সৃষ্টির প্রেরণা।

সে যাই হোক,—এই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ও তার ভাবধারার প্রভাবে শুধুমাত্র আশু ফলপ্রদতা এবং ব্যবহারিক লাভ-লোকসানের হিসাব দিয়েই সব বস্তুর মূল্য মানুষের সমাজে নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। একে অনায়াসে "বণিক—বুদ্ধি" বলা চলে। এদের মূল্যায়নের এই মাপ কাঠিতেই সমগ্র যোগশাস্ত্র না হলেও, যোগাঙ্গ গুলির মূল্য অল্পনা কিছুটা স্বীকৃত হয়ে আসছে। তাই আমরা, ভারতীয়রা, অবশ্যই খানিকটা গর্ব্ব বোধ করতে পারি। স্পুটনিকে মনুষ্যোত্তর জীব প্রেরণ করে সর্ব্বাংশে সফল পাওয়া যায় নি। তাই আজ শারীরিক গঠন ও বিশেষ বিশেষ—যোগ প্রক্রিয়ার সিদ্ধহেই মানুষকে ভবিষ্যতে স্পুটনিকে করে গ্রহে—গ্রহান্তরে পাঠাবার-প্রস্তাব নিয়েও কিঞ্চিৎ জল্পনা কল্পনার ও গবেষণার আভাষও পাওয়া গেছে বলে প্রকাশ মানুষের মেধা ও বীর্য্যশক্তির পরম ও চরম উন্নত সাধন করে, অতি মানসিক অবস্থার স্তরে মানুষকে উন্নীত করা, অথবা সুদীর্ঘ—জীবন লাভের উপযুক্ত সুস্থ সবল দেহ-প্রস্তুত করে দেওয়ার ব্যাপারে যোগশাস্ত্রের উপযোগীতা আজ বর্ত্তমান জগতে সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত।

যোগশাস্ত্রের ও যোগ সাধনার ক্ষেত্রে এ-সব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের বহুকাল পূর্ব্বেই শ্রীঅরবিন্দের তীক্ষ্ণ প্রতিভায় যোগপন্থার বৈশিষ্ট্য ও উপযোগীতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করাকে আজ আর অলীক বলে মনে করবার হেতু নেই।—

অরবিন্দের লিখিত "স্বাধীনতার অর্থ" নামে যে প্রবন্ধটির উল্লেখ ইতি পূর্ব্বে করা হয়েছে,—তার থেকে ছোট একটি উদ্ধৃতি দিলেই আমার বক্তব্যটি আরো স্পষ্ট হবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, যে, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা তখনও অর্জিত হয় নি। তিনি সেই প্রবন্ধে বলেছেন "জাতির পক্ষে স্বাধীনতা মুক্তির সূত্র ও আত্মরক্ষক। স্বাধীনতার জীবন রক্ষা, স্বাধীনতার উন্নতির সম্ভাবনা। স্বধর্ম অর্থাৎ স্ব-ভাব নিয়ত জাতীয় কর্ম ও চেষ্টাই জাতীয় উন্নতির একমাত্র পন্থা। বিদেশী যদি দেশ অধিকার করিয়া অতি দয়ালু হিতৈষীও হন, তাহা হইলেও আমাদের মস্তক পরধর্ম্মের ভার চাপাইতে ছাড়িবেন না। তাহার উদ্দেশ্য ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহাতে আমাদের অহিত ভিন্ন হিত

হইবে না। পরের স্বভাব নিয়ত পথে অগ্রসর হইবার শক্তি ও প্রেরণা আমাদের নাই,— সেই পথে আমরা অতি মন্দরকমে পরের অনুকরণ করিতে পারি, কিন্তু পরীক্ষাকালে আমাদের পরধর্ম সেবা সঙ্কুচ দুর্বলতা ও অসারতা বিকাশ পাইবে। আমরাও এই অসারতার ফলে বিনাশ প্রাপ্ত হইব। রোমের অধিকারভুক্ত, রোমের সভ্যতাপ্রাপ্ত প্রাচীন ইউরোপীয় জাতিসকল অনেকদিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শেষ-অবস্থা অতি ভয়ানক হইল' মনুষ্যত্ব— বিনাশে তাঁহাদের ঘোর দুর্দশা হইল,—প্রত্যেক পরাধীনতা প্রধান জাতির সেইরূপ মনুষ্যত্ব বিনাশ ও ঘোর দুর্দশা অবশ্যম্ভাবী "

সশস্ত্র বিপ্লববাদে বিশ্বাসী, বাংলাদেশের বিপ্লবী-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতার পাশ্চাত্য ধরণের রাজনীতির পথ ত্যাগ সিদ্ধান্ত যে হঠকারিতা বা ভাববিলাসের নামান্তর নয়, ভারতীয় বিপ্লবীদের-ভবিষ্যৎ মনুষ্যত্ব বিনাশের আশঙ্কা থেকে রক্ষা করতে, "স্ব-ভাব নিয়ত" হয়ে ভারতীয় কৃষ্টিধারার শ্রেষ্ঠ কর্মপথ, যোগচেষ্টা অবলম্বন করে, নিজের সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি নিজ সিদ্ধান্তের যোগ্যই প্রমাণ করে গেছেন। "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"— অর্থাৎ যোগেই কর্মের কৌশল,— গীতার এই উপদেশ বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই তিনি "স্বভাবত নিয়ত" ছিলেন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের কল্যানকামীদের জন্য শ্রীঅরবিন্দের স্থাপিত এই চারিত্রিক আদর্শ এদেশের ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়াছে। একে অবশ্য নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় কৃষ্টিধারায় বৈপ্লবিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত বলেও গণ্য না করে উপায় নেই —।

এই প্রবন্ধটির মধ্যে আরো একটি ব্যাপার অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজন্ম পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিবেশে লালিত পালিত ও পরিপুষ্ট শ্রীঅরবিন্দ সেই সভ্যতার থেকে কোন প্রেরণা-আহরন করতে পারেন নি,—এবং তা পারলেও যে তাতে আমাদের পক্ষে অহিত ভিন্ন হিত হবেনা, শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্টভাবেই সে কথার উল্লেখ করে গেছেন।

"আমাদের আশা"-নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে শ্রীঅরবিন্দ পরে বলেছেন—

"পণ্ডিত ও ভিরু ব্যক্তিগণ বলেন.....যুদ্ধই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ...(অথচ)...আমরা যুদ্ধ করতে অসমর্থ। —(আমরা) স্বীকার করিলাম, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ। আমরাও যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ নিই না। কিন্তু ইহা কি সত্য যে; বাহু বলই শক্তির আধার?—না, শক্তি আরও গুঢ়-গভীর মূল হইতে নিঃসৃত হয়? .....বাহুবলে কোন বিরাট কার্য্য সাধিত হওয়া অসম্ভব। যদি দুই পরস্পর বিরোধী, সমান বলশালীশক্তির সংঘর্ষ হয়, যাহার নৈতিক ও মানসিক বল অধিক যাহার ঐক্য, সাহস, অধ্যায় উৎসাহ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও স্বার্থত্যাগ উৎকৃষ্ট, যাহার বিদ্যাবুদ্ধি, চতুরতা, দীক্ষদৃষ্টি' দূরদর্শিতা, উপায় উদ্ভাবনী শক্তি বিকশিত, তাহারই জয় নিশ্চয় হইবে। এমন কি বাহুবলে সংখ্যায়, উপকরণে যে অপেক্ষাকৃত হীন, সে-ও নৈতিক ও মানসিক বলের উৎকর্ষে—প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটাইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে।—...এই ফলের বৈপরীত্য কেন হয়? ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত-সকল পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিব, আধ্যাত্মিক শক্তিই, বাহুবলকে তুচ্ছ করিয়া মানব জাতিকে জানায় যে; এই জগৎ ভগবানের রাজ্য,—অন্ধ মূল প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র নহে। শুদ্ধ আত্মাই শক্তির উৎস'— যে আত্মা প্রকৃতি গগনে অযুত সূর্য্যকে ঘুরাইয়া থাকে, অঙ্গুলি-স্পর্শে পৃথিবী দোলাইয়া মানবের সৃষ্টি পূর্ব্ব—গৌরব চিহ্ন সকল ধ্বংস করে,—সেই আত্মা—প্রকৃতি শুদ্ধ আত্মার অধীন। সেই প্রকৃতি অসম্ভবকে সম্ভব করে, মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করিবার শক্তি দেয়।"

যে আধ্যাত্মিক শক্তির এই দীপ্ত প্রশস্তিতে বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগী ও চিন্তানায়ক শ্রীঅরবিন্দ মুখর হয়েছিলেন, তার মূল যে কত গভীরে, যোগবল যে কত বড় শ্রেষ্ঠ বল, ভারতীয় আধ্যাত্ম—শাস্ত্রেও তার বহু সমর্থন উদাহরণ-স্বরূপ গীতার কথাই ধরা যাক। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৬ তম শ্লোকে আছে ——

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥ ৬।৪৬

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—হে অর্জুন তপস্তাপরায়ণ ব্যক্তিদের অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। নানা শাস্ত্রজ—পণ্ডিতগণ অপেক্ষা এবং বহুবিধ কর্মপরায়ণ কর্মীদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। অতএব তুমি যোগী হও'। অন্যত্র আছে যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ২।৪৮ অর্থাৎ, 'হে ধনঞ্জয়, সর্বপ্রকার আসঙ্গ অর্থাৎ কামনা ত্যাগ করে যোগস্থ হয়ে তুমি কর্ম কর। ফলাফলে সমত্ব অর্থাৎ নির্বিকার ভাবকেই যোগ বলা হয়।—

এই যে বার বার 'যোগ" শব্দটির প্রয়োগ গীতায় আছে এবং তার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে,—সে বস্তুটি কী? কী উপায়ে "যোগস্থ" হয়ে কর্ম করা যায়?

এ-সম্বন্ধে গীতার নবম অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে বলা হয়েছে।—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহম্। ৯।২২

অর্থাৎ, যাঁরা অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকে(অর্থাৎ ঈশ্বরকে) উপাসনা করেন, সেই নিত্যযুক্ত (বা নিত্য যোগস্থ) ব্যক্তিদের যোগ ও ক্ষেম [যোগৈশ্বর্য] আমি বহন করে থাকি।

এতে বুঝা যাচ্ছে একাগ্র বা অনন্য চিন্তাই যোগ এবং তাহাই যোগক্ষেম লাভের উপায়।—এটিই কর্ম করার কৌশল।—

কেন আমরা এই শ্রেষ্ঠ কৌশল অবলম্বন করছি না, বা করতে পারছি না, এবং শ্রেষ্ঠ এই যোগবলে বলীয়ান হয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার জন্য চেষ্টা করছি না?— এ-সব প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই, মনে উঠতে পারে। অনেকের মনে যে এসব চিন্তার উদয় হয় না,—এমনও নয়। কিন্তু কেন "যোগস্থ" বা একাগ্র হয়ে কাজ করা সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না?— তার উত্তর অনেকটা এইরূপ বলেই মনে হয়।—

বর্তমান মানব জগতের সমাজে কোন বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য না থাকলে—তাকে সচরাচর বাতিল করা হয়ে থাকে। বর্তমান সভ্যতাকে আধুনিক আখ্যা, দেওয়ায় যাঁদের চোখ চড়কগাছে উঠেছিল তাঁদের অবগতির জন্য বলা যায় যে, এই সভ্যতার প্রভাবে, বণিক-বৃত্তি মূলত—আন্তর্জাতিক ব্যবহারিক জগতের লাভ-লোকসানের হিসাবগুলিই শুদ্ধ সরল জিজ্ঞাসুর বিশুদ্ধ চিন্তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। বণিকেরা একহাতের ধন হস্তান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গেই, যদি অপর হাতে মুনাফা না লুটতে পারে,—তবে সেই আদান প্রদানের কোন মূল্যই তারা দেয় না,—এতেই তারা অভ্যস্ত। মানুষের মেধা, ধী-শক্তি, কর্মকুশলতা, উদ্ভাবনী শক্তি, এ সব মানসিক ও নৈতিক বলের কোন মূল্যই বণিকের কাছে নেই,—যতক্ষণ না এ সব বস্তু বাজারের পণ্যবস্তু হয়ে তাদের আয়ত্বে আসে—

মনে হয়, এইটিই মূল কারণ, যার প্রভাবে যোগাসনের তথাকথিত "ব্যায়ামত্বরের" এবং যোগ বিভূতির অস্তিত্বের সন্ধান আজ পাশ্চাত্য শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তাই বলে কি সমগ্রটা আজ মূল প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রেই রূপান্তরিত হয়েছে? শ্রীঅরবিন্দের উপরি-উদ্ধৃত মতে এটি কোন মতেই, কখনো, সম্ভবপর নয়।

শ্রীঅরবিন্দের সূত্র ধরেই এটি ধরা পড়েছে যে Nature বা আদ্যা প্রকৃতি শুদ্ধ, বুদ্ধ আত্মারই অধীন—তেত্রিশের অধীন নয়। এ বিষয়ে বিশ্বের মনীষী সমাজের প্রায় সকলেই একমত। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ, আইরিশ বার্নাড শ, ভারতের রবীন্দ্রনাথ, ইংরেজ বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতির বিভিন্ন উদ্ধৃতি দেওয়া আজ অনাবশ্যক বলেই মনে করি।

শুদ্ধ আত্মার প্রকাশ হয় নির্মল চরিত্র ও পবিত্র কর্মকাণ্ডের রূপায়ণে।—বর্তমান কালে এদেশীয় সমাজে যা নিতান্তই দুর্লভ বস্তু হয়ে উঠেছে। আজ ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্ছে তবুও বিশুদ্ধ কর্মকাণ্ডের রূপায়ণ কদাচিৎ মাত্র নজরে পড়ে।

(চলবে)

নাসিকা সংকট

শ্রীসতী ভূষণ সেন

গবেষণা চাপা পড়ল গাড়ীটা এসে পড়াতে। নাক নিয়ে গবেষণা। চোখই হোক আর বোঁচাই হোক, আয়নায় দেখতে নিজেরটি মোটামুটি ভালই। বিপদ হয় যখন জল ঝরতে থাকে, রুমাল ভিজে ওঠে। কোথায় ওর জলের উৎস জানাটা দরকার হয়ে পড়ে

আওয়াজে বুঝতে অসুবিধা হয়নি ওটা ডাক্তারবাবুর অ্যামবাসাডার। হাঁ করতে হল, জিভ দেখলেন। টর্চ জ্বেলে গলায় খুঁজলেন। নল ঢুকিয়ে বুকের আওয়াজ "আজ কাল চারদিকে সর্দিকাশী হচ্ছে। ভাইরাস ইন্‌ফেকশন বড্ড ছোঁয়াচে। সাবধানে থাকবেন। ভয়ের কিছু নেই। দু দিনেই সেরে যাবে।" প্যাড খুললেন, ওষুধ লিখলেন। ষোলটি টাকা পরিশ্রমিক নিয়ে, অন্য ভাইরাসগ্রস্থদের সন্ধানে ছুটলেন।

ছেলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে ভূতের গল্প শুনতেন, এ যুগের ভাইরাসও সেই রকম ভৌতিক ব্যাপার। চোখে দেখা যায় না, গা গরম, মাথা ধরা, লক্ষণ সবই আছে, নেই কোন বীজাণু। প্রতিষেধক নেই, ওষুধও আবিষ্কার হয়নি। আসবে যখন টেরও পাবেন না, যতক্ষণ থাকবে মাকালি চুবানি খাওয়াবে, হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কেন যে আসে আর কিসে যে যায়, দেবতারাও জানেন না। এমনি রহস্যময় বন্ধু এই ভাইরাস।

তা হলে গোড়া থেকেই শুরু। সেই বাস স্ট্যাণ্ডেই ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। আপনার অবশ্য মনে থাকবার কথা নয়। বাসটা থামতেই নামলো একটি রোগামত ছেলে। নামবার আগে তার একবার হাঁচি এসেছিল। অন্য যাত্রীদের অসুবিধা হবে তাই মুখের সামনে হাত দিয়ে ঢেকে, তাড়াতাড়ি হেঁটেছিল। আপনি তাকে হাঁচতে দেখেন নি। যে হাতল ধরে সে নামলো, সেটি ধরেই আপনি সুবুৎ করে উঠে বসেছিলেন। ছোট ছোট ঘাম লেগেছিল গায়ে। একটু খালি জায়গা পেয়ে বসে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন কপালটা ভালো। চশমা খুলে ভাল করে মুছে সহযাত্রীদের দিকে তাকালেন, চোখটাও মুছে নিলেন।

বাসের যে হাতলটা ধরে উঠেছিলেন, সেটা যদি ল্যাবরেটারীর সাধারণ মাইক্রোসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করতেন, রোগাছেলেটির হাঁচির কয়েক লক্ষ জলবিন্দু, যা ধুলোয় মিশে হাতলের সঙ্গে সেঁটে বসেছিল, সেগুলি চোখে পড়ত না। বাসের বদ্ধ বাতাসে যে বিন্দুগুলি ভেসে বেড়াচ্ছিল, তারাও মাইক্রোসকোপে ধরা পড়ত না। জলের বিন্দুতে যে ভাইরাসরা ভেসে বেড়াচ্ছিল, তাদের দেখতে পাওয়ার তো কথাই আসেনা। নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাদের আদর করে টেনে নিচ্ছিলেন মাকে; তারাও মনোমত পরিবেশ খুঁজে নিয়ে বসে পড়ছিল। বাসের হাতলের ভাইরাস আর জলবিন্দু অনেক খানিই আপনার হাতে লেগেছিল। চোখ মুছবার সময় তারা চোখের কোণায় আশ্রয় পেয়েছিল।

মানুষের নাক ও চোখে 'সিলিয়া ভাইব্রিং' আছে, তাদের কাজে নাক চোখ পরিষ্কার রাখা। মিনিটে ৬০০ বার করে তারা কাজ চালায়, নাক চোখ ঝকঝকে রাখে। কিন্তু এত বেশী বিন্দু ঘড় মুড় করে ঢুকতে থাকলে, কত আর পরিষ্কার করবে? কিছু কিছু বিন্দু নাক চোখের মিষ্টি

মিষ্টি গরম, জিভে ভিজে জমিতে সেঁটে বসে পড়ে। ধুলোর কণা যেমন তেমন, কিন্তু ঐ কণার সঙ্গে সন্ধির ভাইরাস যে প্রবেশ করেছিল, তারাই হল ভয়ঙ্কর নষ্টের গোড়া।

যে Cell এর গায়ে ওষুধ বসেছিল, ভাইরাসদের তুলনায় তারা হাজার গুণ বড়। হাতির গায়ে মশা বসার মত। পছন্দ সই Cellই বেছে নিয়েছিল ভাইরাসরা। বসেই আক্রমণ করে মুড়মুড়ি দিতে সুরু করেছিল। বোকা Cellগুলি তাতেই ভুলে গেল, আর দরজা খুলে অতিথিকে ভেতরে নিয়ে গেল। এর পর আরও ভয়ঙ্কর ভুল করে বসল। ভাইরাসের গায়ে যে শক্ত বর্ম ছিল, সেটা গলিয়ে ফেলে দিয়ে ওকে নিজের অঙ্গীভূত করে নিল। বুঝতেও পারল না কি সাংঘাতিক বস্তু এই 'ভাইরাস নিউক্লিক এসিড,' যাকে বুকে তুলে নিল।

এই নিউক্লিক এসিডের একটি মাত্র কাজ জানা বংশবৃদ্ধি। যদিও বংশ বৃদ্ধির কৌশলটা জানে না। মানুষের দেহের Cell কে দিয়ে সেই কাজটি করিয়ে নেওয়ার জন্যই তার শুভাগমন। Cell দের বংশবৃদ্ধির কারখানাটি ছলে বলে কৌশলে হস্তগত করে, প্রথমে Cell দের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়। তারপর সেই কারখানায় নিজেদের বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। প্রথমে তৈরারী করে নিউক্লিক এসিড। অনেকটা তৈরায়ী হবার পর বাইরের বর্মটি তৈরায় করে। শেষটায় নির্মান করে পুরো ভাইরাস। ভেতরে নিউক্লিক এসিড, বাইরে বর্মের আবরণ। প্রতি Cell এ প্রায় ১০০ টি ভাইরাস। এই ১০০ কোয়ার্ণ শেষটায় Cell টি ফেটে বাইরে বেরিয়ে আসে, আর বংশবৃদ্ধির তাড়ায় নতুন Cell এর সন্ধানে অভিযান করে।

এই সময়, প্রথম জেনারেশন ভাইরাসরা দেহে ছড়িয়ে যাওয়ার পরে আপনি প্রথম অনুভব করলেন, কেমন যেন গা ম্যাজ ম্যাজ করছে। হয়ত রোদে বসতে ভাল লাগল, এক পেয়ালা গরম চা, আদার রস মিশিয়ে খেয়ে ফেললেন। খেতে ভালই লাগল। একঝাঁক ভাইরাস বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে। রোদের আলো লেগে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। কয়েক হাজার ভাইরাস চা-এর সঙ্গে পেটে চলে গেল, তারা পেটের এসিড লেগে কোতল হল। কিছু গিয়ে পড়ল 'টনসিলে'; অমনি এলার্ম বেজে উঠল, দেহের 'লিমফোসাইট' রা বেরিয়ে পড়ল, ভাইরাস দেখলেই বধ করতে লাগল। কয়েকটাকে ধরে নিয়ে গেল দেহ অফিসে, ওদের সহজে বধ করবার ওষুধ তৈরায়ীর জন্য। ওষুধ তৈরায়ী হতে দেরী হল না, সেই এন্টি ধারোটিক ছড়িয়ে দিতে লাগল চারদিকে। কিন্তু 'লিমফোসাইট' রা যত ভাইরাস মারে, তার চেয়ে অনেক বেশী যে জন্মায়, তাই তো বিপদ। এইভাবে প্রথম দিনের যুদ্ধ শেষ হল।

দ্বিতীয় দিন। ভাইরাস সংক্রমণের ৪৮ ঘন্টা পরে, দ্বিতীয় জেনারেশন ভাইরাস জন্মাতে (ও মারাত্মক হতে) সুরু করল। এদের সংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি। নাকের সিলিয়া লাইনিং মরা cell দের পরিষ্কার করতে সুরু করল। জল পড়তে লাগল নাক দিয়ে। ঘন ঘন রুমাল দিয়ে নাক মুছবার দরকার হতে লাগল।

তৃতীয় দিন। ৭২ ঘন্টা পরে ভাইরাসদের তৃতীয় জেনারেশান জন্মাতে সুরু করল। এদের সংখ্যা হবে দশ হাজার কোটি। লিমফোসাইটরা যদি একটিকে বধ করে, দশ হাজার সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। মরতে মরতে, একমাত্র সংখ্যার জোরেই ওরা জিতে যেতে এই রকম জীব। আপনার শারীরিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। নাক ও চোখ দিয়ে প্রবল জল পড়ছে, মাথায় দারুন যন্ত্রনা। গলায় খুক খুক কাশি, চোক গিলতে দারুন ব্যথা। Sick Report করেছেন, অফিসে ছুটি নিয়েছেন, শয্যা গ্রহন করেছেন কাটা সৈনিকের মত। আদার রস দিয়ে গরম চা পান করছেন। এস পিরিন গিলছেন, ভিটামিন-সি খেয়ে যাচ্ছেন। ভ্রুক্ষেপও করছে না ভাইরাস, বেড়েই চলছে। শেষটায় ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হল।

চতুর্থ দিন। ৯৬ ঘন্টা কেটে গেল, হঠাৎ ভাইরাসদের বংশবৃদ্ধির কাজ থেমে গেল। কেমন যেন হত বুদ্ধি হয়ে

পড়ল ছোকরা ডাইরাসরা। কি যে করতে হবে বুঝতে পারছে না। অভাব হেওয়ার কোন লোক নেই বেন। সুযোগ পেয়ে লিমফোসাইটরা কেঁটিয়ে বধ করতে লাগল ডাইরাসদের। কাড়ুপারুরা মরা Cell ও ডাইরাস পরিষ্কার করে ফেলল। কি যে হল ডাইরাসদের, কেন যে ওদের বৈরাগ্য উপস্থিত হল, আজ ভিন বংশবৃদ্ধির কাজে, আজও বিজ্ঞানীরা বুঝে উঠতে পারেন নি।

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এইতো মাত্র ১৯৩৫ সালে প্রথম ডাইরাস ধরা পড়ল ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপে। জানা গেল সবচেয়ে ব্যাকটিরিয়ার চেয়ে ছোট, প্রোটিন, রাসায়নিক দ্রব্য এবং নিউক্লিয়াসের মৌলিক আর ফিউক্লিক এসিডের সংযোগে মিশ্রিত। ডাইরাস বহু প্রকারের, সব ডাইরাসেরই এক Composition। ভেতরে একই বস্তু, বাইরের বর্ম বা আধারটির আকার বিভিন্ন। এক এক আকৃতির খোলসে যেমন এক এক জাতীয় মন থাকে।

সর্দির ডাইরাসকে পৃথক পৃথক করা হল ১৯৩০ সালে। সেই থেকে পরিশ্রম কিছু কম করছেন না বিজ্ঞানীরা, টাকাও কিছু কম খরচ হচ্ছে না। ওকে পায়ের তুলে ওজন করেছেন, ভেঙে টুকরো করেছেন, ছিঁড়ে ছেড়ো দিয়েছেন টুকরোগুলো। দেখেছেন ওর গায়ের বর্ম এমন সহনশীল যে—১০০ ডিগ্রি ঠাণ্ডাতেও কোন ক্ষতি হয় না। এমন শক্ত যে মাধ্যাকর্ষণের একশত বেশী চাপও সহ্য করতে পারে। সর্দির ডাইরাসই আছে ১০০ আকৃতির। প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ওষুধ চাই। এই ১০০ ওষুধের কক-টেল বানিয়ে সেবন করলে আর সর্দি হবে না। ওষুধগুলো অবশ্য এখনো তৈরী হয় নি।

Moral বা উপদেশ।

মনে রাখবেন, ছোলা ডালনার ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয় না। হয় বহু দূরে, ডাইরাস নামক

ওষুধের বড়ি বা মিকশ্চার কিম্বা ভিটামিন-সি বড়ি সর্দি বন্ধে অ্যান্টিবায়োটিকের সাধ্য নেই সর্দির গায়ে হাত দেয়

সর্দি হলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। ওর কোন after effect নেই। যে আসে তাকে কদিন নিজের নিয়মেই চলতে, যাওয়ার না বলতেও না।

ডাক্তার ডাকলে এক সপ্তাহে ভাল হয়ে যাবেন, না ডাকলে সাত দিন ভুগতে হবে।

যকৃতের দোষে বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র
প্রস্তুতকারক শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী

RegdNo. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

e/36

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'ফলজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল, বি (কলি °) এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ব্যতীত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য ন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক ন্যূনপক্ষে ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা :

বি-৩৪, কানুনগো পার্ক, গড়িয়া, ২৪ পরগণা

৫ নং বাসরুট, বৈষ্ণবঘাটা ষ্টপ।

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীঅরীন রায়।

সম্পাদক—শ্রীশান্তি পরণ রায়চৌধুরী

বিপ্লবীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীঅরীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীমধুগোপাল পাল।

একাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীঅশোক গুহ।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১

মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০১

19 JUL 197

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৮৫ ২২শে জুলাই, ১৯৭৮	৪২ সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL REFERENCE LIBRARY

এই সংখ্যায়

আলেয়ার আলো
। শ্রীমতী হুষণ সেন

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

যোগ সাধনা ও শ্রীঅরবিন্দের মৌন নির্দ্দেশ
। শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন রায়গুপ্ত ।

জনতাদল কোন পথে
। বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানতঃ এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্ত সঙ্গোত্রীহে ইহার উদ্ভব।

—রবীন্দ্রনাথ

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	CALCUTTA		
Basu Narendra Mohan	28, Jogendra Basak Road Calcutta-36	200	1. 4. 78
Basu Smt. Saraju Bala w/o Late Upendranath Bose	1/65 Naktala, Calcutta-47	100 (Enhancement)	1. 10. 76
Bhattacharjee Bireswar	L/1 Rly. Qr Canal Junction Dakhindwari, Lake Town Calcutta-48	200	24. 1. 74
Bhattacharjee Kanailal	156 Acharya P. C Road Block K-4, Calcutta-6	200	16. 9 77
Biswas Smt Kalyani w/o Dharani Kanta Biswas	5/1F. Keyatola Road Calcutta-29	100	17. 12 77
Chakraborty Smt. Renuka w/o Late Narayan Chakraborty	123, S. P. Mukherjee Road Calcutta-26	100	26. 1. 78
Chowdhury Jogesh Chandra	1/16, Bapuji Colony, Cal-31	200	1 7. 77
Das Bhudeb Chandra	38 Chaulpatty Rd , Cal-10	200 (Enhancement)	1. 10. 76
Dutta Jogesh Chandra	22 Suren Sarkar Road, Cal-10	200	1. 5. 75
Gupta Smt. Nilima w/o Late Naresh Gupta	13 Sahid Dinesh Gupta Road Calcutta-34	Cancelled (Higher Income)	1. 4. 75
Majumdar Ganesh Chandra	34 Sevadar Road Calcutta-49	200 (Enhancement)	1. 10. 76
Mukherjee Sudhir Chandra (alias Fatik)	12 Netaji Colony, Lowland Calcutta-50	200	15. 8. 72
Mukherjee Smt. Renukona w/o Late Sachindra	Kakurgachi C. I. T. Block 3 Flat 14, Calcutta-54	100	20. 2. 77
Roy Pijush Kanti (alias Ramesh Ch. Roy)	32A/12 Suren Sarkar Road Calcutta-10	200	24. 3. 74 (instead of 21. 11. 75)
Saha Taraknath	30/2 Bagbazar St. Calcutta-3	200 (Enhancement)	1. 10. 75

(Contd. on 3rd cover)

আলেয়ার আলো

শ্রীমতী ভূষণ সেন

সহরের আলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মাটির মায়া কাটিয়ে সবাই ছুটে আসছে, আলো ঝলমল সহরের দিকে। কাল যা ছিল সাধারণ সহর, কাজে কর্মে আসা যাওয়া ছিল, আকর্ষণ ছিল না, আজ তাই হয়ে উঠেছে অপরূপ রহস্যময় এক মানবআবাস। তার অনুকূল প্রতিশ্রুতিই চোখে পড়ছে, প্রতিকূল সমস্যার কথা মনেও আসছে না। জলে ডুবে ডাঙ্গাগড়ার খেলার মত এ জনস্রোত আগেও ছিল, এমন করে চোখে পড়ত না। উপনীবেশ থেকে উঠেছে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে।

গ্রামে কাজ নেই ভাত নেই বলে যে দলে দলে মানুষ সহরে ছোটেন তা নয়। গোটেন গ্রামে সুযোগ নেই বলে। যারা উদ্যোমী ও সাহসী, যারা ডানপিটে তারাই গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। সহরে একটা উদ্দীপনা আছে, সব সময়েই কিছু না কিছু ঘটছে। দেখতে দেখতে বুদ্ধি খুলে যায়, কুড়িয়ে নেওয়ার মত সুযোগ পাওয়া যায়। খুব যে আরামের জায়গা ওটা তা নয়। আরাম খুঁজতে কেউ সহরে যায় না। যায় নিজেকে বিকশিত করতে, যায় নতুন পথ খুঁজতে। ঘুম কাতুরে গ্রাম আর ভাল লাগে না, কোলাহলের সন্ধানে সহরে চলে যায়।

লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা সহরে আসছেন, ঐ একটি আশা নিয়েই আসছেন, কিছু না কিছু ঘটে যাবে তাঁর জীবনে। এতো আলো, এমন ঘটনা প্রবাহ, এতো সব হাতছানি; তারই মাঝে মাঝে সুযোগের টিমটিমে আলো। কখন ঝলমল করে জ্বলে উঠবে কে জানে। সেদিনকার সেই আধা অজানা সহরটা কবে যে হঠাৎ কর্মব্যস্ত মানব মক্ষিকার মৌচাক হয়ে উঠল, জানি না। লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে পাঁচ লক্ষ [আকার্তা] তিরিশবছর পরে সেখানে সাড়ে পাঁচ লাখ মোটর ছোটাছুটি করছে, আর তার Exhaustএর ধোঁয়ায় চটপট করছে বিশ লাখ অধিবাসী। তবু মানুষ আসছে দলে দলে। আরেক সহরে [ব্যাংকক] এত বেশী মোটর চলাচল করে যে মোটরগুলি বাম্পারে বাম্পারে লাগিয়ে দাঁড় করালে সহরের ১৫০ কিলোমিটার পথ দুবার ঘিরে রাখা যায়। বুঝতেই পারছেন গত ক' বছরে কি পরিমাণ মোটর বেড়েছে জন সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, এবং জনসংখ্যা বেড়েছে আয়তনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। ফলে সহরগুলিতে যে পরিবর্তন এসেছে তা কল্পনাতীত। চওড়া চওড়া নতুন নতুন Avénue গজিয়ে উঠেছে, জ্যামিতির হিসাবের মত ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। Avenue-র মাঝ দিয়ে গেছে সবুজ ঘাসের 'মাল' [mal] দুধারে পাম গাছের সারি। পথের দুধারে আকাশচুম্বী হাইড্রোপাথ, আগের মত সাদা ও গ্রে কংক্রীটের দেওয়াই বাস্তব নয়, বাড়ীগুলি, রং বেরংএর কারুকার্য আর কাঁচে আলোয় লুকোচুরি। গরীব মানুষদের বস্তী ভেঙ্গে সরিয়ে নিয়ে গেছে দূরে, সরকারী খরচে Public Housing ফ্ল্যাট বানিয়ে সস্তা ভাড়ায় বিলি করেছে। ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করেছে যাওয়া আসার জন্য। এ যুগের ময়দানবেরা দ্রুত সহর বিস্তার করে চলেছেন। খুবই আধুনিক এবং সংস্কারমুক্ত তাঁদের কল্পনা। একমাত্র দুঃখ তাঁদের, যত প্রয়োজন রাজকোষে তত টাকা নেই।

সকলের উপরে টেক্কা দিয়েছে আমাদের সিঙ্গাপুর। আমার দ্বিতীয় যৌবনের সময় আপনারা যার প্রাচীন নাম 'সোনার' পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইংরাজের পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের ঘাঁটি সিঙ্গাপুর, আজ পুরো দ্বীপটি নিয়ে একটি megolopolis বা মহানগর হয়ে বসেছে। আমাদের এই সুন্দর বক্ষ ভেদ করে সহসাই আচমকা উর্বশীর মত পাতালফুঁড়ে উঠে আসে নি। গড়ে উঠেছে কঠোর প্রশাসনিক কর্মতৎপরতার ফলে। যার আর এক নাম বৈজ্ঞানিক। আমাদের বহু নিন্দিত emergency বীভৎস প্রয়োগের সুফল দেখা যায় এই নগর-রাষ্ট্রটিতে।

সিঙ্গাপোর থেকে যারা টুরিস্টরা পথে ফেলেছেন কি ঠিক চোখে পড়বে পুলিশের। জরিমানা হবে যাবে হাজার দুয়েক টাকা। আপনি সিঙ্গাপুরের নাগরিক, বলাই বাহুল্য কিম্বা নির্বাসি, সরকারী অফিসের খাতায় আপনার পরিচয় একটি নম্বর। Central computer এ আপনার রেকর্ড লিপিবদ্ধ হচ্ছে। জোথায় বাস, কি পেশা, ছেলেপিলে কটি। তৃতীয় সন্তান হওয়ার পরে জন্মনিরোধ অপারেশান করেছেন কি না, সব তথ্যের ভাণ্ডার। সরকার মোটরা করার শাস্তি পেয়েছেন সে তথ্যটিও বাদ পড়ে নি। এই computer বসানোর ফলে জনসংখ্যা সীমিত রাখাও সম্ভব হয়েছে। কখনো Rod পড়ছে পিঠে, কখনো carrot হাতিস দিচ্ছে। ছেলেমেয়েকে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করতে চান. computer বলে দেবে দুটি বাচ্চা হওয়ার পরে বাবা মা অপারেশন করিয়েছেন কি না। করিয়ে থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন গাড়ী চান, বাড়ী চান. চাকরীতে প্রমোশন কিম্বা ব্যবসায়ে পারমিট চান, ঐ নাসবন্দীর অপারেশনের সার্টিফিকেট দেখাতে হবে।

সর্বসাধারণের জন্য Public Housing Complex নির্মিত হচ্ছে। চাকরীতে ঢুকেছেন সার্টিফিকেট দেখালেই ফ্ল্যাট পেয়ে যাবেন, instalment চালাবে আপনার কোম্পানী। বাড়ী আপনার হয়ে গেল চিরকালের মত। অবসর নেওয়ার পরে বাড়ী ছাড়তে হবে না। বাড়ীগুলো পাড়ায় পাড়ায় ভাগ করে নির্মিত, কিন্তু এমনই অদৃষ্টের পরিহাস যে দুটি ফ্লাটের মধ্যে যে সখ্য করিয়েছে, সেটিই হয়ে উঠেছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, কোন প্রতিবেশীসুলভ সখ্যতা জমে উঠতে পারছে না।

অথচ বাইরে থেকে দেখুন zone এ zone এ ভাগ করা কেমন নিখুঁত পরিকল্পনা। এক এক শ্রেণী বাসের জন্য এক একটি zone আকাশচুম্বী Skyscrapper এর লাইন, এখানে ওখানে উত্তাল তরঙ্গের মত flyover। হেক্টারের এর পর হেক্টার সবুজ পার্ক, ঝলমলে ফোয়ারা দূর থেকে দেখলে মনে হবে স্বর্গ-পুরী। দুদিন বাস করুন, কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইবে। আগের দিনের মনোরম বিশৃঙ্খলা ও অকারণ কর্ম ব্যস্ততার অভাবে মন কেমন করবে। সেই যে খাই, এম. এ. র বন্ধুদের নিয়ে চায়ের দোকানে বসতেন, ভিড় বাড়তো আর চেয়ার আসতে লাগল. দোকান ছড়িয়ে পড়ল রাজপথে; গরম গরম চায়ের সঙ্গে মিশতো গরম গরম বক্তৃতা। সেই অনাবিল আনন্দের অভাব পীড়িত করে তুলবে মন। ভাববেন কি আছে এই ছককাটা সুখের জীবনে?

সহর বাড়ছে মানুষগুলি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। তার ব্যক্তিগত পরিচয় জোড়দার হচ্ছে, সামাজিক পরিচয় গড়ে উঠছে না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দূরত্ব বাড়ছে বই কমছে না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরী করেন, ভোরে উঠে কাজে বেরিয়ে পড়েন, ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। তখন কি কারো সঙ্গে গাল গল্পের শক্তি থাকে বা ইচ্ছা করে? এমনিই তো সহর জীবনের বহু ব্যর্থতার বোঝা-বিলা করতে জান শেষ, এর পর চিত্ত বিনোদন যদি করতে চান, যেতে হবে নাইট ক্লাবে; নয় window shopping এর জানলায় কিম্বা ঘরে বসে নয় চ্যানেল টি. ভি. খুলে চাই তুলতে থাকুন।

পরাধীন যুগের দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণের স্মৃতি যারা ভুলতে পারেন নি, তাঁরা বলবেন, তবু এ পরিবর্তন অলৌকিক। "পথের পাশে কুঁড়ে ঘরে যাথা গুঁজে পড়ে

থাকতাম, পেটে দুটো ধানা কোনদিন পড়তো কোনদিন পড়তো না। এখন আমার নিজের ফ্ল্যাট; যেখানে কাপবোর্ড আছে, টেবিল আছে, ফ্রিজ আছে। আর আছে রঙীন T.v.। আগের দিনে মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়ার জল আনতে হত এক বালতি, এখন কল টিপলেই জল পাচ্ছি। এ যে কত বড় আরামের বস্তু, আপনারা বুঝবেন না।"

সে তুলনায় আমাদের পুরানো কলকাতার তেমন কিছু পরিবর্তন হয় নি। পুরানো শহরের পেট ফুঁড়ে দু চারটে Sky Scrapper যথা তুলে দাঁড়িয়েছে এই পর্যন্ত। গোটা কলকাতা মিলে একটা মহা নগর বা megalopolis সৃষ্টি হয় নি। তাই কলকাতার মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিশতে পারে। কলকাতা মোহময়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মোহময় গন্ধ ধনী দরিদ্র সমান ভাবে ভোগ করে। কলকাতা বেঁচে আছে এখনও অতীতকে মুছে ফেলেনি বলে।

এর কারণ পাড়াগুলো এখনও টিকে আছে। ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে যায়নি। এক পাড়ার সবাই প্রতিবেশী মাসোমাসে তেরটি সার্বজনীন উৎসবের অংশীদার। মহোনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ঘটি বাঙালের চিরন্তন Fight এখনো আছে। কলকাতার আয়তন বেড়েছে, জনসংখ্যাও বেড়েইছে, তবু সে মহানগরের ভাবহীন আত্মকেন্দ্রিকতা স্বীকার করে নেয় নি। গলির মোড়ে মোড়ে ছেলেদের জটলা, পাড়ায় পাড়ায় যুবকদের সখলতা, ইউনিফর্ম পরা বাচ্চাদের মায়ের হাত ধরে ইস্কুলে যাওয়া এখনো টিকে আছে। এখনো দরিদ্ররা ধনীর পাশের বাড়ীতেই জন্মায়, এখনো পুরানো অট্টালিকার পাশেই গড়ে ওঠে নতুন কারখানা।

অনেকের কাছেই কলকাতা এখনও land of promise। যদিও কারোকাছেই এই শহর এখনো promised land হয়ে ওঠে নি। হবেও না কোন দিন। কারণ মাটির মানুষ আমরা; স্বর্গের উপরে কোন লোভ নেই।

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

যোগ সাধনা ও শ্রীঅরবিন্দের মৌন নির্দ্দেশ

শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হয়তো, এই দুর্লভ বস্তু,— অর্থাৎ নির্মলচিত্ত শুদ্ধ কোন আত্মার দেখা, জীবন পথে অনুতোভয়ে অগ্রসর হবার মত প্রেরণা পেতে পারে.— এই চরসাহই সব বন্ধ-জীবনের এই সমীক্ষার অবতারণায় লেখকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সে যা-ইহোক, যোগ-সাধনা সম্বন্ধে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের এ-পর্য্যন্ত আলোচনায় এটুকু বুঝতে পেরেছি, যে, যোগবল একটি শ্রেষ্ঠ বল, আর শুদ্ধ-আত্মা ব্যক্তির পক্ষেই তা লভ্য:— যোগের আটটি অঙ্গ, প্রত্যেকটির সাধনেই বিশেষ প্রকার শক্তি লাভ হয়ে থাকে।—"যোগ" বলতে মোটামুটি কায়মনোবাক্যের একাগ্রতা; সিদ্ধ ও অসিদ্ধির প্রতি নিস্পৃহতা; আর আত্মা-প্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্যের আত্মার নিবিড় সংযোগই বুঝায়। অর্থাৎ যোগে "অস্বাভাবিক" কিছু নেই। কিন্তু এটুকুই সব নয়। প্রাচীন কালের মনীষীরা অর্থাৎ ঋষিরা এই স্বাভাবিক একাগ্রতার সাধনাকে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা—নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে, একে একটি নিখুঁত শিল্পে বা আর্টে পরিণত করে গেছেন।— কিন্তু যোগশাস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অঙ্গ হতে পারে না;— তা' নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়।— বর্ত্তমানে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, সাধারণের দু'একটি ভ্রান্তি নিরসন করেই আমরা যোগ শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক আলোচনাটুকুর সমাপ্তি করব।—

ভারতীয় যোগশাস্ত্র নানা পুস্তকে রক্ষিত বিবরণে অতি সুশৃঙ্খল ভাবেই বিবৃত আছে। কিন্তু পুস্তক দৃষ্টে যোগ-সাধনার চেষ্টা করা বিপজ্জনক:— যে-কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সে সব পুস্তক পাঠে উপকৃত হবেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি "যোগী" হতে পারেন কিনা, তা সন্দেহাতীত নয়। —কারণ, যোগাঙ্গ গুলির অনুষ্ঠানের কালে, বহু প্রকার ব্যাবহারিক সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে যাদের সমাধান পুস্তকাদিতে অপ্রাপ্য। যা'হোক যোগ সাহিত্যের সামান্য প্রাসঙ্গিক পরিচয়টুকু এই :—

"শিব সংহিতায়" আছে —

মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়যোগস্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ সর্ব্বচিন্তাক বর্জ্জিতঃ। ৫।১৭

অর্থাৎ, যোগ প্রধানতঃ চার প্রকার— মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ। এই সব যোগে ভৈতভাব থাকে না অর্থাৎ এতে যোগস্থ বা যোগাকৃত হলে, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই তিনটিই সমভাবাপন্ন হয়ে পরমাত্মা মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

একাগ্রতা সাধনের এইটিই চরম অবস্থা।— একে বলা হয় "সমাধি"। ভারতীয় অদ্বৈত বাদের ব্যবহারিক পরিণাম।

যোগ যেমন চারপ্রকার, যোগসাধকও তেমনি চতুর্বিধ। মৃদু সাধক, মধ্যসাধক, অধিমাত্র সাধক ও অধিমাত্রতম সাধক। এই চার প্রকার সাধকের মধ্যে অধিমাত্রতম সাধকই সর্ব্বপ্রধান এবং শীঘ্র সংসার-সাগর উত্তরণে ক্ষমতাবান।—এদের সমস্ত বিস্তৃত বিবরণই শিব-সংহিতায় আছে। এখানে সেই বিস্তৃত বিবরণই নিষ্প্রয়োজন।—

মৃদুসাধক মন্ত্রযোগের, মধ্যসাধক লয়যোগের, অধিমাত্র-সাধক হঠযোগের, এবং অধিমাত্রতম সাধক সর্বপ্রকার যোগেরই অধিকারী। এই অধিকার ভেদ না মেনে উপায়

নেই। কারণ, শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণার হওয়ার উপযুক্ত অধিকারী-সীমাকে ঘিরে কবিতা লেখানো বা শ্রেষ্ঠ— কবির শক্তির অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে মন্ত্রযুদ্ধের পাঠ দিয়ে, শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণাকে পরিণত করাবার চেষ্টা সর্বতোভাবে পণ্ডশ্রমে পরিণত হতে বাধ্য। তেমনি যে-কোন অনধিকারীকে যে-কোনও যোগ-পথে চালিত করার ব্যাপারটিও পরিণামে পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। জীবে-জীবে মানুষে মানুষে, অঙ্গসংগঠনের উপাদানে, চারিত্রিক ও মানসিক গঠনে, এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে যে সব পার্থক্য বর্তমান, তাদের অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে কোন কার্যেই সাফল্য লাভ করা যায় না।—প্রত্যেক রাজনীতিকেরও এ সত্য অজ্ঞাত নয়।

অহিংসা পরম ধর্ম—এটুকু সবারই জানা আছে মহাভারতের সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা শ্রীকৃষ্ণেরও এটি অবশ্যই জানা ছিল। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ, ক্ষত্রিয় কুলজাত অর্জুনকে তিনি অহিংসার পথ থেকে নিরস্ত করে, উপদেশ করলেন—

"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ১১.৩৩

অর্থাৎ—'অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও ও যশোলাভ কর; এবং শত্রু বর্গকে পরাজিত করে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর। আমাদ্বারা (অর্থাৎ নিয়তির দ্বারা) এরা পূর্বেই নিহত হয়েছে। হে সব্যসাচী,—তুমি এদের বধ করার নিমিত্ত মাত্র হও।'

যোগ-সাধনার বেলায়, এই অধিকারীভেদের মীমাংসা কে করবে? শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সে যুগের বিচক্ষণতম নেতা। কিন্তু এ যুগে যোগ সাধকদের মধ্যে কে কোন্ যোগের অধিকারী তার মীমাংসক কে হবেন?—অবশ্যই সিদ্ধ যোগী ছাড়া এ কাজ করার সামর্থ্য আর কার আছে? তাই আজ দিনে, বিশেষ করে ভারতীয় সমাজে সিদ্ধ যোগীর জন্য খোঁজাখুঁজির অন্ত নেই।

যোগ সাধনার দেশ ভারতেও তাই আজকাল, নানান প্রকার বিভূতি প্রদর্শনকারী বহু সাধুর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এ সব তথাকথিত সাধুর বহু প্রকার অসাধারণ বা অলৌকিক কাজ কর্মকে আবার যোগ বিভূতির ফল বলেও দাবী করা হয়ে থাকে। এ সব সাধুবাবাদের মধ্যে কেউ বা আশ্রিতদের রোগ ব্যাধি দূর করছেন, কেউ বা শরণাগতকে মামলায় জয়ী করে, অথবা ধনপ্রাপ্তি করিয়ে দিচ্ছেন; কেউ বা নানা ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন, এবং তার কোন বাণী সফল হতে দেখলে, অনুগত শিষ্যবর্গের প্রচারণায় দেশতে তাঁরা যোগ-বিভূতির গৌরব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় আনুসংগিক হিসাবে প্রচুর অর্থও করে মহানন্দে জীবন-যাপন করে চলেছেন।—যে সব সিদ্ধ যোগীর জন্যে আজ কিছুটা খোঁজাখুঁজি চলছে—আমাদের জিজ্ঞাসা—এঁরাই কি তাঁরা? এঁদের জন্যেই কি সন্ধান চলছে বিশ্বের মানব সমাজের কোন কোন অংশে?

যোগ শাস্ত্রের কয়েকটি মৌলিক নির্দেশের ধারণা না থাকলে এ প্রশ্নের সহজ সরল উত্তরটি বুঝা যাবে না।—উত্তরটি অবশ্যই খুব সরল।—এবং সর্বজনবোধ্য।—

পূর্বোক্ত সাধু ও যোগীবাবাদের মধ্যে কোন সিদ্ধ যোগী যে থাকতে পারে না—এমন কথা বলা যায় না,—হয়তো বা কেউ আছেনও; কিন্তু সাধু বা সিদ্ধযোগীদের মূল্যায়নে যে মাপকাঠি ব্যবহৃত হয়েছে—সেটি একেবারেই অচল। অর্থাৎ, সাধুসঙ্গের সাধুত্ব বিচারের জন্য 'বিভূতি' নামক যে মাপকাঠি ধরা হয়েছে, সেটা নিতান্ত ভ্রান্ত। নানান অসাধারণ কাজকর্ম—যার মূলে যোগসিদ্ধির শক্তি আছে বলে মনে করা হয়,—তার অধিকাংশই যোগসিদ্ধির ব্যতীতই অর্জন করা সম্ভবপর।—আবার কিছুটা হাত সাফাই আর প্রচারক শিষ্যমণ্ডলীর সাহায্যে, স্বার্থান্বেষী তথাকথিত কোন কোন সাধুদেরও পক্ষে, যোগ-বিভূতির খ্যাতি অর্জন করাও তেমন শক্ত কাজ নয়, বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ ভারতীয় সমাজ। এছাড়াও—যোগ-শাস্ত্রোক্ত নানা শারীরিক ও মানসিক ব্যায়ামের ফল স্বরূপ নানা

প্রকারের ক্ষুদ্র সিদ্ধিও অর্জন করা যায়। যোগ শাস্ত্রোক্ত নানা প্রক্রিয়ার অভ্যাসের অবান্তর ফল স্বরূপ এসব ক্ষুদ্র সিদ্ধির উদয় হয়ে থাকে। সার্বীয়ের অবাক ব্যাপারের সঙ্গে সাধারণ প্রাণায়াম করে, কেউ বা মোটর গাড়ীর পূর্ণ চলন্ত বেগ রোধ করে দেয়। অথবা লোহার পাঁচ টন ওজনের রোলার বুকের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে, বা হাতীকে বুকে তুলে জন সাধারণকে বিস্ময়ে অভিভূত করে থাকেন। এঁরা যোগী হওয়া দূরস্থান—সামান্য অর্থ আহরণকারী ব্যবসায়ী মাত্র। এদের প্রণিপাত করে গণ্য করা যায় না। মানসিক একাগ্রতার জন্য নির্দিষ্ট যোগ ব্যায়ামের ফল স্বরূপ স্বর্গীয় গণিতজ্ঞ লোমেল চক্র বহু একশত সংখ্যক একটি রাশিকে, অপর একটি একশত সংখ্যক রাশি দিয়ে যৌথিক ভাবে গুণ করে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তার গুণফল সঠিকভাবে বলে দিতে পারতেন। তিনি এদেশ ও বিদেশের বহু বিদ্বজ্জন সভায় তাঁর এই শক্তির পরিচয় দিয়ে খ্যাত হয়েছিলেন। তিনিই বর্তমান লেখককে একদা বলেছিলেন যে এ শক্তি তাঁর মানসিক অভ্যাসের ফলেই আয়ত্ত হয়েছে। তিনি যে যোগ-সাধনারও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সে কথাও সত্য বটে। কিন্তু তিনি তাঁর অতিরিক্ত মানসিক শক্তির অনেকখানিই অর্জন করেছিলেন যোগ সিদ্ধির বহু পূর্বেই—একথা তিনিই বর্তমান লেখককে বলেছিলেন। তবে যোগসিদ্ধির ফলে তাঁর শক্তি আরও অধিক, আরো উন্নত, পরিপক্ক, দৃঢ় ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল, একথাও তিনি নিজমুখেই স্বীকার করেছিলেন।

এবার দেখা যাক, যোগ-বিভূতি সম্বন্ধে ভারতীয় যোগ-শাস্ত্র কী অভিমত দিয়েছেন। যোগ-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পাতঞ্জল দর্শন চারটি অংশে বা পাদে বিভক্ত। এর তৃতীয় অংশের নাম 'বিভূতি পাদ'। এ অংশ মোট ৫৫টি সূত্রে সম্পূর্ণ। ১৬নং সূত্র থেকে নানা প্রকার যোগ-বিভূতির বিবরণ ও তাদের অর্জনের উপায় বর্ণিত আছে। সে সব বিভূতির মধ্যে কয়েকটির নাম হল—অতীতানাগত জ্ঞান, জাতিস্মরত্ব, অন্তর্ধান, দূর-দর্শন, পরশরীরাবেশ, অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি ইত্যাদি—ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সবকে সাধারণতঃ যোগৈশ্বর্য বলেই অভিহিত করা হয়ে থাকে। অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি জনসাধারণের কিঞ্চিৎ বিখ্যাত বলেই, একটু বিশদ ভাবে বলা হচ্ছে।—১নং সিদ্ধির নাম অনিমা। এর মানে হল—কোন যোগীর দেহ যদি আয়তনে ও বিস্তারে বিশাল ও বৃহৎ হয় যোগবলে তাকে অণু অর্থাৎ পরমাণু তুল্য করার শক্তি। ২নং লঘিমা। শুরুভার দেহ হলেও, তুলার ন্যায় লঘু হওয়ার শক্তি। ৩নং—মহিমা বা গরিমা। ক্ষুদ্র দেহ হলেও, পাহাড় পর্বতাদির মত বৃহৎ হওয়ার সামর্থ্য। ৪র্থ, প্রাপ্তি।—ইচ্ছা মাত্র দূরস্থ অলভ্য বস্তুকে নিকটলভ্য করার সামর্থ্য। ৫ম প্রাকাম্য। ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাত, অর্থাৎ সকল ইচ্ছা। পর্বতের বা ভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছা হলেও, তাকে সিদ্ধ করার সামর্থ্য। ৬ষ্ঠ—বশিত্ব। যে-শক্তি অর্জন করলে, ভূত-ভৌতিক অর্থাৎ জড় পদার্থগুলিও বশীভূত অর্থাৎ আজ্ঞাকারী হয়ে থাকে। ৭ম—ঈশিত্ব। ভৌতিক পদার্থের উপর সর্বাত্মক কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা। অর্থাৎ, সিদ্ধ যোগী জড় পদার্থাদিকে যখন যেরূপ অবস্থায় রাখতে ইচ্ছা করেন,—সেরূপ রাখতে ও করতে পারেন। ৮ম—যত্রকামাবসায়ীত্ব; অর্থাৎ সত্য সংকল্পতা। যোগীরা এই সিদ্ধির বলে বিষকেও অমৃতশক্তি সম্পন্ন করে মৃত জীবকেও জীবিত করতে পারেন, আবার অমৃতকেও বিষে পরিণত করে জীবের মৃত্যু ঘটাতে পারেন।

এই হল মোটামুটি যোগসিদ্ধির বা বিভূতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার আমাদের সাধুবাবাদের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। পাতঞ্জলের "বিভূতি পাদে" বর্ণিত এসব সিদ্ধি বা যোগৈশ্বর্য সম্বন্ধে একটি সূত্রে আছে—"তে সমাধাবুপসর্গাঃ ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ"—এর অর্থ হল যে, এসব সিদ্ধি হল ব্যুত্থান সময়ে অর্থাৎ অযুক্ত বা সাধারণ অবস্থাতেই সিদ্ধি কিন্তু এরা আসলে যুক্ত অবস্থার অর্থাৎ একাগ্রতা বা সমাধি লাভের বিঘ্নকারী, অন্তরায় বা উপসর্গ।

(ক্রমশঃ)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যাবলী]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নাথের দেখবার মত চোখ আছে, তারাই এই জন-সমাবেশ প্রদর্শনীর মধ্যে সম্মিলিত জাতীয় জীবন লাভের সূচনা দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন ভারতীয় জনগণের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা—যা ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। লর্ড রিপণ যে আমাদের জন্য খুব বেশী কিছু করতে পেরেছেন, তা বলা যায় না। কিন্তু তাঁর সদিচ্ছা তাঁর উচ্চ আদর্শবাদ ন্যায় পরায়ণ নীতি ও বর্ণ-বৈষম্যের প্রতি তাঁর ঘৃণা এ সমস্তই ভারতীয়গণের নিকট পুঁথির খোলা পাতার মত উন্মুক্ত। তারা সে বইয়ের পাতা পড়েছে এবং একজন বিদেশী ইংরেজের কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। তারা দেখেছে এই ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর উৎসাহ-হীন আমলাতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যেও ভারতে ইংল্যাণ্ডের মহান মিলন কী, তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তা ভালমন্দ সব রকম রিপোর্টের মধ্য দিয়েই সফল করতে চেষ্টা করেছেন। কলকাতায় আমরা এক বিরাট জন সমাবেশের ব্যবস্থা করেছিলাম, সে কাজে আমার ভূমিকা আমি পালন করেছি। প্রকৃত পক্ষে এর আগের বছরই আমরা এই রকম এক জন-সমাবেশ করেছিলাম। তবে তা এ রকম আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল না। বেল-গাছিয়া গার্ডেনে সে সান্ধ্য মজলিস বসেছিল। সেখানে সমাজের উঁচু নীচু সব শ্রেণীরই বিস্তর লোক উপস্থিত ছিল। সেই অনুষ্ঠান দেখে এদেশ ইতিহাসবিদগণ বুঝতে পারল যে তারা ভাইসরয়কে প্রকাশ্যে বোঝাপড়া করেছে, তিনি এ দেশের লোকের কাছ থেকে এমন শ্রদ্ধা ভালবাসা পেয়েছেন যা ইতিপূর্বে আর কোন ভাইসরয় পান নি।

লর্ড রিপণের পরে লর্ড ডাফেরিণ এলেন ভাইসরয় হয়ে। ইংল্যাণ্ডে থাকা কালেই আমি লর্ড ডাফরিণকে জানতাম। সিভিল সার্ভিস কমিশন আমাকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে আমি যখন সঙ্কটে পড়েছিলাম, তখন দয়া পরবশ হয়ে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে আমার এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে নিজে থেকেই আমাকে চিঠি লিখে আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, এবং আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তার পরে বললেন যে তিনি তৎকালীন ভারত সচিব ডিউক অব আরগিলের নিকট আমার সম্পর্কে কথা বলবেন। তাই আগে থেকেই তাঁর প্রতি আমাদের এক অনুকূল মনোভাব ছিল। কলকাতায় এলে তাঁকে আমরা অভ্যর্থনা জানাতে চাই এবং এক মানপত্র দিয়ে স্বাগত জানাই। সেই মান-পত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রাদেশিক লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সংস্কার ও পুন-র্গঠনের প্রয়োজনীয়তার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই মানপত্রের খসড়া আমিই প্রস্তুত করে-ছিলাম এবং উহা ১৮৮৪ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁর হাতে অর্পণ করা হয়। এটা ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের ঠিক এক বছর আগের ঘটনা। মান-পত্রের যে অংশে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছিল সে অংশটুকু পুনরায় উদ্ধৃত করে দেখাবার মত। মাত্র কিছু কাল আগে যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করা হয়েছে, তার উল্লেখ করে পূর্বেই মানপত্রে বলা হয় :

"এই প্রসঙ্গে একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, ক্রমবর্ধমান জনমত যে সমস্ত শাসন সংস্কার দাবী করছে প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির দ্রুত পুনর্গঠন তার মধ্যে একটি। এই রকম একটা বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে পর্যালোচনা করার স্থান ও কাল এটা নয়; কিন্তু একথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে, বর্তমানে প্রাদেশিক আইন-সভাগুলি যে ভাবে গঠিত হচ্ছে তাতে জনমত প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। কারণ, বর্তমানের আইন সভাগুলিতে কোন প্রশ্ন করা যায় না আর্থিক বিলি ব্যবস্থার পরিকল্পনার অংশ গ্রহণ করার কোন অধিকার নেই, সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাই এখানে অনেক ক্ষেত্রে অধিক; এবং যে সব বে-সরকারী সদস্য রয়েছেন, তারা সকলেই সরকার মনোনীত ব্যক্তি। ফলে এই আইন সভাগুলি জনসাধারণের কোনটা বিশ্বাস অর্জন করতে

পারে না। এটা বিধান এগুলির দক্ষতার সহিত কাজ করার জন্য প্রয়োজন। এমন কি পার্লামেন্টারী ব্রিটিশ রাজমুকুটের দাস কলোনী 'সংহল রাজ্যের আইন পরিষদও অধিকতর ভাবে জনমতের আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত।"

শাসন-সংস্কার ও কাউন্সিল সমূহের পরিবর্তনের প্রশ্নে যখন এসে পড়েছি তখন যে প্রয়াসের ফলে এই বৃহৎ শাসন সংস্কারের সূচনা হয়েছে, তার কিছুটা উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। ১৮৮৭ সাল ছিল মহারাণীর জুবিলির বছর। ভারতে এবং ইয়োরোপের সর্বত্র যথাযথ আড়ম্বরের সহিত এই জুবিলি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। মিঃ (পরে স্যার) হেনরী হ্যারিসন তখন কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। কলকাতায় এই উৎসবের সমস্ত আয়োজন ও বন্দোবস্ত করার ভার ছিল তাঁর ওপর তিনি আমাকে মহানগরীর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাহায্য করতে এবং ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আগত নিমন্ত্রিত ডেলিগেটদের আপ্যায়নের ভার গ্রহণ করতে বলেন।

এখানে মুহূর্তের জন্য একটু থামি থেমে তাঁর হেনরী হ্যারিসনের প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করছি। ইংরেজ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যে কজন যোগ্যতম সহানুভূতিশীল বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়েছি তাঁর মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। আমার স্মৃতিতে স্যার হেনরী হ্যারিসন এবং স্যার হেনরী কটন এক অবিচ্ছিন্ন যুগ্ম সত্তায় বিরাজ করছেন। দুজনই অতি উচ্চস্তরের বুদ্ধি-দীপ্ত লোক ছিলেন। মাদ্রাজের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম টার্নার স্যার হেনরী হ্যারিসন সম্পর্কে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর বুদ্ধি নির্বাচন করতে ভুল করে ফেলেছেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান না করে তিনি যদি ইংল্যাণ্ডের বারে যোগদান করতেন, তা হলে এডভোকেট জেনারেল হতে পারতেন। তর্কের আসরে তিনি ছিলেন ঠিক যেন রিউপার্ট, তর্কে পণ্ডিত যত জন লোককে আমি এ যাবৎ দেখেছি, তার সর্বোত্তমদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। দীপ্তিমান, মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। তর্কের বক্তৃতার অবলম্বনাধারণ, অতি সুন্দর সুন্দর ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা ও ছিল অসাধারণ। আমি যতদূর জানি, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মধ্যে এই দক্ষতায় তাঁর মত লোক আর হয়নি। কলেজে পড়ার সময় তিনি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানরূপে, কিংবা তাঁর কোন সভার সভাপতি হিসাবে সমস্ত আলাপ-আলোচনায় তাঁর কথাই ছিল চূড়ান্ত। তাঁর বিরুদ্ধে ভোট সংগ্রহ করা ছিল একটা কঠিন ব্যাপার। এই কারণে আমরা একটা ফিকির আবিষ্কার করলাম প্রচলিত নিয়মের বদল করে ঠিক করলাম যে কোন প্রস্তাবের প্রস্তাবকই শেষ কথা বলবেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের আলোচনায় প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাঁরই ছিল শেষ কথা বলার অধিকার সুতরাং আমরা পরাজিত হলাম। তাঁর প্রাধান্যকে আর চ্যালেঞ্জ করা গেল না। কিন্তু তিনি তাঁর সেই প্রাধান্য সহৃদয়তার সহিত এবং সময় সময় তাঁর সহকর্মীদের সমর্থন নিয়েই, মর্যাদার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।

কলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে একবার একটি উপদলীয় চক্রের আবির্ভাব হয়। হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ছিলেন এই চক্রের নেতা। তিনি মহানগরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু ভাসা ভাসা অভিযোগ তুলে বিতণ্ডামূলক আলোচনার সৃষ্টি করেন। স্যার হেনরী সাহসের সঙ্গে কর্পোরেশনের পক্ষে দাঁড়ালেন এবং সরকারের সঙ্গে লড়াই করলেন। তাঁর এই কাজের জন্য শত্রু-মিত্র সকলের কাছেই তিনি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পেলেন। ইলবার্ট বিল নিয়ে বিতর্কের সেই ঘন অন্ধকারময় দিনগুলিতে বিদ্যুতের স্পর্শের মত বর্ণ-বিদ্বেষের ছোঁয়াচ যেরূপ চরম প্রকাশ লাভ করেছিল, সেই সময়ে স্যার হেনরী হ্যারিসন এবং মিঃ কটন তাদের কিড স্ট্রীটের বাড়ীতে এক ডিনারের আয়োজন করে সেখানে নেতৃস্থানীয় ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের নিমন্ত্রণ করেন। মিঃ কটন সেই ডিনারের সভায় যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে তিনি ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের সমানাধিকারের ভাব ব্যক্ত করেন, ১৮৮৪ সালে পাঁচদফা ঘটনার পরে আমরা যখন বাঙালীদের নিয়ে এক ভলান্টীয়ার বাহিনী গঠনের আন্দোলন শুরু করলাম, তখন তার দৃঢ় সমর্থন করে স্যার হেনরী হ্যারিসন এক প্যাম্পলেট প্রকাশ করেন। অথচ সরকার যে এই প্রচেষ্টার বিরোধী তা তাঁর অজানা ছিল না। সেই প্রচার পত্রে তিনি এই দাবী তুললেন যে

শিক্ষিত সমাজের ন্যায়-সঙ্গত অভিলাষকে পূর্ণ করতে হবে। শিক্ষিত ভারতীয়দের সম্বন্ধে তিনি বললেন :

"এখন এদেশের শিক্ষিত লোকেরা এজেন্টের কাজ করছেন, শিক্ষকের কাজ করছেন, বার্তাবিহের কাজ করছেন তাই বলে এরকম ভাবনায় আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় যে ভারতের যে শ্রেণীর মানুষের হাতে ক্ষুর রয়েছে, প্রেস রয়েছে, কোর্ট কাছারি রয়েছে সরকারী চাকরী রয়েছে, তাদের শিক্ষা যতই ভবিষ্যৎ ভারত অনিবার্যভাবে চিন্তা করবে ও কাজ করে যাবে। ভারতের মর্মবাণী, ভারতের চিন্তাই ভবিষ্যৎ ভারতকে পরিচালিত করবে, জনগণ হবে তার হাতিয়ার। জনগণই ভারতের শিক্ষাকে প্রতিফলিত করবে। সুতরাং সময় সময় এই ভাবনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, যদি আমরা নবীন ভারতের সঙ্গে আমাদের আচরণে এই মনোভাব দেখাই যে আমরা রাজনীতির দিক থেকে। (যেমন আমরা সাময়িক ব্যাপারে করে থাকি) সমাজের একটি নগণ্য অকিঞ্চিৎকর শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের কাজ-কারবার করছি, তা হলে তা হবে একটা প্রচণ্ড ভুল। যে তীব্র আবেগ এখন লাখ দুই মানুষের মধ্যে ফুটছে, তা বেরিয়ে আসবে। আর আসবেই বা বলছি কেন, এসে গেছে। এই আবেগ বিশ কোটি মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। তাই সব চেয়ে বড় ভুল যেটা আমরা করে বসতে পারি, তা হল এটা মনে করা যে এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক সম্পর্কের যে ফল তার শুরু ও শেষ কেবল মাত্র সেই শ্রেণীর লোকদের নিয়েই হতে পারে।"

দেশে ফিরে গিয়ে ১৮৯৬ সালে "কোয়ার্টারলি রিভিউ" পত্রিকায় ঠিক এই রকম ভাষাতেই স্যার হেনরী হ্যাবিসন লিখেছেন। তার লেখায় তিনি বললেন : "শিক্ষিত দেশীয় লোকদের উপর বিদ্বেষ চালাও, চালাও দমন নীতি তাদের আশা অভিলাষের উপর, দেখবে তোমরা এক কঠিন শত্রু সরকার বিরোধী বাহিনী সৃষ্টি করে ফেলেছ। আর যদি তাদের উচ্চাভিলাষকে পূর্ণ কর, চরিতার্থ কর, দেখবে তোমরা সরকারের মিত্র রূপে তাদের পেয়ে যাচ্ছ।"

এই প্রকৃতির লোক ছিলেন স্যার হেনরী হ্যাবিসন—একজন ইংরেজ, যার মত সুন্দর লোক ইংরেজদের মধ্যে কম দেখেছি। এখন আর তিনি বেঁচে নেই, অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন। তার বন্ধুত্ব আমি এক গৌরবময় অধিকার রূপে উপভোগ করেছি।

মহারাণীর জুবিলি উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমাকে স্কুল বোর্ডের নির্বাচিত ডেলিগেটদের আপ্যায়নের ভার করতে অনুরোধ করলাম, আমি মনে করলাম যে সমস্যাটিকে আমি সব চেয়ে প্রধান সমস্যা বলে মনে করে আসছি সেই শাসন সংস্কার ও লেজিসলেটিভ কাউন্সিলগুলির গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনর্গঠন—তাকে আমি এই সুযোগে তাদের কাছে তুলে ধরতে পারব। মফঃস্বলের প্রত্যেকটি মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে একটি করে অভিনন্দন পত্র উপস্থাপনের বন্দোবস্ত ছিল। আমি খুব সতর্কতার সহিত এই ব্যবস্থা করলাম যে প্রত্যেকটি অভিনন্দন পত্রে যেন শাসন সংস্কার কাউন্সিলগুলির পরিবর্তনের দাবিদেন থাকে। আমি সমস্ত মফঃস্বল মিউনিসিপ্যালিটির কাছে ঐ মর্মে এক সার্কুলার পাঠালাম এই সার্কুলারে আমুরিক সাড়া পেয়েছি। সবগুলি অভিনন্দন পত্র উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তার একটি থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি। সবগুলো অভিনন্দন পত্রই একই সুরে বাঁধা ছিল

"কৃতপূর্ব বিজ্ঞ ভাইসরয় মহোদয়ের ইচ্ছেমত দেশের সর্বত্র স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। এই স্বায়ত্তশাসন মোটামুটি ভাবে এমন সাফল্য লাভ করেছে যে নীতির ভিত্তিতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে সেই নীতিগুলির ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য এক সার্বজনীন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে; এবং জুবিলি দিবসের এই শুভ মুহূর্তে আমরা এই আশা প্রকাশ করার সম্মতি প্রার্থনা করছি। যে আপনার মহান মঙ্গলময় ও গৌরবময় রাজত্বের অধীনে ভারতের জনগণ যেন সেই উচ্চ অধিকার লাভ করে যা কেবল মাত্র আংশিক হলেও যেন প্রতিনিধীত্ব মূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের আবির্ভাব দেখতে পায়। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন সব সময়ই ইংরেজ সভ্যতার অনুসৃত নীতি এবং এটাই হচ্ছে ইংরেজ শাসনের সব চেয়ে মহাকীর্তি স্তম্ভ। (চলবে)

চিঠিপত্র

অনুশীলন সমিতির পরিচালক মণ্ডলী

শিয়ালদহ, কলিকাতা

আপনারা স্বাধীনতা সংগ্রামী 'সতীর্থ' দিগকে ২১শে মে তারিখে যে আবেদন করেছেন তা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। তার জন্য আপনাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিহড়া সেবা সদনে মহাত্মার ত্রৈলক্য চক্রবর্তী মহানায়ক রাসবিহারী বোসজী ওয়ার্ডে থাকবার সময়ে পত্রখানি পাই। বিপ্লবী বাংলার ১৭ই জুন তারিখে তা আবার ছাপা হয়েছে। ভালই হয়েছে এতে আরও বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই বিপ্লবী বাংলার মাধ্যমে আমার বক্তব্য প্রকাশ করছি।

আপনারা আমাদের সহানুভূতি সহযোগিতা ও পরামর্শ চেয়েছেন। আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি কারণ বর্তমান অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির কথা চিন্তা করিতেছেন। আমি ৮১ বছর অতিক্রম করছি—একেবারে পঙ্গু না হলেও শক্তি প্রায় নিঃশেষ—তবে বয়োবৃদ্ধ হিসাবে আন্তরিক আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

পরামর্শও চেয়েছেন—আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে তাও দিতে চেষ্টা করছি—ইংরেজীতে একটা ভাল কথা আছে—Fools rush in where wise men fear to tread (বুদ্ধিমান লোক যেখানে এগুতে ভয় পায়—বোকা সেখানে ঢুকে যায়) নিজেকে কেউ বোকা মনে করে না (আমিও না) আবার খুব বুদ্ধিমান বলে দাবী করবার সাহস নেই কারণ দীর্ঘ জীবনে ভুলের ত ছড়াছড়ি হয়ে গেছে এবং এখনও চলেছে। তবে 'চড়ে চড়ে' বুদ্ধি হয়ত কিছু বেড়েছে। তাই এ পত্র হয়ত এটাও বোকামি! তা হোক! এই বোকামী থেকেই হয়ত কেউ কিছু শিখবে। আপনারা প্রথমেই লিখেছেন দেশ জননীর শৃঙ্খল মোচন এবং সুখী সমৃদ্ধ শোষণমুক্ত ভারত গড়বার সংকল্প নিয়ে বিপ্লবের দুর্গম পথে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সত্যই কি শোষণমুক্ত ভারত গড়তে আমরা নেমে ছিলাম? ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির জন্য নিশ্চয়ই যাত্রা শুরু—কিন্তু সকল রকম শোষণ থেকে মুক্তির জন্য কি আমরা যাত্রা শুরু করি? হয়ত ঋষি অরবিন্দ করেছিলেন আমি নিজে এবং আরও অনেকে শুধু ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ১৯০৫ সাল থেকে অভিযান আরম্ভ করি। শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণের শোষণের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় কিছু অভিযান বিশেষতঃ অস্পৃশ্যতা দূর করার অভিযানে সামান্য অংশ নিয়েছি, কিন্তু মানুষের দ্বারা শ্রেণীর দ্বারা মানুষের শোষণ জিনিসটা আমার কাছেও খুবই অস্পষ্ট ছিল। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজ বিপ্লবের কয়েক বছরের মধ্যে তা আমার জ্ঞান বা বুদ্ধির কাছে ধরা পড়ে নি। আমার নেহাত সৌভাগ্য ক্রমে ১৯২২ সালের শেষে মস্কো উপস্থিত হই এবং সেখানে প্রাচ্য বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়বার সময় প্রকৃত শোষণ কি ও কিভাবে হয় তা বুঝতে পারি মার্কসের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও লেনিনের সক্রিয় কর্মপন্থা আমার চোখ খুলে দেয়। তা না হলে হয়ত আরো বহু বছর শুধু ইংরেজের শোষণের কথাই ভাবতাম।

আজ শ্রেণী শোষণ টাটা বিড়লা গোষ্ঠির শোষণ অতি কঠ, প্রত্যক্ষ ও বেদনা দায়ক—ইংরেজ শাসনের ৩০ বছর পরেও এই অবস্থা। জহর লালের ১৭ বছর পর তার মেয়ে ইন্দিরার শাসনের সময় তাই চলছে শ্রেণী সংগ্রামের ফলে শোষণ কিছুটা নিশ্চয় আমরা কমাতে পেরেছি কিন্তু মূল শ্রেণী শোষণ চলছেই—'জনতা' পার্টিতে বসলেও এক বছরে বিশেষ পরিবর্তন বা পরিবর্তনের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না।

তাই তীব্র অস্ত্র বিকাশের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এবং সাথে সাথে সমাজ বিপ্লব ও শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজনও অত্যাবশ্যকীয়তা ছাড়েগাড়ে শোষিত শ্রেণী বুঝতে পারছে—তাই অনুশীলন সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর এই নূতন পথে চলার চিন্তাকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'পথ অজানা' লিখেছেন কিন্তু পথ আর অজানা নয়। এই পথে চলার লোকেরও দৃঢ়তার অভাব। পথ নিয়ে মতভেদ নিশ্চয় আছে—তবে পথ চলতে আরম্ভ করলে ভুল হয় হবে। নির্ভীক ভাবে মত প্রকাশের জন্য একখানি মুখপত্রের প্রয়োজন সন্দেহ নেই—তবে যত দিন তা না হচ্ছে 'বিপ্লবী বাংলা'কে কি এই নূতন পথের মুখপত্র করা যায় না? নূতন মুখপত্র বের করা খুব অর্থসাপেক্ষ এবং কষ্টকর। তাই বিপ্লবী বাংলার মাধ্যমে আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করতে আরম্ভ করতে পারি। আমার সেই 'পরামর্শ'। আশা করি কর্তৃপক্ষ এটা ভাল করে ভেবে দেখবেন এবং সতীর্থরা এ সম্বন্ধে বিপ্লবী বাংলার মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করতে আরম্ভ করবেন।

আমি নিজে কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্র চালাবার চেষ্টা করেছি বহু বছর ধরে। তাতে আমার ও বন্ধু-বান্ধবদের বহু টাকা খরচও হয়েছে কিন্তু সেগুলি প্রায়ই শিশুমারী (child mortality) রোগে এক বা দুই বছরের মধ্যে উঠে গেছে। তাই নূতন আরম্ভ করার আগে পুরাতনের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করাই আমার সুচিন্তিত মত ও পরামর্শ। এ বিষয়ে আমার সতীর্থদের মতামত জানলে আমার বক্তব্য আবার উপস্থিত করতে চেষ্টা করবো।

যাবতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র
প্রস্তুতকারক: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
নীলকণ্ঠ কুটির • কুমার খুরু • বরাহনগর • ২৪ পরগণা

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ স্মরণীয়। এই বৎসর ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম। পরবর্তী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে বাঙলা দেশের বর্দ্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে এক শিশুর জন্ম হল। বাঙালী সেদিন শৌর্য-বীর্য হীন, সৈন্যদলে প্রবেশের অধিকার তার নাই। সেদিন কে জানত অখ্যাত বাঙালীর ঘরে জাত এই শিশু একদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সেনাপতির আসন গ্রহণ করবে। কিন্তু এই বিশ্বটে একদিন সত্য হয়ে দাড়াল। ভারতে শিখ, মারাঠা, রাজপুত, পাঠান প্রভৃতি বহু সামরিক জাত থাকা সত্ত্বেও অসামরিক বলে চিহ্নিত বাঙলা দেশে জন্মলাভ করেও এই শিশুই হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতি। জন্মের অল্পদিন পরেই মাতৃহারা হল শিশু। হুগলী জেলার পালরঘাটি গ্রামে মাতুলালয়ে শিশু লালিত পালিত হতে লাগল। কিছুদিন পরে পিতার সঙ্গে চন্দননগরে এসে বাস করতে থাকে। পিতা সরকারী উচ্চপদে সামরিক বিভাগে চাকরী করতেন সিমলাতে। শিশুকে চন্দননগরে মাসীর নিকট রেখে পিতা সিমলা চলে যান। এই শিশুই পরবর্তীকালে রাসবিহারী বসু নামে খ্যাতি লাভ করেন।

১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই জ্যোতিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে এই সমিতিতে এসে যোগ দেন। আরও ছয় মাস পরে বারীন্দ্রকুমার ও অরবিন্দের নির্দেশে কলকাতায় এসে বিপ্লব কেন্দ্রে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হয়। যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসার পরেই তিনি চন্দন নগরে ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে বিপ্লবী সংগঠন প্রসারের চেষ্টা করেন। এরই ফলে গড়ে উঠল প্রথম বিপ্লবী সংগঠন। চারুবাবু তার বন্ধু যোগেন্দ্র সেন, শান্তি ঘোষ প্রভৃতিকে নিয়ে গড়ে তুললেন সুবাদ সম্মিলনী। সংগঠনের কর্মসূচী হল পল্লীবালকদের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব সৃষ্টি করা এবং তাদের ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া। বালক রাসবিহারী এই সংগঠনভুক্ত হল ১৯০৪ সালে।

বাঙালী জাতির সামরিক শিক্ষা লাভের অধিকার নাই এজন্য সেদিনের তরুণ বাঙালী মাত্রেরই ক্ষোভ ছিল। বালক রাসবিহারী অন্তর ও এজন্য ক্ষুব্ধ ছিল। তিনি কিশোর বয়সে চন্দননগরে শিক্ষালাভ কালেই পণ্ডিচেরিতে ফরাসী সৈন্যদলে প্রবেশ করে সামরিক শিক্ষালাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু বয়স কম বলে তার আবেদন মঞ্জুর হয় নাই। কলকাতা ফোর্টউইলিয়াম কলেজে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যদলভুক্ত হবার চেষ্টাও তিনি করেন। কিন্তু বাঙালী হিন্দু বলে তার এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কিন্তু ব্যর্থতা মেনে নেবার পাত্রে রাসবিহারী ছিলেন না।

তিনি স্থির করলেন জয়পুরে গিয়ে সেখানকার দেশীয় রাজ্যের রাজার সৈন্যদলে ভর্তি হবেন। কাউকে কিছু না জানিয়ে একদিন তিনি জয়পুর অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে অনেক আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি তাকে ফিরিয়ে বাড়ী নিয়ে এলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও যে কোন রূপে সামরিক শিক্ষালাভই ছিল রাসবিহারীর লক্ষ্য। ১৯০৫ সালে ফোর্টউইলিয়াম কলেজে এক কেরানীর পদখালি হলে রাসবিহারী চেষ্টা করে এই চাকুরী গ্রহণ করেন। মাত্র দুই সপ্তাহ এই চাকুরী করেছিলেন। পরে সংযুক্ত প্রদেশের কাসালীতে গিয়ে তিনি বনবিভাগে একটি চাকুরী নেন, এবং অল্প দিন পরে দেরাদুন গিয়ে সরকারী বনবিভাগে চাকুরী আরম্ভ করেন দেরাদুনে সরকারী বনবিভাগে চাকুরী করার সময়েই রাসবিহারী উত্তর ভারতে বিপ্লবী সংগঠনের সম্পর্কে আসেন। উত্তর ভারতে, দিল্লীতে এক বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন পাঞ্জাবের লালাহরদয়াল। ১৯০৫ সালে এম. এ. পাশ করে সরকারী বৃত্তি নিয়ে অধ্যয়নের জন্য তিনি বিলাত যান। বিপ্লবী সংগঠনের ভার অর্পণ করে যান জিতেন্দ্রমোহন চাটার্জী জনৈক কর্মীর উপর। রাসবিহারী তখন দেরাদুনে অবস্থান করছিলেন। এক বিয়ে অনুষ্ঠান উপলক্ষে জিতেন্দ্রমোহন দেরাদুনে গেলে সেখানে রাসবিহারীর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং উভয়ে উভয়ের বিপ্লবী মনোভাব জানতে পারেন। ১৯১০ সালে জিতেন্দ্রমোহন ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য ইংল্যাণ্ড রওনা হয়ে যান। যাবার সময় বিপ্লবী সংগঠনের ভার রাসবিহারীর হাতে অর্পণ করে যান। কিন্তু দিন পরে হরদয়াল স্বয়ং ভারতে এসে দিল্লী এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনের পরিচালনার ভার রাসবিহারীকে দিয়ে যান।

এদিকে অনুশীলন সমিতির ঢাকা শাখার উদ্যোগে ১৯০৮ সালের ২রা জুন ঢাকাতে এক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হল। প্রকৃতপক্ষে এটাকে ডাকাতি না বলে বিপ্লবী পুলিশের সংঘর্ষ বলাই সঙ্গত। ডাকাতির কাজ এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়েছিল। কিন্তু এর পরে সমস্ত রাত্রি, পরদিন, পরের রাত্রি এবং তারপর দিন ও সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের গুলি বিনিময় চলে। একদিকে অস্ত্রশস্ত্রসহ নদীবক্ষে নৌকায় প্রায় পঞ্চাশ জন বিপ্লবী এবং অন্যদিকে নদী তীরে পুলিশ এবং অগণিত জনতা। দলের নেতা পুলিনবাবু এই সংঘর্ষই চেয়েছিলেন। এই জন্যই তিনি কলকাতা কেন্দ্রীয় সমিতি থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এনে বিপ্লবীদের হাতে দিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে অস্ত্রাদি নিয়ে ঢাকা যান নলিনীকুমার সরকার এবং শৈলেন চক্রবর্তী। ডাকাতিতে তারাও যোগ দিয়েছিলেন। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে সংঘর্ষ চালানে বিপ্লবী কর্মীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তিন দিন তিন রাত্রি সংগ্রাম চালিয়েও তাদের গুলি ফুরিয়ে যায় নাই। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় গুলি চালাতে চালাতে বিপ্লবীরা পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সদলবলে অস্ত্রশস্ত্র এবং লুণ্ঠিত অর্থাদি সহ আত্মগোপন করতে সমর্থ হন। পুলিশ এক জনকেও গ্রেপ্তার করতে পারে নাই। শুধু বিপ্লবী গোপাল সেনের মাথায় গুলি লাগায় তাঁর মৃত্যু হয়। তার মৃতদেহের সন্ধানও পুলিশ পায় নাই। এর অল্প কয়েক দিন পরেই সরকার পক্ষ থেকে অমৃত হাজরা এবং নন্দী সরকার ঢাকা সমিতির দুজন কর্মীর নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারি করা হয়। বিপ্লবীরা ফেরার হলে তাদের ধরবার জন্য যথাক্রমে পাঁচশত এবং এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। অমৃত হাজরা ফেরারী অবস্থায় কলকাতা চলে আসেন।

এই সময় সম্পর্কে অমৃত হাজরা লিখেছেন, 'ঢাকা সমিতিতে আমরা কয়েকটি বন্দুক রিভলবার সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম করার সময় ঐটা কিছুই নয়। এজন্য আমরা সর্বদাই বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করতাম। আমাদের কলকাতা সমিতির বারীনবাবুরা চন্দননগর সংগঠন থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতেন আমরা জানতাম। এ জন্য ফেরার অবস্থায় কলকাতা অবস্থান কালে আমিও চন্দন নগর সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করি। সুযোগ ও জুটে গেল। আত্মোন্নতি সমিতির সতীশ সেনের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল। তার সঙ্গে চন্দন নগর সমিতির মতিলাল রায়ের পরিচয় ছিল আমি জানতাম। এক দিন স্থির হল তিনিই আমাকে চন্দননগরে মতিলাল রায়ের নিকটে নিয়ে যাবেন। একদিন তাঁর সঙ্গে চন্দননগরে গিয়ে আমি মতিবাবুর সঙ্গে আলাপ করে এলাম চন্দন নগরে বিশিষ্ট বিপ্লবী শ্রীঘোষের সঙ্গেও সেই দিনই আলাপ হল।

এ সম্পর্কে মতি বাবু তাঁর "আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী" পুস্তকের সাতাশী পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'একদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীরামপুরে সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তর সহিত এক সুপুরুষ তরুণ আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। সতীশবাবুর সহিত আমার পরিচয় আমার ছাত্র ও শিষ্য অরুণ চন্দ্রের বাসায়। অরুণচন্দ্র এই সময় রিপণ কলেজে বি. এ. পড়ত। তাহাকে মাঝে মাঝে দেখিবার জন্য তাহার বাসায় উপস্থিত হইতাম। সতীশ চন্দ্র তখন কলিকাতার কোন স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং আত্মোন্নতি সমিতি নামে যে বিপ্লবী সমিতি মধ্য কলিকাতায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তিনি তাহার একজন অধিনায়ক ছিলেন। সতীশবাবু আমার তরুণ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে ইনি ঢাকা অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট কর্মী। বাঘা ডাকাতির একজন পলাতক আসামী। কলকাতায় আইস ফ্যাক্টরীতে কাজ করেন, এর নাম অমৃত হাজরা, বর্তমানে বিপ্লবী মণ্ডল শশাঙ্ক নামে পরিচিত।" (চলবে)

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী প্রতুল চন্দ্র মিত্র

গত ৯ই জুলাই রাঁচীর হাসপাতালে প্রবীণ বিপ্লবী প্রতুলচন্দ্র মিত্র পরলোক গমন করেন। বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ আচার্য্য মহাশয়ের নিকট তিনি বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির দীক্ষা গ্রহণ করে প্রতিটি সংগ্রামে সক্রীয় অংশ গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর রাঁচী কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। রাঁচীর সর্বজনপ্রিয় বন্ধুবৎসল মহান বিপ্লবী প্রায় ২০ বৎসর রাঁচী মিউনিসিপলিটির কমিশনার ছিলেন, এবং ১২ বৎসর বিহার থেকে নির্বাচিত হয়ে রাজ্য সভার সভ্য ছিলেন। আমরা তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি—এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

পরলোকে প্রবীন বিপ্লবী

সুধীর চন্দ্র মজুমদার

প্রবীণ বিপ্লবী সুধীর মজুমদার গত ৪ঠা জুলাই তাহার কলিকাতার বাস-ভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর। অনুশীলন সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী সুধীর চন্দ্র বাল্যকালেই বিপ্লব আন্দোলনে দীক্ষা গ্রহণ করেন; স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি আন্দোলনেই তিনি সক্রীয় অংশ গ্রহণ করেন। বিপ্লব কর্মে তিনি বহুদিন আত্মগোপন করিয়া বিভিন্ন স্থানে সার্থক সংগঠন গড়িয়া তোলেন। মোট ১৫ বৎসর তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি "অনুশীলন ভবনের" সুষ্ঠু পরিচালনায় সক্রীয় অংশ গ্রহণ করেন। আমরা একনিষ্ঠ বন্ধু-বৎসল মহান বিপ্লবীর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

জনতাদল কোন্ পথে

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চৌধুরি চরণ সিং ও জগজীবনরামকে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীসভা-থেকে অপসারণের পর, দেবীলালকে হরিয়াণার মুখ্য-মন্ত্রীত্ব হইতে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিল জনতা সংসদীয় বোর্ড—অপরাধ, দেবীলাল নাকি প্রস্তাবিত কৃষক সমাবেশ যাহা ১৭ই জুলাই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে তাহা সর্বশক্তি দিয়া সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন এবং এই কৃষক সমাবেশের মুখ্য উদ্দেশ্য চরণ-সিংহের পশ্চাতে যে বিপুল জনসমর্থন আছে তাহা কেন্দ্রীয় জনতা নেতৃত্বকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। জনতার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বর্তমানে চরণ সিং ও তাঁর নেতৃত্বাধীন বি. এল. ডি দলের একের পর একগুলি ধ্বংসসাধন করার যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তা জনতা দলকে পরিণতি বিধ্বংসিত করিতে বিশেষ সহায়ক হইবে-একথা কি চন্দ্রশেখর এবং দেশাই একবারও চিন্তা করে দেখেছেন না। ভারতীয় জনগণ তাঁদের ভোট দিয়েছিল কি কেবল ক্ষমতা ভুক্ত দেখার জন্য—না উন্নত মানের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য? যাদের সমর্থনে ও যাদের আশীর্বাদে জনতা নামে একটি বিচ্ছিন্নদল হঠাৎ গানা বাঁধতে পারলো এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে পারলো—তাদের কথা, তাদের কল্যাণ-চিন্তা, তাদের জন্য আশু করণীয় দায় ও দায়িত্ব সব ভুলে নিজ নিজ স্বার্থ চিন্তায় মত্ত ও বৃথা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে জনতাদল মহা মূল্যবান সময় কেন অথবা নষ্ট করছে? পরস্পরের ক্ষমতা কাড়াকাড়ি, পরস্পরের উপর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করে, নিজেকে বিরাট বলে জাহির করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি ঐক্যকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দেওয়ার জন্য নির্বোধ মানসিকতা জনতাদলের নেতাদের পক্ষে কি শোভন সঙ্গত কাজ হচ্ছে? তাঁরা যে ঘড়ির উপর দোদুল্যমান অবস্থায় বিচরণ করছেন সে ঘড়ি, যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে তা কি তাঁরা এখনও বুঝতে পারছেন না? চরণ সিং ও তাঁর দলভুক্তদের পরামর্শে ও উদ্যোগে দিল্লীতে যে বিরাট সমাবেশের আয়োজন চলছে সেই আয়োজনসফল হলে জনতাদলে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হবে—একথা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করা যায়। উত্তর প্রদেশ, বিহার, হরিয়াণার ও সন্নিহিত অঞ্চলের জাঠ সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক গণ সংখ্যায় বেশ ভারী এবং চরণ সিংকেই তাদের শীর্ষনেতা বলে মানে এবং প্রশ্নাতীত সমর্থন করে। কাজেই চরণের এই পতনের সময়ে তারা দলবদ্ধ হয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে এবং চন্দ্রশেখর ও মোরারজীদেশাইয়ের বিরুদ্ধে দল পরিবর্তনের কাজে ইন্ধন যোগাবে—যার ফল বিষময় হবে জনতা দলের পক্ষে। ইতিমধ্যে সংবাদে প্রকাশ চরণ সিং নাকি প্রকাশ্যে এমন উক্তি করেছেন যা বোম্ব-শেল তুল্য। তিনি বলেছেন যে, প্রধান মন্ত্রীর পুত্র কান্তিভাই দেশাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে বহু অভিযোগ আসে সেগুলি শুরুতর দুর্নীতির সম্বন্ধে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সে সম্বন্ধে বলেন ও সবাই মন্ত্রী হিসাবে পুলিশ বা সি. বি. আই কে দিয়ে তদন্ত না করিয়ে বিচার বিভাগীয় কমিশন বসিয়ে কান্তি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে যে সব দুর্নীতির অভিযোগ তাঁর কাছে এসেছে সে সব বিষয়ে কমিশন দ্বারা তদন্ত করালে এবং তদন্তে তা মিথ্যা প্রমাণিত হলে বর্তমান মন্ত্রীসভার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে। কারণ এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং সংবাদ পত্রে বিবৃতি দিয়ে ছিলেন যে, তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে জনগণের যদি কোন দুর্নীতির ব্যাপারে অভিযোগ থাকে তবে তিনি তা কমিশন বসিয়ে সত্যানুসন্ধান করবেন। নিজের পুত্র বলে তাকেও তিনি রেহাই দিতে চান না—তিনি সকলের উপর সমান, ন্যায় ও নীতিপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তাঁর চোখে সবাই সমান। মোরারজী ভাইয়ের এই বিবৃতি জনগণের নিকট হইতে বিপুল সমর্থন ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

(৬পৃষ্ঠে)

Contd. from 2nd cover

Name	Address	Amount Rs.	Date
Sarkar Kalipada	34 Bhagabati Chatterjee St. Calcutta-56	200 (Enhancement)	1. 10. 76
Sarkar Smt Pravabati w/o Late Nagendra Nath	13 Chandi Charan Banerjee Lane Calcutta-35	100	15. 8. 72
Sen Gupta Nalini Ranjan	72A, Chandra Mondal Lane Calcutta-26	200 (Enhancement)	
Sen Gupta Smt. Smritikona w/o Late Nani Gopal	26/1 & 2 Ratan Babu Road Cossipur, Calcutta-2	100 (Enhancement)	
Talukdar Sangram Singha	55/1 Purna Das Road Cal-29 Dist—24 Parganas	200	26. 4. 74
Bain Smt Durga Bala w/o Late Abinash Bain	Krolleria, P. O. Bhojerhat P. S. Bhangar	100	12. 1. 78
Bindu Smt Latika Bala w/o Late Sudhin Chandra Bindu —and—		100	15. 8. 72
Bindu Smt. Sudharani	Panchal Bey, P. O. Falta	100	15. 8. 72
		Amendment to previous order	
Bose Smt. Banalata w/o Late Ashutosh Bose	Boalia. P O. Garia, P.S. Sonarpur	200	11. 12. 77
Chakraborty Bireswar	P. O. Natagarh, P. S. Khardah Vill Ramkrishnapur	200 (Amendment)	5. 11. 73
Das Smt. Nivarani w/o Late Rash Behari	P. O. & Vill Baruipur	200	19, 2. 78
Das Gupta Nihar Kona	Barrackpore	Suspension (Higher Income)	
Guha Smt. Hiron Kusum w/o Late Upendra Nath	Silpara Road, Nutan Palli Barisha	100	1. 10. 76
Mukherjee Smt. w/o Late Nani Gopal	172/3/48 Banerjee Para Road Paschim Putiary, Behala	150	30. 3. 78
Roy Smt. Minu w/o Late Adhir Nath Roy	458/4 Ashokenagar	200	19. 3. 78

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাষ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

cf3b

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'ফলিতজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল, বি (কলি :) এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ব্যতীত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক ন্যূনপক্ষে ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা :

বি-৩৪, কানুনগো পার্ক, গড়িয়া, ২৪ পরগণা

৫ নং বাদকট, বৈষ্ণবঘাটা ষ্টপ।

25 JUL 1978

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন ঘোষ।

সম্পাদক—শ্রীসাতি সরল রায়চৌধুরী

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বোম্বাই—শ্রীমনমোহন পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। কভার সজ্জা—শ্রীবীরেন্দ্র গুহ।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং যদুনাথ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণে :—প্রিন্টিং সার্ভিস লিমিটেড, ৮১৭ নং বেনিয়াটোলা লেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

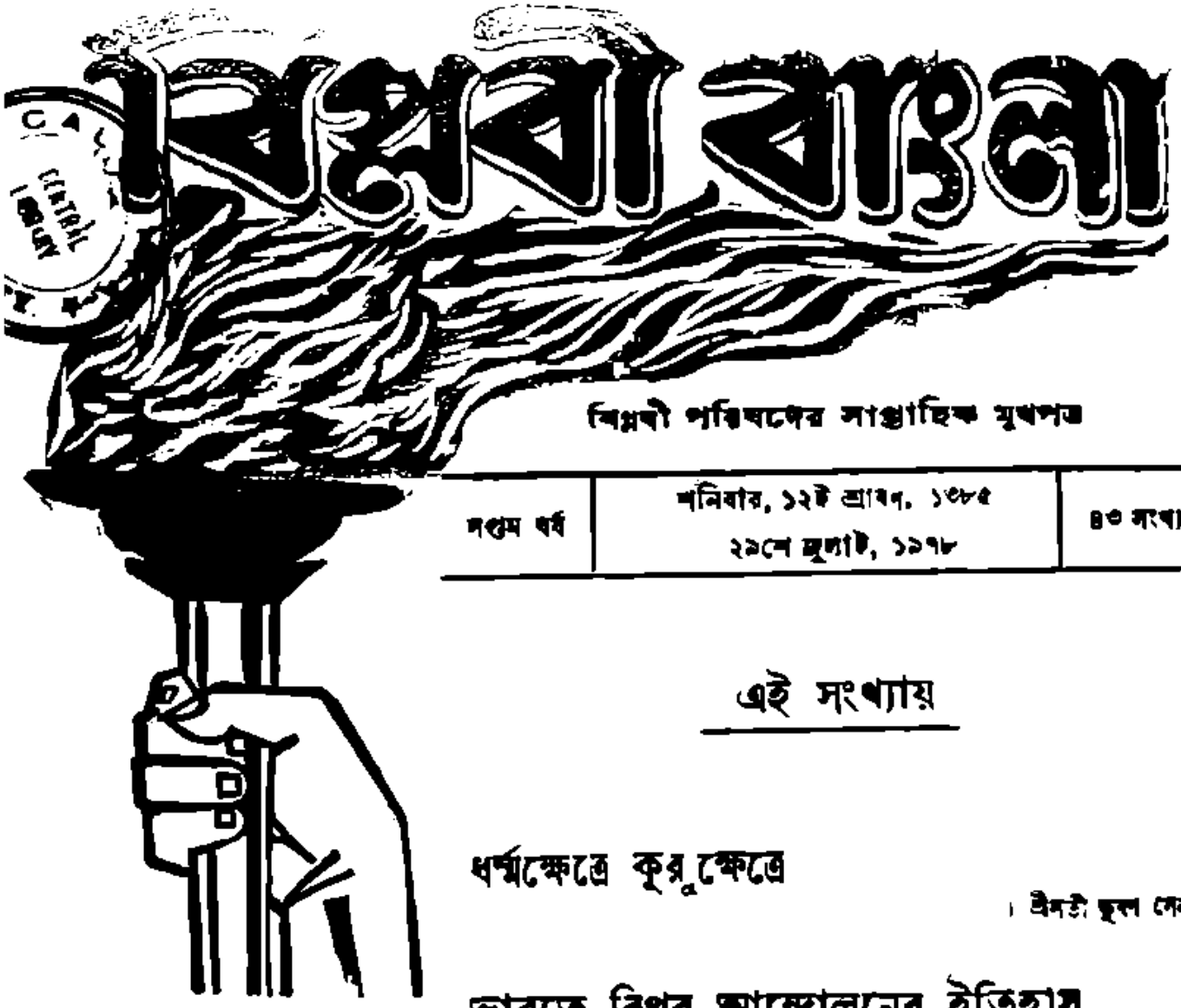

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৮৫ ২৯শে জুলাই, ১৯৭৮	৪৩ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে

। শ্রীমতী ভুলা সেন ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। শ্রীযোগেশ দত্ত ।

যোগ সাধনা ও শ্রীঅরবিন্দের মৌন নির্দ্দেশ

। শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মনিনী মোহন-দাশগুপ্ত ।

জনতাদল কোন পথে

। বাণীমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়

মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা—
ভগবানের এই তিন গৃহকে
আমি পৃথক ভাবে দেখি না।

—মহাত্মা গান্ধী

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—24-PARGS—contd.		
Sanyal Smt. Santana w/o Late Samarendra Nath Sanyal	540/8 Ashokenagar	200 (Enhancement)	1. 10. 76
Sarkar Kshitish Chandra	Plot No. 36 (Scheme No. 2) Poddarnagar No. 2	200 (instead of 24. 8. 72 previously(	15. 8. 72
Sharma Smt. Kaushalya Debi w/o Late Manindra Ch. Sharma	Asarpara, Ushumpur Sibir	200	24. 1. 78
	Dist—HOWRAH		
Dey Smt. Sudharani w/o Late Sachindra Nath Dey	West Bauria, P. O. Chackasi P. S. Bauria	200	1. 3. 78
Paul Smt. Apsara w/o Late Ramani Ranjan	Vill Mohiary. P.O. Andul Mouri	250	17. 1. 78
	Dist– HOOGHLY		
Chakraborty Smt. Kamala	Ramkrishna Palli, Station Road P. O. Bhadreswar	100	6. 4. 78
Chatterjee Smt. Sudharani w/o Late Bisweswar Chatterjee	Vill Adisaptagram, P.O. Mogra	100 (Amendment)	9 2. 78 (instead of 9. 7. 78 previously)
Das Smt. Sandhyarani w/o Late Dinesh Ch Das	32, K. C. Sen Road, Risbra	150	25. 3. 78
Roy Smt. Bakul Rani w/o Dhirendra Ch. Roy	C/8/4 BTPS Tranship, P. O. Tribeni	100	15. 3. 78
Roy Smt. Sudharani	Keota Colony, P.O. Sahaganj	100	11. 4. 71
	Dist—BURDWAN		
Chatterjee Sm. Jyotsna w/o Late Satyendra Chatterjee	P. O & Vill Kashigsam	100	4. 12. 77

(Contd. on 3rd cover)

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে

শ্রীসতী ভূষণ সেন

রাজনারায়ণ যখন প্রথমে সভাপতি চন্দ্রশেখরকে আক্রমণ করলেন, সভাটা তখন বেশ জমে উঠেছে। লড়াই যখন প্রথম সুরু হয় তখন কেউ কল্পে আন্দুলটি তুলেও ওদের খামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। ভেবে ছিলেন, সব হবে' বলে মিট মাট করতেও এগিয়ে আসেন নি। গ্যালারিতে বসে মজা দেখছিলেন, আর হাত তালি দিচ্ছিলেন। এখন বড় দেরি হয়ে গেছে, ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। সবাই বুঝতে পারছেন এটা রাজ-নারায়ণ ও চন্দ্রশেখরের লড়াই নয়। এটা বকলমে যুদ্ধ বা war by proxy, চৌধুরি ও মোরারজীর মধ্যে। তাই পরট গ্রানের জন্য দুই আচার্য্যের ডাক পড়েছে।

লড়াই সূত্রপাত হয়েছিল ৭৭ সালের মে মাসে। চৌধুরি চরণ সিং মনে করেছিলেন, তিনিই যখন জনতা দলের প্রধান স্থপতি, রাজমুকুটটি তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু পাঁচ সরিক মিলে সেটা চাপিয়ে দিলেন মোরারজী দেশাইর মাথায়। সেটাও সহ্য হয়েছিল, হাজার হোক মোরারজী বয়সে অনেক বড়। কিন্তু যখন সহকারী প্রধান মন্ত্রীর সম্মানটুকুও লাভ করতে পারলেন না, তখন ক্ষুব্ধ হলেন। এর পর এল জুনমাসের বিধানসভা নির্ব্বাচন। তাঁর মনো-নীত ৮৮ জন প্রার্থীর নাম বাতিল করে দিলেন সভাপতি চন্দ্রশেখর। তিনি অপমানিত বোধ করলেন, ক্রুদ্ধ হলেন, অসহযোগের ডাক দেখালেন। শেষটায় শান্ত হলেন, যখন দেখলেন চন্দ্রশেখরের মনোনীত ৮৮ জন প্রার্থী প্রায় সকলেই ধরাশায়ী হয়েছে। বললেন, "জনতাদল কতো বেশী শক্তিশালী হত, যদি আমার তালিকার উপরে হস্ত-ক্ষেপ না করতেন চন্দ্রশেখর।

মোরারজীর মাথায় তখন রাজমুকুটের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। বিদেশী রাজাদের কণ্ঠে সাধুবাদ শ্রবণ করে বুক ফুলে উঠেছে। ভাবছেন, আমি আদি কংগ্রেসের সন্তান, রাজভক্তের আসল উত্তরাধিকারী। দেশের কর্ত্তা কর্ত্তা এবং বিধাতা। চন্দ্রশেখরের পরাজয়, আমারই পরাজয়। আমার সমালোচনা করে আমারই গৃহমন্ত্রী। ডাকলেন, কোই হ্যায়।"

চরণ সিংএর বিশ্বস্ত অনুচর বেরিলাল। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী। সম্রাটের রোষদৃষ্টি তাঁর উপরে পড়ল। রাজ আদেশ এসে গার্দানা চেপে ধরল। চরণ সিংএর অপর অনুচর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও আক্রান্ত হলেন। তখন চরণ সিংএর মুখ রাগে অন্ধকার হয়ে উঠল। তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন, "বেশ, বিধান সভাগুলিতে লোকদলের যে কজন মন্ত্রী আছেন, তাঁদের সমর্থন যাচাই করা হোক। এর পর যাচাই করা হবে সভাপতির সমর্থন। দেখা যাবে তাঁকে কজন চায়।"

এই যে অন্তর্দাহ কলহ, এর মূলে শুধুমাত্র ব্যক্তিত্ব বা উচ্চাশার সংঘাত, মনে করলে ভুল হবে। সন্দেহ নেই এগুলিও অন্যতম কারণ, কিন্তু বিরোধের প্রকৃত বীজ নিহীত ছিল জনতা দলের উপাদানে। যে মাল মশলায় জনতার ইমারত গঠিত, তাদের পরস্পর বিরোধী শ্রেণী স্বার্থের মধ্যেই এর মূল। এ সংঘাত কেউ রোধ করতে পারে না। একটু বিস্তারিত ভাবে এটার আলোচনা করা যাক।

চৌধুরি চরণ সিং উত্তর ভারতের সম্পন্ন কৃষক ও অল্প-প্রদেশ মধ্যবর্গের কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের মুখপাত্র। চৌধুরিকে

তারা যেমনভাবে ভক্তি করে এবং চৌধুরিও চিরকাল তাদের পক্ষ সমর্থন করে এসেছেন। অন্যদিকে জনসঙ্ঘ ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই দুই গোষ্ঠীর স্বার্থ বিপরীত, এদের রাজনৈতিক দর্শনও বিপরীত। চৌধুরির রাজনীতি হিন্দু সমাজকে 'অগ্রসর' ও 'অনগ্রসর' যেন দুটো বিপরীতমুখী বিভক্ত করতে চায়। যার ফলে সেদিন বিহারে এখানে ওখানে আগুন জ্বলে উঠেছিল। জনসঙ্ঘ চায় সংযুক্ত হিন্দু সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি। জাতিভেদের অন্তর্নিহিত বিরোধ উত্তেজনা কিম্বা Exploitation কে স্বীকারই করতে চায় না। বলতে চায় আমাদের সবই ভাল।

কিন্তু আসলে তো আমি কৃষক ও মহাজনের সম্পর্ক খাতক মহাজনের সম্পর্ক। কৃষক চাষ করে, সম্পদ উৎপাদন করে। মহাজন ঋণ দেয়, উৎপন্ন সম্পদে ভাগ বসায়। ব্যবসায়ী কৃষকের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে অল্প মূল্যে কৃষকের সম্পদ গ্রাস করে। চোখ বুঁজে থাকলেই তো এরা ভাই ভাই হয়ে উঠবে না। লোকদল ও জনসঙ্ঘের আঁতাত চিরস্থায়ী হতে পারে না; ভেঙে পড়বেই দুদিন আগে আর পরে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কর্তাদের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ আর অহংভাব।

যারা ছিলেন বোকে না, চোখ মেলে দেখে না, কিম্বা সেই জাতের মানুষ; দোতানী তা নয়। গত একটি বছরের নিজের কোলে ঝোল টানবার যে কৌশল দেখিয়ে এসেছেন জনসঙ্ঘ, সেটা একমাত্র তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। রাজস্থলিতে তাঁরা চৌধুরির সমর্থক, কেন্দ্রে সমর্থক মোরারজীর। উভয়ের কাছ থেকেই সমর্থনের পুরো বখশিস আদায় করে ছেড়েছেন। আর বাইরে এমন ভাব দেখিয়েছেন, যে জনতা দলকে আটুট রাখবার জন্য শুধু স্বার্থত্যাগই করে চলেছেন।

রাজ্যে রাজ্যে লোকদলের সঙ্গে আদান প্রদানে, আকার ইঙ্গিতে এমন ভাবে দেখিয়েছেন যে লোকদল শুধু সমস্যা সৃষ্টি করছে, এবং জনসঙ্ঘের করতে হচ্ছে সমাধান। ইতিমধ্যে রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীত্ব করতল গত করেছেন। হরিয়ানায় নিয়েছেন অর্ধবিহার্ষা দুটি বন্দর, স্বরাষ্ট্র ও শিল্প, বিহারে নিয়েছেন অর্থ ও শিক্ষা। শুধু মাত্র উত্তর প্রদেশে যখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দিকে হাত বাড়ালেন তখন চৌধুরী এমন ধমক লাগালেন, যে হাত উঠিয়ে নিতে হল। —এই হল দিল্লীর বর্তমান রাজনৈতিক সাকটের পশ্চাদ্ পট।

রাজনারায়ণ যখন চন্দ্রশেখরকে আক্রমণ করছিলেন অটলবিহারী বাজপাই তখন মোরারজীর সঙ্গে সোপনে আলাপ করছিলেন। যুদ্ধবিধে উঠলে, শেষ যুদ্ধে জনসঙ্ঘ সমর্থনের বিনিময়ে মোরারজীর কাছ থেকে কতটা আদায় করা যাবে, অনুমান করার চেষ্টা করছিলেন। মোরারজী পাকা কথা দিলেন না, শুধু বললেন "আগে মন্ত্রিত্ব করুন কার পক্ষে থাকবেন, আমার না চৌধুরীর, পরে অন্য কথা হবে।" জনসঙ্ঘ মোরারজীকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিল।

এই সময় এল আক্রমণের mid term election। জনতার প্রার্থী ছিল চৌধুরীর নিজের মানুষ। নির্বাচনের ফলাফলপরীক্ষা করে দেখা গেল একমাত্র জনগ্রসর কৃষক সমাজই জনতাকে ভোট দিয়েছে। হরিজন মুসলিম ও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ভোট দিয়েছে ইন্দিরা মনোনীত প্রার্থীকে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ক্ষমতা হস্তগত করার পরে এখন aggressive হয়ে উঠেছিল লোকদল যে মুসলিম ও হরিজনরা ভয় পেয়ে গেছিল। ওদের সমর্থন ফিরে পেতে হলে প্রথমেই চৌধুরী কে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। সেটা করা চলে যদি চ্যবনপন্থী কংগ্রেসীদের অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া যায়। স্বরাষ্ট্র দপ্তরটি বাবুকি, কার্গাতিজ বা বহুগুণাকে দিলে, মুসলিম ও হরিজনদের আস্থা ফিরে পাওয়া কঠিন হবে না। মহারাষ্ট্র রাজ্যটি চ্যবনের হাতে তুলে দিয়ে ওঁর সমর্থন জয় করা স্থির হল। এই ভাবে রাজি করালেন মোরারজী। চ্যবনও এই প্রলোভনে ধরা দিলেন। টোপ গিললেন।

চৌধুরীর মূর্খ যখন সরে পড়ছে; তখন তিনি ভোর পর্যায়। মুখের চাকা ধরনী গ্রাস করেছে। পৃষ্ঠরক্ষা

করছেন রাজনারায়ণ। আসন্ন বিপদে রাজনারায়ণের মুখ কেঁপে উঠল। তিনি কাতর দৃষ্টিতে চৌধুরীর দিকে চাইলেন, বোঝাবার চেষ্টা করলেন, অবিলম্বে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যাকে বিশ্বাস করা যায় যে, ব্যক্তি, বুদ্ধির দর্পে অন্ধ হবে না; চন্দ্রশেখরের পরিবর্তে এমন কাউকে সভা পরিচালনার ভার দেওয়া উচিত। তার পর ক্ষণে ক্ষণে চন্দ্রশেখরকে আক্রমণ করে ফেললেন। শেষ সংগ্রামের দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই তাঁর উৎসাহ বাড়তে লাগল। চৌধুরী অবশেষে পরিষদ ভবনে ফিরে শিবির পরিবেশ করলেন। তাঁর একমাত্র চিন্তা হল সঙ্কটকালে জনসংঘের সমর্থন পাওয়া যাবে কি না।

একদিন বাবুজীকে দেখা গেল চরণ সিংহের শিবিরে। বাবুজীর মনের কথা দেবতারাও জানেন না, আমরা আর কি করে জানব। সকলে জানেন তিনি ঝড়ের পাখী। ঝড়ের আগমনী তাঁর কানেই প্রথমে পৌঁছে যায়। সঙ্কটকালে তাঁকে দেখা যায় বন্ধুদের পক্ষে। তিনি অভয় দিলেন চৌধুরীকে বললেন, অতীতে যা ঘটে গেছে, তা ঘটে গেছে পুরোনো কথা ভুলে গিয়ে নতুন ভাবে কাজ করতে হবে। জানালেন এখন থেকে তিনি মোরারজীর বিরুদ্ধে চৌধুরীকেই সমর্থন করবেন। চৌধুরী দেখলেন, বাবুজীর সমর্থন পেলে জনসংঘকে কাবু করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। এটাই তাঁর চরম কাম্য আকাঙ্ক্ষা, তাই বাবুজীর প্রস্তাব তাঁর মনে ধরল।

জনতা পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় রাজনারায়ণের কঠোর সমালোচনা করলেন দেশাই। দেশাইর বক্তব্য সমর্থন করলেন ফার্নাণ্ডিজ। এর পর ব্যাকপাই বলতে উঠলেন। সাহে আছে সত্য বলবে, অপ্রিয় সত্য চেপে যাবে, সত্যকে মধু মাখিয়ে পেশ করবে। বাজপাই মোরারজীর Resolution সমর্থন করলেন, আবার সেই Resolution ফেটে ছেটে নতুন করে চৌধুরীকেও তুষ্ট করলেন। বাবুজী সোজা রাজনারায়ণের বিপক্ষে ভোট দিলেন, চোখের পাতাটি পড়ল না।

চরণ সিং বেকলেন তাঁর সমর্থক কেউ নেই। বুঝলেন তিনি পরাজিত, শত্রুরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে, বধ করবেই। তখন রাজনারায়ণকে রক্ষার চেষ্টা না করে, ইন্দিরাকেই শেষ আক্রমণ করা স্থির করলেন। পরোক্ষে বললেন প্রধান মন্ত্রীর প্রচ্ছন্ন সমর্থনের জন্যই ইন্দিরা আজও কারাগারের বাইরে। সুযোগ দিলেন দেশাইকে তাঁকে বরখাস্ত করবার। মন্ত্রীত্ব থেকে অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল তাঁর যৌবন। ঘুম ভাঙার বেলায় পেয়ে বসল। আহত বাঘের মত এক লম্ফনায় পুনঃ দুই হয়ে যাওয়ার নেশায়। প্রশ্ন করলেন, মোরারজী দেশাই, তি ননসেন্স পয়সায়ে নিয়ে যেতে পারবেন, যে এক তাঁর অর্থলোভ? তার পর ধীরে ধীরে তৈরী হলেন শেষ সংগ্রামের জন্য। এ লড়াইটিকে কেউ কাউকে পাশ ছাড়তে না, ক্ষমাও করবে না। কোন অস্ত্রই নিষিদ্ধ হবেনা আসন্ন দিনের সংগ্রামে। এ যুদ্ধে চৌধুরীর শিবিরে যার একজন সেনাপতি, শত্রু পক্ষে সেনাপতি পাঁচ জন। প্রত্যেকেই নিজের মনের মত ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রাম কৌশল স্থির করেন। উদ্যম যা তা দেখছি চৌধুরীর শিবিরে, উদ্যম পাচ্ছি ওদের বুকে ঝড়ের মূল্য, অনুভব করছি ওদের আত্মাহুতির 'অহরহ'!

ঝড় উঠছে; নেমে আসছে দুর্দিনের আঁধার। আজকের ভারতে দুজন নেতার পেছনে জনসমর্থন। একজন চৌধুরী চরণ সিং, অন্যজন ইন্দিরা গান্ধী। সমর্থ যা দেখে উঠছে, ইন্দিরা তাতে সংশ্লিষ্ট নন। তিনি সুযোগের অপেক্ষা করছেন।

যাবতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত বুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৩০ একত্রে
ঋষিকুলম্ শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
হিমসাগর কুটীর • ফুল বেড় • হাওড়া • ৩ ফোন

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চন্দননগরে শ্রীষ ঘোষের বাড়ীর পাশেই ছিল রাসবিহারীদের বাড়ী। দামোদর নদের অপর তীরে বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে ছিল দুই পরিবারেরই অধিবাস। রাসবিহারী এবং শ্রীষ ঘোষ দুজনেই ছিলেন সমবয়স্ক। এ জন্য বাল্যকাল থেকেই দুজনের মধ্যে একটা অকৃত্রিম সৌহার্দ্য জন্মেছিল। রাসবিহারী এবং শ্রীষচন্দ্রের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ও কিছু কিছু সন্ধান রাখতেন। রাসবিহারী বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, একথাই এটা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। রাসবিহারীর পিতা গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী ছিলেন। এজন্য শ্রীষ ঘোষ অথবা চন্দননগরের বিপ্লবী দলের অন্যান্য নেতৃবর্গ রাসবিহারীকে দলে না টানাই সমিচীনবোধ করে ছিলেন। ফলে বিপ্লবী দলে যথারীতি দীক্ষা হয় হয় নাই। কিন্তু শ্রীষচন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশার ফলে রাসবিহারীর মধ্যে বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মেছিল। এবারে দেরাদুনে গিয়ে উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে রাসবিহারীর এই অপূর্ণতা দূর হল। ১৯১১ সালে বিমাতার বিয়োগ হলে রাসবিহারী চন্দন নগরে এসে শ্রীষ ঘোষ এবং অন্যান্য নেতাদের উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের কথা জানালেন। চন্দন নগরের নেতৃবর্গ বুঝলেন রাসবিহারী পুরোপুরি বিপ্লবী দলভুক্ত হতে গিয়েছেন। চন্দননগরে রাস-বিহারীর যথারীতি দীক্ষার ব্যবস্থা হল। এই সময় অনুশীলন দলের সঙ্গে চন্দননগরের মিলনের কথাবার্তা চলছিল ফলে রাসবিহারী এক সঙ্গে উভয় দলভুক্ত হয়ে পড়লেন। ক্রমে উভয় দলে নেতৃত্ব ভারই উপর এসে পড়ল। অনুশীলন চন্দননগরের মিলন সম্পর্কে মতিলাল রায় বলেন, "এই সময় আমার সঙ্গে অনুশীলন সমিতির ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী মহারাজের পরিচয় হয়। ত্রৈলোক্যনাথের পরিচয় করিয়া আমি আরও কয়েকজন খাঁটি বিপ্লবীর সন্ধান পাইলাম। অনু-শীলন সমিতির বাদুড়বাগান কেন্দ্রে বসিয়াই অনুশীলনের বিপ্লবী তরুণ রবীন্দ্র সেনগুপ্ত, কেদারেশ্বর সেন, সীতানাথ দাস, কালীপদ দে, মদন ভৌমিক, অমৃত সরকার এবং বর্তমান আনন্দ বাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক নলিনী কিশোর গুহের সংযোগে আসিলাম। ইহাদের অসাধারণ কর্মতৎপরতার কথা চিরদিন আমার স্মরণে থাকিবে। অনুশীলন সমিতির প্রত্যেকটি তরুণ মরণের জন্য সর্বদাই উদ্যত হইয়া থাকিত। পুলিন বিহারীর এই সৃষ্টি তাঁহার চিরকীর্তি হইয়া থাকিবে। দেশের জন্য, জাতির জন্য স্বাধীনতার জন্য নেতার এমন অনুগত জীবন, আমরা সর্বক্ষেত্রে দেখিনা।"

২৯৬/১ নং আপার সারকুলার রোডে অনুশীলন সমিতির বাজাবাজার কেন্দ্রে অনুত হাজরা থাকতেন ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে এখানে তিনি গ্রেপ্তার হন। রাজাবাজার ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি যাবৎ-জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। এর আগেই রাসবিহারী দীর্ঘ চার মাসের ছুটি নিয়ে দেরাদুন থেকে বাঙলাদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আগেই বলা হয়েছে। তিনি এসেই বললেন এই চার মাসের ভিতরে আমাকে বিশেষ কিছু বিপ্লবের কাজ করতে হবে, (১) অসাধারণ উৎসাহে তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করলেন। একদিন বাগুড়বাগানের কেন্দ্রে চন্দননগর ও অনুশীলন বিপ্লবীদের নেতৃবৃন্দ রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। টেবিলের উপরে কয়েকটি রিভলবার ছিল অনুশীলনের নেতা প্রতুল চন্দ্র গাংগুলী একটি রিভলবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন সেটায় গুলিভরা তা তিনি জানতেন না। কিন্তু হঠাৎ একটি গুলি বেরিয়ে গেল এবং রাসবিহারীর বাঁহাতে একটা আঙুল বিদীর্ণ হয়ে গেল। প্রতুলবাবু অপ্রতিভ হলেন কিন্তু বিচার বিবেচনার সময় নাই। কাছেই সুকীয়া ষ্ট্রীট থানা রিভলবারের শব্দে পাছে পুলিশ কেন্দ্রে হানা দেয় এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ রিভলবার গুলি বস্ত্রাবৃত করে নিয়ে তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। রাসবিহারীও প্রাথমিক চিকিৎসার পরে চন্দননগরে চলে গেলেন।

কাশীতে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং বিভূতিভূষণ ধালদারের উদ্যোগে এক বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সমিতির নাম দেওয়া হয়েছিল অনুশীলন সমিতি। শচীন্দ্রনাথ বালক বয়সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসে কিছুদিন উত্তর কলকাতায় ছিলেন। এই সময় তিনি অনুশীলন সমিতির উত্তর কলকাতা কেন্দ্রে মাঝে মাঝে স্যায়াম করতে যেতেন। কিন্তু কলকাতা ত্যাগ করার পরে আর এই কেন্দ্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নাই। কাশীতে বিপ্লবী সমিতির নাম দেওয়ার ব্যাপারে এই প্রভাব হয়ত পড়ে থাকবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঢাকা অথবা কলকাতা বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে কাশী সমিতির কোন সম্পর্ক ছিল না। ১৯০৮ সালের শেষ দিকে ঢাকা এবং কলকাতা অনুশীলন সমিতি যখন বে-আইনি ঘোষিত হয়। তখন কাশী সমিতিরও নাম পরিবর্তন করে যুব সমিতি রাখা হয়। সমিতি বিপ্লবী সংগঠন অথচ সমিতিতে কোন অস্ত্রাদি নাই এজন্য সংগঠনের বড় অসুবিধা হচ্ছিল। কাশীতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কোন সূত্রও শচীন্দ্রনাথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বাঙলাদেশে এই সময় আলিপুর মামলা প্রায় শেষ হয়েছে। প্রত্যহই নানা স্থানে বৈপ্লবিক কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শচীন্দ্রনাথ একটি রিভলবারের সন্ধানে কলকাতায় এসেন। কলকাতা সমিতির অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে তিনি আগে থাকতেই চিনতেন। এবারে কলকাতা আসার সময় তিনি ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা মাখন লাল সেনের নামে একখানি পরিচয় পত্র নিয়ে এলেন। কিন্তু অমরেন্দ্র নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি তার ঈপ্সিত রিভলবার পেলেন না শচীন্দ্রনাথ তখন মাখনবাবুর নিকটে এলেন কিন্তু মাখনবাবুও অপরিচিত যুবককে বিশ্বাস করে রিভলবার দেওয়া সঙ্গত মনে করলেন না। মাখনবাবু এই সময় বিপ্লবের পথ থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব করছিলেন। তিনি তখন ছিলেন অনুশীলন সমিতিকে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরূপ সংগঠনে রূপায়িত করার

পক্ষপাতি। শচীন্দ্রনাথ যখন মাখনবাবুর নিকট উপস্থিত হলেন অমৃত হাজরাও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাশী বিপ্লবী সংগঠন থেকে শচীন্দ্রনাথ এসেছেন শুনে বিপ্লবী সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী অমৃত হাজরা মাখনবাবুর কক্ষ ত্যাগ করে নিকটবর্তী কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসলেন। মাখন বাবু এই সময় পটুয়াটোলা লেনে এক গৃহে থাকতেন। রিভলবার না পেয়ে শচীন্দ্রনাথ কলেজ স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরছিলেন। অমৃতবাবু তাঁকে ডেকে বেঞ্চিতে পাশে বসালেন। শচীন্দ্রনাথ অমৃতবাবুকে মাখনবাবুর গৃহে পূর্বেই দেখেছিলেন, সুতরাং উভয়ের পক্ষে উভয়ের পরিচয় পেতে বিলম্ব হল না। কলেজ স্কোয়ারে বসেই উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হল অমৃতবাবু এই সময় বাঘা যতীনের ডাকাতির কেসের আসামী শচীন্দ্রনাথ কাশী বিপ্লবী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা নেতা। দুজনে দুজনের পরিচয় পেয়ে প্রীত হলেন। কথা প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ রিভলবারের প্রয়োজনের কথা ও জানালেন। অমৃতবাবু শচীন্দ্রনাথকে একটি রিভলবার সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরদিন তিনি শচীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়েই চন্দননগরে উপস্থিত হলেন। তিনি মতিবাবুর নিকট থেকে একটি রিভলবার চেয়ে নিলেন এবং কী উদ্দেশ্যে এই রিভলবার তিনি চাইছেন সে কথাও মতিবাবুকে জানালেন। উভয়ে একমত হয়েই শচীন্দ্রনাথকে রিভলবার দেওয়া সঙ্গত বলে স্থির করলেন। এই সূত্র ধরেই পরে চন্দননগর, কাশী এবং অনুশীলন বিপ্লবী সংগঠন এক সঙ্গে মিলিত হল। বিপ্লব যুগের ইতিহাসে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের নাম অমর হয়ে থাকবে। তাঁর কর্মচাতুর্যে সন্তুষ্ট হয়ে রাসবিহারী তাঁর নাম দিয়েছিলেন "লাটু"। এমন দুঃসাহসিক কর্ম কিছু ছিল না যা সিদ্ধ করতে করতে শচীন্দ্রনাথ এগিয়ে যেতেন না।

(চলবে)

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'কলিতজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল, বি (কলি:) এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ব্যতীত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক ন্যূনপক্ষে ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা:

সি-৩৪, কাননগো পার্ক, গড়িয়া, ২৪ পরগণা

৫ নং বাসরুট, বৈকুণ্ঠবাটা ষ্টপ।

যোগ সাধনা ও শ্রীঅরবিন্দের মৌন নির্দ্দেশ

শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মূলতঃ এরা হল যোগের মুখ্য লাভের বিঘ্নকারী উপসর্গ মাত্র। প্রকৃত সিদ্ধ যোগীরা এ সব বিভূতিকে স্বীয় "ঘন মূত্রবৎ" বলে নিতান্তই অনাদর করে থাকেন। কিন্তু হায়, আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রাদুর্ভূত বর্ত্তমান কালের তথা কথিত যোগী প্রভুরা স্বীয় বিভূতির ঢাক পিটিয়ে, এবং তাকে মূলধন করে এই অধিক সভ্যতা মূল্যায়নের ফলে বহুল সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশনের জন্য লালায়িত হয়েই আছেন। ভক্ত শ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ পরমহংস কিন্তু বলতেন একটা সিদ্ধাই লাভ করলেই তার গর্বে ঈশ্বর লাভ করা আর হয় না।

বিভূতির গৌরব সত্যই হোক বা মিথ্যাই হোক, বিভূতি নামক পণ্যের ব্যবসায়ে যাঁদের আসন প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা না সাধু, না যোগী। পূর্বেই বলা হয়েছে, যে, বিভূতি যদি মেকি না হয়ে যথার্থও হয়, তবুও তার সঙ্গে যোগ-সিদ্ধির কোনও সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে।— এই কারণেই যোগসিদ্ধির মাপ কাঠি হিসাবে বিভূতিগুলি যোগশাস্ত্রে কোন স্বীকৃতিই পায়নি, এগুলি যোগশাস্ত্রে যোগের বিঘ্নকারী এবং সিদ্ধযোগীর তপস্যায় অর্জিত যোগৈশ্বর্য্য বলেই বর্ণিত। মেকি বিভূতির সঙ্গে গর্ব্ব ও মিশ্রিত থাকে—বিভূতির গর্ব্ব। প্রকৃত বিভূতি অনাদৃত প্রকৃত যোগীর কাছে অষ্টাঙ্গ যোগের বিভূতির সময় এ-প্রসঙ্গে "ঘন" ও "নিয়ম" নামে দুটি যোগাঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটি যোগাঙ্গ, পূর্ণ যোগের, অর্থাৎ একাগ্রতা বা সমাধির সহায়ক বটে, কিন্তু তার অন্তরঙ্গ সাধন নয়। কিন্তু তা হলে কী হবে?— এই দুটী যোগাঙ্গের উৎকর্ষ— কোন যোগীতে কতটা হয়েছে, তাই দিয়েই, সাধু বা যোগীর সাধুত্ব বা যোগীত্ব সম্বন্ধে বিচার হয়ে থাকে— বিভূতির মাপকাঠি দিয়ে নয়।

এবার এই দুটি যোগাঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে, আমরা যোগশাস্ত্র থেকে বিদায় নেব।—এই দুটি যোগাঙ্গের প্রথমটি হল "যম"। এতে পাঁচটি জিনিষ বুঝায়, যথা, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ। দ্বিতীয় যোগাঙ্গটির নাম— "নিয়ম"। এতেও পাঁচটি জিনিষ বুঝায় যথা— শৌচ বা শুচিতা, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রনিধান। এই দুটি যোগাঙ্গের প্রত্যেকটি বিষয়ের পৃথক পৃথক বা সবটা একত্রে সাধনা করতে হয়। প্রত্যেক সাধনের সুস্পষ্ট ফল লাভ হয়ে থাকে। যথা,— মনে প্রাণে ও কর্মে যিনি প্রকৃত পক্ষে অহিংস,— তাঁকে জগতের কোন জীবই হিংসা করবে না,— এমন কি, হিংস্র ব্যাঘ্র, সিংহ বা সর্পাদি জন্তুও নয়।—

কায়মন প্রাণে সত্যে প্রতিষ্ঠিত যোগীর বাক্য "ফলাশ্রিত" হয়' অর্থাৎ, লোকহিত তাঁহার, তাঁর বাকসিদ্ধি হয়। তেমনি শৌচ বা শুচিতা সাধনের ফলে সত্ত্ব শুদ্ধি, সৌমনস্য, একাগ্রতা ও ইন্দ্রিয় জয় হয়ে আত্মদর্শনের ক্ষমতা জন্মে ঈশ্বর প্রনিধান, অর্থাৎ ঈশ্বরে মনোনিবেশ যখন পরিপক্কতা লাভ করে, তখন অপর কোনও সাধন ব্যতীতও উৎকৃষ্ট সমাধি লাভ হয়। সমাধিই যোগের অপর নাম।

একটা লক্ষ্য করার বিষয় এই, যে, এ-সব কথা ও বিচারের মধ্যে বিভূতির কোন উল্লেখই নেই।— তাই, ঐ দুটি যোগাঙ্গের কোন যুক্তিই বর্ত্তমান "আত্মরিক" সভ্যতার

বিচারের ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপস্থিত। আমরা কিন্তু প্রকৃত সাধু ও সিদ্ধ যোগী কারা, তার বিচারের একটি ধারণা পেয়ে গেলাম।—অর্থাৎ প্রকৃত সাধু বা যোগী বলতে আমরা—বুঝব তাঁকে—যিনি 'যম' ও 'নিয়ম'—এই যোগাঙ্গ দুটির বিশেষ— তপস্যায়—সিদ্ধ। —বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আসুরিক বলে যেখানে যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে,—এটা লেখকের ব্যক্তিগত মত বা ধারণাপ্রসূত বলে মনে করলে বিশেষ ভুল এবং বর্তমান লেখকের প্রতি অবিচারই করা হবে। শ্রীঅরবিন্দের মতগুলি বিশ্লেষণ করলে অবশ্যই এ-মতের সমর্থন পাওয়া যাবে। গীতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার অরবিন্দ কর্মে ও বাক্যে গীতাকেই সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করে গেছেন,—তাঁর অবশ্য নিজস্ব পথ ও পরধর্মের ভয়াবহতার কথা গীতোক্ত উপদেশেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

যাঁদের মনে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে "আসুরিক" আখ্যা দেওয়ার আপত্তির ভাব আছে, তাঁদের অবগতির জন্যে গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের উল্লেখ করতে হল। এই অধ্যায় "দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ" নামে প্রসিদ্ধ। এ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদ ও আসুরী সম্পদকে বিভাগ করতে গিয়ে বলা হয়েছে,— "দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা —" অর্থাৎ, দৈবী সম্পদ বন্ধন থেকে মুক্তির হেতু, আর আসুরী সম্পদ বন্ধনের কারণ।—এর পরে আসুরী সম্পদ পরিত্যাগ করবার উদ্দেশ্যে সে সম্পদের বিস্তৃত বিবরণ অর্জুনকে দেওয়া হয়েছে। যে কোন পাঠক বর্তমান সভ্যতার ধারা ও চরিত্রের সঙ্গে এই বর্ণনা মিলিয়ে দেখে এবে "আসুরিক" সভ্যতা বলেছেন কি না, সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারেন।—

গীতায় আছে :—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরা সুরাঃ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ১৬।৭ অর্থাৎ, অসুর স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ধর্মবিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্মবিষয়ে নিবৃত্ত হতে জানে না। তাদের শুচিতা বা শৌচ নেই, আচার নেই, এবং সত্য বলেও কিছু নেই।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।

অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্। ১৬।৮

অর্থাৎ এরা বলে, এ-জগৎ সত্যশূন্য ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাশূন্য, ঈশ্বর বলে কিছুই নেই এবং স্ত্রী পুরুষের কামসংসর্গ ব্যতীত এই সৃষ্টির কী কারণ বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ। ১৬।১১

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্। ১৬।১২

অর্থাৎ নিজের অহমিকা বলে স্বকীয় ধন ও মানের অপরিমেয় ধারণাকে আশ্রয় করে, মৃত্যুকাল পর্যন্ত এরা ধারণ করে। এবং কামনার উপভোগই জীবনের পরম পুরুষার্থ,—এইটুকুই নিশ্চিতভাবে বুঝে নিয়ে, অসংখ্য আশাপাশে বদ্ধ হয়ে, কাম ও ক্রোধের অধীন হয়ে, তারা বিষয় ভোগের জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে থাকে।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্। ১৬।১৩

অর্থাৎ, আজ আমার এইটুকু লাভ হল, ভবিষ্যতের এই মনোরথও পূর্ণ হবে;—বর্তমানে এইটুকু ধন আছে ভবিষ্যতে আরোও ধন হবে। [এরা এরূপই হিসাব করে]।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।

ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহম্ বলবান সুখী ১৬।১৪

অর্থাৎ এই শত্রু আমারদ্বারা নিহত হয়েছে, অন্যান্য শত্রুদেরও আমি বিনাশ করব। আমি ঈশ্বর তুল্য, সবারই নিগ্রহ করতে সমর্থ, আমি ভোগী, বলবান ও সুখী। [এদের এরূপই চিন্তা]

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোস্তি সদৃশো ময়া।

যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ। ১৬।১৫

অর্থাৎ, আমি ধনী ও উচ্চবংশজাত, আমার তুল্য আর কেউ নেই। আমি সমারোহপূর্ণ সৎকর্মাদি করব, আমি দান করব, আমি আনন্দ করব। এই মনোভাবেই অসুর ভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অবিবেকে মুগ্ধ হয়।

আত্ম সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমান মদান্বিতা।
যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধি পূর্ব্বকম্। ১৬।১৭

অর্থাৎ এসব ব্যক্তি আত্ম শ্লাঘা বিশিষ্ট এবং ধন নিমিত্ত মানের গর্বে গর্বিত হয়ে, যে সব নাম-মাত্র কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সেগুলির বিধিবিধান কোন ধর্মশাস্ত্রেই অনুমোদিত বা বিহিত নয়।

"অসুর" ও "আসুরিক" শব্দে গীতার কালের ও কী চরিত্রের লোকদের বুঝায়— সে সম্বন্ধে আশা করি, আর বেশী উদ্ধৃতির প্রয়োজন হবে না। এই শব্দ দুটির ব্যবহারের ব্যাপারে যাঁদের কোন আপত্তি ছিল, বা আছে,— তাঁরা বর্ত্তমান কালের ভারতীয় সমাজের শীর্ষস্থ কাকন কৌলিকে কুলীন, ক্রোড়পতি শিল্পপতি ও রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে,— দয়া করে যদি গীতার উদ্ধৃতি গুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, তবে অবশ্যই নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন।— বর্ত্তমান সমাজের নেতৃস্থানীয় কারা, কারা এদেশের রাজনীতি, ধর্ম-নীতি ও সমাজ নীতির মূল শক্তি, অর্থাৎ আর্থিক সম্পত্তির অধিকারী, সে-টুকুই শুধু বিচার্য,— তাদের চরিত্রের ও নিদিষ্ট কর্মপন্থার অনুশীলনেই কি সমাজ বাসী জনগণ নিযুক্ত নয়? সমাজ কি এদেরই অনুসিদ্ধেসনে চলছে না?

একে গীতায় উক্ত আসুরিক সমাজ নাম দিন, বা অপর অপর কোন মনঃপুত নাম দিন,— সমাজের নেতৃত্ব কাদের হাতে তা'তে যেন ভুল না করেন।— অন্ততঃ পাশ্চাত্য পরিবেশে বর্দ্ধিত মহামনীষি অরবিন্দ সে সম্বন্ধে ভুল করেছেন, এটা বলা যায় না।

এইবার আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহারে আসতে হয়। এই ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে ভারতীয় যোগসাধনরূপ মহাসমুদ্রের উপযুক্ত পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।— সে সম্বন্ধে আভাস মাত্র দেওয়া গেল। কোন শুভ আত্মা তরুনের মধ্যে যদি এ-টুকু কোন আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়, তবেই লেখকের শ্রম সার্থক বলে মনে করবার কারণ ঘটবে।

যোগী অরবিন্দের প্রসঙ্গ দিয়েই এই প্রবন্ধের সাময়িক অবসান করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ তৎকালীন অনুসৃত ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে ভালো কি মন্দ করেছেন,— এ প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি। পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিবেশে মানুষ হয়ে তিনি সেই সভ্যতার অনুসরণকে "পরধর্ম" আচরণ বলে আখ্যাত করেছেন, এবং সেই ভোগ প্রধান সভ্যতা ও তার রাজনৈতিক দুরীভূমি থেকে কোন প্রেরণা লাভ করতে অক্ষম হয়ে,—'স্ব-ভাব' ও 'স্ব-ধর্ম' নিয়ত পথে ভারতীয় যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করে ভারতীয় ভবিষ্যৎ 'শুদ্ধ আত্মাদের, জন্য অনন্ত আদর্শ' স্থাপন করে গেছেন। পরধর্ম থেকে প্রেরণা লাভ করা যায় না,—যা করা যায় তার ফলে বিনাশের পথই উন্মুক্ত হয়— এই সিদ্ধান্তই তিনি তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে অটলভাবে প্রকাশ করে গেছেন— কোন তর্ক, কোন আলোচনায়ও তিনি অংশ গ্রহণ করেন নি। (চলবে)

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

জনতাদল কোন পথে

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ চরণ সিংয়ের এই উক্তি—যে উক্তিতে তিনি মোরারজী দেশাইয়ের উপর কর্তৃত্ব নিক্ষেপ করেছেন, অর্থাৎ বলেছেন যে কান্তি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে কমিশন নিয়োগের যে পরামর্শ তিনি মোরারজী ভাইকে দিয়েছিলেন তারই পরিণামে তাঁকে মোরারজী দেশাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগে বাধ্য করেছেন এবং তা করেছেন ঝটিকা গতিতে। তিনি পদ-ত্যাগ না করিলে তাঁকে চাপরাশীর মতন বরখাস্ত করিতে মোরারজী দেশাই ইতস্ততঃ করিতেন না। চরণ সিং যে গভীর ভাবে আহত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে মোরারজী দেশাইয়ের বিরুদ্ধে কান্তি দেশাই জড়িত যে উক্তি চরণ সিং করেছেন তাতে পরিষ্কার বুঝায় যে চরণ সিং কিছুতেই আর মোরারজী দেশাইকে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে সহ্য করিতে রাজি নয় এবং চরণ সিংয়ের এখন একমাত্র কাজ মোরারজীকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসরণ তা যেভাবেই হউক। কুখ্যাত সভার দিল্লীতে বিভিন্ন সমাবেশ ইত্যাদির যে এত তোড় জোড় তার মূল কারণ মোরারজীর বিরুদ্ধে এবং চন্দ্রশেখরেরও বিরুদ্ধে চরণ সিংয়ের বিষোদ্গার এবং জনতাদলকে লোকদলে যেন সাব্যস্ত করা। যতদিন যাচ্ছে ততই জনতা দলে ভাঙনের খেলা একে একে প্রকাশ পাচ্ছে। বহু দলমত নিয়ে তৈয়ারী জনতাদল তার আত্যন্তরিন স্বার্থের সংঘাতে এমনই বিচ্ছিন্ন রূপ পরিগ্রহ করছে যে জনগণ দিনের পর দিন বিরক্ত হয়ে ক্রোধান্বিত হতে শুরু করেছে। অনেকে বলতে আরম্ভ করেছে যে, পুত্রবান কোন ব্যক্তি বা পুত্রবতী কোন মহিলাকে যেন ভবিষ্যতে কখনও প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসান না হয়। মানুষ আজ ব্যথা হত, চিন্তিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতে বাধ্য হচ্ছে। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে।

জনতার উৎস ছিল ভারতের জনগণ, তারাই আজ জনতার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে জনতা সরকারও হতাশায় ভুগছে। রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে জনতার মুখ্য মন্ত্রীরা তলায় বি.এল. ডির সমর্থনের উপর নির্ভরশীল, যদিও মুখ্যমন্ত্রীরা উক্ত রাজ্য গুলিতে জন সংঘী। বি.এল. ডির সমর্থন ছাড়া তারা গদীচ্যুত হতে পারেন এরূপ আশঙ্কা আছে। আবার উত্তর প্রদেশে, হরিয়ানা ও বিহারে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা, উক্ত রাজ্যগুলিতে জনসংঘের সমর্থনে মুখ্য মন্ত্রীরা গদী-নশিন। জনসংঘের সমর্থন ছাড়া তাঁরা ক্ষমতাচ্যুত হবেন বলে অনুভূত হয়। জনতা দলে ঐক্য যখন ভাঙনের মুখে তখন উক্ত ছটি রাজ্যে জনতা সরকার পতনোন্মুখ বলে ধারণা করিতে আপত্তি কি? মোরারজী দেশাই কি এই অবস্থার কথা জানেন না? চরণ সিংয়ের ইন্দিরার বিচার নুরেমবার্গ ধরণের বিশ্বে আদালতে চালানোর ব্যাপারে সাম্প্রতিক বিবৃতি যে চরম শৃঙ্খলাহীনতার কার্য তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। কারণ সরকারের মধ্যে থেকে সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপ ও চাঞ্চল্য-কর সমালোচনা যা তার নিজেরও বিরুদ্ধে (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে) ও প্রধানমন্ত্রীরও বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে করা হয়েছিল এবং যা ছিল যুক্তিহীন, অবান্তর ও অনভিপ্রেত তা যে চরম শৃঙ্খলাহীনতার পরিচায়ক সে বিষয়ে আশাকরি কেহই দ্বিমত পোষণ করিবেন না। কিন্তু মোরারজী দেশাই যে কৌশলে মন্ত্রীসভার চরণ-সিং ও রাজনারায়ণের পদত্যাগ আদায়ের সিদ্ধান্তকে ঝটিকা গতিতে পাশ করালেন ও অতি দ্রুততার সঙ্গে উভয়ের কাছে বিশেষ দূত মারফৎ পদত্যাগ দাবী করে পত্র পাঠালেন এবং পদত্যাগকে

সুনিশ্চিত করার জন্য অটলবিহারী বাজপেয়ীর পরামর্শ মত একটুও অপেক্ষা করলেন না এবং অটলবিহারী আসল মিমাংসা করার প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করলেন ও তাঁকে সাধারণ নির্বাচন তাকার ভয় দেখালেন তাতে এটা যেন পরিষ্কার হয়ে গেল, অন্ততঃ বাজপেয়ীজীর কাছে; যে প্রধান মন্ত্রী চরণ সিং ও রাজ নারায়ণকে মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় দেবেন এবং তা যতশীঘ্র সম্ভব। মোরারজী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন উক্ত দুই সত কর্মীকে মন্ত্রী সভা হইতে বিতাড়িত করিয়া। মোরারজী যদি কেবল রাজনারায়ণকে প্রথম দফায় সরাতেন, তবে অবশ্যই তাহার এত গভীর ও আকস্মিক হইত না। যদিও তিনি জানতেন রাজনারায়ণ চরণ সিংহের আজ্ঞাবহ ও পরম ভক্ত তাকে বোধ হয় মারাত্মক ভুল হলো। একসঙ্গে দুইজন কে বিদায় না দিয়া, একের পর এক এবং কিছু সময় পরে পরে যদি এই কার্য্য সংঘটিত হতো হয়ত উত্তেজনা এতটা চরমে উঠিত না। এখন জনতা দলকে তিনি কিভাবে সামাল দিবেন, ইহা কঠিন সমস্যা। উপরোক্ত চরণ সিংহের কান্তি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে মোরারজীর নিকট কমিশনের প্রভাব অনসাধারণের মনে গভীর সন্দেহ উদ্রেক করিবে বলিয়া যুক্তি সঙ্গত মনে হয়। কারণ মোরারজী দেশাই উক্ত দুই মন্ত্রীর পদত্যাগ পত্র যে ভাবে দ্রুততার সহিত কলিকাতায় অবস্থিত রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁর সুপারিশ সহ বিশেষ আমলা মারফৎ কলিকাতায় পাঠালেন এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি সহ যে আমলাটি দিল্লীতে দ্রুত ফিরিল তাহাতে ইহা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে মোরারজী দেশাই চরণ সিংকে সরাবার জন্য পূর্ব্বেই মনস্থির করেছিলেন এবং পাছে চরণ সিং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে পদত্যাগ গৃহিত হবার পূর্বেই কান্তি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু মারাত্মক সিদ্ধান্ত সরকারী ফাইলে লিপিবদ্ধ করে রেখে যান যা মোরারজীর সুনামকে কলঙ্কিত করিলেও করিতে পারে তাহা বন্ধ করিতে। মোরারজী—ভাইয়ের এত দ্রুততা ও সতর্কতা যেন প্রমাণ দেওয়া বলে অনেকেই এখন মন্তব্য করছেন। সত্যই জনতার তখন তীব্রগতিতে ধাবমান। শ্রী শ্যামনন্দন মিশ্র জনতা দলে এই ভাঙ্গনের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী করেন মোরারজী দেশাইকে। তাঁর পরিষ্কার ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি আসল কথাটি ফাঁস করে দিয়েছেন। জনতা সংসদীয় দলের নয় নেতার পদে ইস্তফা দিবার সময়ে তিনি বলেন যে মোরারজী দেশাই জনতা সংসদীয় দলকে পর্যাপ্ত বিশ্বাস করেন না। তিনি মোরারজীর বিরুদ্ধে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন না করে অভিযোগ আনেন। অথচ এই অভিযোগে মোরারজী চরণ সিংকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। শ্রীমিশ্র সাংবাদিকদের নিকট সকল বিষয় ব্যাখ্যা করে বলেন, মোরারজী দেশাই শ্রীমতী গান্ধীর বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন ও তৎসম্পর্কে যে সব উক্তি করেন তা মোটেই সাংবিধানিক দায়িত্ব-বোধের পরিচায়ক নহে। তিনি আরো বলেন, শুধু তাই নয় উপরন্তু মন্ত্রীসভার বৈঠকে চরণ সিং ও রাজনারায়ণকে নিজ নিজ আচরণের জন্য ব্যাখ্যা দিবার কোনরূপ সুযোগ না দিয়ে সরাসরি পদত্যাগ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে বদ্ধ পরিকর হন। মোরারজীর এই আচরণে যদি চরণ সিং ও রাজনারায়ণ সত্যই দুঃখ হন তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে এই যে, সহকর্মী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অসুস্থ চরণ সিংহের সহিত বিদেশ প্রত্যাগত মোরারজীর সুস্থমস্তিষ্কে সিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ, সুখ বিনিময় ও আলাপ আলোচনা না করেন। ইহা সাধারণ সৌজন্যের ব্যাপার ছিল। কাজেই যদি লোকে ভাবে ও বলে যে মোরারজী বিদেশী শক্তির প্রভাবেই এরূপ কাজ করিয়াছেন, তবে দোষ হয় লাখাদের মুখ চাপিয়া ধরা শক্ত হইবে। রাজনারায়ণ ও ঐরূপ কথাই প্রচার করিতেছে এবং জনগণ তাহা বিশ্বাসও করিতেছে— কি দুর্ভিসহ অবস্থায় আজ দেশ নিপতিত তাহা ভাবিলে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। চরণ সিং তাঁর বাস ভবনে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সমাবেশে বলেন, যে কাজটি নিজের পত্নীর প্রতি বিশ্বস্ত নয়, দেশের প্রতি তিনি কোনদিনও বিশ্বস্ত হতে পারেন না— অবশ্য তিনি ত বাম ধরে

কারো নাম উল্লেখ করেন নি। জয়প্রকাশজীর ও কৃপালনীজীর মধ্যস্থতায় এই গোলযোগ আপসে মিটমাটের যে কথা অনেকেই তুলেছেন, নানাজী দেশমুখ, চন্দ্র শেখর ও খোদ মোরারজী দেশাই কৌশলে প্রস্তাবকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এখন আর জে. পি. ও জে. বি. ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজন নাই—জনতা দখলের সময়ে জয়প্রকাশ ও কৃপালনীর দরকার ছিল—এখন জনতার নীড়ে তাঁরা নেই।

কৃপালনীজী তাই দুঃখ করে বলেছেন, এখন আর কেউ আমার মধ্যস্থতা চায় না। জনতা সরকারও জনতা দলে সংকট এখন বেশ ঘোরতর—এ সংকট থেকে যাঁরা জনতাকে উদ্ধার করলেও করতে পারেন তাঁরা হলেন জয়প্রকাশজী ও কৃপলনীজী। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা জনতা মন্ত্রিসভা চন্দ্রশেখর ও মোরারজী দেশাই এঁদের ছাড়া মিটমাটের চেষ্টা চালাতেও নারাজ বলে সংবাদে প্রকাশ। চরণ সিংয়ের কোলা থেকে যে বিড়াল রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে তাকে পুনরায় কোলায় পুরিবে কে? দেশাই এ সম্বন্ধে কোন হ্যাঁ—না, উচ্চারণ করেন নাই কেন? তিনি শুধু নাকি বলেছেন যে, চরণ সিং ও রাজ নারায়ণকে মন্ত্রীসভা থেকে সরান ছাড়া তাঁর কোন উপায়ন্তর ছিল না। এর আসল কারণ অতএব রহস্যাবৃত হয়ে গেল। যে দলের নাম জনতা এবং জনতার অকুণ্ঠ সমর্থনে যাঁরা গদীতে বসতে সক্ষম হলেন—সেই দলের শীর্ষ নেতারা বিশেষ করে মোরারজী দেশাই, নানাজী দেশমুখ; চন্দ্র শেখর, রামকৃষ্ণ হেগড়ে, বিজু পট্টনায়ক, কর্পূরী ঠাকুর, অটল-বিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবানি প্রভৃতি প্রস্তাবিত কৃষক সম্মেলনের তথা জনতা—সমাগমের আশঙ্কায় এত নৈরাশ্য ও অস্বস্তি বোধ করছেন কেন? কি তার উত্তর? কেবল গদির লড়াই, ব্যক্তি কেন্দ্রিক সুযোগ সুবিধা ভাগা-ভাগি করে গ্রহন এবং গোষ্ঠী কোন্দল আর সর্বোপরি সাধারণ মানুষকে ধামাচাপা দিয়ে নিজেদের আখের গোছাবার ধান্দা পরিষ্কার করা ছাড়া কিছুই পরিদৃশ্যমান হয় না কেন? কতদিন আর এই দুর্ভোগ নির্বিবাদে চলতে থাকবে—এর কি শেষ নাই? তথাকথিত জনতা নেতারা জেনে রাখুন তাঁদের এই ধামাধাজি, ধূর্ত শৃগাল-বৃত্তি এবং এই নীতিহীনতা ক্রমে ক্রমে সাধারণ মানুষের ধৈর্যের সীমাকে অতিক্রান্ত করে যাচ্ছে—একে আর বন্ধ করা সম্ভব নয়। সময় থাকতে থাকতে সাবধান হউন নচেৎ বিপদ অনিবার্য ও জনতার পতন অবশ্যম্ভাবী। জনতা দলের সভাপতি চন্দ্রশেখর যে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট তা বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং, যিনি বর্তমানে জনতা দলের কোষাধ্যক্ষ এবং মোরারজীর ঘনিষ্ট ও বিশ্বস্তজন, তিনি কি করে আদি কংগ্রেস ও অন্যান্য দুই কংগ্রেস অর্থাৎ C. F. D এবং চাবন প্রভাবিত কংগ্রেস ইত্যাদির পুর্বমিলনের কথা উচ্চারণ করেন এবং উক্ত তিন কংগ্রেসের মিলনের বাধাকে ও অন্যান্য আঞ্চলিক দল গুলির সংযোগে ও সমর্থনে বর্তমানজনতাদলকে উৎখাত করে মোরারজীর প্রধান মন্ত্রীত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার বাসনা প্রকাশে ঘোষণা করেন? অবশ্য এই সাক্ষাতে বি. এল. ডি ও জন সাংঘের বাজপেয়ী কৃষ্ণকান্ত, রামধন, চন্দ্রশেখর ও মোহন ধারিয়াকে ও তাঁদের অনুগামী লোকসভা সদস্যদের সঙ্গে নেওয়া হবে বলে উল্লেখ থাকে। ইহা শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রকৃষ্ট উদাহরণ নয়? যদি তাই হয়, তবে চন্দ্রভান গুপ্তের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চন্দ্রশেখর বা মোরারজী দেশাই অপারগ হলেন কেন? চরণ সিংয়ের বেলায় যত শৃঙ্খলাভঙ্গের মিথ্যা অজুহাত তুলে তাকে বহিষ্কার করার জন্য এত তাড়াহুড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হলো কেন? জাতীয় নেতার আসনে যাঁকে বসান হয়েছে; তিনি যে এত ছোট চরিত্রের লোক এ কথা জনতা দলের হোমরা চোমরা খ্যাতিমান নেতারা কি পূর্বে বুঝতে পারেন নি? রাজ-নারায়ণ যে বার বার সংবাদ পত্রে বিবৃতি দিয়ে জনতাদলের মনোনীত কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহক সমিতি ও তার সভাপতি চন্দ্রশেখরকে উহা জনতা সংসদ সদস্য ও এম. এল. এদের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থার পরিবর্তিত তথা ঢেলে সাজাতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তা কি অন্যায় কার্য ছিল? যুক্তির দিক দিয়ে রাজ নারায়ণ ঠিকই করেছিলেন। তিনি জানতেন যে জনতার অনেক নেতা গোপনে জনতার কবর রচনা করে ইন্দিরা বিরোধী সকল কংগ্রেসী সংসদ সদস্যকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হাত করে জনতার বদলে পুনরায় কেন্দ্রে এক কংগ্রেসী সরকার গঠনের উদ্যোগ-আয়োজনে লিপ্ত ছিলেন এবং এই গোপন ব্যবস্থার কথা রাজনারায়ণের মনে সম্ভবতঃ উদয় হয় চন্দ্রভান গুপ্তের উপরোক্ত আচার আচরণে এবং কিছু কিছু প্রকাশ্য বিবৃতিতে।

(চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[রাজনৈতিক কার্য্যাবলী]

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

লর্ড ডাফেরিণ এর একটি যোগ্য উত্তর দিলেন। তিনি বললেন: "প্রভাবশালী শিক্ষিত ভারতীয়গণ তাদের জনগণের আস্থাভাজন হয়ে আমাদের লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল সমূহে উপযুক্ত সহযোগী হয়ে উঠেছেন। একযুগ আগে যখন রাষ্ট্রনীতিবিদ লর্ড হ্যালিফ্যাক্স তাদের যে রাজনৈতিক মর্য্যাদা দিয়েছেন, ভারতীয়গণের মধ্যে আমার অবস্থানকালে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে তা আরও সম্প্রসারিত ও দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করতে পারলে আমার পক্ষে তা সুখের ও আনন্দের বিষয় হবে।"

মিঃ জর্জ ইউল—যিনি পরবর্তীকালে কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন—সভায় আমার পাশেই বসেছিলেন। তিনি লর্ড ডাফরিণের এই কথা শুনে আমাকে বললেন, "আপনারা পাঁচ বছরের মধ্যেই শাসন সংস্কার লাভ করবেন।" এই কথাগুলি ভবিষ্যৎ বাণী হয়ে দেখা দিল। ১৮৮৭ সালে এই কথা বলা হয়েছিল, আর ঠিক পাঁচ বছর পরে ১৮৯২ সালে আমরা শাসন সংস্কার লাভ করি। এটা ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে লর্ড ডাফরিণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ধারণাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং কংগ্রেসের সৃষ্টি কাল থেকেই এর উচ্চাভিলাষের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন, তিনি এদেশের কার্য্য ভার ত্যাগ করে যাওয়ার পূর্ব্বে এদেশের শিক্ষিত সমাজকে এক "অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখার মত সংখ্যালঘু সমাজ" বলে বর্ণনা করেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে যখন তিনি কলকাতার সেন্ট এণ্ড্রুজ ডিনারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই ভাবে নিন্দাবাদ করছিলেন, ঠিক সেই সময়েই তিনি কংগ্রেসের কাউন্সিলগুলি সংস্কার করার সুপারিশকে সমর্থন করে এক গোপন ডেসপ্যাচ লিখছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালকদের গতি প্রকৃতিই অদ্ভুত!

যা হোক, যে ডাইসরয় সর্ব্বপ্রথমে জন সাধারণের নির্বাচনের ভিত্তিতে আইন পরিষদগুলি পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনাকে সুপারিশ করেছেন তার জন্য অনেক কাজের জন্য তাকে আমরা ক্ষমা করতে পারি এবং তা ভুলেও যেতে পারি, তার এই গোপন ডেসপ্যাচ সর্ব্বপ্রথমে আমি ১৮৮৯ সালের মার্চমাসে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশ করি। এই গোপন ডেসপ্যাচই ১৮৯২ সালের পার্লামেন্টারী ষ্ট্যাটুটের ভিত্তি রচনা করে।

এখানে আমি বলতে পারি যে লর্ড ডাফরিণ আইন পরিষদগুলি সংস্কার করা সম্পর্কে তার ডেসপ্যাচ পাঠাবার আগে তিনি কয়েকজন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন তার সেক্রেটারি হ্যারিসন, মিঃ কটন; এবং মনে হয় আরও দু একজন ছিলেন, আমাকেও—গভর্ণমেণ্ট হাউসে ডাকা হয়েছিল এবং ডাইসরয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। আমি জোর দিয়েই বলেছিলাম যে কাউন্সিলগুলি নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত হওয়া উচিত এবং সদস্যদের প্রশ্ন করার ও বাজেটের উপর কর্তৃত্ব দিতে হবে, আলোচনা খোলাখুলি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেই হয়। আলোচনা শেষে তিনি আমাকে তার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কামরায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে স্যার হেনরি মেকেঞ্জীর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে বললেন, 'মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি হোমার কাছ থেকে যা যা জানতে চান, সব তাকে জানিয়ে দাও।" আমি ডাইসরয়ের সঙ্গে আমার যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে তা সবই

স্যার হেনরি হ্যারিসনের কাছে বললাম। হেনরি হ্যারিসন যে আগেই ভাইসরয়ের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা আমি জানতে পারলাম, স্যার হ্যারিসন আমাকে বললেন, "সুরেন্দ্রনাথ, একটি কাউন্সিল গঠিত হবে এবং তুমি তার একজন মেম্বার হবে।" এই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছিল। সজ্জনের কথা কখনো বিফলে যায় না।

যে ঘটনাবহুল বছরের কথা এখন আমি বলতে যাচ্ছি সে বছরটি ছিল আমার পক্ষে একটি কঠিন পরিশ্রমের বছর। রাজস্ব আদায়ের জন্য হুগলী জেলায় একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল, এই পদ্ধতিটি আউটস্টিল সিস্টেম নামে পরিচিত ছিল, এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে দেশী মদের দাম অনেক কমে গেল এবং বিক্রিও খুব বেড়ে গেল। দাম কমে যাওয়ায় লোকে বেশী পরিমাণে মদ খেতে আরম্ভ করল। গ্রাম অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে ভয়ঙ্কর ভাবে দ্রুত পানোন্মত্ততা প্রসার লাভ করল। আমি বাস করি হুগলীজেলার বিপরীত দিকে এবং আমার বাড়ীর কাছে এক ক্রোড়া ঢিলের গতি পথের মধ্যে নদীর তীরে একটি মদের দোকান ছিল। আমি মাতলামির কথা, নৈতিক অধঃপতনের কথা ও এইভাবে ধ্বংস পাওয়ার কথা শুনতে পেলাম। জিলার অভ্যন্তর থেকে যে সমস্ত রিপোর্ট পেতে থাকি তাতেও এই সংবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হল। কিন্তু এই রিপোর্টে-ই আমি খুশী থাকলাম না, নিজে হরিপালে এক মদের দোকান দেখতে গেলাম। সেখানে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তা জীবনে কখনও ভুলব না। দেখলাম ৬ জন মেয়ে ও পুরুষ মদে মাতাল হয়ে মড়ার মত দোকানের মেজের উপর শুয়ে পড়ে আছে, আর প্রায় ১২ জন নিম্নশ্রেণীর মেয়ে পুরুষের একটি দল মত্ততার বিভিন্ন অবস্থায় বিকারগ্রস্ত বন্য উত্তেজনায় আমাকে ঘিরে নাচতে শুরু করে দিল। আমার উপরে আক্রমণ চালাতে পারে এই আশঙ্কায় আমি আস্তে আস্তে সতর্কতার সহিত দোকান থেকে পিছু হটে চলে এলাম। আমি সঙ্কল্প গ্রহণ করলাম যে আমার সাধ্য মত এই পাপাচার দূর করতে চেষ্টা করব।

দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি বাড়ীতে ফিরে এলাম। বুঝলাম সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দীর্ঘকাল ধরে ধৈর্য্যের সহিত চেষ্টা করে লোকগুলোকে এই সর্বনাশা মদের ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে বাঁচাতে হবে। আমরা জন সাধারণের কাছে মদ্যপান না করার জন্য আবেদন করলাম, সরকারের কাছেও আবেদন করলাম আউট স্টিল সিস্টেম্ তুলে দিতে। জনসাধারণের কাছে আবেদনকেই আমরা আমাদের কার্য্যক্রমে প্রথম স্থান দিলাম কারণ, আমরা বুঝতে পারলাম, একবার জনমত আমাদের পক্ষে আসত হলে আমাদের আবেদনকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। এই ভাবেই আমরা কাজে এগিয়ে গেলাম। এইভাবে কাজ করে আমরা যে ফল পেয়েছি তাতে আমাদের অবলম্বিত কর্মপদ্ধতি যৌক্তিক্য প্রমাণিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ভাবে কাজ করে যাওয়ার পথ নির্দেশ এই কাজের ভিতর দিয়ে পেলাম।

এই পাপ দূর করার জন্য আমরা এক অভিযান শুরু করলাম। হুগলী জেলার নানা স্থানে আমরা কয়েকটি জনসভার অনুষ্ঠান করি। এগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত গভীর শ্রেণীর লোকদের সভা। প্রায়ই হাজার লোক সভায় আসতে থাকে সভা কখনও খোলা জায়গায় কখনও কখনও বৃষ্টির মধ্যেও সভা হয়েছে। সভায় যে ভাষায় বক্তৃতা করা হত, তা ছিল অতি সহজ সরল সাধারণ ভাষা—সাধারণ লোকেরা সহজেই বুঝতে পারে। সে ভাষার মধ্যে অলঙ্কার ছিল না বা সাহিত্যিক রসসৃষ্টির জন্য প্রয়াস সাধ্য কথার বিন্যাসও ছিল না। এর আগে আমি কোন দিন কোন জনসভায় বাংলায় বক্তৃতা করিনি, কিন্তু একটু পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে বাংলায় বক্তৃতা করার এই নতুন পথে চলতে আমি সহজেই পারলাম। এই ভাবে বাংলায় বক্তৃতা করার মূল্যবান শিক্ষা আমি লাভ করলাম। পরে এই শিক্ষা আমার খুব কাজে লেগেছিল, যখন "স্বদেশী আন্দোলনের" সময় বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য জন সভায় আমাকে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। এই সব সভায় সঙ্কীর্তনের দলগুলিও এসে যোগদান করত। এই সঙ্কীর্তনের দলগুলি খোল-করতাল সহযোগে সময়োপযোগী কীর্তনগান করতে

করতে গ্রাম পরিক্রমা করে সভায় এসে যোগ দিত। এর ফল খুব ভাল হয়েছিল। দূর দূর গ্রাম থেকেও দলে দলে লোক আমাদের পিছনে পিছনে আসত, সভায় উপস্থিত থাকত এবং আমাদের বক্তৃতা শুনত। এই সমস্ত সভার জৌলুসের মধ্যে সঙ্গীতের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। প্রয়োজন বোধে আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যও পাঠ করেছি এবং সেই থেকে বাংলাদেশে জনস্বার্থে ও রাজনৈতিক প্রচার কার্যের ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ত্তন একটি বিশিষ্ট ভূমিকা হিসাবে কাজ করেছে। আমরা এই কীর্ত্তন গানের জন-প্রিয়তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছি; ফলও খুব চমৎকার হয়েছে। আমাদের দলে বাবু বংশী গগন রায় ছিলেন একজন মধুর কণ্ঠ গায়ক। তিনি নিজেই গান রচনা করতেন এবং সেই গান গেয়ে শ্রোতৃবর্গের মনে শিহরণ জাগিয়ে তুলতেন, এখানে মনে রাখতে হবে যে এ সমস্ত কাজ যারা করতেন তারা কেউ সে জন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। সকলেই সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাদানের আনন্দেই কাজ করতেন। কেবলমাত্র তাই নয়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস ধরে তারা অনেক ত্যাগ স্বীকার ও অসুবিধা বরণ করেই এ কাজ করে যেতেন।

এই সমস্ত মহান ব্যক্তিদের নাম স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য। সর্ব প্রথমে এবং পুরোভাগে যার নাম স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র, তিনি ছিলেন তখন তাঁর জীবনের সর্বোত্তম স্তরে। বয়স বেশী হলেও সাংসারিক বিয়োগ বেদনার মধ্যেও তিনি নিজেকে ঠিক রেখে জন-সেবামূলক কাজে চরম উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। তিনি ছিলেন সাধু প্রকৃতির লোক। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যদি কোন সৎ এবং খাঁটি মানুষকে স্মরণে রাখতে চান তাহলে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁকেই সব চেয়ে গুণী, যোগ্য এবং নিঃস্বার্থ ব্যক্তি বলে মনে রাখবেন। প্রকৃতির দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, রাজনীতি ছিল তাঁর ধর্মবোধের অঙ্গীভূত। তাঁর প্রতিটি জনসেবা মূলক কাজ গভীর ধর্মবোধের দ্বারা চালিত ছিল। তাঁর কথা মনে হলেই আগেকার দিনের পিউরিটানদের কথা মনে পড়ে। তপস্বীর মত প্রকৃতি বিশিষ্ট এই মনীষী স্ব-প্রত্যয়ে দৃঢ় আস্থাশীল ছিলেন। জীবনের সুখ ভোগের প্রতি ছিলেন উদাসীন। ভণ্ডামী ও আড়ম্বরের প্রতি ছিল তাঁর অত্যন্ত ঘৃণা। কিন্তু সেই পুরানো দিনের পিউরিটানদের সঙ্গে তাঁর কিছু পার্থক্য ছিল। তাঁর মধুর আন্তরিক ব্যবহার তাঁর চরিত্রকে পরিপূর্ণ করেছিল। যে কোন রকম ভাল কাজেই তিনি অন্তরের সহিত সাড়া দিতেন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের মত স্বদেশী আন্দোলনের এত বন্ধু এবং বঙ্গবিভাগের এতবড় অকুণ্ঠ বিরোধী আর কেউ ছিলেন না। দেশ সেবা স্বদেশ ভক্তির জন্য তাঁকে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। তাঁর প্রতি নির্বাসন দণ্ড লাভ করার অর্থ হল তাকে চরমতম, নিষ্ঠুরতম আঘাত হানা। কারণ তিনি নিয়মতান্ত্রিক বৈধ আন্দোলনেরই সমর্থক ছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী। ১৯০৯ সালে ইণ্ডিয়া অফিসে লর্ড মর্লের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কারের সময় আমি তাকে বলেছিলাম যে কৃষ্ণকুমার মিত্রকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া অতি অন্যায়ের কাজ হয়েছে। আমার মনে হয় আমার এই অভিমত আজ এমন কি সরকারী কর্মচারীরা নিজেরাও স্বীকার করবেন। পুলিশের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে এক তরফা ভাবে কাউকে শাস্তি দেওয়া যে কতখানি বিপদজনক ও নিরাপত্তা বোধের অভাব সৃষ্টি কারক, তার যদি বাস্তবিকই কোন প্রমাণের প্রয়োজন থেকে থাকে, তাহলে এই ঘটনাই তার প্রমাণ। এই রকম শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির পুলিশের বিবরণ সম্পর্কে নিজের কিছু বলবারও সুযোগ ছিলনা। এই সব কথা বলে আমি পরে যা আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব তারই কিছুটা পূর্বাভাস দিয়ে ফেলেছি।

আমি সেই জন-সভাগুলি সম্পর্কীয় আলোচনায় আবার ফিরে আসছি এবং যে সমস্ত বন্ধু সে কাজে যুক্ত ছিলেন তাদের বিষয়ও এখানে বলছি। আর একজন কর্মী ছিলেন বাবু কালীশঙ্কর শুকুল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

একজন উজ্জ্বল ছাত্র এবং তার পরীক্ষা পাশের বছরের কয়েকের মধ্যেই তিনি লাভ করেন। তিনি বাঙালী ছিলেন না। যুক্ত প্রদেশের কানপুর অঞ্চলের কোন জায়গার লোক। তবে একথা হয়ত আমি বলতে পারি যে তিনি সম্পূর্ণরূপে এদেশের জলবায়ুর সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। আচার আচরণে তিনি বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। একজন বাঙালী মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন এবং অন্য বাঙালীদের মতই সহজ স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা ভাষায়ই কথা বার্তা বলতেন। আমার বরং মনে হত যেন তিনি তার মাতৃভাষা হিন্দীই তেমন ঠিক ভাবে বলতে পারেন না। কানপুরে একবার এক জনসভায় বক্তৃতা করে পরে আমাকে বলেছিলেন যে তিনি বক্তৃতায় অনেক ব্যাকরণ ভুল করে ফেলেছেন। তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৮৭৬ সালে যখন আমি ভারতীয় ঐক্য সম্পর্কে এক সভায় বক্তৃতা করছিলাম। উপস্থিত ছাত্রদের ভিতর থেকে তিনি উঠে এসে বক্তৃতা করলেন। তার বক্তৃতাটি ছোট ছিল বটে; কিন্তু খুব উপযোগী ও কলপ্রসূ হয়েছিল। শ্রোতাদের মনের উপরে তা রেখা পাত করে। তখনই আমার মনে হল, এই যুবকের মধ্যে সম্ভাবনা আছে। আমার সে ধারণা ঠিকই হয়েছিল, এইভাবে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে এবং তা ক্রমে আন্তরিক বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করে। তিনি আইল বিল আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। আমি যখন সিভিল সার্ভিস আন্দোলন ব্যাপদেশে কৃষ্ণকুমার মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরভারত পরিক্রমায় যাই, তিনিও তখন আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। শেষের দিকে ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়ায় তিনি আর আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে পারেন নি; কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।

(চলবে)

মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা কমিটি

৩২/৮, চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০

আগামী ৯ই আগষ্ট, ১৯৭৮ বুধবার সকাল ৯ ঘটিকায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে। প্রবীণ বিপ্লবী সংসদ সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরমন্ত্রী মাননীয় শ্রী প্রশান্ত শূর মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিবেন।

বিপ্লবসাধনার সার্থক প্রতীক মহারাজ ত্রৈলক্যনাথের সমাধিতে এই স্মরণীয় দিনে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করিতে আপনাকে সবান্ধবে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

অনুষ্ঠানে শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও ক্রান্তি শিল্পী সংঘ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন।

স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সভাপতি

Contd. from 2nd cover

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—BURDWAN—contd.		
Dey Smt. Gita Rani w/o Late Gopal Krishna Dey	P.O. & Vill Kasthasali P. S. Purbasthali	150	1. 7. 77
Kundu Smt Saraju Bala w/o Late Balai Chand Kundu	Mahlamordinitolai P.O. Kalna	200	13. 1. 78
	Dist—BANKURA		
Karmakar Smt. Prabhabati w/o Late Golak Nath Karmakar	P. O. Barabazar	200	3. 12. 77
Dashi (Mondol) Smt. Uttarbala w/o Late Shreedhar Mondol	P. O. Chandra, P.S. Saltora	150	25. 11. 77
Devi (Sinha) Smt. Rimkumari w/o Late Saktipada Sinha	Vill Bhalrabpur, P.O. Amarkanan	200	29. 7. 77
	Dist—PURULIA		
Mahoti Smt. Subhadra	Vill Andio, P. S. Manbazar	100	28. 6. 76
	Dist—NADIA		
Dey Smt. Namita Renu w/o Late Kanailal Dey	Shyamchandpara, P. O. Shantipur	200	24. 1. 78
Dey Smt. Usha Rani w/o Late Nibaran Ch. Dey	Plot 960 Kheshberh Mohulla P. S Chakdah	150	1. 10. 76 (Enhancement)
Maitra Smt, Usha Rani w/o Late Bindhu Bh. Maitra	1/75 Dhubulia Old Camp P. O. Belpukur	200	13. 4. 78
Sinha Smt. Jogmaya w/o Late Jatish Kamal Sinha	Vill Karimpur, P.S. Krishnagaoj Chandannagar	200	1. 4. 78
Sur Smt. Sudha w/o Naresh Ch. Sur	Rajendranagar P. O. Bethuadahari	200	25. 11. 77

RgedNo/ R. N . 24511/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. WB/NC 77

পাক্ষিক—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাষ্মাষিক ১—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

c/36

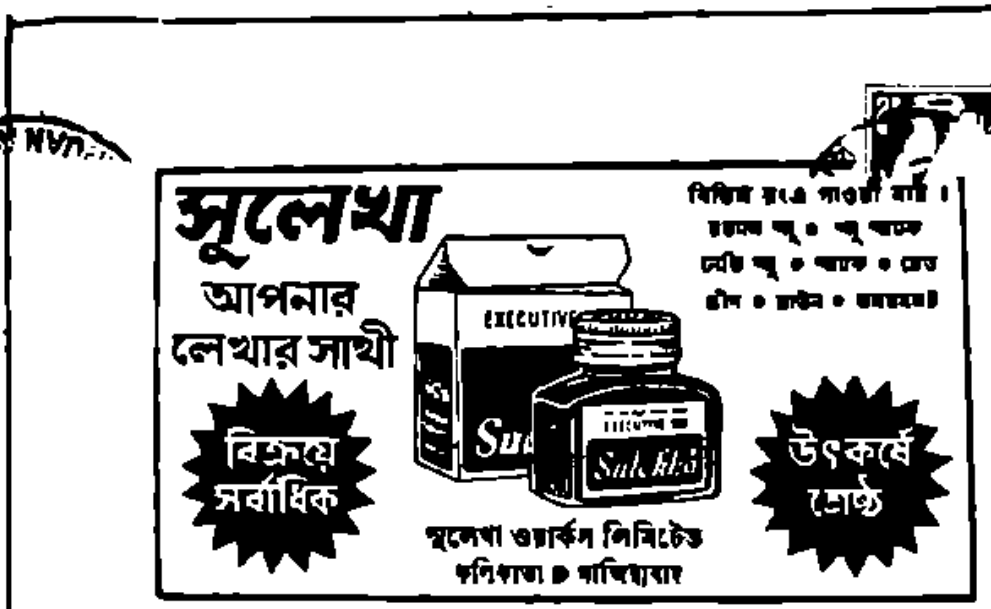

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।

সম্পাদক—শ্রীসাজি সরণ রায়চৌধুরী

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীমধুগোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবীরেন্দ্র গুহ।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৩৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রণে :—কিষ্টি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮ নং বেথুন রো ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৬

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ২রা ভাদ্র, ১৩৮৫ ১৯শে আগষ্ট, ১৯৭৮	৪৫ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

এই সংখ্যায়

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

জনতাদল কোন পথে

। বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। শ্রীকীরোদ দত্ত ।।

বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি

। ডাঃ চিত্তরঞ্জন দাশ ।

বিপ্লবী পুস্তক সংগ্রহ অভিযান

ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই।

—বঙ্কিমচন্দ্র

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—MALDA		
Chowdhury Sunil Kumar	Sabuj Villa, Bibigram P. S. English Bazar, P.O. Malda	200	1. 4. 77
	Dist—WEST DINAJPUR		
Chatterjee Smt. Nani Bala w/o Late Kshitish Chatterjee	Mohanbati- ulsitola P. O. Raiganj	150	24. 3. 78
Samajdar Smt. Nirode Bala w/o Late Surendra Nath Samajdar	Vill Jalghar, P.S. Balurghat	100	9. 2. 77
	Dist—MIDNAPORE		
Bera Smt. Kiron Bala w/o Late Gourhari Bera	Gourangapur, P.O. Kakgachia	200	29. 9. 77
Bhunia Narendra Nath	Vill Lakshyakuri, P. O. Bejoyram Chak	200	12. 2 74
Das Adhikary Smt. Jnanada Bala w/o Late Narendra Nath	Vill Chak Simulia P. O. Kumar Chak, P.S. Mahisadal		27. 1. 78
Ghosh Smt. Gayatri w/o Late Shanhtiprio Ghosh	Vill Bhawanipur, P.O. Narajob P. S. Debra	200	26. 12. 77
Samanta Smt. Labangalata w/o Late Pratap Ch. Samanta	P.O. & Vill Lakshya P.S. Mahisadal	100	13. 2 78
Samanta Smt. Draupodi Bala	Vill Alinan P. O. Hogla	100 (Enhancement)	1. 10. 76
Patra Smt. Narmada w/o Late Bhim Ch. Patra	Vill Kunjapara, P.O, Itaberia P. O. Bhagwanpur	100	17. 9. 77
	Dist—COOCH BEHAR		
Sen Ananda Mohan	Tapurhat, P.S. Kotwali	200	1. 10. 76
	Dist—JALPAIGURI		
Bagchi Sudhir Chandra	Plot 231, Pandapara P. O. Jalpaiguri	200	15. 3. 72
Lahiri Manindra Prasanna	P O. Prasannanagar Vivekananda Colony	200 (Enhancement)	1. 10. 76

(Contd. on 3rd cover)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস]

এই সম্মান-জ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানটি এর পূর্বে বা পরে আর কখনও কংগ্রেসের আদর্শের জন্য এত উৎসাহ দেখায় নি। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। রাজেন্দ্র লাল ছিলেন খ্যাতি। পণ্ডিত হিসাবে তিনি যত বড় ছিলেন, রাজনীতিবিদ হিসাবে তত বড় ছিলেন না। বাংলার অভিজাতদের নিষ্ঠার স্বরূপ ছিলেন ৭৯ বছরের বর্ষীয়ান নেতা বাবু জয় কৃষ্ণ মুখার্জি। তিনি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের জন্য দাদাভাই নৌরজির নাম প্রস্তাব করলেন। এ যেন এক যোগাযোগেরই কংগ্রেস। এই অনুষ্ঠানে প্রধান ঘটনা-রূপে যা সকলকে আকৃষ্ট করল, তা হল এই যে এই কংগ্রেসের অধিবেশন বৃদ্ধ, যুবা, মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত জমিদার বর্গ সকলকেই এক কংগ্রেস মঞ্চে এনে মিলিত করেছে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রাজা দিগম্বর মিত্র এবং মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের যাকে বলা যায়—এক রাজনৈতিক জোট। এদের নেতা ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল। তবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন এই জোটের তাত্ত্বিক সাহিত্যিক প্রতিভা। দিগম্বর মিত্র এবং কৃষ্ণদাস পাল এখন আর বেঁচে নেই। এদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখন গিয়ে বর্তিয়েছে রাজা রাজেন্দ্র লালের উপর। আমি তখন তরুণ। এরা আমাকে খুব বিশ্বাস করতেন, এমন কি এই প্রতিভাবান নেতৃগোষ্ঠীর প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমি এদের খুব কাছ করেই জেনেছি। কোথায় তাদের শক্তি, এমন কি কোথায় তাদের দুর্বলতা, তা সবই আমি জানতাম। রাজা রাজেন্দ্র মিত্র ছিলেন একজন বক্তা এবং শক্তিশালী লেখক। তিনি প্রধানতঃ একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তবে তিনি সহজভাবেই সাধারণের সমস্যাবলী বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারতেন। তিনি ছিলেন সে যুগের অগ্রগণ্য নেতাদের মধ্যে একজন। আমি তাঁর বক্তৃতা প্রায়ই শুনেছি। তাঁর বাচনভঙ্গী ছিল সহজ, সরল যেন সাধারণ ভাবে কথা-বার্তা বলে চলেছেন এবং তার মধ্যে বেশ কৌতুকও ছিল। শেষ জীবনে তিনি কানে ভাল শুনতে পেতেন না। কর্পোরেশনের সভায় তিনি কৃষ্ণদাস পালের পাশেই বসতেন। কৃষ্ণদাস—সভায় যে সমস্ত বক্তৃতা হত তার বিষয়গুলি সংক্ষেপে নোট করে তাঁকে দিতেন। তার উপরে ভিত্তি করে তিনি সভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি দেশের কাছে তাঁর আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং গোটা সমাজের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে গেছেন। প্রবীণ, বর্ষীয়ান নেতাদের অতীতের অচল মানুষ বলে পরিত্যাগ করার হেডোজ তখনও দেখা দেয়নি। বিগত যুগের প্রভাবান ব্যক্তিদের জনসেবার ঐতিহ্য জন-মনের উপর তখনও পর্য্যন্ত দৃঢ় আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কলকাতা কংগ্রেসে এবং পরবর্তী সমস্ত কংগ্রেসের অধিবেশনেই আমি শাসন সংস্কার ও কাউন্সিল সমূহের পরিবর্তন দাবী করে প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। যে পর্য্যন্ত সেই শুভ অধিকার আদায় না হয়েছে, সে পর্য্যন্ত সে দাবী অক্ষুণ্ণ ছিল। আমার কাছে এই দাবীর ব্যাপারটা ছিল একটা সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ নিবদ্ধ করার বিষয়। এ ছাড়া অন্য কোন ভাবনা আমার বড় ছিল না। একে দুর্বলতা বা সফলতা, যা খুসী বলতে পার (আমি বিশ্বাস করি, নিজেকে এভাবে প্রকাশ করার জন্য আমি মার্জনা পাব)। আমাকে জীবনে সময় সময় একক ভাবে প্রবল আদর্শবাদের প্রভাবে কাজ করতে হয়েছে। সিভিল সার্ভিসের প্রশ্ন, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্ন, কাউন্সিল

সমূহকে পরিবর্তনের প্রশ্ন এবং "স্বদেশী"—যার সঙ্গে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার প্রশ্ন জড়িত ছিল এই সমস্ত চিন্তাই আমার মনের বিপ্লবাত্মক পরিবেশকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছিল। এই চিন্তা আমার উৎসাহকে উদ্দীপ্ত করে আমার অন্তরাত্মাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। কিছুদিনের জন্য আমি আমার আদর্শবাদের মধ্যেই বেঁচে ছিলাম। অন্য সমস্ত কাজ তখন করেছি কতকটা অল্প বেশী পরিমাণে যান্ত্রিক ভাবে। আমি মনে করেছি যে এই কাজই হল একমাত্র কাজ যা অন্য সব কাজের উপরে স্থান পাওয়ার যোগ্য বা সব চেয়ে মূল্যবান, যার সাফল্য অর্জন একান্ত প্রয়োজন। অপরকে এই মতে আনতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। এই কাজে সফলের সঙ্গে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে কিছুটা সময় আমার লেগেছে। কিন্তু সেই প্রস্তুতির পর্ব শেষ হয়ে গেলে আমাকে সে কাজ থেকে কোন কিছুই প্রতি-নিবৃত্ত করতে পারেনি। আমি আমার নিজেরই সৃষ্ট এক জগতে বাস করতে থাকি। সে পরিবেশ আমি নিজেই গড়ে নিয়েছিলাম। বাইরের কোন প্রভাব তা ভেদ করতে পারেনি। তাই বঙ্গ-ভঙ্গ নিয়ে দোরগোলের সময় যখন জন-সাধারণের কানের কাছে সর্বক্ষণ ঢ্যাঁ ঢ্যাঁ করে এই কথাই প্রচার করা হচ্ছিল যে দেশ-বিভাগ একটা স্থায়ী ব্যবস্থারূপেই করা হয়েছে, ওর আর কোন নড়-চড় হবে না, এবং আপাত দৃষ্টিতে তাই ঠিক বলেও মনে হচ্ছিল, তখনও আমি আমার অনমনীয় মনোভাব নিয়ে স্থির সঙ্কল্পের উপর দাঁড়িয়ে-ছিলাম। আর সকলে যা বাস্তব সত্য ও স্পষ্ট বলে মনে করলেন তা দেখবার মত দৃষ্টি বা সে সম্পর্কে কিছু শুনবার মত কানও তখন আমার ছিলনা। অবিশ্বাসীদের কাছে যা অসম্ভব বলে মনে হয়েছে আমি তাকে আমার আত্ম-বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখেছি।

এখন আমি আমার আত্ম পর্য্যালোচনার কথা ছেড়ে দিয়ে ১৮৮৭ সালের ঘটনাগুলির কথায় যাচ্ছি। এই সমস্ত ঘটনাগুলির মধ্যে আমার নিজের ভূমিকা ছিল। এই বছরটি ছিল মহারাণীর রাজত্বকালের জুবিলিবছর। কলকাতা ছিল তখন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী। যথাযথ জাঁক-জমক সহকারে কলকাতায় জুবিলি অনুষ্ঠিত হয়, একথা আমি পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। আমরা যারা ধীর এবং দৃঢ় পদক্ষেপে কাজের ভিতর দিয়ে স্বায়ত্তশাসন বিকাশ লাভের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তারা আমাদের এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই জুবিলির জাঁক-জমকের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমরা দাবী করছি, আমাদের সে কাজ বৃথা যায়নি। কারণ, আমরা এই উপলক্ষে ভাইসরয় লর্ড ডাফেরিনের কাছ থেকে শাসন সংস্কার ও আইন পরিষদগুলি পরিবর্তনের পক্ষে এক ঘোষণাবাণী আদায় করেছি (অন্যত্র এই ঘোষণা বাণীর পূর্ণ বিবরণ দিয়েছি)।

এ বছরের কংগ্রেস অধিবেশন হয় মাদ্রাজে। আমরা একখানা জাহাজ ভাড়া করলাম। আমরা বহুসংখ্যক প্রতিনিধি সেই জাহাজে চড়ে মাদ্রাজ রওনা হলাম। আমাদের মধ্যে ছিলেন স্যার বাসবিহারী ঘোষ এবং রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী। রাজা কিশোরীলাল পরবর্তী কালে বাংলার একটি কিউটিভ কাউন্সিলের প্রথম সদস্য নিযুক্ত হন। আমাদের এই সমুদ্র যাত্রা বেশ আনন্দদায়ক হয়েছিল। কাজ এবং আনন্দ, দুটাই আমরা এক সঙ্গে এই সমুদ্র যাত্রায় পেয়েছি, এক সঙ্গে এতগুলো লোকের এক জায়গায় মিলন এবং কয়েকদিন ধরে একত্র বসে কংগ্রেস ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা ছাড়া অন্য কোন আলোচনার মধ্যে না গিয়ে যে পরিবেশ রচনা করি তা আমাদের আন্দোলনের এই শৈশব অবস্থায় আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিল। সে যুগের এই প্রতিনিধিগণ যারা জাহাজে মিলিত হয়ে আলোচনা করেছিলেন তারা প্রায় সকলেই আজ এজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু তাঁদের আত্মা আজও জাতির মধ্যে বেঁচে আছে। তারা তীর্থযাত্রী পিতৃপুরুষের কাজ করে গেছেন। যে কাজ তারা করেছেন তার মধ্যে ছিল ভবিষ্যতের মহান সম্ভাবনা। প্রারম্ভিক উৎসাহের জৌলুষ-ছটা এখন আর না থাকলেও (এবং একথা অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে কংগ্রেস এখন নিষ্ফলে সমুদ্রযাত্রা করেই চলেছে) জনগণের মনে এ

বিশ্বাস অটুট আছে যে কংগ্রেসকে কাজের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতেই হবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতের ভাগ্য স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নির্দ্ধারিত না হয়।

মাদ্রাজে আমাদের যেরূপ আন্তরিকতার সহিত স্বাগত জানান হয় তা এখনও আমার স্মরণে আছে। পরবর্ত্তী-কালে সমস্ত কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির নিকট এইরূপ হার্দ্দিক আপ্যায়ন করা একটা দস্তুর হয়ে দাঁড়ায়। দিবারাত্র সন্ত্রান্ত পরিবারের তরুণ স্বেচ্ছা সেবকগণ স্ফূর্ত্তির সহিত আমাদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই স্বেচ্ছাব্রতী তরুণদের বিন্দু মাত্র নিষ্প্রানন্দ স্পর্শ করতে পারেনি। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে আমরা যে বন্ধুত্ব লাভ করেছি তা সারা জীবনভর অক্ষুণ্ণ ছিল। এদের সঙ্গে বাংলার বন্ধুদের মতই প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সমস্ত বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা ছিলেন বীর রাঘব চারিয়ার, জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, রঙ্গ নাইডু এবং আনন্দ চালু। অসংখ্য বন্ধু পেয়েছিলাম যাদের সকলের নাম করা সম্ভবপর নয়। কংগ্রেস অধিবেশনের সামাজিক দিকটার আকর্ষণও কম ছিল না। আন্দোলনের এই দিকটারও বিশেষ মূল্য আছে। এখানে এমন একটা সাধারণ মঞ্চ গড়ে উঠলো যা ভারতের জনমতের ধারক নেতৃবৃন্দের এক মিলনভূমি হয়ে তাদের ও মতের আদান প্রদান করে, ভুল বোঝা বুঝি দূর করে, বন্ধুত্বের ভাব গড়ে তোলায় সাহায্য করেছে।

মাদ্রাজে এই সময়ে যে সমস্ত বন্ধু পেয়েছিলাম তার মধ্যে একজন বন্ধুর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। স্বর্গত ভিজিয়ানী গ্রামের মহারাজার সঙ্গে এখানে আমার ঘনিষ্ট পরিচয় ঘটে। তৎকালীন মাদ্রাজের গভর্ণর স্যার মাউন্টষ্টুয়ার্ট গ্রান্ট-ডাফ তাঁকে বলতেন "প্রিন্স চার্মিং"। গভর্ণর বাহাদুরের দেওয়া এই নামটি ঠিকই হয়েছিল।

অধিবেশনের প্রথম দিনের সভায় যা যা ঘটেছিল তা আমার কাছে এখনও পর্য্যন্ত এত স্পষ্ট যে মনে হয় যেন তা এই গত কালই ঘটে গেছে। আইন পরিষদ সম্পর্কীয় বিষয়ের উপর আমার বক্তৃতা শেষ করে প্যাভিলিয়ন থেকে নেমে আসতেই তিনি আমার দিকে এগিয়ে এসে গভীর আন্তরিকতার সহিত কর-মর্দ্দন করলেন। আমরা পরস্পরের সঙ্গে সৌজন্যমূলক বাক্যালাপ করলাম। তারপর থেকে আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা কেবলমাত্র ১৮৯৭ সালে তাঁর অকাল প্রয়াণে পরিসমাপ্ত হয়। তিনি খুব ঘন ঘন কলকাতায় আসতেন। এখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেতাম। তাঁর সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে চাই যে তাঁর মত উৎসাহী, আগ্রহী এবং উদার-হৃদয় মানুষ আমি কমই দেখেছি। তিনি যে কেবলমাত্র সৌজন্যেরই একটা মিশিষ্ট নিদর্শন ছিলেন, তা নয়। সে রকম সৌজন্য অল্প বিস্তর পরিমাণে তাবৎ ভারতীয় নৃপতিবর্গের কাছেই পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন তার চেয়েও বেশী কিছু। যে প্রচুর সম্পদের তিনি অধিকারী ছিলেন, তা তাঁর উদার প্রকৃতির সমস্ত আবেগকে রূপ দেওয়ার কাজে সাড়া দিত। ভূকৈলাসের রাজাদের সঙ্গে তাঁর ছিল একটা পুরুষানুক্রমিক বন্ধুত্ব। সেই রাজারা আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়লে তিনি তাদের বেশ ভালভাবেই আর্থিক সাহায্য করেন। এই রকম সাহায্য তিনি একটি ইংরেজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকেও করেছিলেন। জাতি, ধর্ম, মত কোন কিছুই তাঁর বদান্যতার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে নি। মাদ্রাজেই হোক, বাংলায়ই হোক আর যুক্ত প্রদেশেই হোক, সর্ব্বক্ষেত্রেই গণ-আন্দোলন ও গণ প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন এক উদার পৃষ্ঠপোষক। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে কিছু চাঁদা দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানা-লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কাজে কত টাকা লাগবে এবং এ পর্য্যন্ত সেজন্য কত টাকা পেয়েছি। আমি কম করেও বিশ হাজার টাকার কথা বললাম; আরও বললাম যে পাঁচ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি; যারা টাকা দিয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন মহারাণী স্বর্ণময়ী তিনি দু-হাজার টাকা দিয়েছেন। তিনি তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক শুভতার সঙ্গেই বললেন, "সুরেন বাবু, এর কাছে, তার কাছে টাকার জন্য ঘোরাঘুরি করে সময় নষ্ট করার কি প্রয়োজন? সে সময় অন্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করা যেতে পারে। আমি আপনাকে বাকি

পনেরো হাজার টাকা দেবে তাঁর মূর্তির কথা মানেই বড়ো সই করার মত ব্যাপার। তাঁর এই রাজকীয় দানে আমরা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নামে একটা খ্যাতি অর্জন করলাম এবং একটি নিজস্ব আবাসস্থল পেয়ে তাঁর একখানি তৈলচিত্র এসোসিয়েশনের হলে টাঙিয়ে রাখার জন্য তাঁর অনুমতি চাইলে তিনি তাঁর একখানা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি পাঠিয়ে দেন।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। তাঁর চিত্তের বিশেষ তাঁর উদার প্রকৃতির এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮৮৯ সালে প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তাঁর সম্বর্ধনার জন্য যে টাকা তোলা হয়েছিল সে টাকা কিভাবে ব্যয় করা হবে তা নিয়ে একটা তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কলকাতার ধনী সম্প্রদায় এই ব্যাপারে একটা শক্তিশালী দল ছিল। তারা চেয়েছিলেন যে আমোদ-প্রমোদ ও রঙ্গ তামাসার মধ্যেই এই ব্যয়-ভূষণ সীমাবদ্ধ রাখা হোক। অপর পক্ষে আমরা চেয়েছিলাম তাঁর কলকাতা আগমনকে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটি স্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্মাণ করে স্মরণে রাখা হোক। টাউনহলে এ বিষয় নিয়ে যে সভা হয় সেই সভায় আমি একটি সংশোধনী প্রস্তাবটি উপস্থাপন করি। আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি গৃহীত হল, এতে সরকার পক্ষীয় কর্মচারীরা ও তাদের বন্ধুগণ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হলেন। একজন মহারাজা সভা থেকে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই বলে উঠলেন, "ভাব, ভাব, কি কাণ্ডটাই তোমরা করে বসলে; তোমরা সভাটাকে পণ্ড করে দিলে, আর লেফ্টেন্যাণ্ট গভর্নরকে অপমান করলে? লেফ্টেন্যাণ্ট গভর্নর তার ইুয়ার্ট ব্যাণ্ডে কিন্তু সে রকম কিছুই মনে করেন নি। তিনি মোটেই অপমানিত বোধ করেন নি। কারণ তিনিও রাজপুত্রের কলকাতা পরিদর্শনের ঘটনাটিকে একটি স্থায়ী স্মৃতির মাধ্যমে সম্মানিত করার ধারণাকে উৎসাহই দিয়েছেন। সে যাই হোক না কেন, আমি কিন্তু শীঘ্রই সরকারী অসন্তোষের চাপ অনুভব করার অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলাম। স্থায়ী স্মৃতি রক্ষা সম্পর্কীয় প্রস্তাব নিয়ে প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য একটি ডেপুটেশন পাঠান হবে বলে স্থির হল। সেই ডেপুটেশনের একজন সদস্য হিসাবে আমার নামটি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা আমার নামটি তালিকা থেকে কেটে দেন। তারা এই কর্মটি করার সুযোগ পেলেন এ কারণে যে সমস্ত কিছুর বন্দোবস্ত করার তাদের হাত ছিল। আরও আছে। আমি জানতে পারলাম যে ভারত সরকারের কাছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে একজন মনোনীত সদস্যপদের জন্য আমার নাম দেওয়া হয়েছিল। এলবার্ট ভিক্টর স্মৃতি সভার ঘটনাটি এই ঘটনার পরে ঘটে, এখানেও তালিকা থেকে আমার নামটি বাদ যায়।

স্থায়ী স্মৃতি রক্ষার পক্ষে এই ভোট দান ঘটেছিল এমন একটি সভায় যে সভায় সভাপতি ছিলেন প্রদেশের লেফ্টেন্যাণ্ট গভর্নরস্বয় এবং যা সংগঠিত হয়েছিল এবং যার পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছিল শক্তিমান ইয়োরোপীয়ান চেম্বার অব কমার্স দ্বারা। এ হেন সভায় ভোটের জোরে স্থায়ী স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব পাশ হয়ে যাওয়ার মানেই হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন-মতের জয়। এ সম্পর্কে কোন ভুল ধারণার অবকাশ নেই। এই ভোটদান ব্যাপারে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা সরকারী ও আধা সরকারী মহলের অসন্তোষ পুরোমাত্রায় অনুভব করেছেন। বাজে ভোটভো হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন দেখা দিল টাকা আসবে কোত্থেকে যা দিয়ে স্থায়ী স্মৃতি রক্ষা হবে? যাদের টাকা আছে তারা তো এক পয়সাও দিবে না।

(চলবে)

বিপ্লবী বাংলার বিপ্লবী পুস্তক সংগ্রহ অভিযান

১৯৫৬ সালে বিপ্লবী বাঙ্গালী প্রকাশের গোড়ার দিকে আমাদের ক্ষোভ ও দুঃখ ছিল,—দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অবদান স্বীকৃত হল না। ভারত হ'তে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে বিপ্লবীদের কর্ম প্রচেষ্টা অন্ধকারেই রয়ে গেল। বাংলার বিপ্লববাদ সারা ভারতে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়লেও স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের ত্যাগ ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তুলে ধরে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করার মত উপাদানের নিতান্তই অভাব ছিল, ইতিহাসের অপ্রকাশিত অধ্যায়ই ছিল বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সেই সময়ে।

বিপ্লবী বাঙ্গালীর ও ইহারই উত্তরসূরি বিপ্লবী বাংলার লেখকদের, পাঠকদের ও পৃষ্ঠপোষকদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় আজ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ভাণ্ডার উন্মোচন হয়েছে, দিন দিনই প্রকাশিত হচ্ছে নানাতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও পুস্তক। বিপ্লবী বাংলার আরব্ধ কাজ সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলছে বলে বিপ্লবী বাংলা গর্ববোধ করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে দেশ দরদীদের নিকট ধন্যবাদ জানাচ্ছে বিপ্লবী বাংলার লেখকদের, পাঠকবর্গদের ও শুভানুধ্যায়ীদের।

আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। দেশবাসীর আগ্রহ বেড়েছে বিপ্লবীদের আদর্শ ও কর্মকাণ্ড জানার জন্য। বিপ্লবীদের কর্ম প্রচেষ্টা জানার জন্য মাঝে মাঝে আমরা অনুসন্ধান পাই। কেহ কেহ অনুসন্ধানের বিষয় জানিয়ে বই পাওয়ার জন্য সাহায্যের আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। আমাদের সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় এবং বন্ধুদের নিকট কোন্ কোন্ বই পাওয়া যেতে পারে সঠিক না জানায় বিপ্লবী আন্দোলন বিষয়ে জানার আগ্রহীদের খোরাকের যোগান দিতে পারি না। আমাদের এই অক্ষমতা দূর করার জন্য আমরা "বিপ্লবী পুস্তক ভাণ্ডার" খোলার প্রচেষ্টার ব্রতী হতে চাই। সমবেত প্রচেষ্টায়ই ইহা সফল হতে পারে।

সংগৃহীত পুস্তক বিপ্লবী বাংলা অফিসে সমাহিত থাকবে। যে কেহ নির্দ্ধারিত সময়ে এই সমস্ত পুস্তক পড়ার সুযোগ পাবেন। বিষয় সূচী অনুযায়ী পুস্তকের তালিকা করা হবে এবং বিপ্লবী বাংলায় প্রকাশ করা হবে। পুস্তক ভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত কর্মী স্কুল কলেজের ছাত্রদের কোন্ পুস্তকে কোন্ বিষয়ে জানা যাবে পরিবেশন করবে। আমরা আশা করি এই প্রচেষ্টায় ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে জানার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

এই উদ্দেশ্যে আমাদের অভিযানে বন্ধু-বান্ধবদের সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই। আপনাদের সংগৃহীত পুস্তক বিপ্লবী পুস্তক ভাণ্ডারে রাখার ব্যবস্থা করে বিপ্লবী পুস্তক ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিন। পুস্তক দাতাদের প্রয়োজনে তাঁদের পুস্তক নেওয়ার অধিকার থাকবে। বিপ্লবী পুস্তক লেখকদের নিকট অনুরোধ তাঁদের প্রকাশিত পুস্তক বিপ্লবী পুস্তক ভাণ্ডারে পৌঁছে দিতে যেন ভুল না হয়।

এই বিষয়ে বিস্তৃত জানার জন্য বিপ্লবী বাংলা অফিসে অথবা শ্রীসুধাংশু ভূষণ (চুনী) ব্যানার্জির সাথে যোগাযোগ করুন। শ্রীসুধাংশু ব্যানার্জীর ঠিকানা ১০২, আচার্য্য পি, সি, রায় রোড, কলিকাতা-৯, ফোন ৩৫-৩৪৮৬।

বিপ্লবী পুস্তক বিষয়ে যে কোন সংবাদ সাদরে গৃহীত হবে। এগিয়ে এসে এই বিষয়ে সাহায্য করুন আমাদের বিনীত নিবেদন। দেশের স্বার্থে, জাতীর স্বার্থে গড়ে উঠুক বিপ্লবী পুস্তক ভাণ্ডার। সার্থক হউক অভিযান সমবেত প্রচেষ্টায়।

বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি-অফিস তালা বন্ধ

ডাঃ চিত্তরঞ্জন দাশ

শুক্রবার, ২৮শে জুলাই, ভোর ৪টা ৪৫ মিঃ সমিতির অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক প্রখ্যাত বন্যা চিকিৎসক ডাঃ বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য গাড়ী ভিমেক পুলিশ, কিছু বাইরের লোক এবং সমিতির বিশিষ্ট সম্মানিত সদস্য ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে সমিতি অফিসে আসেন। হুকুম করলেন দরজা খোল। দরজা খুলে গেল। সদলবলে উঠে গেলেন উপরে যেখানে কর্মীদের থাকার ঘর। ঘুমন্ত পরিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকে ডাঃ সুন্দরী মোহনের স্মৃতিবিজড়িত গুথা তাঁরই নামে উৎসর্গীকৃত রাস্তায় নামিয়ে দিলেন। তাঁদের রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হল তাঁদের মধ্যে মাত্র কুড়ি ঘণ্টা বয়সের নিষ্পাপ নির্দোষ নাগরিকও ছিলেন, অবশ্য তার অচল অনড় মায়ের কোলেই। প্রবল বৃষ্টি, রাস্তায় যেমন জলস্রোত বয়ে চলেছে, ঠিক তেমনই ঐ হতভাগিনী জননীর দেহে রক্তস্রোতে তেমন কোন ভাটা পড়েছিল প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ দেখেছেন বলে আমার জানা নেই।

সকাল ৫টা ২০ মিনিট, সদর দরজায় তালা ঝুলিয়ে ভজনখানের সশস্ত্র পুলিশ বসিয়ে দিয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেবা-মন্দিরের পূজা সাঙ্গ করে যেন তৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে চলে গেলেন। সেবাব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, যক্ষা রোগে আক্রান্ত মৃত্যু-পথ যাত্রীদের সেবা-মন্দিরের অধিনায়ক পূজকশ্রেষ্ঠ পুরোহিতের প্রাণে সদ্যজাত একটি (নাগরিক?) শিশুর প্রতি নজর দেওয়ার অবকাশ না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ, ওদের কারবার ব্যবসা বাণিজ্য তো মৃত্যু-পথ যাত্রী রোগীদের নিয়ে (অবশ্যই ডাক্তারী ভাষায় সব রোগীই সমান) আর ওটাতেই প্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান। ঐ সদ্যজাত কুড়ি ঘণ্টার তো কোন রোগ নেই, নেই তার পরিবারের অন্য কারো। আর যদি থাকতোও বা, কি আসে যায়? কারণ, ওখানে না আছে দু'টো পয়সা; না আছে একটু সুনাম। এই সেবক শ্রেষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সেবার কথা কে না জানে এ পাড়াতে। কত শত হাজার-লক্ষ মানুষের সেবায় কতই সাধনা করতে হয়েছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা কিছু ঘটে গেল। যেমনটি আমরা শুনেছি—দুর্গাপূজা সবাই "সয় মা", কালীপূজায় ত্রুটি ঘটলে রক্ষা নেই। হয়তো এখানেও তেমনি কোন ত্রুটি ঐ পূজক শ্রেষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও ছিল, আর সেই ত্রুটীর জন্য গণদেবতারা মন্দিরের বেইমানী ছেড়ে দিয়ে সেবক শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের পিছু নিলেন, পুরোহিত তাঁর পূর্বপুরুষদের সুকৃতির (হয়তো) পুণ্যফলে জানে-প্রাণে বিনষ্ট হলেন না। ঐ বেইমান গণদেবতা কুলপুরোহিতের নিষ্প্রাণ দেহে ক্লোরোসিস দিয়ে দাহ কার্য্য সমাধা করলেন।

অবশ্যই, অন্যায়—হিন্দুশাস্ত্র মতে বি-দেওয়ার প্রথা তো আছে—ওরা দেবতাকুল বলেই হয়তো বাবুস ঠাকুরদের ন্যায়নীতির কথায় কানদেয়নি।

হাজার হলেও পূজক শ্রেষ্ঠ,—সেবক অধিনায়ক, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ—তাই ঐ বেইমান গণদেবতাকুলকে নাকি প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন এবং ঐ সেবামন্দির ত্যাগ করে গণদেবতাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন নিয়েছেন। এটাই কি কম মহত্বের কথা? দুঃখ কি জানেন—মহত্বের মাহাত্ম্য আমরা সকলে বুঝি না—তাই যত এই সব আপদ-বিপদ আসে—আসবেও।

এবার কিন্তু 'সেবাব্রত' নূতন করে শুরু হল ঐ যক্ষা সমিতিতে। প্রথম পূজোতেই মহাশয় অর্ঘ দিলেন ভ্রাম্যমান চিকিৎসা বন্ধ আর নৈবেদ্য দিলেন শিশু চিকিৎসা গুটিয়ে। এখানে পুরোহিত ঠাকুরের দূরদর্শীতার কথা কিন্তু আমার মত নিমকহারামও স্বীকার না করে পারছে। কারণ, ভবিষ্যতে যেন আর ঐ বেইমান গণদেবতার বংশ বৃদ্ধি না ঘটে তার জন্যই শৈশবেই "শব" বানিয়ে শিবালয়ে পাঠানই কর্ত্তব্য। হয়তো ভেবেছিলেন, এখানকার "দেবকুল—শিব—কালী—শিতলা—চণ্ডী—নয়;—হয়তো বিষ্ণু, বিষ্ণুপ্রিয়া কুলো-দ্ভব হবে; যখন পুরোহিতের নজর 'নৈবেদ্য অর্ঘ" ইত্যাদির চারপাশের ঘোরপাক খাচ্ছে—হঠাৎ দেখলেন এখানে দু'কুলের কেউ নেই—রয়েছে একদল কর্মী যাঁরা এই সমিতির মেরুদণ্ড-প্রাণ; যাঁরা নিজেদের গত ৩০ বছরেরও বেশী সময় ধরে সমিতিকে নিজের মা, মেয়ে, স্ত্রী-পুত্র থেকেও আপন করে দেখছেন আর এর সমৃদ্ধিতে গৌরব বোধ করছেন।

পুরোহিত প্রমাদ গুনিলেন; যে দেবকুলের সেবাব্রতে মন্দির—তারা আসছে না—আসবে না। সুতরাং মন্দির খুলে রেখে পূজোর নামে প্রহসন তো করা যায় না—তাই দিলেন মন্দিরের দরজা বন্ধ করে।

(চলবে)

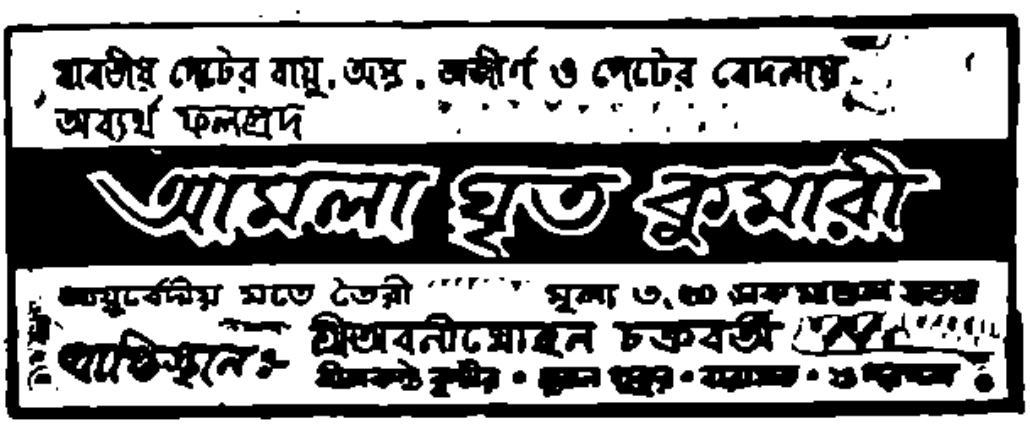

জনতাদল কোন পথে

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

জনতাদলের অনেকেই চরণসিংকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন, বিশেষ করে মধুলিমায়ে, রামনরেশ যাদব, বেণী-লাল, কর্পুরীঠাকুর প্রভৃতি যে, যে জনতাদলের সংগঠনের মূলে তাঁর অবদান আজিকার অনেক নীতিনেতার চেয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং তিনি তাঁর সৃষ্ট দল নিশ্চয় ধ্বংস করিতে চান না; তখন প্রস্তাবিত কৃষক সমাবেশ প্রত্যাহার করা একান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় দল ভাঙার কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবে, ইহা কি তিনি নিজেও স্বীকার করেন না। চরণ সিং আশ্বস্ত হলেন, ভেবে দেখলেন এ যুক্তি ত ঠিকই। তাই অবশেষে জনতা দলের ভবিষ্যৎ কল্যাণ চিন্তায় জনতা ঘরানী চরণ সিং নিজেই বিনাসর্তে, পূর্বঘোষিত কৃষক সমাবেশ প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলেন ৮ই জুলাই তারিখে তাঁর অভেজ্ঞার নিদর্শন স্বরূপ। চন্দ্রশেখর ফাঁদ ছেড়ে বাঁচলেন এবং এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালেন দলের আশু ভাঙন রোধে। বিজু পট্টনায়ক ও মধুলিমায়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন যারণ যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে ইতিপূর্বে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাহা এক্ষণে দূরীভূত হলো—সকলেই প্রসন্ন হলেন, যেন বুকের উপর হতে বিরাট পাথর শেষ পর্যন্ত নামিয়া গেল। এই প্রত্যাহার সম্বন্ধীয় চরণ সিংয়ের বিবৃতিটি সাংবাদিকদের গোচরে আনেন চরণ শিবিরের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি শ্যামনন্দন মিশ্র। এই বিবৃতিতে বলা হয় :—বর্তমান সংকটের গোড়া থেকেই আমি স্পষ্ট বলে আসছি যে, দলের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রে যাহা কিছু ক্ষতিই হোক না কেন, এ ব্যাপারে যুক্তির শেষ সীমায় যাইতে আমি প্রস্তুত আছি। দলা দাক্ষিণ্যের মনোভাব নিয়ে আমি এ কথা বলছি না, দলের প্রতি কর্তব্য হিসাবেই একথা বলছি। এই দল আমার বহুদিনের স্বপ্ন ও লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর আশা আকাঙ্খার ফল। তিনি এই বিবৃতিতে আরো অনেক মূল্যবান কথা বলেন, যে কথাগুলিতে তাঁকে বেশ উন্নত চরিত্রের মহান নেতা বলে স্বীকার করতে সহজেই জনগণ উল্লসিত চিত্তে রাজি হবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই সংবাদ কাশ্মীরে সফররত অবস্থায় যখন জানলেন তখন তাঁর মধ্যে কোন ভাববৈলক্ষণ্য পরিদৃশ্যমান হলো না। বরং তাঁর উক্তি বেশ চাঞ্চল্যকর বলে আমরা মনে করি। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, চরণ সিং ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে আপসের জন্য সরকারী পর্যায়ে মধ্যস্থতা আবার কিসের। এসবের কোন সম্ভাবনা আদৌ নেই। এর জন্য জনতা দলে ভাঙন ধরে ত হলক। আমি প্রস্তুত। কি মারাত্মক কথা? তিনি প্রস্তুত থাকতে পারেন কিন্তু ভারতীয় জন সাধারণ কি মোরারজী ভাইয়ের মতন জনতাদলের আসন্ন ভাঙনের জন্য প্রস্তুত বলে তিনি অনুমান করেন? আমরা কিন্তু বিপরীত মত পোষণ করি, কারণ 'জনতায়' ভাঙন বর্তমানে দেশের পক্ষে বাস্তবিকই ক্ষতিকর ও বিপদজনক বলে বিশ্বাস করি এবং মোরারজীর এই এক ওঁয়েমির জন্য প্রচণ্ড ব্যথা পাই ও দুঃখ ভোগ করি। তিনি কেন যে এত জেদী মানুষের মত এক রোখা মনবৃত্তি নিয়ে চলতে চান তাহা বোধগম্য নয়। সত্যই জনতার বিপদ জিতরেই এবং এর মূল বেশ গভীরে প্রথিত বলে অনুমান হয়। একদিকে যখন চরণ সিং উদার মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখালেন প্রস্তাবিত কিষাণ সমাবেশের ইতি টেনে, অপর দিকে মোরারজী ভাইয়ের এই বক্রোক্তি সাধারণ মানুষকে হতাশ করেছে। মোরারজীভাই কি দেশের ও দলের স্বার্থে একটু মিটমাটের চেষ্টা চালিয়ে যেতেও এরূপ বিরক্তি পোষণ করেন? বড়ই দুর্ভাগ্য দেশবাসীর, তারা অনেক আশা করে 'জনতাকে' সমর্থন করেছিল, কিন্তু এখন সবই নিষ্ফল বলে প্রতীয়মান হয়। কূপালনীজীও

মোরারজীর এই সব আচরণে বেশ ক্ষুব্ধ বলে সংবাদে প্রকাশ। জয়প্রকাশজী একজন বীরত্ব আছেন, কারণ মনে হয় তিনি বুঝেছেন যে তাঁর কথা হয়ত এখন কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ উপেক্ষা করতে পারেন। গাং পেয়োলে সবাই কুমীরকে কলা দেখায়—এ-আর নূতন কি? তবে মোরারজী তাই কাশ্মীরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কার করে বলেছেন যে, চরণ সিং কান্তিভাই সংক্রান্ত তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা তুলেছেন তা সব মিথ্যা, হাজার বার বললেও তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এই প্রথম তিনি চরণের অভিযোগকে মিথ্যা আখ্যা দিলেন এবং কৃপালনীজীর মধ্যস্থতার ব্যাপারে তাঁর অভিমত:—সরকারের ব্যাপারে মধ্যস্থতা কিভাবে হতে পারে? জনতাদলের এই সংকট মুহূর্তেও তিনি মোটেই বিব্রত বলে তাঁকে দেখে সাংবাদিকদের মনে হয় নি। তিনি বেশ সহজ ও স্বাভাবিক মেজাজেই ছিলেন। তিনি এ আভাসও তখন যেন যে, যদি বি. এল. ডি গোষ্ঠী দল ছেড়ে চলেও যায় তবে জনতাদল যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় শক্তিশালীই থাকবে বলে তাঁর ধারণা। তিনি আরো বলেন, ক্ষমতাসীন জনতা পার্টিতে অন্ত কলহে তাঁর সরকারের আদৌ কোন বিপদ নাই। বিপদকে তিনি বিপদ বলেই মনে করেন না। তাঁর দৃঢ়তা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি কংগ্রেসীদের সাথে আঁতাত করবেন কি না, প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তিনি কি করে তা বলতে পারেন—কংগ্রেসীরাই সেকথা বলতে পারেন, তবে কংগ্রেসীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ তিনি রাখেন না বা পূর্বোক্ত কোন আলোচনা করেন নি কারণ তাঁর সরকার আসলে আদৌ কোন বিপদের মধ্যে এখনও পড়েনি। বেশ নিঃশঙ্ক তাঁর মানসিক অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তবে তাঁর এই উক্তি চরণ শিবিরে বেশ রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং চরণ সিং নিজে ও তাঁর অনুরাগীরা নিতান্তই মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং এঁদের মনোরাজ্যে যে ব্যাপক বিক্ষোভণ সংঘটিত হয় তার ফল যে শেষ পর্যন্ত জনতাদলের মধ্যে কি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি নিকট ভবিষ্যতে করবে তা এখন বলা সম্ভবও না এবং সঙ্গতও না। জনগণ শঙ্কিত চিত্তে অপেক্ষমান এবং সত্যই বিশেষ চিন্তিত বলে মনে হয় কারণ তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে। তবে জনতার সঙ্কট মোচনের এবার প্রশমিত হবে। চরণ সিংয়ের মনের ঘরফ গলে যখন জলের আভাষ, দেখা দিতে শুরু করেছে তখন আশা করা যায় যে, মতান্তর অবসানে আর দেরী নেই। এদিকে শ্রীমতী গান্ধী জনতার এই অন্তর্দ্বন্দ্বে উল্লসিত এবং তাঁর বক্তব্য হল যে, জনতা কি করে দেশের শাসন রজ্জু ধরে রাখতে পারবে? তারা ত এখন বিতর্ক ও প্রায় বিধ্বস্তিত। তাই তিনি তাঁর সহকর্মীদের ডাক দিয়ে বলেছেন দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ মানসে আগামী ১ই আগষ্ট 'ভারত বাঁচাও' দিবস পালনের উদ্দেশ্যে জনমত সৃষ্টি করতে এবং উক্ত দিবসে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে যাতে তারা জনতার আসল রূপ দেখে বুঝতে পারে যে জনতা দেশ কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারছে না, কেবল নিজেদের উপদলীয় শক্তি বৃদ্ধিতে মত্ত। নানাজী দেশমুখ জনতা দলে যৌথ নেতৃত্বের আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনতার প্রত্যেক কর্মীর এখন থেকে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে তারা জনতা দলের লোক অন্য কোনও উপদলের উপর তাদের আনুগত্য থাকা উচিত নয়। কথাটা ন্যায় সঙ্গত কিন্তু বাস্তবে কি তার কোনও সম্ভাবনা জনগণ দেখতে পাচ্ছে? চরণ সিং কৃপালনীজির সৎপরামর্শে কৃষক সমাবেশ বন্ধ করে দেওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে মোরারজীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি কঠিন সমালোচনা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী যদি ভেবে থাকেন বর্তমান সংকট একান্তভাবে সরকারেরই সঙ্কট এবং তা সরকারেরই বিচার্য বিষয় তবে ভুল বলা হবে—এ সংকট জনতাদলের তথা সমগ্র ভারত বাসীর তাই মোরারজী ভাইয়ের এ বিষয়ে যে চিন্তাধারায় তিনি প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন তা ঠিক নয়। বরং প্রধানমন্ত্রীর উদাসিকতায় কৃপালনীজি ক্ষুব্ধ ও বেশ বিরক্ত বলে সংবাদে প্রকাশ।

(চলিবে)

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

— শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একদিন রাসবিহারী প্রস্তাব করলেন, স্বদেশ সেবার পরিচয় হিসাবে নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী কর্মীদের প্রত্যেককেই কোন না কোনরূপ "পি. এম" অনুষ্ঠান করতে হবে। রাজনৈতিক হত্যাকার্য্য অর্থাৎ পলিটিক্যাল মার্ডারকে রাসবিহারী নাম দিয়েছিলেন "পি. এম."। বৈঠকে রাসবিহারী ব্যতীত শ্রীশ ঘোষ, প্রতুল গাঙ্গুলী এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। রাসবিহারী বললেন যে যার অনুকূলে কোন "পি. এম." নাই তাকে বিপ্লব কার্য্য নিয়ন্ত্রীত করবার অধিকার দেওয়া হবে না। কথাটা শুনেই প্রতুলবাবু এগিয়ে এলেন তিনি বললেন এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করবার ভার আমিই প্রথম নিলাম। কয়েকদিন পরেই ১৯১২ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর জনবহুল কলেজ স্কোয়ারে জলপথের ঘাটে দাঁড়িয়ে গোয়েন্দা পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর হরিপদ দেব যখন রাহু সেবন করছিলেন এবং বিপ্লবীদের পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন তখন এক অজ্ঞাত আততায়ী তাকে গুলির আঘাতে হত্যা করে। এই আততায়ীই প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী তিনি রাসবিহারীর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করলেন। এই হত্যা কার্য্য সম্পর্কে কেউ ধরা পড়ে নি। হত্যা কার্য কে করেছে পুলিশ তা সন্ধানও করতে পারে নি।

ক্রমে চন্দননগর, অনুশীলন, কাশী ও দিল্লী সংগঠনের ঐক্য বন্ধন আরও দৃঢ় হল। এ সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বলেন, 'পুলিনবাবুর পরে ঢাকা সমিতির যাহারা নেতা হইলেন তাহারা বুঝিলেন ভিন্ন ভিন্ন বিপ্লবদল যখন এক না হইতেছে ততক্ষণ মঙ্গল নাই। এ জন্য তাহারা সব দলের সহিত মিলিতে উদ্যুক্ত হইলেন। এই জন্য বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার সময়েই ঢাকা সমিতি চন্দননগর দলের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যায়। কাশীর দলও এই ঢাকা সমিতির মাধ্যমেই রাসবিহারীর উত্তর ভারত দলের সাথে পরিচিত হয়। এইভাবে আমাদের দল পূর্ববঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়া এক সঙ্গে কাজ করিতে ছিল। পাঞ্জাবের বিপ্লব আয়োজনের সংবাদ অধিকাংশ স্থানে এই ঢাকা সমিতির মাধ্যমেই অন্যান্য দলের নিকট পাঠানো হইত। লাহোর দিল্লী, কাশী, চন্দননগর এবং ঢাকার বিপ্লব দল এইভাবে সম্পূর্ণ এক হইয়া যায়। বাঙলার অন্যান্য বিপ্লবদল এ সংবাদ তখন ঘুনাক্ষরেও জানিত না।'

১৯১৩ সালের ২১শে মে অনুশীলনের রাজাবাজার কেন্দ্রে অমৃতলাল হাজরা গ্রেপ্তার হন। পূর্বরাত্রি বারোটা পর্যন্ত রাসবিহারী রাজাবাজার গৃহে তাহার সঙ্গী ছিলেন। ঐ সময় তিনি কয়েকখানা পত্র লেখেন। একখানি পত্র ছিল দিল্লীতে আমীর চাঁদের নিকট। পত্র লিখে ব্লটিং প্যাডের সাহায্যে তিনি কালী শুকিয়ে নেন। পত্রগুলি লিখে সেগুলি নিয়ে রাসবিহারী স্থান ত্যাগ করেন। রাত তিনটার সময় শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্রের নেতৃত্বে

পুলিশ দল ঐ গৃহে হানা দেয়। অমৃতবাবুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার সময় গোয়েন্দা পুলিশ শ্রীমহাপাত্র ও ঐ ব্লটিং প্যাডটি নিয়ে যান। প্যাড থেকে পুলিশ সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধার করে আমীর চাঁদের গৃহের ঠিকানা পায়। কাল দিল্লীতে আমীর চাঁদ গ্রেপ্তার হন এবং সন্দেহক্রমে তার ভ্রাতুষ্পুত্র দীননাথকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। দীননাথ রাজসাক্ষী হয়ে সবকিছু পুলিশের নিকট প্রকাশ করে দেয়। এ থেকেই দিল্লীর ষড়যন্ত্র মামলার উদ্ভব।

পাঞ্জাবী যুবক লালা হরদয়াল দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়তেন। ১৯০৫ সালে সরকারী বৃত্তি নিয়ে তিনি বিলাত যান। সেখানে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার সাথে পরিচিত হয় এবং বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেন। দিল্লীতে আমীর চাঁদ, আউদ বিহারী, বালমুকুন্দ প্রভৃতির যে বিপ্লবী দলটি ছিল তার সংগঠক এবং নেতা ছিলেন হরদয়াল। দেশ ত্যাগ করার আগে তিনি এই দলের ভার জিতেন্দ্রমোহন চ্যাটার্জীর উপরে দিয়ে যান। ১৯০৭ সালে হরদয়াল একবার দেশে আসেন ঐ সময় তিনি লালা রাজপত রায়ের গৃহে ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার আগে তিনি সংগঠনের নেতৃত্বভার রাসবিহারীর উপর অর্পন করে যান। এইভাবে অনুশীলন, চন্দননগর মিলিত দলের সঙ্গে দিল্লী সংগঠনও যুক্ত হল।

১৯১১ সালে অনুশীলনের উদ্‌যোগে লিবার্টি নামে একখানি ইংরেজী পত্রিকা এবং স্বাধীন ভারত নামে একখানি বাঙলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দুইখানি পত্রিকাই চন্দননগরের মতিলাল রায় মাঝে মাঝে লিখতেন। পূর্বেই বলা হয়েছে দীননাথের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দিল্লীর সংগঠনের আমীর চাঁদ, আউদ বিহারী, বালমুকুন্দ। বসুমল্ল মাথুর প্রভৃতি গ্রেপ্তার হয়ে যান। এই সময় পুলিশ রাসবিহারীরও সন্ধান পায়। রাসবিহারী সরকারী কর্ম ত্যাগ করে ফেরার জীবন যাপনে বাধ্য হন। এই সময় তিনি কখনও কাশী, চন্দন নগর এবং কখনওবা অনুশীলন সমিতির নবদ্বীপ কেন্দ্রে অবস্থান করতেন।

১৯১১ সালের শেষদিকে রাসবিহারী, শ্রীশ-চন্দ্র, প্রতুলচন্দ্র, ও শচীন্দ্রনাথের এক মিলিত বৈঠকে স্থির হল বিপ্লবী সমিতির পক্ষে শুধু ছোটখাট হত্যাকার্যে দু-একটি বড় রকম কার্যও করা উচিত। বৈঠকে শ্রীশচন্দ্র তখনকার বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি রাসবিহারীও সমর্থন করলেন। এই সময় ইংরেজ সরকারের ঘোষণায় বঙ্গ বিভাগ রদ হয়েছিল এবং ঐ ঘোষণাতেই ভারতের রাজধানী কলকাতার পরিবর্তে দিল্লীতে হবে স্থির হয়েছিল। রাসবিহারী বললেন, এবারে দিল্লীতে দরবার হচ্ছে তার উদ্যোগ আয়োজন চলছে। ভারতের রাজন্য বৃন্দ সেখানে সম্রাটের ভারত প্রতিনিধিকে কুর্নীশ করে ভারতের রাজভক্তি জানাবে। বিশ্বময় ভারতের রাজভক্তি ঘোষিত হবে এ আমরা হতে দিতে পারি না। ঐ অনুষ্ঠানেই আমরা গুলি করে বড়লাটকে হত্যা করে জগতের কাছে ভারতবাসীর স্বাধীনতা স্পৃহা ঘোষিত করব।' কথাটা সকলেই সমর্থন করলেন। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তখনও বাঙলা দেশ ত্যাগ করেন নাই। দুই এক দিনের জন্য কলকাতা ছেড়ে বোম্বাই গিয়েছিলেন। সেখান থেকে নাগপুর হয়ে মেদিনীপুরে আসবেন এবং তারপরেই কলকাতা ফিরে স্বাভাবিকভাবে দিল্লী বাস করবার জন্য চলে যাবেন এ সব সংবাদ সংগ্রহ

করা হল। বিপ্লবী বৈঠকে প্রথম স্থির হল এই যাত্রা পথে কোথাও গাড়ী উল্টে তাকে হত্যা করা হবে। নাগপুর থেকে বড়লাটের মেদিনীপুর ফেরার পথে অথবা মেদিনীপুর থেকে কলকাতা আসার পথে বোমার আঘাতে গাড়ী উল্টে দিয়ে তাকে হত্যা করার একটা ব্যবস্থা হল। কিন্তু হাতে বেশী সময় না থাকায় তা সফল হল না। আর এ প্রচেষ্টায় কেউ কেউ আপত্তি করলেন এ জন্য যে এতে সাফল্যের সম্ভাবনা কম। তাই শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠানের সমারোহের মধ্যেই হার্ডিংকে হত্যা করা হবে স্থির হল। রাসবিহারী বললেন এই হত্যাকার্যে বাঙলার বিপ্লবীদেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। বাঙলার বিপ্লবীদের দ্বারা একার্য্য অনুষ্ঠিত হলে বাঙলা ও উত্তর ভারতের বিপ্লবী সংহতি আরও দৃঢ় হবে। শেষ পর্যন্ত স্থির হল দরবার অনুষ্ঠানে বোমা নিক্ষেপে বড়লাটকে হত্যা করা হবে।

বসন্ত বিশ্বাস এবং মন্মথ বিশ্বাস নামে দুই ভ্রাতা কলিকাতা অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট যাতায়াত করতেন। একদিন তিনি এই দুইজনকে চন্দননগর সমিতির মতিলাল রায়ের নিকট অর্পন করেন এবং এদের তিনি বিপ্লবী কার্যে নিয়োগ করতে বলেন। রাসবিহারী মতিলাল রায়ের নিকট বসন্ত বিশ্বাসকে রেখেছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করেন যে দিল্লীতে বসন্ত বিশ্বাসের সাহায্যেই বোমা নিক্ষেপ করা হবে। চন্দননগর থেকে দিল্লী ফিরে যাবার সময় তিনি বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। চন্দননগর থেকে একটি বোমাও সঙ্গে নিলেন।

(চলবে)

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'ফলিতজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল, বি (কলি:) এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ব্যতীত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক ন্যূনপক্ষে ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা:

পি-৩৪, কামনগো পার্ক, পড়িয়া, ২৪ পরগণা

৫ নং বাসরুট, বৈষ্ণবঘাটা ষ্টপ।

Contd. from 2nd cover

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—CALCUTTA		
Basu Ratna d/o Late Sailendra Nath Basu	6/1A, Radhanath Mullick Lane Calcutta-12	100 (till marriage)	9. 6. 76
Chakraborty Smt. Kanak Prova w/o Late Purnendu Nath	79A, Babu Bagan Lane Calcutta-31	150	19. 3. 78
Chaudhury Smt. Dipali w/o Late Karuna Kanta	36/7, B K Samadhi Road Calcutta-54	200	2. 7. 77
Das Smt. Saila Prova w/o Late Hem Chandra Das	70, Akhil Mistri Lane Calcutta-9	200	14. 3. 78
Guha Smt Pushpalata w/o Late Nalini Kishore Guha	57, Purna Das Road Calcutta-29	100	30. 9. 77
Home Roy Sourindra Kishore	50 Debinibas Road Calcutta-28 (Amendment)	200	16. 8. 73 (instead of 16. 9. 73)
Majumdar Smt. Santi Rani w/o Late Nripendra Kumar	83 Beniatolas Street Calcutta-5	150	28. 8. 77
Kundu Nagendra Nath	Bloc 'C' Flat 12 Govt. Housing Estate, Entally. Calcutta-14	250	14. 6. 78
Mukherjee Santosh Kumar	56 Baruipara Lane Calcutta-35	200	15. 8. 72
Saha Makhanlal	236/H/16 Manicktola Main Rd. Calcutta-54	200	
Sanyal Kumari Kaberi d/o Late Sudhir Ranjan	Flat-6, Block B/1, L. I. G. Housing Estate, 37 Belgachia Road Cal-37	100	26. 2. 71
	Dist—24-PARGANAS		
Basu Smt. Latika w/o Late Sailendra Madhab	Taki, Hasnabad, 24 Pargs & of 19 Madhab Halder Road Calcutta-34	150	20. 12. 77
Chatterjee Sudbir Kumar	P. O. & Vill Madhyamgram	200	15. 8 72
Dhar Makhan Lal	Bandhusunder Kanan Nabadhai Govt. Colony P. O. Dattapukur	200	1. 10. 76
Guha Jyotish Chandra	South Garia Home	200	15. 8 72

RgedNo. R. N .24911/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

2 2 AUG 1979

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীসাধি শরণ রায়চৌধুরী
বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমৈত্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বন্ধুরাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১১ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

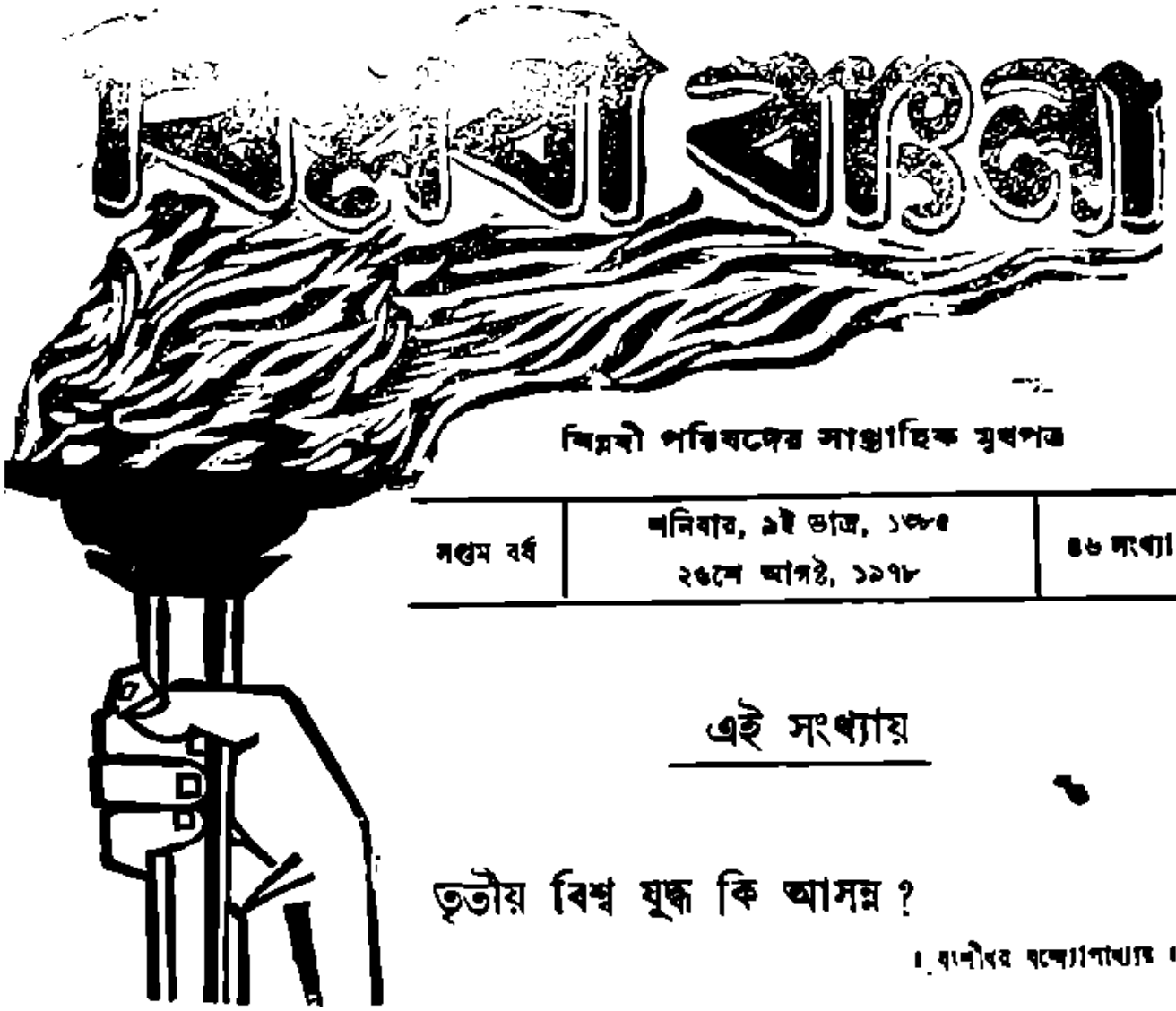

মিলনী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

সপ্তম বর্ষ	শনিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৩৮৫ ২৬শে আগষ্ট, ১৯৭৮	৪৬ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ কি আসন্ন ?

। বাণীবর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মল্লিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। শ্রীবীরেন্দ্র কর ॥

ছাত্র আন্দোলন

। মণীন্দ্রমোহন লাহিড়ী ।

লক্ষ লক্ষ লোক যাহা ভোগ করিতে পারেনা, তাহা অর্জনের দৃঢ় অস্বীকৃতিই শ্রেষ্ঠতম বিধান।

—গান্ধীজী

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি আসন্ন ?

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতির গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চীন তার সন্নিকটবর্তী রাষ্ট্রগুলির সাথে এক ঘনিষ্ঠ সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে বদ্ধপরিকর। ভারতের সাথে তার বিচ্ছিন্ন কূটনৈতিক সম্পর্ক আবার স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে চীনের নিজের তাগিদে কারণ সীমান্ত বিরোধ নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে তার ঠাণ্ডা যুদ্ধ আগেই শুরু হয়ে গেছে এখন সেই ঠাণ্ডা যুদ্ধ ক্রমশ উত্তপ্ত হতে আরম্ভ করেছে এবং তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে আমেরিকা তার নিজের স্বার্থে। দুই কমিউনিষ্ট তথা সমাজবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ জিইয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদীদের অনেক লাভ। আর কিছু যদি নাও পাওয়া যায়, অন্তত চীনের বিরাট বাজার আমেরিকার উৎপন্ন পণ্যে ছেয়ে যাবে ও—তাই কি কম লাভ? আর যদি দুই কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে এই বিভেদ, বিদ্বেষ ও বিবাদ স্থায়ীভাবে প্রসার লাভ করে এবং ফলে খুঁটিনাটি বিষয়ে রেষা-রেষী চলতে চলতে পরিণামে বিরাট মত পার্থক্য ও সংঘর্ষ, তবে ত আমেরিকার সব দিক দিয়েই সুবিধা। কারণ চীনকে তার বিপুল আধুনিক ধ্বংসাস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে একদিকে প্রচুর অর্থলাভ ও অন্যদিকে মহাপরাক্রমশালী রাশিয়াকে হীনবীর্য করার সুযোগ লাভ। আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য পৃথিবীতে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে হীনবল করা—তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন। ভিয়েৎনামে, কাম্বোডিয়ায় ও লাওসে এবং অন্যান্য ছোট খাট কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে ইতিপূর্বে আমেরিকার নীতি যে কি তা আমরা বারে বারে লক্ষ্য করেছি—সে নীতি হচ্ছে কমিউনিজমকে খর্ব করা—যেন তেন প্রকারেণ। আমেরিকার ভাণ্ডারে যে বিশেষ ধিশেষ মারাত্মক মারণাস্ত্র গুলি সঞ্চিত আছে ও নিয়মিতভাবে যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে তার প্রধান প্রয়োজন কমিউনিজিমের মূলোচ্ছেদ বলে আমেরিকানরা বিশ্বাস করে। আমেরিকা ভবিষ্যতে আর ইউরোপ ভূখণ্ডে তথা পাশ্চাত্যে যুদ্ধবিগ্রহ চায় না। সে এখন এশিয়া ভূখণ্ডে যুদ্ধ বাধাতে চায়—তাতেই তার সবদিক দিয়ে সুবিধা ও সার্থকতা বলে সে মনে করে। অতীতে যে চীনকে সম্মিলিত রাষ্ট্রসভায় (U. N. O.) আমেরিকা কিছুতেই ঢুকতে দিতে রাজি ছিল না। আজ সেই চীন হঠাৎ কি করে ও কি ভাবে তার এত নিকট-বন্ধু ও পরস্পর পরস্পরের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হয় কেন? কারণ আমেরিকার বন্ধুত্ব চীন অর্জন করেছে শুধু রাশিয়ার সঙ্গে তার বর্তমান তৈরী মনোভাবের জন্য। আমেরিকা কৌশলে রাশিয়াকে জব্দ করতে চায় এবং তা চীনকে দিয়ে। আর চীন আমেরিকার কাছে সব রকম সাহায্যের আশা ও আশ্বাস পেয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্য খুব শীঘ্র তৈরী হয়ে আসরে নামতে যাচ্ছে—সেজন্য জাপানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে সে হালেই নিজের গরজে আবদ্ধ হয়েছে। ভারতের সঙ্গে চীন খুব ভাল ব্যবহার ও প্রীতির সম্পর্ক তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে উৎগ্রীব বলে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কিছু পূর্বেই জার্মানী তার সন্নিকটস্থ শক্তিশালী রাষ্ট্র তথা রাশিয়া ইত্যাদিকে বন্ধুত্ব সূত্রে গেঁথে রেখে তবে পোল্যাণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পিছন থেকে যাতে রাশিয়া জার্মানীর ঘাড়ে না লাফিয়ে পড়ে সে ব্যবস্থা পাকা করে তবে জার্মানী যুদ্ধে নেমেছিল। এটাই বর্তমান যুগের রণ-কৌশল। পশ্চাৎ ভাগ সুরক্ষিত, পার্শ্ব ভাগ সুরক্ষিত এবং সর্বোপরি বন্ধু রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পর্ক মধুর করে রেখে, তবে যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে আগে বাড়তে হয়, নচেৎ পিছন থেকে, পাশ থেকে ও বন্ধুদের কাছ থেকে বিপদ এসে তাকে ঠেকান বড়ই কঠিন হয়। এটাই

বুদ্ধিমানের পক্ষে বুঝে অবশ্যই প্রথম কথা অবশ্যই। বর্তমানে চীনের ভাবগতিক দেখে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে সে যুদ্ধের জন্য নিজেকে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত ও যোগ্য করে তুলতে সব রকম ব্যবস্থা বেশ সুচিন্তিতভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করছে। রাশিয়া বহুদিন পূর্ব হইতেই চীনের উত্তর ভূখণ্ডের একটা মোটা অংশ অন্যায় ভাবে জবর দখল করে বসে আছে। চীন বারে বারে, বিশেষ করে চীনের মহান নেতা মাও সে তুং রাশিয়াকে অনেক অনুনয় বিনয় এবং শেষে বেশ চোখ রাঙ্গিয়েই তার ভূখণ্ড ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। আণবিক বম মারণাস্ত্রের বিশেষ করে হাই-ড্রোজেন বোমা, এটম্ বোমা ইত্যাদির ধমকে রাশিয়া চীনের কথায় কর্ণপাত করেন নি, উল্টে চীনকে নানাভাবে ভয় দেখিয়েছে এবং জবর দখল ভূ-খণ্ডগুলি যারা চীনের ন্যায্য প্রাপ্য তাহা ফিরে দেয় নি। এই নিয়ে বিগত ১৯৫০ বৎসর উভয় পক্ষে বেশ মনোমালিন্য এবং পরস্পরের প্রতি-বিদ্বেষভাব প্রায়শই দেখা গেছে। দুই দেশই সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আমেরিকার সহিত চীনের বর্তমানে মাখামাখিটা কিছু বেশী বলেই মনে হয়। চীন তাই এবার রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে অভিলাষী হয়েছে বলে অনেকেই আশংকা করছে।

ভিয়েৎনাম ও কম্বোডিয়ার যে সাম্প্রতিক দুলের লড়াই চলছে, তাতে চীন কাম্বোডিয়ার পক্ষাতে মদৎ দিচ্ছে, যেহেতু ভিয়েৎনামকে রাশিয়া অর্থ, মারণাস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দিচ্ছে। সর্বত্রই চীন ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর বিরোধী কার্যকলাপ ও ক্রিয়াকর্ম দেখা যাচ্ছে যা সত্যিই চীন ও রাশিয়াকে যুদ্ধের মুখোমুখি নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। চীন ও রাশিয়ার যুদ্ধ মানেই এশিয়া ভূখণ্ডে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তাতে এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে আশংকা হয় কারণ ভারতের পররাষ্ট্র নীতি এখন পর্যন্ত মোটেই বলিষ্ঠ নয়। চীন ভারতেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারতের উত্তর সীমান্তের বেশ অনেকটা ভূখণ্ড গ্রাস করে বসেছে এবং যুদ্ধ বিরতির পরও চীন ভারতীয় ভূখণ্ড এখনও জবর দখল করে বসে আছে। চীন তার নিজের ভূখণ্ড রাশিয়ার হাতে বেদখল হয়েছে বলেছে, কিন্তু সে যে ভারতীয় ভূখণ্ড অন্যায়ভাবে জবর দখল করে আছে তার কি ব্যবস্থা নিচ্ছে? ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি যদি সরল ও সঠিক হতো তবে চীনকে আক্রমিক যৌথ পাঠাবার পূর্বে সীমান্ত বিরোধের ফয়সালা অটল বিহারী বাজপেয়ীর আগেই করা দরকার ছিল। ভারতের পক্ষে এখনই সুবর্ণ সুযোগ কারণ চীন এখন রাশিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে নামবে বলে ভারতের সঙ্গে মোলায়েম করতে সাহস পাবে না। এখনই ভারতকে জোর দিয়ে বলতে হবে যে আগে সীমান্ত বিরোধের সঠিক ও ন্যায় সঙ্গত মিমাংসা কর নচেৎ চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব নৈব নৈব চ। আগ্রাসী চীন কখনই ভারতের বন্ধুরাষ্ট্র বলে পরিচিত হতে পারে না। ভারত অতীতে বহুদিন এই লজ্জাকর পরিস্থিতিকে মাথা নিচু করে মেনে এসেছে এখন আর একে মানতে রাজি নয়। ভারত চীনকে সত্যিকার বন্ধুর মত দেখতে চায়—সুযোগ সন্ধানী বন্ধুর ছদ্ম বন্ধুর মত দেখতে চায় না। তাই চীনকে ভারতীয় ভূখণ্ড যা সে জবর দখল করে রেখেছে তা এখনই ছেড়ে দিতে হবে—বাজপেয়ীজীর একথা বলতে এত টাল বাহানা কেন বা কটা দিনের তাই দেশবাসী জানতে চায়। চীন ভারতীয় ভূখণ্ড জবর দখল করে রাখবে আর ভারত তার বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে তাকে বোঝাতে করবে বা তোষণ করবে—এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কি হতে পারে? ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি এত দুর্বল কেন? চীন যখন স্বেচ্ছায় রাশিয়ার সহিত সীমান্ত বিরোধ নিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত—অবশ্য আমেরিকার প্ররোচনায় ও সাহায্যের আশায়, তখন চীন ভারত ভূখণ্ড ছেড়ে দেবে না কেন? চীনকে অতীতে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে—আর নয়।

জওহরলালজী পঞ্চশীল প্রতিষ্ঠায় চীনের সঙ্গে সখ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিব্বতকে চীনের অঙ্গভুক্ত হতে দিতে রাজি হয়ে ছিলেন, কিন্তু চীন সে সখ্যতার যে নিদর্শন দেখিয়েছে ভারত আক্রমণ করে ইতিহাসে তার উদাহরণ বিরল। চীনের মতিগতি খুবই বিপদজনক বলে পূর্বে তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি, কাজেই এখন আর

তাও মিটমাটের না তুলে আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্য চীনের উপর ন্যায়সঙ্গত চাপ সৃষ্টি করা একান্ত দরকার ; নচেৎ ভারতের জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি বিপন্ন হবে। চীন এখন বলোন্মত্ত, সে মদ-মত্ত জানোয়ার। তার অবিমিশ্রকারীতার ফলেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন এবং ভারতই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে কারণ চীন ও রাশিয়ার যুদ্ধে ভারত নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকতে পারবে না কারণ আমেরিকা চীনের পক্ষাবলম্বন করে রাশিয়াকে ধ্বংস করতে এগিয়ে আসবে।

ভারত শত অনিচ্ছা সত্তেও আমেরিকা, বাংলাদেশ, আফগানিস্থান, ইজরাইল, পাকিস্তান ও আরব রাষ্ট্রগুলির চাপে পড়ে মধ্যবর্তী রাষ্ট্রহিসাবে উক্ত চীন রাশিয়া-আমেরিকার যুদ্ধে নেমে পড়তে বাধ্য হবে বলে খুবই আশঙ্কা হয়। চীন ও রাশিয়ার যুদ্ধ মূলতঃ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে কারণ চীনের দিকে যেমন আমেরিকা, ইজরাইল, পাকিস্তান, কাম্বোডিয়া, বাংলাদেশ ইত্যাদি গোড়াতেই জড়িয়ে পড়বে এবং অপরদিকে রাশিয়ার দিকে তেমন ভিয়েৎনাম, আফগানিস্থান, আরবরাষ্ট্রগুলি গোড়াতেই জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে এবং শেষ পর্যন্ত ন্যাটো, সিয়াটোভুক্ত সকল দেশগুলিই যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক এবং সমগ্র যুদ্ধ তখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করবে। তবে আশার কথা এই যে বর্ত্তমান বিশ্বের মানুষ আজো হিরোশিমো ও নাগাশাকিতে আমেরিকার ভৈরবী ও প্রক্ষিপ্ত এটম্ বোমার কথা ভুলে যায়নি। সে এটম্ বোমার ছিল ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়ামের তেজস্ক্রিয় শক্তি আর এখনকার আমেরিকান নিউট্রন বোমা তার চেয়ে শতগুণে শক্তিশালী যা প্রাণীজগৎ নিশ্চিহ্ন করতে মাত্র কয়েক ঘন্টা সময় নেবে—তাই মানুষ যদি পরিপূর্ণ ধ্বংসের পথে পা বাড়াতে না চায় তার প্রথম ও প্রধান কাজ হবে যেমন করেই হোক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে পরিহার করার জন্য আলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে পুরাতন বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি ও উভয় রাষ্ট্রের নায়কগণকে যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক করে দিয়ে উভয়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে সুদৃঢ় ও স্থায়ী করা। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের কথা চিন্তা করে এবং ভবিষ্যৎ প্রজাতির ও বংশধরদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার মানসে চিরকালের মত যুদ্ধকে স্থায়ীভাবে বর্জন করাই হবে বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদের একমাত্র কাজ। মানুষ যদি সত্যই উন্মাদ না হয়ে যায় এবং বর্ত্তমান কালের যুদ্ধ যে কি ভয়ঙ্কর ও বিভৎস আকার ধারণ করে কোটি কোটি নিরীহ নিরপরাধ ও নির্লোভ মানুষকে মুহূর্ত্তে চরম ধ্বংস করতে পারে—সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তা করে ও সজাগ ধারণা থাকে তবে নিশ্চয় পৃথিবীতে আর যুদ্ধ সম্ভব হবে না। মানুষেরই সৃষ্ট ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্র আজ মানুষকেই আতঙ্কিত, ভয়বিহ্বল ও বিচলিত করেছে। তাইতো আমরা আশা করবো, মানুষেরই উপর আস্থা রাখবো, যে মানুষ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে—মানুষের মঙ্গলের জন্য ও সুখী সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ মনুষ্য সমাজ গড়ে তোলার তাগিদে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা থেকে নিজ নিজ দেশ ও জাতিকে সজাগ ও সতর্ক করে চিরদিনের মত যুদ্ধের হাত থেকে মনুষ্য সমাজকে বাঁচাতে সচেষ্ট থাকবে। ইহাই আমাদের প্রার্থনা ও একান্ত কামনা—আশাকরি পৃথিবীতে চির শান্তি বিরাজ করবে। আনবিক মারণাস্ত্র তৈরীই বন্ধ করে দিয়ে, মানুষ সারা বিশ্বে মানব কল্যাণের জন্য অতঃপর আনবিক শক্তি ও সৌরশক্তিকে কাজে লাগাবে। বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবন ও আবিষ্কার মানব ধ্বংস করার জন্য নিশ্চয় নয়, বরং এই সব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও আবিষ্কার যাতে সম্পূর্ণ ভাবে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে ও মানবীয় রোগ জ্বালা নিরাময় করার কাজে সারা বিশ্বে স্থান পায় তাহার ওকালতি করা প্রত্যেকটী সভ্যতার প্রেম প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক রাষ্ট্র-নায়কের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলে বিশ্বাস করি। অন্যথায় বিশ্বের মানবজাতির বিলুপ্তি ও বিরাট অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী। আসন্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কামনা বা পরিকল্পনা সর্বদা বর্জনীয় কারণ মানুষ চায় শান্তি, ধ্বংস নিশ্চয় নয়। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

———

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস]

ছেজিয়ানী গ্রামের মহারাজাই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা রূপে দেখা দিলেন। তিনিই প্রথমে স্থায়ী কৃতির জন্য দশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে এক পত্র লিখে তা জানিয়ে দিলেন। আমরা এই কাজের জন্য মোট পঁচিশ হাজার টাকা তুললাম এবং তা কুষ্ঠাশ্রমে দিয়ে দিলাম। প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টরের নামে এই কুষ্ঠাশ্রমের নামকরণ করা হল। আমাকে আশ্রমের পরিচালক সমিতির একজন সদস্য করা হল, কয়েকবছর পরে—আমি যখন অবসর গ্রহণ করি, তখন বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে আমার স্থানে মনোনীত করি। কুষ্ঠাশ্রমের বর্ত্তমান স্থান নির্বাচনে আমার এক প্রধান ভূমিকা ছিল।

মহারাজার সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব থাকলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একই মন্ত্রে উপাসনা করতাম না, আমাদের মধ্যে সময় সময় মত বিরোধ দেখা দিত। এক সময় একটি বিশেষ ঘটনায় আমাদের মত বিরোধ খুব তীব্র হয়েই দেখা দিয়েছিল, প্রাক্তন লেপটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার চার্লস ইলিয়টের সঙ্গে ছিল মহারাজার খুব বন্ধুত্ব, স্যার চার্লস শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করবেন, এই রকম এক সময়ে তাঁর সম্মানে একটি স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করতে চেয়ে মহারাজা এক প্রস্তাব তোলেন। তিনি আমাকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইলেন। তিনি বেশ কিছুটা কূটনৈতিক চালে। তাঁর সমস্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ও সরল ব্যবহারের পেছনে যথেষ্ট পরিমাণে চাতুর্য্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। আমার কাছে বললেন যে এ স্মৃতি রক্ষার জন্য যে তহবিল গড়ে তোলা হবে তার একটা উদ্দেশ্য হবে রিপন কলেজে একটি অধ্যাপনা বৃত্তির প্রবর্ত্তন করা। কিছুটা প্রলোভনের আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও আমি সোজাসুজি এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকতে অস্বীকার করলাম। আমি বললাম, "মহারাজ, স্যার চার্লস ইলিয়ট জুডি মেটিকিকেসনের দ্বারা নিজেই নিজের সুনাম নষ্ট করেছেন। জন সাধারণ এ রকম একজন শাসন কর্ত্তাকে কোন সম্মান দেখাতে পারেনা। এই রকম কোন প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হওয়া আমার পক্ষে রাজনৈতিক আত্মহত্যার সামিল হবে"। আমার দিক থেকে এই ঘটনার পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটে। এর পরে এ বিষয়ে আমি কোনও কিছু শুনিনি। কিন্তু মহারাজার সঙ্গে আমার এই মত পার্থক্য আমাদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে কোন রকম বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি বা বন্ধুত্ব সম্পর্কের উষ্ণতাকে ঠাণ্ডা করতে পারেনি।

আর্মস এ্যাক্টের উপর ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে যে উজ্জীবিত আলোচনা হয়েছিল; তার জন্য কংগ্রেসের সে অধিবেশন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই অস্ত্র আইনের উপর যে আলোচনা সে সময়ে হয়েছিল তার ফল এ প্রশ্নের উপরে আজও পর্য্যন্ত থেকে গেছে। তখনকার সেই আলোচনা বর্ত্তমানের অস্ত্র-আইন প্রশ্নের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক হীন নয়। অস্ত্র-আইন রদ করার জন্য অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উঠল, আর্মস এ্যাক্ট এবং ভার্নাকুলার প্রেস এক্ট লর্ড লিটনের শাসনকালে এই আইন দুটল প্রবর্ত্তিত হয়। লর্ড লিটনের কালে যে অবিশ্বাসের নীতি স্পষ্টভাবে প্রকট হয়েছিল, এই আইন দুটি তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার পরে লর্ড রিপনের চেষ্টায় সেই অবিশ্বাসের নীতি

দূর হয়। আগেই বলেছি, মিঃ মাণ্টেগু তার নিজ লেবারিয়ান নির্বাচনী প্রচার কার্যের সময় কঠোরভাবে এই আইন দুটির সমালোচনা করেছিলেন। সাধারণ নির্বাচনে তিনি যখন ক্ষমতায় এলেন তখন ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট রদ করলেন, কিন্তু আর্মস এ্যাক্টকে এ দেশের আইনের একটি অংশরূপে বহাল রাখলেন। এই আর্মস এ্যাক্ট সর্বদার জন্য একটি উত্তেজনার কারণ হয়ে থাকল। এই আইন সমাজ-জীবনে সর্বদাই একটা ক্ষতের বেদনার মত অনুভূত হতে থাকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে পুনঃপুনঃ এই বেদনার কথা প্রকাশ পেয়েছে। মাদ্রাজ কংগ্রেসে ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ত্রৈলোক্য নাথ ছিলেন তখনকার দিনে একজন প্রধান আইনজীবী। যদি তার অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু না ঘটত, তাহলে তিনি হয়ত কলকাতা হাইকোর্টের একজন জজ হতেন। ত্রৈলোক্যনাথের সংশোধনী প্রস্তাব এই আইনের রদ চায়নি, চেয়েছিল আইনটি যেন উদারভাবে প্রয়োগ করা হয়। তার প্রস্তাবের মধ্যে এই সুপারিশ ছিল যে স্থানীয় এবং মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট দিলেন তার সঙ্গে অস্ত্র রাখতে পারবেন, এই অনুমতি আইনে দেওয়া হোক। এই প্রস্তাবের উপর খুব উত্তপ্ত আলোচনা হয়। সে আলোচনায় আমি অংশ গ্রহণ করি। আমি এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করি। মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হল। তবে তার মধ্যে একটুখানি পরিবর্তন করা হল এই যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর ক্ষেত্রে সরকার যদি সঙ্গে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করেন, তবে লিখিতভাবে তার কারণ দেখিয়ে তা করতে হবে। আর্মস এ্যাক্ট সম্পর্কে পরে কংগ্রেসের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। কংগ্রেস আর্মস এ্যাক্টের পুরোপুরি রদ আর চাইছে না। চাচ্ছে এর কিছুটা পরিবর্তন এমন পরিবর্তন যাতে এ ব্যাপারে সর্বপ্রকার জাতি-বর্ণগত অযোগ্যতার প্রশ্ন লোপ পায়! ভাইসরয় রূপে লর্ড চেমস ফোর্ড এই নীতি স্বীকার করে নেন এবং মোটামুটি ভাবে তাকে কার্যকরী করা হয়।

১৮৮৭ সালের মাদ্রাজ অধিবেশন ছিল কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র তখন কেবলমাত্র রচিত হচ্ছিল। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রথাও পরিচালনার নিয়ম গুলি এ যাবৎ গড়ে উঠছিল। এই গড়ে ওঠার কালে একটা বড় রকমের সমস্যা ও সংকোচের ভাব দেখা দেয়। বাংলার তাহির পুরের রাজা শশিশেখর এই মর্মে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিলেন যে গোহত্যা নিষিদ্ধ করা হোক। যে কোন সময়ে এবং যে কোন অবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত জন-সমাবেশে এ রকম কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা সুবিবাজনক নয়। তখন তো এটা বিশেষভাবেই অসময়োপযোগী ছিল। স্যার সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেস থেকে দূরে সরেই ছিল। তারা তখন সোজাসুজি জাতীয় আন্দোলনের বিরোধীদল হিসাবে প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশনের অধীনে কাজ করছিলেন। আমাদের সমালোচকগণ জাতীয় কংগ্রেসকে একটি হিন্দু-সংগঠন বলে মনে করতেন। বিরোধী পত্র-পত্রিকাগুলিও আমাদের সেই ভাবেই বর্ণনা করত। জাতির এই মহৎ কর্মপ্রচেষ্টায় আমাদের মুসলমান স্বদেশবাসিগণের সহযোগিতা লাভের জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছি। অনেক সময় আমরা মুসলমান ডেলিগেটদের পথ-খরচ এবং অন্য নানা রকম সুযোগ সুবিধাও দিয়েছি।

সুতরাং এই প্রস্তাবটি আমাদের সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিল। এখন কি করা যায়। একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল। সমাধানটি সকলের স্বার্থই রক্ষা করবে। সমাধান সূত্রটি সর্বসম্মতি ক্রমে নিল। সেই থেকে এই সূত্রটি কংগ্রেসে একটি স্বীকৃত রেওয়াজ রূপে চলে আসছে। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে যদি এমন কোন প্রস্তাব আসে যে প্রস্তাব কোন বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে স্পর্শ করে এবং তা যদি সেই শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ আপত্তিকর বলে মনে করেন, তা হলে, তারা সংখ্যায় লঘু হলেও, সেই প্রস্তাব কংগ্রেস বিবেচনার জন্য গ্রহণ করবে না। কেবলমাত্র অন্য আর একটি ক্ষেত্রে, আমার মনে পড়ে, এই নিয়মটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। সেটি হল পাঞ্জাবের ভূমি হস্তান্তর আইন

সম্পর্কে। লাহোর কংগ্রেসে অধিবেশন কালে এক সভায় এই ভূমি হস্তান্তর আইনের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছিল।

১৮৮৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের কথা, আমার সুস্পষ্ট ভাবেই মনে পড়ে। এলাহাবাদে বসেছিল এই অধিবেশন। এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন এইটিই প্রথম। সেই দিনগুলি ছিল কংগ্রেসের শৈশবের দিন। যে অভিনব উদ্যোগ আয়োজন ও শোভাযাত্রাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার ভিতর দিয়ে একটা বিপুল আবেগ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে এলাহাবাদে এরূপ আর কোন অনুষ্ঠান হয়নি। কয়েকটি ঘটনার জন্য এই উৎসাহ-উদ্দীপনা আরও বেশী দেখা দিয়েছিল। বিরোধিতা বিপক্ষতা একটি নিজ সংগঠনকে যেরূপ নিজেকে গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করে তেমন আর কিছুতেই করেনা। ১৮৮৪ সালে লর্ড রিপনের ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে তার অকৃত্রিম কলভিন তাঁহাতে নবজীবনের আবির্ভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেই কলভিন সাহেবই আজ ফিরে হয়ে কংগ্রেসকে আঘাত হানলেন। এরূপ আঘাত পাওয়া তো কংগ্রেসের জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য। কলভিন লর্ড ডাফেরিন পন্থী। লর্ড ডাফেরিন তার ভাইসরয়ের পদ ছেড়ে যেতবার ঠিক পূর্বক্ষণে কংগ্রেসকে এবং কংগ্রেসের কার্যক্রমকে নিন্দা করে গেলেন এবং মন্তব্য করলেন যে ভারতের শিক্ষিত সমাজ 'অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার মত সংখ্যাল্প' ভারতের সরকারী তার কাজ থেকেই মজির পায়। মিঃ হিউম এক উদ্দীপনাময়ী ভাষায় শিক্ষিত ভারতীয়গণকে কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য আবেদন জানিয়ে যে প্রেসে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন তা যুক্ত প্রদেশের লেপ্টন্যান্ট গভর্নরের ঊষা জাগিয়ে তোলে। তিনি যে কেবলমাত্র লেখনী ধারণ করে বাদ বিতণ্ডায় নেমে পড়লেন তা নয়, এলাহাবাদে যাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হতে না পারে সেজন্যও নানা অসুবিধার সৃষ্টি করলেন। তবে যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ছিলেন একাই একটি বাহিনী। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ আইনজীবী, একজন হৃদয়বান স্বদেশ প্রেমিক একজন বিরাট সংগঠক। তিনি সমস্ত অসুবিধা ও ত্রুটি জয় করলেন এবং এলাহাবাদে কংগ্রেস অধিবেশন হল। এক অর্থে ১৮৮৮ সালে কংগ্রেসের এই এলাহাবাদ অধিবেশন আমরা তরুণের দুঃসাহসিকতার উপরে তার মতোই বিজয় ঘোষণা করল।

বারাণসীর রাজা শিবপ্রসাদ ছিলেন সরকারী কর্মচারীদের বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি ডেলিগেট হয়ে কংগ্রেসের মণ্ডপে ঢুকলেন তার কংগ্রেসে যোগদান করা ছিল একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু এটা ছিল একটা চালাকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই, তিনি যে বক্তৃতা করলেন তাতেই তার অভিসন্ধি ধরা পড়ল, তিনি কংগ্রেসকে আলিঙ্গন দেওয়ার জন্য আসেননি; এসেছিলেন ক্ষতি করতে। তিনি এইরূপ নাটকের কাজ থেকে আচ্ছা রকম উপযুক্ত দৌহিত্র দুনর প্রত্যুত্তর পেলেন। নটন সাহেবের কলমে যে ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ পেল তা রাজা সাহেবকে ম্লান করে দিল।

এলাহাবাদ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন জর্জ ইউল সাহেব। তিনিই হলেন সর্বপ্রথম অ-ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি। তিনি ছিলেন কলকাতার একজন ব্যবসায়ী— এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তা ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্খার প্রতি এরূপ অকপট সহানুভূতিশীল ও উদার মতাবলম্বী ব্যক্তি কলকাতার ব্যবসায়ীগণের মধ্যে খুব কমই দেখেছি। তিনি ছিলেন একজন কঠিন বুদ্ধির ভদ্রমানুষ। সমস্ত কিছু তিনি অন্তর দিয়ে দেখতে পেতেন। তিনি যদি চাইতেন যে কোন ব্যাপারে তাঁকে স্পষ্ট এবং সুলভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে হবে, তাহলে একজন ভদ্রমানুষের প্রকৃতি নিয়েই তিনি নির্দ্বিধায় তা করতেন। তিনি বরাবরই কংগ্রেসের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডে যে ডেপুটেশন যায় সেই ডেপুটেশনকে সাহায্য করে কংগ্রেসকে তিনি উপকৃত করেছিলেন। অবসর গ্রহণের পরে তিনি ব্রিটিশ-কমিটির একজন সদস্য হন। এই ব্রিটিশ কমিটি হল কংগ্রেসের লণ্ডন সংগঠন। সেই কমিটির কাজে তার সক্রিয় ভূমিকার কথা আমার বেশ মনে আছে। তাঁর অকাল প্রয়াণে

ভারতের পক্ষে ইংল্যাণ্ডে প্রচার কার্যের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে বলে তার কংগ্রেসের বন্ধুরা সকলেই বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন।

কংগ্রেস আন্দোলনের ইতিহাসে ১৮৮৯ সালটি একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরই মিঃ ব্রাডলু ভারত ভ্রমণে আসেন তাঁর ভারত ভ্রমণ কংগ্রেসকে নতুন উৎসাহ দান করে। পরের বছর মিঃ ব্রাডলু হাউস অব কমার্স ভারতে শাসন সংস্কার ও আইন পরিষদগুলির পরিবর্তন সম্পর্কীয় তার বিলটি আনয়ন করেন। বোম্বেতে যখন ভ্রমণ করতে যান তখন তিনি সেখানে খ্যাতনামা ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে ভোলেন নি এবং এই বিলের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের অভিমত সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। এই এলাহাবাদ কংগ্রেসে আমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম তা ছাড়া আরও কিছু কাজ আমাকে করতে হয়েছিল। অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য টাকা চেয়ে আবেদন করার ভার দেওয়া হল আমার উপর। আমি যে আবেদন করলাম সে আবেদনে বিস্ময়কর সাড়া পাওয়া গেল। উপস্থিত বিশাল জনতার মধ্যে এক উৎসাহের ঢেউ খেলে গেল এবং এক ঘণ্টার মধ্যে ৬৪ হাজার টাকা চাঁদা উঠলো। এর মধ্যে ২০ হাজার টাকার উপর সভাস্থলেই পাওয়া গেল। যে কোনও গণআন্দোলনের ইতিহাসের মধ্যে এই ঘটনাটি একটি অদ্বিতীয় ঘটনা। সভায় উপস্থিত মহিলারা তাদের হাতের ঘড়ি, এমন কি অলঙ্কারাদিও খুলে দান করলেন। আমার রাজনৈতিক জীবনে এই দিনটির কথা চিরকাল এক অতীব সুখ-স্মৃতির বিষয় হয়ে থাকবে। আরও দুবার দুটি ঘটনা উপলক্ষে এরূপ আবেদন করেছিলাম। তার একটি ১৮৯২ সালে এলাহাবাদে, অপরটি হল লাহোরে ১৯০৯ সালে। এই শেষের বারের আবেদন ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে আবেদনে বোম্বে থেকে যেরূপ উদারভাবে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল সেরূপ আর কোন জায়গা থেকে পাওয়া যায় নি। বোম্বেতে সাড়া পাওয়ার যে দৃশ্য মিঃ ব্রাডলু নিজে দেখে গেছেন। সেই ঘটনার কথা দিয়ে তিনি যে ধারণা নিয়ে গিয়েছেন তা নিশ্চয়ই খাঁটি স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ একটি জাতির রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ সাধনের জন্য তিনি যে নিষ্পৃহভাবে শ্রম স্বীকার করেছেন তাতে আমাদের প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে।

(চলবে)

বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতি

ত্রিষষ্টিতম স্মারক দিবস

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ ঐতিহাসিক বালেশ্বর চাষখণ্ড প্রান্তরে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে মহান্ বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বীর বিপ্লবী-চতুষ্টয়ের আত্মনিবেদনের ত্রিষষ্টিতম পবিত্র স্মারক দিবস উদ্‌যাপিত হইবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সকাল ৯ ঘটিকায় কলিকাতার আজাদ হিন্দ্ বাগে যতীন্দ্রনাথের মর্মর মূর্তির সম্মুখে। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন প্রখ্যাত বর্ষীয়ান বিপ্লবী নায়ক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয়।

আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

নিবেদক—

শ্রী জগদীশ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রী প্রভাংশু ধর চৌধুরী

বিঃ দ্রঃ—১০ সেপ্টেম্বর বালেশ্বর অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তীর্থযাত্রিগণ ৯ সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯ ঘটিকায় হাওড়া হইতে যাত্রা করিবেন। যাতায়াতের ভাড়া কুড়ি টাকা মাত্র।

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীবিনোদ দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাসবিহারী প্রথমে বসন্ত কুমারকে দেরাদুনে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে এক পরিচিত ঔষধের দোকানে চাকুরী দিয়ে রাখলেন। ১৯১২ সালের প্রথম দিকে দিল্লীর দরবার যখন আসন্ন তিনি তাকে দিল্লীতে নিয়ে এলেন। ২৩শে ডিসেম্বর বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ নূতন রাজধানী দিল্লীতে। বিরাট সমারোহে বড় লাটের শোভাযাত্রা যাচ্ছে দিল্লীর চাঁদনীচকের মধ্য দিয়ে। পার্শ্বদেশ এক বাড়ীর বারান্দা থেকে এক বোমা নিক্ষিপ্ত হল। মহাশব্দে বোমা বিস্ফোরণ ঘটল। বড় লাট আহত হয়ে পড়ে গেলেন। মাহুত নিহত হল। শোভাযাত্রা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হল। রাসবিহারী বলেছিলেন বিনা প্রতিবাদে আমরা ইংরেজ রাজশক্তিকে জগৎ সমক্ষে ভারতবাসীর রাজভক্তি প্রচার করতে দেব না। রাসবিহারীর এ সংকল্প সফল হল। রাস্তার ধারের গৃহের বারান্দা থেকে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন মহিলা-বেশী বসন্ত বিশ্বাস। বোমা নিক্ষেপের পরে বসন্ত বিশ্বাস দিল্লীতেই বাস করতেন। মাঝে মাঝে দেরাদুন গিয়ে রাসবিহারীর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে আসতেন। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে রাসবিহারী এবং দিল্লী সংগঠনের আমীরচাঁদ, আউধবিহারী, বালমুকুন্দ এবং দীননাথের এক মিলিত বৈঠকে স্থির হয় যে জনসাধারণের মধ্যে বৈপ্লবিক উত্তেজনা সৃষ্টি করবার জন্ত 'লিবার্টি' নামে এক ইংরেজী ইস্তাহার প্রচার করা হবে। ইস্তাহার লিখতেন আউধ-বিহারী। কপুর তলায় এই ইস্তাহার মুদ্রিত হত। ভারতের সর্বত্র ইংরেজী ভাষায় লিবার্টি ইস্তাহার প্রচারিত হত। ইস্তাহারটি ছিল এইরূপ বিপ্লব মানুষে করে না। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভগবানের ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল দত্ত, মদনলাল ধিংড়া প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ভগবানই নিজের কাজ করছেন। যে ভগবান এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করেছেন তিনিই দিল্লীতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। ভারতের অমর শহীদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দলে দলে এগিয়ে আসুন। তবেই তাদের ঋণ শোধ হবে বসন্তকুমার দিল্লীতে আমীরচাঁদের গৃহে বাস করতেন। সুতরাং দিল্লীর বিপ্লবীরা সকলেই তাকে চিনতেন।

এদিকে আসামের অরুণাচল আশ্রমের ধর্মগুরু ঠাকুর দয়ানন্দের আশ্রমকে বিপ্লবী আড্ডা মনে করে এক দিন মৌলবী বাজারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার গর্ডন সেখানে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী সহ হানা দেন। ঠাকুর দয়ানন্দের শিষ্যগণ পুলিশ বাহিনীকে আশ্রমে প্রবেশ করতে বাধা দেন। ফলে পুলিশের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। তারা বলপূর্বক আশ্রমে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশ গুলি চালায়। ঠাকুর দয়ানন্দের প্রধান শিষ্য মহেন্দ্র-নাথ দে এবং অন্য তিনজন নিহত হন। ঠাকুরের শিষ্য দলের বিশ্বাস ছিল যে তারা ভগবানের আশীর্বাদপুষ্ট। সুতরাং তাদের গায়ে গুলি লাগবে না। এই বিশ্বাস বলে দয়ানন্দ ঠাকুরের শিষ্যগণ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আশ্রমের তুলসীতলার মাটি গায়ে মেখে পুলিশ ও সৈন্য বাহিনীর গুলির সম্মুখীন হন। ফলে মহেন্দ্রবাবু এবং অন্য তিনজন নিহত হন। ঠাকুর দয়ানন্দ এবং অন্য কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

একজন ধর্মগুরুর উপর এই অত্যাচারের সংবাদ

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে ভারতের সর্বত্রই এক অভূতপূর্ব আতঙ্কের সঞ্চার হয়। রাসবিহারী অনুশীলন নেতৃবর্গকে বলেন যে বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে সরকার পক্ষের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে গর্ডনকে হত্যাকরে বিপ্লবীদলকে জন-প্রিয় করার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। সকলেই রাসবিহারীকে সমর্থন করেন। এ সম্পর্কে চন্দন-নগর বিপ্লবীদলের বিশিষ্ট নেতা শ্রীমতিলাল রায় বলেন, 'একদিন অনুশীলনের বাদুড়বাগান বস্তীতে এ নিয়ে কথা হচ্ছিল আমি বললাম ম্যাজিষ্ট্রেট্ গর্ডনের জীবননাশই এর একমাত্র প্রতিকার। অমৃত হাজরা প্রমুখ অনুশীলন সমিতির সকলেই আমার কথায় সায় দিল। এর পরেই গর্ডন হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিয়ে যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মৌলবীবাজার যাত্রা করেন। কিন্তু সাহেবের প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গনে লাফাইয়া প্রবেশ করিবার সময় অকস্মাৎ বোমা বিস্ফোরণে যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। যোগেন্দ্রনাথের স্মৃতি আমরা চিরদিন গৌরবের সঙ্গে বহন করিব।' যোগেন্দ্রনাথের আত্মদান যাতে ব্যর্থ না হয় সেইজন্য গর্ডন হত্যার দ্বিতীয়বার চেষ্টা চলল। এদিকে বোমা বিস্ফোরণে যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হওয়াতে পুলিশ বুঝল বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে হত্যা করার চেষ্টা চলছে। ফলে মিষ্টার গর্ডনকে আসাম থেকে সুদূর পাঞ্জাবে বদলী করা হল। লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে এই সময় তিনি বাস করতেন। স্থির হয় যে বসন্ত বিশ্বাসের উপর এই হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করার ভার দেওয়া হবে। একটি বোমা হাতে দিয়ে বসন্ত বিশ্বাসকে লাহোরে পাঠানো হল। লরেন্স গার্ডেনে প্রবেশ করে তিনি বোমাটি সেখানে স্থাপন করে এলেন। কিন্তু মিষ্টার গর্ডনের আসার আগেই জনৈক চাপরাশী এসে জুতাপায়ে বোমাটিকে আঘাত করে। ফলে বোমা বিস্ফোরণে চাপরাশীর মৃত্যু হয় এবং সাহেব রক্ষা পান। বোমা স্থাপন করে বসন্ত বিশ্বাস তখনও বেশী দূরে যান নাই। পুলিশ রাস্তায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৯১৩ সালের ১৭ই মে লাহোর লরেন্স গার্ডেনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশ সন্ধান করে জানতে পারেন বসন্ত বিশ্বাস দিল্লীতে আমীর চাঁদের গৃহে বাস করতেন। এর কিছু দিন আগে ২৯৬/১ আপার সারকুলার রোডে অনুশীলনের রাজাবাজার কেন্দ্রে অমৃত হাজরা গ্রেপ্তার হওয়ার সময় গোয়েন্দা পুলিশ শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র সেখান থেকে একটি প্লটিং প্যাড নিয়ে গিয়েছিলেন এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এর ফলে দিল্লীর ঘটনার সঙ্গে লরেন্স গার্ডেনের ঘটনা যোগ করা সহজ হল এবং দিল্লীর হর্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ লরেন্স গার্ডেনে বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতির যোগাযোগ সম্পর্কেও পুলিশ সন্ধান পেল। আমীরচাঁদ এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র অবধবিহারী অবনীনাথকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। অবনীনাথের স্বীকারোক্তির ফলে ব্যাপক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হল এবং এই ষড়যন্ত্রের নেতা যে রাসবিহারী পুলিশ তাও জানতে পারল। বসন্ত বিশ্বাস গ্রেপ্তার হতেই রাসবিহারী ফেরার হয়েছিলেন। এবারে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে আসামী করবার জন্য চেষ্টা চলতে লাগল। তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য বারোহাজার পঁচিশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার ভার দেওয়া হল শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্রের উপর। এই মামলায় আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, আউধবিহারী এবং বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসী হল। রাসবিহারী এবং বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসী হল। রাসবিহারী যে হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টার নায়ক এবং আমীরচাঁদ, আউধ-বিহারী প্রভৃতির সাহায্যে তিনি যে ঐ কার্য্য করেছেন তাও পুলিশ জানতে পারে। (চলবে)

প্রয়াত সতীর্থ বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
ও
ছাত্র আন্দোলন

১৯২১ সালে গান্ধীজীর আন্দোলনে বাংলার ছাত্রদল অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় যে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়াছিল তাহা ছিল মূলত দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান—তখনকার বাণী ছিল :—

Education may wait, but SWARAJ cannot.

বলা বাহুল্য যে বঙ্গভঙ্গের পর হইতেই (১৯০৫) যুবক ও ছাত্রদল বরাবরই জাতীয় আন্দোলনে—বৈপ্লবিক সংগঠনে ও জনহিতকর কাজে বহুলাংশে নিয়ত থাকিলেও তাহাদের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন এবং তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতির উদ্দেশ্য লইয়া বাংলাব্যাপী কোন স্থায়ী ছাত্র সংস্থা গঠিত হয় নাই—১৯২৮ সালের নিখিল বঙ্গছাত্র সমিতি (A. B. S. A) ই প্রকৃত পক্ষে এই পথে প্রথম পদক্ষেপ এবং প্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন ইহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম এবং প্রথম সাধারণ সম্পাদক।

১৯২৫ সালে তরুণ বীরেন্দ্রনাথ ··· (উত্তরবঙ্গ) হইতে I. Sc. পাশ করিয়া আসিয়া যাদবপুরে Bengal Technical এ Chemical Engineering বিভাগে ভর্তি হন, তৎপূর্ব হইতেই তিনি অনুশীলন সমিতির সক্রিয় কর্মী এবং স্বদেশহিতব্রতে উদ্বুদ্ধ যুব ও ছাত্র সংগঠনের কল্পনা তাহার মনে বিশেষ ভাবে মুদ্রিত ছিল—যাদবপুর কলেজে যোগদানের পর দ্বিতীয় বৎসরই College Union এর প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ঐ সময় (১৯২৩-২৪) হইতে প্রয়াত দেশকর্মী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতির উদ্যোগে Calcutta Students Association নামে একটি ছাত্র সংস্থা গড়িয়া উঠিতেছিল—ইহার কর্মক্ষেত্র কলিকাতা সহরতলীর মধ্যে সীমিত ছিল এবং Students নামক একটি ইংরাজী পত্রিকাও কিছুদিনের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯২৭ সালে বীরেন্দ্রনাথ ও বর্তমান "বিপ্লবী বাংলার" সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি শ্রীজয়দীপ চট্টোপাধ্যায় Jadavpur College of Technology র প্রতিনিধি হিসাবে ঐ Association এর কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন—ইহাতে বীরেন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র অধিকতর প্রশস্ত হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে ১৯২৮ সালে ভারতে Simon Commission আসার প্রস্তাব ঘোষিত হয় এবং জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঐ কমিশন বয়কট করা স্থির হয়। ঐ কমিশনের বোম্বাই অবতরণের তারিখ ছিল, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ এই উপলক্ষে বীরেন্দ্র প্রভৃতির উদ্যোগে Calcutta Student Association এর তরফ হইতে কলিকাতায় ছাত্র ধর্মঘট ঘোষণা করে এবং ঐ দিন এই সংস্থার বহু সদস্য Presidency College এর Gate এ পিকেটিংরত থাকা কালীন তাহাদের সাথে পুলিসের সংঘর্ষ হয় ফলে কলেজের অন্যতম মেধাবী ছাত্র ও Presidency College Union এর সম্পাদক প্রয়াত প্রবোধকুমার ঘোষাল গুরুতর রূপে আহত হন—

College Square এ বিরাট ছাত্র সমাবেশ হয় এবং বাংলা ব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পরিপূর্ণ সফল হয়। ভীত কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ ও হিন্দু হোষ্টেল বন্ধ করিয়া দেয় এবং উদ্যোক্তা সন্দেহে কিছু ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ছাত্রদের এই সঙ্কটের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র উদ্যোগী হইয়া ১২১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে নাড়াগোপালের মুখার্জের বিরাট বাড়ীতে দিনের পর দিন বিভিন্ন কলেজের বহু ছাত্র মিলিত হইয়া বাংলা ব্যাপী একটি ছাত্র সংহতি গঠনের নিরলস চেষ্টা চলিতে থাকে—এই সময় বীরেন্দ্রনাথের অবদান সম্বন্ধে Student Fight for Freedom পুস্তক হইতে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—

"Parallel with the group of Presidency College. Sree Birendra Nath Das Gupta, a student of Jadavpur Engineering College and member of the Executive Committee of the Calcutta Students Association had collected a band of students around him and they were working unassumingly to build up a Students Organisation. He had already brought out a Bengali Journal "ছাত্র" "Chatra" to give expression to the deals of the student movement. This eventually became the official journal of A. B. S. A." তাহার অন্যতম সহকর্মী প্রয়াত সুনীলচন্দ্র সেন ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক।

বহুবাজারের বাসাটি এই সমস্ত সম্মিলিত ছাত্রদের কর্মকেন্দ্র হইয়া উঠে এবং Albert Hall এ ১৭।২।২৮ এ ছাত্রদের এক সাধারণ সভায় নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি গঠনের জন্য তিন জন সদস্য লইয়া একটি আহ্বায়ক কমিটি নিয়োগ করা হয় বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন উহার অন্যতম সদস্য। এ কমিটিকে পরবর্তী সাধারণ সভায় সাধারণ পরিষদে পরিবর্তিত করা হয় এবং বীরেন্দ্র নাথ অন্যান্য সদস্যদের সাথে ঐ গঠনের কাজে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং কার্যতঃ যাদবপুর College এ ছাত্র থাকিলেও তাঁর বিদ্যাচর্চা মোটামুটি ভাবে ত্যাগ করেন।

প্রাথমিক প্রস্তুতির পর নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির প্রথম অধিবেশনের জন্য Reception কমিটি গঠন করা হয়। বীরেন্দ্রনাথ তাহার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

স্বর্গত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ১৯২৮ সালের ২৫শে হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর. পর্য্যন্ত বর্ত্তমান প্রজ্ঞানন্দ পার্কে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অধিবেশন সমাপ্ত হয় এবং বীরেন্দ্রনাথ ১ বৎসরের জন্য এই নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এখানে ঐ সংস্থার আদর্শ গঠনবিধি ও কর্ম প্রণালি লইয়া আলোচনা করিবার অবকাশ না পাইলেও, উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যাদবপুর College of Technology প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র বিভিন্ন সময়ে নানা ভাবে এই গঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া, কঠোর ত্যাগ ও দুঃখ কষ্ট বরণ করে—এবং ইহার মূলে বীরেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও সংগঠন ক্ষমতা বহুলাংশে নিহিত ছিল।

১৯২৯ সালে ছাত্র সমিতির কর্মতৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন জেলায় পৃথকভাবে বার্ষিক সম্মেলন করা হয় কিন্তু ১৯২৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ডাঃ মহঃ আলমের সভাপতিত্বে বৈষনবসিংহ নগরে অনুষ্ঠিত A. B. S. A. দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন রাজনৈতিক জটিলতার ফলে অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে প্রথম দিনেই পরিত্যক্ত হয়।

ইহার পর ২১।১২।২৯ তারিখে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় A. B. S. A. এর কার্যকরী সমিতি পুনর্গঠিত করা হয় এবং এইবারও বীরেন্দ্রনাথ সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বৎসরে 3rd

February ১৯৩০ প্রথম Students Day উদ্‌যাপনের স্মারক হিসাবে A. B. S. A তাহাদের দ্বিপ্রাহিক ইংরাজী পত্রিকা "India To-morrow" প্রকাশ করেন। প্রাক্তন সভাপতি ও প্রয়াত প্রমোদকুমার চৌধুরী ও সতীর্থ শ্রী অমরেন্দ্র নাথ রায় ইহার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

অতঃপর গান্ধীজীর Civil disobedience-এর সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া আসে এবং বাংলার ছাত্রসমাজ কিভাবে উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহা স্থির করার জন্য একটি পর্যবেক্ষক কমিটি গঠন করা হয়। বীরেন্দ্রনাথও এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। তাহাদের পরামর্শে A. B. S. A ৩।৪।৩০ তারিখে কলিকাতার প্রায় ১০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে একটি Convention আহ্বান করে। প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে Iidia Tomorrowতে গান্ধীজীর Message বাহির হয়—

"Every revolution in modern time had found the stndents in the fore front". ১১।৪।৩০ সে গান্ধীজীর নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিয়া সাধারণ সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ টেলিগ্রামে এই উত্তর পান "You wire, strike useless, Voluntary Boycott of Schools and Colleges advised. No compulsion permissible.

এইরূপ নানাবিধ বিচার বিবেচনার পর Working Committeeর সম্মতি লইয়া A. B. S. A, সদস্যগণ একটি "Civil Desobedience Council গঠন করেন এবং পরিপূর্ণভাবে আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কয়েক সহস্র কর্মী নানাভাবে কারাবরণ ও নির্যাতন সহ্য করেন। সাধারণ সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথও ১৯৩০ সালের জুন মাসে ধৃত হইয়া B. C. L. Act-এ দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকেন।

এইখানে Dr. Triguna Sen-এর প্রদত্ত প্রশস্তিটি—

"The Association took a leading part in the C. D. Movement in 1930—33 and the History of A. B. S. A is truly a record of the organising capacity, the patriotism and self sacrifice of the stndents of Bengal" উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গ শেষ করা হইল।

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'কলিতজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল, বি (কলি :) এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ব্যতীত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক ন্যূনপক্ষে ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা :

পি-৩৪, কাননগো পার্ক, পড়িয়া, ২৪ পরগণা
৫ নং বাসরুট, বৈকবঘাটা ষ্টপ।

RgedNo. R. M .24911/71 | Biplabi Bangla | Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষান্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

C136

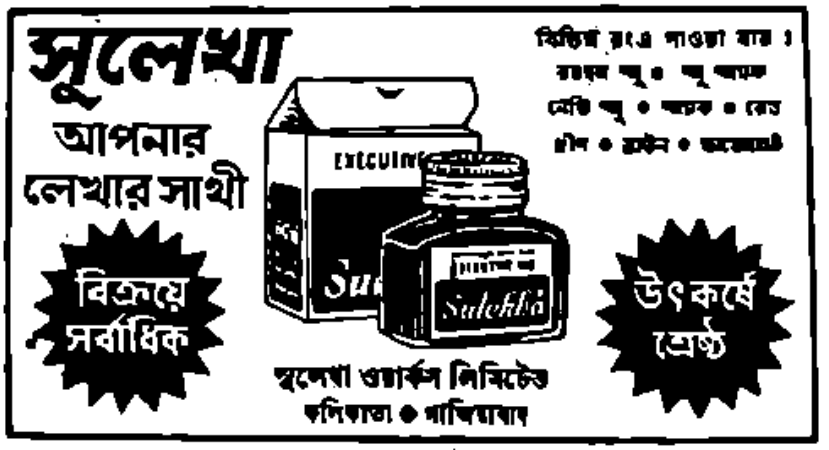

2 9 AUG 1978

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅনাদীনাথ ভট্টাচার্য্য (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীসাধি শঙ্কর রায়চৌধুরী
বিপ্লবী সংঘের প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেহালা—শ্রীঅগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত । প্রচার সচিব—শ্রীঅমীর গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্য্যালয় :—৪নং রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯